রাহে বেলায়াত

ও রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিক্র-ওযীফা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ
www.assunnahtrust.com

الطريق إلى ولاية الله والأذكار النبوية
تأليف د. خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

রাহে বেলায়াত

ও রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিক্‌র-ওযীফা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট ভবন
পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইলঃ ০১৭১১১৫২৯৫৪, ০১৯২২১৩৭৯২১

বিক্রয় কেন্দ্রঃ ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৯৮৬২৯০১৪৭

প্রথম প্রকাশঃ শাওয়ালঃ ১৪২৩ হি, পৌষ ১৪০৯ হিজরী বঙ্গাব্দ, ডিসেম্বর ২০০২ খৃস্টাব্দ
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণঃ
রজব ১৪৩৪ হিজরী, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৯ হিজরী বঙ্গাব্দ,
মার্চ ২০১৩ ঈসায়ী

হাদিয়া
৩৬০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

রাহে বেলায়াতের যিকর ও দুআগুলোর বিশুদ্ধ উচ্চারণের সিডি/মেমোরি কার্ড পৃথকভাবে সংগ্রহ করুন অথবা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করুন।

ISBN: 978-984-90053-1-5

RAHE BELAYAT (The way to Friendship of Allah) by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. 6th eddition March 2013. Price TK 360.00 only.

রাহে বেলায়াতের ১ম সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে দেওয়া

সিদ্দিক বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র শেরে ফুরফুরা

মাও. আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী আল-কুরাইশী সাহেবের

বাণী ও নসীহত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ, আমার নির্দেশে ও অনুপ্রেরণায় "রাহে বেলায়াত" নামের এই বইটি লিখেছে আমার জামাতা খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর। কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বইটি লেখা হয়েছে। আমার সকল মুরীদ এবং যারা আমাকে ভালবাসেন, আমার পরামর্শকে গুরুত্ব দেন বা আমার নিকট থেকে শিক্ষা নিতে আগ্রহী তাঁদের সকলের প্রতি আমার আবেদন যে, এই বইটিকে নিজের আমলের জন্য সদা সর্বদা পাঠ করবেন ও পালন করবেন।

সকলের কাছে আমার অনুরোধ যে, যদি আল্লাহর পথের পথিক হতে চান, আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, রহমত, বরকত ও নাজাত লাভের আগ্রহ মনে থাকে তাহলে নিম্নে বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখুন:

প্রথমত, বিশুদ্ধভাবে তাওহীদ ও রিসালতের উপর ঈমান আনুন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের আকীদা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা যা ইমাম আবু হানীফার (রহ) "ফিকহুল আকবার", ইমাম তাহাবীর (রহ) "আকীদায়ে তাহাবীয়া" ও অন্যান্য প্রাচীন ইমামগণের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেই অনুসারে নিজেদের আকীদা গঠন করুন। পরবর্তী যুগের বিদ'আত ও বানোয়াট আকীদা বর্জন করুন। সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদ'আত ও ইলহাদ থেকে আত্মরক্ষা করুন।

দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার হারাম উপার্জন পরিহার করুন। ফরয ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। সকল কবীরা গোনাহ ও হারাম বর্জন করুন। কোনো মানুষ অথবা প্রাণীর হক (অধিকার) নষ্ট করা বা ক্ষতি করা বিষবৎ পরিত্যাগ করুন।

তৃতীয়ত, মনকে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মতৃপ্তি, জাগতিক সম্মান, প্রতিপত্তি বা টাকা-পয়সার লোভ থেকে যথাসম্ভব পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা সতর্কতার সাথে চেষ্টা করুন। এজন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওফীক চেয়ে কাতরভাবে দু'আ করুন। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সাথে হাশি তামাশা বা গল্পগুজব যথাসম্ভব কম করুন।

চতুর্থত, নফল ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করুন। মানুষের সেবা, উপকার ও সাহায্য জাতীয় কাজ যথাসম্ভব বেশি করুন। নফল সালাত যথাসম্ভব বেশি আদায়ের চেষ্টা করবেন। বিশেষত তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও মাগরিবের পরে কিছু নফল সালাত (আওয়াবীন নামে পরিচিত) সর্বদা পালন করবেন।

নফল সিয়াম বেশি পালনের চেষ্টা করুন। বিশেষত প্রত্যেক সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার, প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথমে, শেষে এবং ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সিয়াম নিয়মিত পালন করবেন। এছাড়া আরাফাতের দিনের সিয়াম ও আশুরার সিয়াম পালন করবেন। নফল দান বেশি করার চেষ্টা করবেন। দান করতে সক্ষম না হলে মানুষের বেশি বেশি সেবা ও উপকার করবেন, যা আল্লাহর নিকট দান হিসাবে গণ্য হবে। সকলেই কুরআন কারীম তিলাওয়াত শিখে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবেন। সাথে সাথে অর্থ বুঝার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। তাহাজ্জুদের পরে বা ফজরের পরে নিয়মিত কয়েক পৃষ্ঠা তিলাওয়াতের অভ্যাস বজায় রাখবেন।

পঞ্চমত, এই গ্রন্থে বর্ণিত সকল যিক্র-ওযীফা নিয়মিত পালন করবেন। সকল দু'আ, মুনাজাত ও যিক্র বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করে তা নিয়মিতভাবে পালন করবেন। যারা সকল দু'আ ও ওযীফা মুখস্থ ও পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন না বা মুখস্থ করতে দেরি হবে বলে মনে করছেন, তাদের জন্য আমি নিম্নরূপ ওযীফা পালনের নসীহত করছি:

(ক). ফজরের সালাতের পরে এবং মাগরিবের সালাতের পরে এই বইয়ের ৭১, ৭২, ৭০, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১২ ও ১১৬ নং যিক্র পালন করবেন। অর্থাৎ, ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহ', ১ বার 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম', ১ বার 'লা ইলাহা ... কাদীর', ১ বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার করে তিন (কুল), ১০০ বার করে ৪ তাসবীহ, ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী', ৩ বার 'সুবহানাল্লাহি ... কালিমাতিহী', ১০ বার সালাত (দরুদ), ৩ বার 'বিসমিল্লাহি ... ', ৭ বার 'হাসবিয়াল্লাহ..', ৩ বার 'রাদীতু..', ১ বার 'ইয়া হাইউ ..', ১ বার 'আল্লাহুম্মা ইন্নী..'। এরপর যতক্ষণ সম্ভব বসে নফী ইসবাতের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিক্র করবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের ও সকল মুসলিমের জন্য দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ ও বরকত চেয়ে মুনাজাত করবেন। সকল মুসলিম মুর্দা, বিশেষত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আখিরাতের উন্নতি চেয়ে দু'আ করবেন।

(খ). কর্মময় দিনের ব্যস্ততার মধ্যে সর্বদা বেশি বেশি ১, ৪, ৯, ১০, ১৩, ১৭, ১৮ ও ১১৭ নং যিক্র পালন করবেন।

(গ). যোহর ও আসর সালাতের পরে : ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ নং যিক্রগুলি পালন করবেন। অর্থাৎ, ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহ', ১ বার 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... ', ১ বার 'লা-ইলাহা ... কাদীর', ১ বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার করে তিন (কুল), ১০০ বার করে ৪ তাসবীহ।

(ঘ). ইশা'র সালাতের পরে যোহর ও আসরের সালাতের অনুরূপ ওযীফা পালন করবেন। ইশার সালাতের পরে বা তাহাজ্জুদের পরে যথাসম্ভব বেশি করে সালাত (দরুদ) পাঠ করবেন। সম্ভব হলে অন্তত ১০০ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের, সকল জীবিত, মৃত মুসলমান ও মুরব্বিগণের জন্য দোওয়া করবেন।
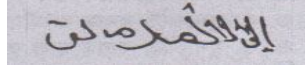
(ঙ). বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর আগে ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১৩১, ১৩৯ ও ১৪০ পালন করবেন। অর্থাৎ, ১০০ তাসবীহ, ১

বার 'আয়াতুল কুরসী', ১ বার 'সূরা বাকারার' শেষ দুই আয়াত, ১ বার সূরা কাফিরূন, ৩ বার করে 'তিন কুল', ৩ বার 'আসতাগফিরুল্লাহা', ১ বার 'আসলামতু নাফসী...'।

এই ওযীফা প্রথম পর্যায়ের জন্য। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সকল যিক্‌র ও দু'আ মুখস্থ করে তা উপরের অযীফার অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন।

মাসনূন পদ্ধতিতে নিয়মিত যিক্‌রের মাজলিস কায়েম করুন। যিক্‌রের মাজলিসে যথাসম্ভব আল্লাহর ভয়ে কাঁদাকাটা ও তওবা বেশি করে করবেন, আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মহব্বত এবং কুরআন-হাদীসের সহীহ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবেন। আল্লাহর দরবারে দু'আ করি – তিনি যেন এই ওযীফার দ্বারা সকল যাকিরের পরিপূর্ণ উন্নতি, বরকত ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং কবুল করে নেন।

আহকারুল এবাদ,

আবুল আনসার সিদ্দিকী
(পীর সাহেব, ফুরফুরা)

দ্রষ্টব্যঃ এ বাণীটি প্রথম সংস্করণে দেওয়া। নতুন সংস্করণে যিকরের নম্বরগুলো পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

জড়বাদী ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী চাপে প্রভাবিত হয়ে পড়ছেন বিশ্বাসী মানুষেরাও। একদিকে যেমন অসংখ্য ভোগবাদী জড়বাদী মানুষ ভোগের অসারতা ও আত্মার শূন্যতার পীড়নে ফিরে আসছেন বিশ্বাসের পথে, অপরদিকে বিশ্বাসীদের জীবনে পড়েছে জড়বাদের ছায়া। বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতা, আন্তরিকতা, মহান স্রষ্টা ও তাঁর প্রিয়তমের (ﷺ) প্রেমের আকুলতা থেকে আমরা অনেকেই বঞ্চিত। আমরা অনেকেই কিছু কিছু ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেও এগুলোর আত্মিক প্রভাব আমরা পুরোপুরি লাভ করতে পারছি না। আমাদের ইসলামী জ্ঞানচর্চা অনেক সময় তর্কে পরিণত হয়ে যায়, আমাদের আধ্যাত্মিকতা হয়ে পড়ে ভণ্ডামী ও বিভ্রান্তিপ্রদ। এ সময়ে দরকার এমন কিছু কর্ম যা আমাদের হৃদয়গুলিকে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর ভালবাসায় আকুল করবে। হৃদয়কে ভরে দেবে প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতায়। যা আমাদের আত্মিক বিকাশকে সুমহান করবে, সত্যিকারের তাকওয়া অর্জনে সহায়ক হবে। মহামহিম প্রভুর সন্তুষ্টি, প্রেম, ভালবাসা, নৈকট্য বা বেলায়াতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর বান্দাকে। ধন্য হবে নগণ্য সৃষ্টি তাঁর মহান প্রভুর প্রেমের পরশে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, বিশুদ্ধ ঈমান ও পরিপূর্ণ তাকওয়া বা মহান আল্লাহর নিষেধকৃত সকল বিষয় বর্জনই তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স বা আত্মশুদ্ধি এবং বেলায়াত বা আল্লাহর নৈকট্য ও প্রেমের পথ। হাদীস শরীফে আল্লাহর বেলায়াত বা নৈকট্যের পথের কর্মকে দুভাগ করা হয়েছে: ফরয ও নফল। ফরয পালনের পাশাপাশি অবিরত নফল ইবাদত করার মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর নৈকট্য ও প্রেম অর্জন করে। এ বইটিতে সংক্ষেপে আত্মশুদ্ধি ও বেলায়াতের এ পথ সম্পর্কে এবং বিস্তারিতভাবে নফল ইবাদত ও আল্লাহর যিক্‌র, দু'আ-মুনাজাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে আমরা দেখি যে, আল্লাহর পথে চলতে ফরয ইবাদতগুলিও আল্লাহর যিক্‌র হিসাবে গণ্য। এছাড়া আল্লাহর পথে চলার নফল ইবাদতের অন্যতম ইবাদত মহান রাব্বুল আলামীনের যিক্‌র করা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর বাণী পাঠ করা, তাঁর মহান হাবীব, মানবতার মুক্তির দূত, সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর সালাম ও সালাত (দরুদ) প্রেরণ করা। এ সবই 'আল্লাহর যিক্‌র'-এর অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুসারে, 'আল্লাহর যিক্‌র' বিশ্বাসীর জীবনের মহাসম্পদ। মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের অন্যতম পথ। মহাশত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার অন্যতম উপায় আল্লাহর যিক্‌র। চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও হতাশা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম আল্লাহর যিক্‌র। ভারাক্রান্ত মানব হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ, বিরক্তি, অস্থিরতা ইত্যাদির মহাভার থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় আল্লাহর যিক্‌র। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের কামনা ও তাকওয়াকে হৃদয়ে সঞ্চারিত, সঞ্জীবিত, দৃঢ়তর ও স্থায়ী করার অন্যতম উপায় আল্লাহর যিক্‌র। পার্থিব লোভ ও ভণ্ডামী থেকে হৃদয়কে মুক্ত করার মাধ্যম আল্লাহর যিক্‌র। জাগতিক ভয়ভীতি ও লোভলালসা তুচ্ছ করে আল্লাহর পথে নিজেকে বিলিয়ে দিতে, তাঁর কালেমাকে উচ্চ করতে মুমিনের অন্যতম বাহন আল্লাহর যিক্‌র।

আল্লাহর যিক্‌র সম্পর্কে আজকাল মুসলিম সমাজে দ্বিবিধ অনুভূতি বিরাজমান। এক শ্রেণীর ইসলাম-প্রিয় ধার্মিক মুসলিম 'যিক্‌র-আযকার' বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেন না। বরং অনেকটা অবহেলাই করেন। অনেকে আন্দাজের উপর বলেন, যিক্‌রের ফযীলতের হাদীস সব যয়ীফ, এর কোনো গুরুত্ব নেই। কেউ বা বলেন, কর্মই তো যিক্‌র, মুখে বারবার আউড়ালে কী হয়? কেউ বা বলেন – আগে কালেমার প্রতিষ্ঠা, ইসলামের প্রতিষ্ঠা, এরপর কালেমার যিক্‌র। সমাজে ইসলাম নেই এখন যিক্‌র করে কী হবে? এভাবে বিভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে অবহেলা প্রকাশ করা হয়।

যিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা করছি বা বই লিখছি শুনলে তারা বিরক্ত হন। তারা মনে করেন, যেখানে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহ মার খাচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে চলছে গভীর ষড়যন্ত্র, সে সময়ে 'অস্তিত্ব রক্ষাকারী বিষয়' নিয়ে আলোচনা না করে এ সকল সেকেলে বা একান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখার কী প্রয়োজন?

আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের আদর্শকে সামনে না রেখে কুরআন ও হাদীসের সামান্য-কিছু কথা শিখে তার সাথে মনের আবেগ ও মাধুরী মিশিয়ে নিজ নিজ মস্তিষ্কে ইসলাম তৈরির ফল এগুলি। মুমিনের জীবনে ঈমান বৃদ্ধি, তাকওয়া বৃদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি যদি অস্তিত্ব রক্ষাকারী বিষয় না হয় তা হলে কি শুধু গরম অন্তঃসারশূন্য বুলি আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই? যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবন ও কর্মকে আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহলে দেখতাম – পরিবারে, সমাজে, দেশে ও বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আগে-মধ্যে-পরে, কর্মের যিক্‌রের সাথে- সর্বদা তাঁদের জিহ্বা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকত। প্রতিদিন সকল ইবাদত ও কর্মের পাশাপাশি হাজার হাজার বার তাসবীহ, তাহলীল ও অন্যান্য যিক্‌র তাঁরা পালন করতেন।

অপরদিকে অন্য কিছু ধার্মিক ইসলাম-প্রিয় মানুষ যিক্‌রকে ভালবাসেন, যিক্‌র করেন এবং নিজেদেরকে যাকির বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের যিক্‌র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যিক্‌রের সাথে মিলে না। যিক্‌রের শব্দ আলাদা, পদ্ধতি আলাদা ও নিয়ম আলাদা। এদের সমস্যাও একই: রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসাবে গ্রহণ না করে, তাঁদের যিক্‌র ও যিক্‌র পদ্ধতির দিকে না তাকিয়ে, যিক্‌র সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত ও হাদীসের উপর নির্ভর করে, তাতে নিজ নিজ বিদ্যা, যুক্তি, প্রজ্ঞা ও রঙ মিশিয়ে তা পালন করছেন তারা। তারা ভাবছেন এভাবেই তারা এ সকল আয়াত ও হাদীসের উপর সর্বোত্তমভাবে আমল করছেন। 'যিক্‌র' শব্দটিই তাদের কাছে

গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী শব্দে, কী-ভাবে, কখন, কোন্ পদ্ধতিতে যিক্র করলেন বা করতে বললেন সে বিষয়টি তাদের কাছে ধর্তব্য নয়। তাদের যিক্রের ধরন-পদ্ধতি এবং যিকিরে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগুলো অধিকাংশই সুন্নাত বিরোধী।

যিক্র শব্দটির যত্রতত্র অপপ্রয়োগ হচ্ছে। যিক্রের নামে এমন শব্দ ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে যা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ করেননি। বড় কষ্ট লাগে যখন আমরা দেখি – যিক্রের নামে, দু'আর নামে, দরুদের নামে ও ওযীফার নামে বিভিন্ন বুজুর্গের বানানো শব্দ, নিয়ম, পদ্ধতি ইত্যাদি অতি যত্ন সহকারে পালিত হচ্ছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো শব্দ, বাক্য, নিয়ম, পদ্ধতি এ সকল ক্ষেত্রে একেবারেই অবহেলিত।

আরো দুঃখ ও বেদনার বিষয় যে, আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী শিক্ষামূলক গ্রন্থগুলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে যা কিছু যিক্র, ওযীফা বা দু'আ-দরুদের উল্লেখ আছে তার অধিকাংশই জঘন্য মিথ্যা ও বানোয়াট বিষয়। বড় আশ্চর্য লাগে যে, বুখারী ও মুসলিম-সহ সিহাহ সিত্তা ও মিশকাতুল মাসাবীহ তো আমাদের দেশে অনেক যুগ ধরেই পরিচিত ও প্রচলিত। এ সকল গ্রন্থে সংকলিত সহীহ সালাত (দরুদ), সালাম, যিক্র, দু'আ ও ওযীফাগুলি সাধারণত আমাদের দেশের কোনো ওযীফার বইয়েই পাবেন না। পেলেও সামান্য অংশ। বাকি সব বানোয়াট, মিথ্যা ও আজগুবি কথা দিয়ে ভরা। শুধু চটকদার সাওয়াবের কথা, উদ্ভট ফযীলতের কথা ও মিথ্যা কল্পকাহিনীর ফলে বিভ্রান্ত হয়ে এগুলির পিছনে ছুটছেন সরলপ্রাণ মানুষেরা। আশ্চর্য বিষয়, যে যা শুনছেন বা দেখছেন তাই গ্রহণ করছেন, বলছেন ও লিখছেন। কোথায় কথাটি পাওয়া গেল, সত্য না মিথ্যা তা নিয়ে কেউ চিন্তা করছেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলার একমাত্র অবধারিত পরিণতি জাহান্নাম।

আরো অবাক লাগে, কোনো কোনো 'ওযীফা গ্রন্থ' বা 'যিক্র-আযকার' বিষয়ক গ্রন্থের লেখক তাঁর ভূমিকায় দাবি করেছেন, তিনি বানোয়াট যিক্র, দু'আ ইত্যাদি পরিহার করেছেন। শুধু হাদীসের যিক্র আযকার ও সাহাবী-তাবেয়ীগণের যিক্র আযকার ও ওযীফা লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ বই খুলে দেখি যা কিছু যিক্র ওযীফা লেখা হয়েছে তার অধিকাংশই বানোয়াট; হাদীস ও সাহাবীগণের আমলের বাইরে। আর কুরআন ও হাদীস থেকে যা লেখা হয়েছে তারও সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ অধিকাংশ যয়ীফ (দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য)। যেমন, কুরআন কারীমের কতিপয় সূরার ফযীলতে অনেক বানোয়াট হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

'হাফত হাইকাল', 'দু'আ গঞ্জল আরশ', 'দু'আ আহাদ নামা', 'দু'আ হাবীবী', 'হিযবুল বাহার', 'দু'আ কাদাহ', 'দু'আ জামীলা', 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুবারাক নামসমূহের ওযীফা', 'দরুদে আকবার', 'দরুদে লাখী', 'দরুদে হাজারী', 'দরুদে তাজ', 'দরুদে তুনাজ্জিনা', 'দরুদে রুহী', 'দরুদে শেফা', 'দরুদে নারীয়া', 'দরুদে গাওসিয়া', 'দরুদে মুহাম্মাদী' ইত্যাদি হাজারো নামের হাজারো বানোয়াট চটকদার কাহিনীসমৃদ্ধ কিতাব পড়ে অগণিত সরলপ্রাণ মুমিন এ সকল দু'আ, সালাত ও যিক্র পালন করছেন। এ সকল যিক্র ও দু'আর মধ্যে অনেক মাসনূন শব্দ বা বাক্য সংকলিত রয়েছে। তবে এগুলির সংকলিত রূপের যে সকল ফযীলত বলা হয়েছে সবই বানোয়াট। এছাড়া এগুলির মধ্যে অনেক বানোয়াট বাক্য রয়েছে, যা পরবর্তী যুগের বুজুর্গ বা অ-বুজুর্গ মানুষদের তৈরি। এ সকল শব্দের মধ্যে নবুয়তের কোনো নূর নেই। এছাড়া এ জাতীয় অনেক দু'আর মধ্যে আপত্তিকর, আদবের খেলাফ বা শিরকমূলক শব্দও রয়েছে। সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো ও পালিত শব্দ বাদ দিয়ে এগুলির নিয়মিত আমল নিঃসন্দেহে সুন্নাতের প্রতি অবহেলা।

যিক্র-আযকারকে অবহেলা করা এবং বানোয়াট শব্দে বা পদ্ধতিতে যিক্র করা উভয়ই সুন্নাতের পরিপন্থী। আমরা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, জীবনের সকল কর্মে ও সকল ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ ও আমাদের আলোর দিশারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, তিনি আমাদেরকে প্রয়োগহীন আদর্শ শিখিয়ে যাননি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার, জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির যত পথের কথা বলেছেন তার সবই নিজের জীবনে কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছেন। তাঁর সাহাবীগণও তাঁর সকল ইবাদত পালনের পূর্ণতম আদর্শ। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত, যিক্র, দু'আ, ইতিকাফ, কুরবানি ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত তাঁরা যেভাবে পালন করেছেন সেভাবে পালনই আমাদের নাজাতের পথ।

এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আমি **"এহ্ইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে করেছি। সেখানে যিক্রের নামে সুন্নাত বিরোধী বিভিন্ন যিক্র ও পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছি। কিন্তু সুন্নাত বিরোধী কর্ম বাদ দিয়ে সুন্নাত-সম্মত কর্ম তো করতে হবে; নইলে তো কোনো লাভ হলো না। এজন্য আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্বশুর ফুরফুরার পীর সাহেব আমাকে নির্দেশ দিলেন সুন্নাতের আলোকে বেলায়াতের পথ ও সুন্নাত-সম্মত যিক্র আযকারের উপরে একটি বই লিখতে।

এছাড়া অনেক আবিদ ও যাকির মানুষ আমাকে মুখে ও টেলিফোনে বলেছেন, জাহাঙ্গীর সাহেব, আপনার "এহ্ইয়াউস সুনান" বই পড়ার পরে তো কোনো বইয়ের উপরেই আস্থা রাখতে পারছি না। মিথ্যা, বানোয়াট বা যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করে পণ্ডশ্রম হবে বলে সর্বদা ভয়ে আছি। আবার কিছু আমল তো করা দরকার। আপনি সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে মুমিনের জীবনের যিক্র-ওযীফা ও পালনীয় নেক আমল সম্পর্কে লিখুন, যা আমরা নিশ্চিতভাবে পালন করতে পারব।

কিন্তু লিখতে বললে তো হলো না। লেখকের পূঁজি তো দেখতে হবে। আমার বিদ্যা তো কিতাবে মুখস্থ করা। কিতাব না ঘেটে কিছু লিখতে পারি না। সময়-সুযোগের অভাব। সর্বোপরি নিজের আমলের অভাব। তা সত্ত্বেও কিছু লিখার চেষ্টা করলাম।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত বা রীতি ও পদ্ধতিই আমাদের এ বইয়ের একমাত্র ভিত্তি। আমি বেলায়াত, তায্কিয়া, যিক্র ইত্যাদির ফযীলত আলোচনা করেই শেষ করিনি। উপরন্তু সেগুলির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। কারণ এ সকল বিষয় সর্বোত্তমভাবে পালন ও অর্জন করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ। কাজেই, তাঁদের বিস্তারিত সুন্নাত আমাদের জানা দরকার। তাঁরা কী-ভাবে, কখন, কী পরিমাণে, কতবার, কী কী বাক্য দ্বারা যিক্র করেছেন তা বিস্তারিতভাবে জানার ও লেখার চেষ্টা করেছি।

সহীহ বা নির্ভরযোগ্য হাদীসই সুন্নাতের একমাত্র উৎস। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামে বানোয়াট কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ অন্যায়ের একমাত্র শাস্তি জাহান্নাম বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে, বিশেষকরে পরবর্তী যুগগুলিতে, অনেকে তাঁর নামে মিথ্যা ও বানোয়াট কথা বলবে। তিনি উম্মতকে এদের থেকে সাবধান থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের ভয়ে সাহাবীগণ পরিপূর্ণ মুখস্থ না থাকলে কোনো হাদীস বলতেন না। অন্য কারো নিকট থেকে শোনা হাদীস গ্রহণ করতে তাঁরা খুবই সতর্ক ছিলেন। কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে তার হাদীস তাঁরা শুনতেনই না। এমনকি অনিচ্ছাকৃত ভুলের সম্ভাবনা দূর করার জন্য কোনো সাহাবী আরেক সাহাবীকে হাদীস বললে তিনি অনেক সময় তাঁকে শপথ করাতেন যে, সত্যিই আপনি এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন কিনা? এছাড়া আপনার কোনো সাক্ষী আছে কিনা? অর্থাৎ, আপনি ছাড়া এ কথাটি তাঁর মুখ থেকে আর কেউ শুনেছেন কিনা? ইত্যাদি।

তাবেয়ীগণও একইভাবে সনদ ছাড়া কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। সনদের বর্ণনাকারীগণের হাদীস বর্ণনায় ভুল হয় কিনা বা তারা মিথ্যা বলেন কিনা– সে বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সকল এলাকা থেকে হাদীস সংগ্রহ করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসকে মিথ্যা থেকে পবিত্র রাখাই ছিল তাঁদের অন্যতম কাজ। পববর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন।

আমি আমার সাধ্যমত শুধু সহীহ ও হাসান হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। আলোচনার মধ্যে কোনো যয়ীফ হাদীসের প্রসঙ্গত উল্লেখ হলে সে সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছি। অনেক সময় যয়ীফ হাদীস শুধু এজন্য উল্লেখ করেছি যে, হাদীসটি আমাদের দেশে প্রচলিত। হাদীসটি যে যয়ীফ তা অনেকের অজানা। হয়ত কোনো সুন্নাত-প্রেমিক পাঠক হাদীসটির সনদের দুর্বলতা জানতে পারলে তিনি উপকৃত হবেন। পরে হয়ত তিনি তার পরিবর্তে সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করবেন। অথবা অন্তত হাদীসটির সনদের দুর্বলতা প্রকাশ করে তা বর্ণনা করবেন।

কোনো হাদীস যয়ীফ হওয়ার অর্থ উক্ত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা না হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ১০০, ২০০ বা ৩০০ বৎসর পরে একজন দুর্বল, অপরিচিতি বা উল্টোপাল্টা কথা বলেন এমন ব্যক্তি দাবি করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছেন বলে অমুক ব্যক্তি তাকে জানিয়েছেন। অন্য কোনো মুহাদ্দিস এ হাদীসটি জানেন না বা কারো কাছে শুনেননি। মুহাদ্দিসগণ বিশাল মুসলিম বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও আর একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ পেলেন না, যে এ হাদীসটি শুনেছেন বা জানেন। এ ধরনের সন্দেহযুক্ত কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বলা উচিত নয়।

হাদীসের সহীহ, যয়ীফ এবং জালিয়াতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করেছেন যা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক। কোনো মুহাদ্দিস এক্ষেত্রে ভুল করলে অন্যান্য মুহাদ্দিস তা সংশোধন করেছেন। যেমন, ইমাম হাকিম তার "মুসতাদরাক" গ্রন্থে কিছু জাল হাদীস ও অনেক দুর্বল হাদীসকেও সহীহ বলেছেন। অপরদিকে ইমাম ইবনুল জাওযী তার "মাওযূআত" গ্রন্থে অনেক সহীহ বা হাসান হাদীসকে জাল বলেছেন। এজন্য আমি সহীহ, যয়ীফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইজমা বা মুহাদ্দিসগণের সমন্বিত মতের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি। বিশেষত প্রাচীন ও পরবর্তী ইমামগণের মতের উপর নির্ভর করেছি। যেমন, ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাঈন, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমা, মুনযিরী, হাইসামী, যাহাবী, যাইলায়ী, ইবনু হাজার ও অন্যান্য ইমাম, রাহিমাহুমুল্লাহ। এছাড়া বর্তমান যুগের মুহাদ্দিসগণের আলোচনার সাহায্য গ্রহণ করেছি।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসের ক্ষেত্রে কোনো মতামত দেওয়া বেয়াদবী। এছাড়া সকল গ্রন্থের হাদীস উদ্ধৃত করে সাথে সাথে হাদীসটির অবস্থা লেখার চেষ্টা করেছি। যে হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ যয়ীফ বলেছেন তা এ গ্রন্থে উল্লেখ না করার চেষ্টা করেছি। কখনো উল্লেখ করলে তার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছি। প্রথমদিকে আমি চিন্তা করেছিলাম, যয়ীফ হাদীসকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করব, বাকি সহীহ বা হাসান হাদীস সম্পর্কে কিছুই লিখব না। কারণ প্রথমেই তো বলে দিয়েছি, যে সকল হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ সহীহ বা হাসান বলে গণ্য করেছেন সেগুলির উপরেরই নির্ভর করার চেষ্টা করব। কিন্তু কয়েক পরিচ্ছেদ লেখার পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সহীহ ও হাসান হাদীসের ক্ষেত্রেও মুহাদ্দিসগণের মতামত উল্লেখ করব। যাতে পাঠক নিশ্চয়তা অনুভব করতে পারেন যে, তিনি সহীহ হাদীস অনুসারে কর্ম করছেন; তাঁর কর্মটি কোনো অনির্ভরযোগ্য সনদের উপর নির্ভরশীল নয়।

উল্লেখ্য যে, হাদীসের সনদের অবস্থা, অর্থাৎ তা সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোন্ পর্যায়ের তা আমি কখনো মূল বইয়ে হাদীসের পরেই উল্লেখ করেছি। কখনো পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। পাঠককে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করছি। হাদীসের পরেই সনদের বিষয়ে কিছু উল্লেখ না থাকলে পাদটীকায় তা দেখতে পাবেন ইনশা আল্লাহ। হাদীসের পাদটীকায় এক বা একাধিক গ্রন্থের উল্লেখ করেছি, যে সকল গ্রন্থে হাদীসটি সংকলিত বা আলোচিত হয়েছে। টীকায় উল্লেখিত গ্রন্থাবলীর কোনো কোনো গ্রন্থে হাদীসটির সনদ ও সহীহ-যয়ীফ বিষয়ক আলোচনা আছে। আগ্রহী পাঠক খুঁজে দেখতে পারেন।

সুত্রপ্রদানের সুবিধার জন্য আমি যিক্রগুলিতে নম্বর প্রদান করেছি। ব্যাপক অর্থে দু'আ, মুনাজাত, ইসতিগফার ইত্যাদি সবই যিক্র। এজন্য আমি সবগুলিকেই যিক্র হিসেবে নম্মর প্রদান করেছি।

যিক্রের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম সমস্যা উচ্চারণ ও অর্থ বুঝা। সাধারণ বাঙালি মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধভাবে আরবী উচ্চারণ করতে খুবই অসুবিধা হয়। অথচ বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থ অনুধাবন যিক্রের সাওয়াব অর্জনের অন্যতম শর্ত। এজন্য প্রত্যেক যাকিরের দায়িত্ব যে, সম্ভব হলে নিজে আরবী দেখে অথবা যিনি বিশুদ্ধ আরবী জানেন এরূপ অন্য কারো সাহায্য নিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যিক্রগুলি মুখস্থ করা। আমি সকল যিক্রের বাংলা অনুবাদ (অর্থ) লিখেছি। পাঠককে অনুরোধ করব অনুবাদসহ যিক্রগুলি মুখস্থ করতে ও যিক্রের সময় মনকে অর্থের সাথে আলোড়িত করতে।

এছাড়া যিক্রের নিচে আমি তার বাংলা উচ্চারণ লিখেছি। এই উচ্চারণ একেবারেই অসম্পূর্ণ। এই উচ্চারণ শুধুমাত্র সহযোগিতার জন্য। প্রত্যেক যাকিরের দায়িত্ব সম্ভব হলে নিজে আরবী দেখে অথবা অন্য কারো সাহায্য নিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে যিক্রগুলি মুখস্থ করা।

ইসলাম সম্পর্কে বাঙালি ধার্মিক মুসলিমের চরম অবহেলার অন্যতম প্রকাশ যে অগণিত ধার্মিক মুসলিম কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন না বা আরবী উচ্চারণ জানেন না। আরবী উচ্চারণ সঠিকভাবে না জানলে কোনোভাবেই প্রতিবর্ণায়ন বা বাংলা উচ্চারণ প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে যিক্‌র বা আয়াত উচ্চারণ সম্ভব নয়। কোনো যিক্‌র বা দু'আর বাংলা উচ্চারণ প্রদান সাধারণত ক্ষতিকর। কারণ বাংলা উচ্চারণের উপর নির্ভরতা সাধারণত ভুল উচ্চারণ স্থায়ী করে দেয়। তা সত্ত্বেও আমি যিক্‌র ও দু'আগুলির বাংলা উচ্চারণ লিখেছি, শুধু অক্ষম পাঠকের সাময়িক সহযোগিতার জন্য। এক্ষেত্রে উচ্চারণকে যথাসম্ভব কম ভুলের মধ্যে রাখার জন্য নিম্নের বিষয়গুলি অনুধাবন প্রয়োজন:

আরবী উচ্চারণে বাঙালির মূল সমস্যা দ্বিবিধ – **প্রথম সমস্যা** আরবী ভাষায় এমন অনেকগুলি বর্ণ বা ধ্বনি আছে যা বাংলা ভাষায় নেই। বাঙালি পাঠক আরবী ধ্বনির নিকটবর্তী বাংলা ধ্বনি দিয়ে আরবী উচ্চারণ করেন। **দ্বিতীয় সমস্যা** আরবী ও অন্যান্য অনেক ভাষায় দীর্ঘ স্বরধ্বনি আছে। বাংলায় কোনো দীর্ঘ স্বর ধ্বনি নেই। এজন্য অন্য ভাষার দীর্ঘ স্বর উচ্চারণে বাঙালি ভুল করেন।

প্রথম সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা

(১). আরবীতে (স) বা (S) এর কাছাকাছি তিনট ধ্বনি : (س) (ص) ও (ث)। (س)-এর জন্য আমি সর্বদা (স) ব্যবহার করেছি। (স্কুল), (স্পষ্ট), (ব্যস্ত) ইত্যাদি শব্দের মধ্যে (স)-র যে উচ্চারণ সেই উচ্চারণ করতে হবে। যেমন : (সুব'হা-নাল্লাহ), (সালা-ম)

(ص) ধ্বনি বাংলায় নেই। কোনোভাবেই অনুশীলন ছাড়া বাঙালি এই ধ্বনি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন না। আমি সাধারণত (ص)-এর উচ্চারণের জন্য (স্ব) ব্যবহার করছি। অপারগ পাঠক (স্ব)-কে যথাসম্ভব মোটা (সোয়া) হিসাবে উচ্চারণ করবেন।

(ث) বাঙালির জন্য অত্যন্ত কঠিন ধ্বনি। জিহ্বাকে দাতের অগ্রভাগের নিচে দাঁত থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে দাঁত ও জিহ্বার মাঝখান দিয়ে বাতাস ছেড়ে দিলে এর উচ্চারণ হয়। এই বর্ণের জন্য আমি (স়) ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি।

(২). বাংলায় (জ) ধ্বনির জন্য দুটি বর্ণ: (জ) ও (য) বাঙালি এ দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না। আরবীতে এর কাছাকাছি চারিটি ধ্বনি (ج), (ز), (ذ), (ظ)। বাঙালি এ চারিটি ধ্বনিই ভুল উচ্চারণ করেন। আমি (ج)-এর জন্য (জ) ব্যবহার করেছি। এই উচ্চারণ ইংরেজি (J)-এর মতো, কড়া ও শক্ত ভাবে জিহ্বাকে মুখের মাঝখানে উপরের তালুর কাছে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে।

(ز، ذ، ظ) তিনটি ধ্বনির জন্য (য) ব্যবহার করেছি, ইংরাজি (Z)- এর মতো। জিহ্বা দাঁতের কাছে নিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। এতে আরবী (ز)- উচ্চারণ ঠিক হবে। বাকি দুটি ধ্বনির উচ্চারণ অনুশীলন ছাড়া ঠিক করা যায় না।

(৩). বাংলায় (ত) একটি, আরবীতে দুটি (ت، ط)। আমি দুটির জন্যই (ত) ব্যবহার করেছি। (ط)-র জন্য (ত)-এর নিচে দাগ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

(৪). বাংলায় (দ) একটি। আরবীতে (د) বাংলা (দ) এর মতো। এছাড়া (ض) ধ্বনিটিও অনেকটা মোটা (দ)-এর মতো উচ্চারণ করা হয়। আমি (د) এর জন্য (দ) ও (ض) এর জন্য (দ্ব) ব্যবহার করেছি।

(৫). আরবীতে দু'টি (ক)। (ق)-এর জন্য (ক্ব) ব্যবহার করেছি। পাঠক (ক্ব)-কে যথাসম্ভব গলার ভিতর থেকে উচ্চারণ করবেন।

(৬). আরবীর কঠিন উচ্চারণগুলির অন্যতম গলার ভিতর থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুলি। যেমন, –(ح، ع، غ،) এগুলির জন্য আমি (ح)-এর জন্য ('হ), (ع) এর জন্য 'আ/'ই/ বা 'উ ব্যবহার করছি। পাঠক যদি দেখেন কোনো বর্ণের পূর্বে উল্টা কমা তাহলে বর্ণটিকে যথাসম্ভব গলার মধ্যে নিয়ে উচ্চারণ করবেন। সর্বাবস্থায় অনুশীলন ছাড়া সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় সমস্যা ও সমাধানের চেষ্টা

দীর্ঘ (ই) বুঝাতে (ঈ) বা (ী), দীর্ঘ-উ বুঝাতে (ঊ) অথবা (ূ) এবং দীর্ঘ (আ) বুঝাতে (-) ব্যবহার করেছি। পাঠক এদিকে খুবই খেয়াল রাখবেন। আপনার মাতৃভাষা যেন আরবীর উচ্চারণে বাধা না দেয়। বাংলা দীর্ঘ কারের কোনো উচ্চারণ নেই। কিন্তু আরবী উচ্চারণের সময় অবশ্যই খেলায় রাখবেন। যেমন,– (আল্লা-হ), (সালা-ম) (সুব'হা-ন)উচ্চারণে (-) এর স্থলে অবশ্যই একটু টানবেন। (সুব্বূহুন কুদ্দূসুন) উচ্চারণে (বূ) ও (দূ) এর (উ)-কে দীর্ঘ করতে হবে: (সুব,বুউউহুন) (কুদদুউউসুন)। (লা- শারীকা লাহু) উচ্চারণের সময় (লা-) এর আ ও (রী)-এর (ই)-কে দীর্ঘায়িত করতে হবে। (লাআআ শারিইইকা)।

এ জাতীয় আরেকটি সমস্যা 'হসন্ত'। বাংলায় আমরা 'কাল' শব্দটির (ল) ধ্বনি দুইভাবে পড়তে পারি : কাল্ – আজকাল, অথবা কালো – কাল রঙ। আরবী শব্দের বাংলা উচ্চারণ লিখলে বিষয়টি সমস্যা সৃষ্টি করে। আমি অনেক সময় হসন্ত ব্যবহার করেছি। তবে সাধারণভাবে মনে রাখতে হবে কোনো অক্ষর আকার, ওকার, ইত্যাদি থেকে মুক্ত থাকলে তা অবশ্যই হসন্ত হবে, হসন্ত দেওয়া থাক বা না থাক। কারণ আরবীতে (অ-কার নেই)। কাজেই (সুব'হা-নাল্লাহ) লেখা থাকলে (সুব্'হা-নাল্লাহ) পড়তে হবে, (ব)-এর নিচে হসন্ত থাক অথবা না থাক।

এ সকল প্রচেষ্টা সহায়ক মাত্র। যাকির যদি আরবী উচ্চারণ না জানেন তাহলে অবশ্যই একজন আরবী জানা মানুষের সাহায্য নিয়ে নিজের উচ্চারণগুলি ঠিক করে নিবেন। একবার ভুল মুখস্থ করলে পরে ঠিক করতে কষ্ট হয়।

আগেই বলেছি, বইটি লিখতে প্রথম প্রেরণা দিয়েছেন আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার পীর সাহেব। আল্লাহ দয়া করে তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন, তাঁকে হেফাযত করুন, তাঁকে সুস্থ থেকে সঠিকভাবে ইসলামের খেদমতের সুযোগ দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের পরিপূর্ণ নিয়ামত দান করুন। বইটি লিখতে যারা সহযোগিতা করেছেন বা উৎসাহ প্রদান করেছেন সকলকেই আল্লাহ উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। বই লিখতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছি ও অধিকার নষ্ট করেছি আমার পরিবারের সদস্যদের। আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন।

সীমিত সময় এবং তার চেয়েও বেশি সীমিত যোগ্যতা নিয়ে লেখা বইয়ে ভুলভ্রান্তি থাকবেই। সকল ভুলভ্রান্তির জন্য আল্লাহর কাছে

ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পাঠককে সবিনয় অনুরোধ করছি, যে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি চোখে পড়লে আমাকে জানানোর জন্য। তার এ সহৃদয় উপকার আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করব এবং আল্লাহ তাঁকে প্রতিদান দিবেন।

মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করছি, তিনি দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করে নেন এবং একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ও পরিজন ও পাঠকবর্গের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

প্রশংসা মহান আল্লাহর ও তাঁর মহান রাসূলের উপর দরুদ ও সালাম।

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য 'তাযকিয়া' বা আত্মশুদ্ধি। শিরক, কুফর, বিশ্বাসের দুর্বলতা, হিংসা, অহংকার, আত্মমুখিতা, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা, লোভ, ক্রোধ, প্রদর্শনেচ্ছা, জগৎমুখিতা ইত্যাদি ব্যাধি থেকে মানবীয় আত্মাকে পবিত্র করে বিশ্বাসের গভীরতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রতি গভীর প্রেম, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা, আখিরাতমুখিতা, বিনয়, উদারতা, দানশীলতা, দয়াদ্রতা, সদাচারণ ইত্যাদি পবিত্র গুণাবলি অর্জন করে আল্লাহর বেলায়াত বা বন্ধুত্ব অর্জন করাই মুমিনের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। স্বভাবতই সকল মুসলিম ঈমান ও তাকওয়ার পর্যায় অনুসারে এ লক্ষ্য কমবেশি অর্জন করেন।

এ লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণতম আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তাঁর আদর্শের পূর্ণতম অনুসরণ করে 'তাযকিয়া' ও 'বেলায়াতের' সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তাঁর সহচরগণ। তাঁদের অনুকরণ-অনুসরণের পূর্ণতার উপরেই নির্ভর করে মুমিনের বেলায়াতের পূর্ণতা। অনুকরণ-অনুসরণ আংশিক হলে তাযকিয়া ও বেলায়াতের লক্ষ্য অর্জনও আংশিক ও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

সুন্নাতের বাইরে ইবাদত বন্দেগি কবুল হবে না বলে অনেক হাদীসে বলা হয়েছে। যদিও পরবর্তী অনেক আলিম আশ্বাস দিয়েছেন যে, খেলাফে সুন্নাত অনেক কর্মই আল্লাহ কবুল করে বিশেষ সাওয়াব দিবেন, কিন্তু অনেক মুমিনের মন এতে স্বস্তি পায় না। তাঁরা সুন্নাতের বাইরে যেতে চান না।

ক্ষণস্থায়ী এ জীবন। ইবাদত বন্দেগি কতটুকুই বা করতে পারি। এই সামান্য কাজও যদি আবার বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো তা সীমাহীন দুর্ভাগ্য। এজন্য তাঁরা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত সম্মত আমল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাঁদের উদ্দেশ্যেই কুরআন কারীম, সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) ও সুন্নাতে সাহাবার আলোকে বেলায়াত ও তাযকিয়ার পরিচয়, কর্ম, পদ্ধতি ও পর্যায় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে 'রাহে বেলায়াত' বইটি লিখেছিলাম। প্রথম প্রকাশের পরে দু'বার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। গত কয়েক মাস যাবৎ বইটি বাজারে নেই। অনেক আগ্রহী পাঠক টেলিফোনে ও মুখে বারংবার বইটি সম্পর্কে তাগাদা দিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধের ভিত্তিতে এবার সম্পূর্ণ নতুনভাবে বইটি ছাপা হলো। বেশ কিছু বিষয় নতুন সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া সামগ্রিক বিন্যাসে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

বইটির সংশোধনে যারা পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন এবং আমাদের নগণ্য কর্ম কবুল করে নিন।

আল্লাহর মহান রাসূলের উপর, তাঁর পরিবার-বংশধর এবং তাঁর সঙ্গীগণের উপর অগণিত সালাত ও সালাম। শুরুতে ও শেষে সকল সময়ে সকল প্রশংসা জগতসমূহের পালনকর্তা মহান আল্লাহর নিমিত্ত।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযি বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস স্বালিহাত। প্রশংসা আল্লাহরই যার নিয়ামতে ভাল কর্মগুলো পূর্ণতা লাভ করে। সালাত ও সালাম মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর এবং তাঁর পরিজন, সহচর ও অনুসারীদের উপর।

১৪২৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে (ডিসেম্বর ২০০২) 'রাহে বেলায়াত' প্রথম ছাপা হয়। দশ বৎসর পরে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে হামদ, সানা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রেম মানব হৃদয়ের খোরাক ও জীবনের পাথেয়। মানুষের প্রেম অর্জন কষ্টকর। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর প্রেম অর্জন খুবই সহজ। তিনি মানুষকে স্নেহময়ী মায়ের চেয়েও অধিক ভালবাসেন, সহজেই ক্ষমা করেন ও খুশি হন। মানুষের সাথে প্রেমের আনন্দ অপূর্ণ ও ভেজালপূর্ণ। পক্ষান্তরে মহান প্রভুর সাথে প্রেম মানুষের হৃদয়ে আনে নির্ভেজাল, পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী আনন্দ, যা পার্থিব জীবনের কঠিনতম মুহূর্তেও হৃদয়ের প্রশান্তিকে স্থায়ী করে।

মহান আল্লাহর এ প্রেম এবং বেলায়াত অর্জন মানব জীবনের সবচেয়ে সহজ কাজ। কারণ, পৃথিবীতে যে কোনো কর্মে সফলতার জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন, কিন্তু মহান আল্লাহর বেলায়াত লাভের জন্য কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। মহান আল্লাহ যাকে যতটুকু যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেটুকুর মধ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করে যে কোনো মানুষ আল্লাহর বেলায়াত লাভ করতে পারেন। একজন সুশিক্ষিত মানুষের কাব্যিক প্রার্থনা এবং একজন গ্রাম্য অথব বাকপ্রতিবন্ধীর অস্পষ্ট প্রার্থনা আল্লাহর কাছে সমান মর্যাদার অধিকারী।

সম্মানিত পাঠক, আমরা দেখব যে, ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বেলায়াত অর্জিত হয়। ঈমান ও তাকওয়ার পূর্ণতার বা আল্লাহর বেলায়াতের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি রয়েছে, যা দিয়ে আপনি আপনার বেলায়াত মাপতে পারবেন। ঈমানের পূর্ণতার মানদণ্ড সুন্দর আচরন। হাদীসের ভাষায়: 'মুমিনদের মধ্যে সে-ই ঈমানে পূর্ণতম যার আচরণ সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রী-পরিবারের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে।' আর তাকওয়ার মাপকাঠি সার্বক্ষণিক আল্লাহর 'মুরাকাবা'। হাদীসের ভাষায়: 'বান্দা যখন আল্লাহর মাহবূব হয়ে যায় তখন তার চোখ, কান, হাত ও পা মহান রবের নির্দেশনা লাভ করে।' 'আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাকে দেখছ; কারণ, তুমি তাকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।' আপনার বেলায়াতের পর্যায় জানতে নিম্নের দুটি অবস্থা বিবেচনা করুন:

(ক) আপনি বেলায়াতের পথের পথিক। এজন্য ফরয-নফল ইবাদত বন্দেগি করেন। অনেক স্বপ্ন, কাশফ বা হালত আপনি লাভ করেন। তবে আপনি মানুষের সাথে দুর্ব্যবহারে অভ্যস্থ। কাউকে আচরণের কষ্ট দিতে আপনার কষ্ট হয় না। মানুষের হক্ক নষ্ট করতে ও অন্যান্য পাপ ও সুন্নাত বিরোধী কাজ করতে আপনার হাত, পা, চোখ, কান বা মন-মগজ আড়ষ্ট হয় না। বিপদে আপদে আপনার হৃদয় অশান্ত হয়ে যায়। আনন্দে ও বিপদে কৃতজ্ঞতা, আকুতি ও আবেদনের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের কথা আপনার হৃদয়ে জাগরুক হয়।

(খ) আপনি সকল মানুষের সাথে ও পরিবারের সদস্যদের সাথে সুন্দর আচরণে অভ্যস্থ। মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করলে আপনার খুবই কষ্ট হয়। ছোট-বড় যে কোনো পাপের কাজে আপনার হাত, পা, চোখ, কান আড়ষ্ট হয়। সর্বদা আপনি অনুভব করেন যে, মহান আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার হৃদয়ের গোপনতম চিন্তা দেখছেন। আনন্দে, কষ্টে, নিয়ামতে ও মুসিবতে সর্বদা আল্লাহর রহমত ও সাহচর্যের অনুভূতি আপনার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে রাখে। উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তা আপনার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করতে পারে না। যে কোনো নিয়ামতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও

যে কোনো কষ্টে শুধু তাঁরই কাছে আকুতির আবেগ আপনার মনকে আলোড়িত করে।

সম্মানিত পাঠক আপনার অবস্থা যদি প্রথম পর্যায়ের হয় তবে আপনি নিশ্চিত হোন যে, আপনি বেলায়াতের সঠিক পথে চলছেন না। সম্ভবত সুন্নাতের ব্যতিক্রম পথে আপনি বেলায়াত অর্জনের চেষ্টা করছেন। আর যদি আপনি দ্বিতীয় অবস্থা অর্জন করে থাকেন তবে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে, আপনি সত্যিকারের বেলায়াতের পথে চলার তাওফীক পেয়েছেন। সম্ভবত আপনি মাসনূন পদ্ধতিতে বেলায়াতের পথ চলার তাওফীক পেয়েছেন। আর বেলায়াতের মাসনূন পদ্ধতিই 'রাহে বেলায়াত' বইয়ের একমাত্র আলোচ্য।

রাহে বেলায়াত-এর বিষয়বস্তু পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। এবার নতুন দুটি অধ্যায় সংযোজন করে গ্রন্থটিকে সাত অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। সকল অধ্যায়েই কমবেশি পরিবর্তন, সংশোধন বা সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে "সালাত ও বেলায়াত" নামে নতুন একটি অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সালাত বিষয়ক 'রাহে বেলায়াতের' পূর্ববর্তী সংস্করণের যিকর ও দুআগুলোর সাথে আরো কিছু যিকর ও দুআ সংযোজন করা হয়েছে এবং সহীহ হাদীসের আলোকে সালাত আদায়ের মাসনূন পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

"রোগব্যাধি ও ঝাড়ফুঁক" শিরোনামের ষষ্ঠ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। রোগব্যাধি জীবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দীর্ঘদিন যাবত অগণিত পাঠক বিভিন্নভাবে তাদের বিভিন্ন সমস্যা, রোগব্যাধি, বিপদাপদ ইত্যাদির জন্য সুন্নাতসম্মত দুআ যিকর ও চিকিৎসা পদ্ধতি জানতে চাচ্ছেন। কারণ তাবীজ-কবজ ইত্যাদির শিরক সম্পর্কে অনেক আলিমই কথা বলছেন। আমি আমার **'ইসলামী আকীদা'** গ্রন্থেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। পাঠকগণ তাবিজ-কবজ বর্জন করতে চান। কিন্তু বিকল্প সুন্নাত পদ্ধতি তো তাদের জানতে হবে। আর এজন্যই এ অধ্যায়টি সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন করা হলো। মহান আল্লাহর কাছে আমরা সকাতরে দুআ করি, তিনি যেন এ সকল সুন্নাত-নির্দেশিত দুআ ও ঝাড়ফুঁকের ব্যবহারকারীদেরকে পরিপূর্ণ উপকার ও কল্যাণ প্রদান করেন।

অনেক আলিম পাঠক আমাকে অনুরোধ করেছেন 'সিহাহ সিত্তার' হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত "ভারতীয়" সংস্করণের তথ্যসূত্র প্রদান করতে। এজন্য এ সংস্করণে "সিহাহ সিত্তার' হাদীসগুলোর তথ্যসূত্র প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমে অধ্যায় (কিতাব) ও পরিচ্ছেদের (বাব) উল্লেখ করেছি। এরপর আরবীয় মুদ্রণের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং সর্বশেষ বন্ধনীর মধ্যে (ভা) অথবা (ভারতীয়) লিখে ভারতীয় সংস্করণের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য যে, আমি 'রাহে বেলায়াত' রচনায় যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছিলাম সেগুলোর বিস্তারিত তথ্য বইয়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ করেছি। গ্রন্থগুলো মূলত আমার নিজস্ব গ্রন্থাগারে ছিল। এখন সেগুলো **'আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট'**-এর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। বর্তমানে "আল-মাকতাবাতুশ শামিলা" নামক ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি আলিমগণের মধ্যে সুপরিচিত। বর্তমান সংস্করণে নতুন তথ্যাদির ক্ষেত্রে অনেক সময় "শামিলা"-র মধ্যে বিদ্যমান গ্রন্থগুলোর উপর নির্ভর করেছি। আগ্রহী পাঠক কোনো তথ্য যাচাই করতে চাইলে শামিলার সাহায্য নিতে পারবেন।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি যে, হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে আমি পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের মতের উপর নির্ভর করেছি। এ সংস্করণের তথ্যসূত্র ও পাদটীকা সংশোধন ও পরিমার্জন করতে যেয়ে কয়েকটি হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নতুন তথ্য ও ভিন্নমত সংযোজন করেছি।

এ সংস্করণে বিভিন্ন অধ্যায়ে, বিশেষত "সালাত ও বেলায়াত" শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে ফিকহ বিষয়ক কিছু বিতর্ক সুন্নাতের আলোকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করেছি। বেলায়াত বা মহান আল্লাহর প্রেম ও নৈকট্যের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করাই উদ্দেশ্যে। কারণ, হৃদয়কে বিদ্বেষমুক্ত করা ও সকল মুমিনকে সুন্নাতের আলোকে ভালবাসা আল্লাহর বেলায়াত লাভের অন্যতম উপায়। কিন্তু আমরা দেখছি যে, অনেক দীনদার মানুষ এ সকল ফিকহী মতভেদের কারণে হৃদয়কে বিদ্বেষ-যুক্ত করছেন এবং তাওহীদ ও সুন্নাতের অনুসারী মুসলিমগণ একে অপরকে ভালবাসার বদলে বিদ্বেষ করছেন।

সম্মানিত পাঠক, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিদ্যমান বিভক্তি ও হানাহানি ক্রমেই বাড়ছে। আলিম-উলামা ও দীনদার মুমিনদের মধ্যে বিদ্বেষ ও দূরত্ব ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। এ সুযোগে খৃস্টান প্রচারকগণ লক্ষলক্ষ মুসলিমকে ধর্মান্তরিত করেছেন। কাদিয়ানী, বাহায়ী, শিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের প্রচারণা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সুস্পষ্ট শিরক, কুফর, হারাম ও বিদআতে লিপ্ত মানুষেরা দীনের নামে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছেন। এ সময়ে 'বিশুদ্ধ সুন্নাত ভিত্তিক জীবন গঠন' এবং 'উম্মাতের আভ্যন্তরীন ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সংরক্ষণ' দুটি আপতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী লক্ষ্যকে একত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন বিষয়। জাগতিক বিচারে এ বিষয়ে সফলতার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে মহান আল্লাহর দরবারে কুবলিয়্যাতের আশাটুকু মুমিনের হৃদয়ের সম্বল। আমার সীমিত জ্ঞানে নিম্নের বিষয়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিঃ

প্রথমতঃ মুসলিম উম্মাহর সকল বিভক্তি, দলাদলি ও ঝগড়ার অন্যতম কারণ 'সুন্নাত' বাদ দিয়ে শুধু 'দলীল'-এর উপর নির্ভরতা। প্রত্যেকেই কুরআন-হাদীস থেকে পছন্দমত দলীল পেশ করেন। কিন্তু যে বিষয়ে দলীল পেশ করছেন সে বিষয়টি পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের কর্ম, পদ্ধতি, রীতি বা সুন্নাত কী ছিল, তাঁরা কিভাবে এ দলীলটি বুঝেছেন ও পালন করেছেন তা বিবেচনা করছেন না। আমরা যদি দলীলের পাশাপাশি সুন্নাত বিবেচনা করি তবে উম্মাতের বিভক্তি ও হানাহানি যেমন অনেক কমে যাবে, তেমনি আমাদের হৃদয়গুলো অকারণ বিদ্বেষ ও বিরক্তির ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত হবে। আকীদা, আমল, দাওয়াত, জিহাদ, যিকর, তিলাওয়াত, দরুদ, সালাম, মীলাদ, কিয়াম, তরীকা, তাসাউফ সকল ক্ষেত্রে বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য। রাহে বেলায়াত-এর মূল উদ্দেশ্যই দলীলের সাথে সুন্নাতের সমন্বয়।

দ্বিতীয়তঃ উম্মাতের বিভক্তি ও হানাহানির অন্য আরেকটি কারণ 'সুন্নাত', 'খেলাফে সুন্নাত' ও 'বিদআত'-এর মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য না রাখা। অনেক সময় আমরা সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা খেলাফে সুন্নাত কর্মকে "জায়েয" প্রমাণ করতে যেয়ে তাকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বানিয়ে ফেলি। আবার কখনো সুন্নাতকে গুরুত্ব দিতে যেয়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল কর্মকে 'বিদআত' বলে দাবি করি। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁরপর তাঁর সাহাবীগণ যে কর্ম যেভাবে করেছেন সেভাবে তা করাই সুন্নাত। সুন্নাতের ব্যতিক্রম হলেই তা বিদআত হয় না। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম বা পদ্ধতিকে "দীন" বানালে তা বিদআতে পরিণত হয়। অর্থাৎ সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম বা পদ্ধতি পালন না করলে ইবাদত অপূর্ণ থাকে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম বা পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ সাওয়াব, বরকত বা বেলায়াত আছে বলে মনে করলে বা

সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্মকে দীনের রীতিতে পরিণত করলে তা বিদআতে পরিণত হয়।

সালাত, সিয়াম, যিকর, দুআ, দরুদ, সালাম, দাওয়াত, জিহাদ ইত্যাদি দীনের সকল বিষয়ে কর্ম ও কর্মপদ্ধতিতে আমরা এ বিতর্ক দেখতে পাই। কেউ সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম, বাক্য বা পদ্ধতিকে "জায়েয়' প্রমান করতে যেয়ে মাসনূন কর্ম, বাক্য বা পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা অবমূল্যায়ন করছেন। কেউ সুন্নাতের ব্যতিক্রমকে অনুত্তম বলতে যেয়ে সবকিছুকেই 'না-জায়েয' বা বিদআত বলে মনে করছেন। আর এভাবে প্রান্তিকতা, বিভক্তি ও বিদ্বেষ জোরদার হচ্ছে। আমরা 'রাহে বেলায়াত'-এ এ প্রান্তিকতা দূর করতে চেষ্টা করেছি।

তৃতীয়তঃ উম্মাতের বিভক্তির আরেকটি কারণ সুন্নাত-সম্মত মতভেদ অপসারণ করা দীনের জন্য কল্যাণকর মনে করা। যে সকল বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতভেদ বিদ্যমান ছিল সে সকল বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান থাকাই সুন্নাত। এগুলো সাধারণত ফিকহী ও মাযহাবী মতভেদ হিসেবে পরিচিত। এ সকল বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ী ও প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ইমামগণ কোনো একটি মতকে উত্তম বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কখনোই ব্যতিক্রম মতকে বাতিল বলার বা ব্যতিক্রম মতের অনুসারীকে 'বিভ্রান্ত' বলে গণ্য করার চেষ্টা করেন নি। কাজেই এ জাতীয় মতভেদের ক্ষেত্রে সুন্নাতের নির্দেশনা মতভেদ মেনে নেওয়া, নিজের বা নির্ভরযোগ্য আলিমের ইজতিহাদকে উত্তম বলা এবং অন্য মতের সম্মান করা। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগের প্রমাণিত এ সকল বিষয়ের কারণে কাউকে 'বাতিলপন্থী" বলে গণ্য করা অথবা মতভেদ মিটিয়ে সকলকে একমত করাকে দীন মনে করা বিদআত। আমরা কখনো সহীহ হাদীস অনুসরণের নামে এবং কখনো মাযহাব অনুসরণের নামে এ অপরাধটি করছি।

আমরা জানি, প্রচলনের অজুহাতে সুন্নাতকে অস্বীকার করা সঠিক নয়। কোনো সমাজে যদি এমন কোনো কর্ম প্রচলিত থাকে যা সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে সমাজের প্রচলন অথবা অগণিত বুজুর্গের আমলের অজুহাতে তা বহাল রাখা এবং এ বিষয়ক সুন্নাত পদ্ধতিকে নিরুৎসাহিত করা ভয়ঙ্কর অন্যায়। এতে এ সকল আমলের সুন্নাত পদ্ধতিকে হত্যা করা হয়।

কিন্তু যে সকল বিষয়ে একাধিক সুন্নাত বিদ্যমান সেক্ষেত্রে বিষয়টি অন্য রকম। সেক্ষেত্রে প্রচলনকে গুরুত্ব প্রদান করাই সাহাবী-তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের রীতি। এরূপ বিষয়ে মতভেদ উত্তম-অনুত্তম বা অধিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। এক্ষেত্রে ভিন্নমতকে বাতিল বলা যায় না। সমাজে প্রচলিত কর্মটির পক্ষে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণের কোনো সুন্নাত প্রমাণিত থাকে তবে উক্ত আমলকে বাতিল বলে সমাজে অস্থিরতা তৈরি করা অন্যায়। কারো কাছে অন্য মত অধিকতর শক্তিশালী বলে প্রমাণ হলে তিনি তা পালন করবেন, তাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলবেন, তবে সমাজে প্রচলিত কর্মটিকে ভিত্তিহীন বলা কখনোই উচিত নয়। এতে সুন্নাতের অজুহাতে উম্মাতের মধ্যে সুন্নাহ-নিষিদ্ধ হানাহানি, বিদ্বেষ ও বিভক্তি আমদানি করা হয়।

প্রচলনের অজুহাতে সুন্নাহ সম্মত অপ্রচলিত মত বা কর্মটির প্রতি অবজ্ঞা পোষণ একইরূপ অন্যায়। সমাজে প্রচলিত সুন্নাতটির বিপরীত সহীহ সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রমাণিত সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা এবং তাঁর পর তাঁর যে সকল সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও বুজুর্গ সালফে সালিহীন এ সকল সুন্নাত পালন করেছেন তাঁদেরকেও ঘৃণা ও অবজ্ঞা করা। পৃথিবীতে একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-কে-ই মহান আল্লাহ এ মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁর প্রতিটি কর্মই বিশ্বের কেউ না কেউ পালন করছেন। এটি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মুজিযা এবং ইসলামের প্রশস্ততা। এটিকে সংকীর্ণতা ও বিভক্তিতে রূপান্তর করা দুর্ভাগ্যজনক।

আমি আমার সকল রচনা ও বক্তব্যে এ বিষয়গুলোকে সামনে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। রাহে বেলায়াতের অনেক পাঠক বারবার কিছু ফিকহী বিতর্ক সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করেছেন। সাধারণ সালাত, সালাতুল জানাযা, সালাতুল বিতর, বিতরের কুনুত, কুনুতে নাযেলা, কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ওযু, গোসল, সাজদায় কুরআনের দুআ বা মাতৃভাষায় দুআ পাঠ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে হাদীসের নির্দেশনার বিষয়ে তাঁরা দ্বিধান্বিত হয়ে অনেক প্রশ্ন করেছেন। উপরের মূলনীতির আলোকে 'রাহে বেলায়াত'-এর বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতার মধ্যে এ সংস্করণে আমি এ সকল বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

এ গ্রন্থে অগণিত ইমাম, ফকীহ ও বুজুর্গের নাম বারবার লেখা হয়েছে। প্রত্যেকের নামের সাথে সর্বত্র (রাহিমাহুল্লাহ) লেখা হয় নি। সর্বত্র তা লেখা তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ী যুগের আলিমদের রীতিও নয়। তবে পড়ার সময় প্রত্যেকের নামের সাথেই রহমতের দুআ করতে ভুলবেন না।

সম্মানিত পাঠক, মহান আল্লাহর বেলায়াত ও প্রেম অর্জন মানব জীবনের সবচেয়ে সহজ অথচ সবচেয়ে বড় অর্জন। জীবনের সকল লক্ষ্যেই ব্যর্থতার সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু মহান আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের লক্ষ্যে ব্যর্থতার কোনোই সম্ভাবনা নেই। মুমিন সাধ্যানুসারে যাই করবেন তাতেই তিনি পরিপূর্ণ ফল ও সাওয়াব লাভ করবেন। সম্মানিত পাঠক, আসুন না, মহান রব্বের বেলায়াত ও প্রেম অর্জনকে নিজেদের জীবনের লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করি এবং এ লক্ষ্য অর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য চেষ্টা করি। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের সকলের হৃদয়কে তাঁর প্রেম ও রহমতে পূর্ণ করে দিন। আমীন।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

প্রথম অধ্যায়
বেলায়াত, ওসীলাহ ও যিক্‌র

১. ১. বেলায়াত ও ওলী

আরবী (الولاية، بكسر الواو وفتحها) বিলায়াত, বেলায়াত বা ওয়ালায়াত অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব (closeness, friendship, guardianship)। 'বেলায়াত' অর্জনকারীকে 'ওলী' বা 'ওয়ালী' (الولي) বলা হয়। ওলী অর্থ নিকটবর্তী, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক ইত্যাদি। 'ওলী' অর্থেরই আরেকটি সুপরিচিত শব্দ 'মাওলা' (مولى)। 'মাওলা' অর্থও অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী ইত্যাদি (master, protector, friend, companion)।

ইসলামী পরিভাষায় 'বেলায়াত' 'ওলী' ও 'মাওলা' শব্দের বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকার আইনের পরিভাষায় ও রাজনৈতিক পরিভাষায় এ সকল শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। তবে বেলায়াত বা ওলী শব্দদ্বয় সর্বাধিক ব্যবহৃত (ولاية الله) 'আল্লাহর বন্ধুত্ব' ও (ولي الله) 'আল্লাহর বন্ধু' অর্থে। এ পুস্তকে আমরা 'বেলায়াত' বলতে এ অর্থই বুঝাচ্ছি।

আরবী 'তরীক' বা 'তরিকত' শব্দের অর্থ রাস্তা বা পথ। ফার্সীতে এ অর্থে 'রাহ' শব্দটি ব্যবহৃত। আমরা এ পুস্তকে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। ওলীদের পরিচয় প্রদান করে আল্লাহ বলেন :

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوْا يَتَّقُونَ

"জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবেন না- যারা ঈমান এনেছেন এবং যারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন বা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করেন।"[১]

ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক ও কুফর মুক্ত বিশ্বাস। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সেসব কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত সকল হারাম, নিষিদ্ধ ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়। এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ঈমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বা বিশ্বাস বর্ণনা করে বলেন:

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ

"সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী তিনি ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী)।[২]

১. ২. ওসীলাহ

উপরে আমরা দেখছি যে, দু'টি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া এ দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দিকে 'ওয়াসীলাহ' সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৩]

আমরা জানি, আল্লাহর সর্বোচ্চ বেলায়াত অর্জনই মানব জীবনের সর্বোচ্চ সফলতা। আর এ সফলতার জন্য এ আয়াতে ঈমানের পরে তিনটি কর্মের কথা বলা হয়েছে: (১) তাকওয়া, (২) ওয়াসীলাহ এবং (৩) জিহাদ।

ঈমান ও তাকওয়ার অর্থ আমরা জেনেছি। ওসীলাহ বা ওয়াসীলাহ (وسيلة) শব্দটি বাংলাভাষায় উপকরণ বা মাধ্যম অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের আরবী ভাষায় ওয়াসীলাহ অর্থ নৈকট্য। বস্তুত ভাষার অনেক শব্দের অর্থই ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়। বাংলা ভাষায় বর্তমানে 'সন্দেশ' শব্দটি মিষ্টান্ন অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু দু শতাব্দী আগে বাংলা ভাষায় 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ ছিল 'সংবাদ'। আরবী ভাষায় বর্তমানে 'লাবান' অর্থ ঘোল। কিন্তু পুরাতন আরবীতে এর অর্থ ছিল দুধ। বর্তমানে আরবীতে 'আমিল' অর্থ শ্রমিক বা কর্মচারী। কিন্তু পুরাতন আরবীতে এর অর্থ ছিল কর্মকতা বা অফিসার।

আর কোনো শব্দ যখন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রবেশ করে তখন তার অর্থের মধ্যে পরিবর্তন হয় আরো বেশি। আরবীতে ও ফার্সীতে নেশা বা নাশওয়া অর্থ 'মাতলামী' বা মাদকতা। কিন্তু বাংলায় শব্দটির অর্থ মাদকতা হয় আবার অভ্যস্ততাও হয়। একারণে অনেক সময় আমরা অস্পষ্টতার মধ্যে পড়ি। কেউ বলেন, নেশা হারাম। উত্তরে অন্যে বলেন, ভাত, চা ইত্যাদিও তো নেশা? প্রকৃতপক্ষে বাংলা

'নেশা' অর্থাৎ 'অভ্যস্ততা' হারাম নয়, বরং ফার্সী নেশা অর্থাৎ 'মাদকতা' হারাম। অভ্যস্ততা হারাম বা হালাল হবে অভ্যাসের বিষয়ের বিধান অনুসারে, আর মাদকতা সর্বাবস্থায় হারাম। 'ওসীলা' শব্দটিও এরূপ অর্থগত পরিবর্তন ও বিবর্তনের কারণে মুসলিম মানসে অনেক অস্পষ্টতার জন্ম দিয়েছে।

আমরা ওসীলা শব্দটিকে আযানের দুআয় প্রতিদিন ব্যবহার করে বলি

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ

'হে আল্লাহ .... মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে 'ওসীলা' প্রদান করুন।"

এখানে আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্য কোনো মাধ্যম বা উপকরণ প্রার্থনা করি না; কারণ, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, তাঁর কোনো মাধ্যম বা উপকরণের প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে তাঁর জন্য "নৈকট্য" প্রার্থনা করি। এ দুআর অর্থ, হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ﷺ-কে আপনার সর্বোচ্চ নৈকট ও নিকটবর্তী স্থান ও মর্যাদা প্রদান করুন।

ভাষাবিদ ইবনু ফারিস (৩৯৫ হি) বলেন: "ওয়াও, সীন ও লাম: দুটি পরস্পর বিরোধী অর্থ প্রকাশ করে: প্রথম অর্থ: আগ্রহ ও তালাশ। ... দ্বিতীয় অর্থ চুরি করা।"[১] প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ও মুফাস্‌সির আল্লামা রাগিব ইসপাহানী (৫০৭) বলেন: "ওসীলা: অর্থ আগ্রহের সাথে কোনো কিছুর নিকটবর্তী হওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন: 'তোমরা তাঁর দিকে ওসীলা সন্ধান কর'। ইলম, ইবাদত পালন এবং শরীয়তের মর্যাদাময় বিধিবিধান পালনের সর্বাত্মক চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকা-ই আল্লাহর দিকে ওসীলার হাকীকাত। এটি-ই নেক আমল বা নৈকট্য।"[২]

সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) বলেন:

وابتغوا إليه الوسيلة يقول واطلبوا القربة إليه ومعناه بما يرضيه والوسيلة هي الفعلية من قول القائل توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه

"তাঁর দিকে ওসীলা সন্ধান কর। এর অর্থ: তাঁর দিকে নৈকট্য সন্ধান কর,অর্থাৎ যে কর্ম করলে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করে। ওসীলা শব্দটি 'তাওয়াস্‌সালতু' কথা থেকে 'ফায়ীলাহ' ওযনে গৃহীত ইসম। বলা হয় 'তাওয়াস্‌সালতু ইলা ফুলান বি-কাযা, অর্থাৎ আমি অমুক কাজ করে অমুকের নিকটবর্তী হয়েছি।"[৩]

ইমাম তাবারী ভাষাতাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেন যে, ওসীলা অর্থ নৈকট্য। এরপর তিনি সাহাবী ইবনু আব্বাস (রা), তাবিয়ী আবূ ওয়ায়িল, আতা ইবনু আবি রাবাহ, কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ, মুজাহিদ ইবনু জাবর, হাসান বাসরী, আব্দুল্লাহ ইবনু কাসীর, সুদ্দী আল-কাবীর, ইবনু যাইদ, প্রমুখ মুফাস্‌সির থেকে উদ্ধৃত করেন: 'তাঁর ওসীলা সন্ধান কর' অর্থ তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর, অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য ও রেযামন্দিমূলক নেককর্ম করে তাঁর নৈকট্য ও মহব্বত লাভে সচেষ্ট হও।[৪]

জিহাদ অর্থ প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম। আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রচারের সকল প্রচেষ্টাকেই কুরআন-হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। সত্যের দাওয়াত, অন্যায়ের প্রতিবাদ, হজ্জ পালন, আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ অর্থ "কিতাল" বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুমিন সাধ্যমত সত্যের দাওয়াত দিবেন এবং সুযোগ থাকলে রাষ্ট্রীয় জিহাদে অংশ নিবেন।[৫]

বস্তুত প্রথম আয়াতে 'তাকওয়া' বলতে যা বুঝানো হয়েছে এ আয়াতে 'তাকওয়া', 'ওসীলাহ' ও 'জিহাদ' তারই তিনটি পর্যায়। তাকওয়া মূলত আত্মরক্ষামূলক কর্ম, অর্থাৎ ফরয-ওয়াজিব কর্ম করা এবং হারাম-মাকরূহ কর্মাদি বর্জন করা। এর অতিরিক্ত আল্লাহর নৈকট্যমূলক কর্মই মূলত "ওয়াসীলাহ" বলে গণ্য। দাওয়াত ও জিহাদ কখনো ফরয এবং কখনো নফল।

বেলায়াত অর্জনের জন্য তাকওয়া ও ওসীলাহর এ দু'টি পর্যায়কে ফরয ও নফল দু'ভাগে ভাগ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন :

مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ.

"যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তারমধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়াতের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার

দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।"[১]

বেলায়াতের এ অবস্থাকেই অন্য হাদীসে 'ইহসান' বলা হয়েছে। "ইহসান" অর্থ সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। "ইহসান" অর্জনকারী "মুহসিন"। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "ইহসান হলো, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখছ। কারণ তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।"[২]

তাহলে ওলী ও বেলায়াতের মানদণ্ড ঈমান ও তাকওয়া। আর 'তরিকতে বেলায়াত' বা 'রাহে বেলায়াত' অর্থাৎ বেলায়াতের রাস্তা সকল ফরয কাজ আদায় এবং বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। যদি কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ সুন্নাত অনুসারে সঠিক ঈমান সংরক্ষণ করেন, সকল প্রকারের হারাম ও নিষেধ বর্জনের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করেন, তাঁর উপর ফরয যাবতীয় দায়িত্ব তিনি আদায় করেন এবং সর্বশেষে যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল ইবাদত আদায় করেন তিনিই আল্লাহর ওলী বা প্রিয় মানুষ। বেলায়াতের পূর্ণতার প্রমাণ যে, মুমিনের দর্শন শক্তি, শ্রবণশক্তি ও দৈহিকশক্তি মহান আল্লাহর নির্দেশনাধীন হবে। সর্দসর্বদা তিনি অনুভব করবেন যে, তিনি আল্লাহকে দেখছেন এবং আল্লাহ তাঁকে দেখছেন। কাজেই সামান্যতম পাপের চিন্তায় তাঁর হাত, পা, চোখ, কান সবকিছু আড়ষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহর যিকর থেকে সামান্য সময় অমনোযোগী হলেও তিনি খারাপ বোধ করেন। তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর দৃষ্টি ও সাহচর্য অনুভব করেন।

আল্লাহর নিষেধ বর্জনকে মূলত তাকওয়া বলা হয়। এজন্য বেলায়াতের পথে নফল মুস্তাহাব পালনের চেয়ে হারাম-মাকরূহ বর্জনের গুরুত্ব বেশি। এ বিষয়ে মুজাদ্দিদ আলফ সানী (রাহ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিক্‌র, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোন নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরয ইবাদত তাহার সময় মত যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। বরং ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।... অতএব, মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরুহ যদিও উহা 'তানজিহী' হয় তাহা হইতে বিরত থাকা যিক্‌র মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাকরূহে তাহরীমির কথা কী আর বলিব! অবশ্য উক্ত কার্যসমূহ (যিক্‌র মোরাকাবা) যদি উক্ত আমলসমূহের (ফরয, মুস্তাহাব পালন ও সকল মাকরুহ বর্জনের) সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ।"[৩]

এভাবে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আমরা দেখি যে, বেলায়াতের পথের কর্মগুলোর পর্যায়, তথা মুমিন জীবনের সকল কর্মের গুরুত্ব ও পর্যায়গুলো নিন্মরূপ:

প্রথম, ঈমান : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবকিছুর মূল বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটিসহ সকল নেক কর্ম ও ধার্মিকতা পণ্ডশ্রম ও বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয়, বৈধ উপার্জন : ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, ফাঁকি, ধোঁকা, জুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তৃতীয়, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন : কর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরয কর্ম। ফরয দু প্রকার (ক) করণীয় ফরয (খ) বর্জনীয় ফরয বা "হারাম"। হারাম দু প্রকার : এক প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলো বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন।

পঞ্চম, ফরয কর্মগুলো পালন।

ষষ্ঠ, মাকরুহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু'আক্কাদা কর্ম পালন।

সপ্তম, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

অষ্টম, ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

আমি এ পুস্তকে কিছু ফরয-ওয়াজিব বিষয়ের আলোচনা করলেও, মূলত অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতই এ পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়। উপরের সাতটি পর্যায়ের কর্ম যদি আমাদের জীবনে না থাকে তাহলে এ অষ্টম পর্যায়ের কর্ম অর্থহীন হতে পারে বা ভণ্ডামীতে পরিণত হতে পারে। আমরা অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, আমাদের সমাজের ধার্মিক মানুষেরা প্রায়শ এই অষ্টম পর্যায়ের কাজগুলোকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেন, অথচ পূর্ববর্তী বিষয়গুলোর প্রকৃত গুরুত্ব আলোচনা বা অনুধাবনে ব্যর্থ হন। মহান রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল ﷺ যে কর্মের যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাকে তার চেয়ে কম গুরুত্ব প্রদান করা যেমন কঠিন অপরাধ ও তাঁদের শিক্ষার বিরোধিতা, বেশি গুরুত্ব প্রদানও একই প্রকার অপরাধ।

এক্ষেত্রে আমরা কয়েক প্রকারের কঠিন ভুল ও অপরাধে লিপ্ত হচ্ছি :

(ক) ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মু'আক্কাদা ছেড়ে অন্যান্য সুন্নাত- নফলের গুরুত্ব দেওয়া। নফল ইবাদতের ফযীলত বলতে

যয়ে আমরা ফরযের কথা অবহেলা করে ফেলি। ফলে সমাজের অনেক ধার্মিক মানুষ অনেক ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে নফলে লিপ্ত হন। যেমন, ফরয যাকাত না দিয়ে নফল দান, ফরয হজ্ব না করে নফর্ণিী.ধংংঁহহধযঃৎঁংঃ.পড়সল ইবাদত, ফরয ইল্‌ম অর্জন না করে ।দনফল তাহাজ্জুদ, ফরয সৎকাজে আদেশ প্রদান না করে নফল যিক্‌র, ফরয স্ত্রী-সন্তান প্রতিপালন বাদ দিয়ে নফল ইবাদত ইত্যা

(খ) হারাম বর্জন ও হালাল উপার্জন থেকে সুন্নাত-নফল পালনকে গুরুত্ব দেওয়া। ফরয পালনের চেয়ে হারাম বর্জন বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যদিও দুটিই একইভাবে ফরয। কিন্তু আমরা সুন্নাত ও নফল বা সপ্তম ও অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে অনেক সময় উপরের বিষয়গুলো ভুলে যায়। ফলে অগণিত মানুষকে আমরা দেখি হারাম উপার্জন, হারাম কর্ম ইত্যাদিতে লিপ্ত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন সুন্নাত-নফল ইবাদত আগ্রহের সাথে পালন করছেন। বিশেষত, অনেকে বান্দার হক সংক্রান্ত হারামে লিপ্ত থেকে নফল ইবাদত পালন করছেন অতীব আগ্রহের সাথে।

(গ) নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির সেবার চেয়ে ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। কুরআন ও হাদীসে মানুষের বা যে কোনো প্রাণীর উপকার করা, সাহায্য করা, সেবা করা, চিকিৎসা করা, কারো সাহায্যের উদ্দেশ্যে সামান্য একটু পথচলা, এমনকি শুধুমাত্র নিজেকে অন্য কারো ক্ষতি করা বা কষ্ট প্রদান থেকে বিরত রাখাকে অন্য সকল প্রকার সুন্নাত-নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি সাওয়াব ও মর্যাদার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর রহমত, বরকত, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৃষ্টির সেবাকে সবচেয়ে বেশী ফলদায়ক বলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা কুরআন ও হাদীসের এসব সুস্পষ্টতম বিষয় একেবারেই অবহেলা করছি। একজন ধার্মিক মানুষ যিক্‌র ওযীফাকে যতটুকু গুরুত্ব দেন মানুষের সাহায্য, উপকার বা সেবাকে সে গুরুত্ব দেন না, বরং এগুলোকে ইবাদতই মনে করেন না।

(ঘ) অষ্টম পর্যায়ের কর্মসমূহের মধ্যেও পর্যায় রয়েছে। সাধারণত সে সকল কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন বা করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন কিন্তু না করলে কোনো আপত্তি করেননি সে কাজগুলোই অষ্টম পর্যায়ের। এ পর্যায়ের কাজের মধ্যে গুরুত্বের কম-বেশি হয় সুন্নাতের আলোকে। যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা করেছেন বা অধিকাংশ সময় করেছেন তবে না করলে আপত্তি করেননি তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে যা তিনি মাঝে মধ্যে করেছেন তার গুরুত্ব তার চেয়ে কম। অপরদিকে যা তিনি করেছেন ও করতে উৎসাহ দিয়েছেন তার গুরুত্ব যা তিনি করেছেন কিন্তু করতে উৎসাহ দেননি তার চেয়ে বেশি।

আমরা এ পর্যায়ের কাজগুলোকেও উল্টাভাবে গ্রহণ করি। একটি উদাহরণ দেখুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা কম খাদ্য খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কম খেতে, ক্ষুধার্ত থাকতে ও মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন ও উৎসাহ প্রদান করতেন। এছাড়া তিনি খাওয়ার সময় দস্তরখান ব্যবহার করতেন বলে জানা যায়। তবে সর্বদা তা ব্যবহার করতেন না বলেই বুঝা যায়। এছাড়া তিনি দস্তরখান ব্যবহার করতে উৎসাহ প্রদান করেননি। সাহাবীগণ হেঁটে হেঁটে, দাঁড়িয়ে বা পাত্রে রেখেও খেয়েছেন। এখন আমরা দ্বিতীয় কাজটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করি, অথচ প্রথম কাজটিকে গুরুত্ব প্রদান করি না।

এছাড়া অনেকেই এক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে যেয়ে সুন্নাতের বিরোধিতা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করলে তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা হয়। কারণ, তিনি মাঝে মাঝে অন্য যে কাজটি করতেন তা বর্জিত হয়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রঙের পোশাক পরতেন, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্নভাবে গ্রহণ করতেন। কখনো পাগড়ি পরতেন, কখনো রুমাল পরতেন, কখনো শুধু টুপি পরতেন। কখনো জামা পরতেন, কখনো লুঙ্গি ও চাদর পরতেন ... ইত্যাদি। এখন শুধু এক প্রকারকে সর্বদা পালন করা তাঁর রীতির বিরুদ্ধতা করা।

(ঙ) বেলায়াত ও তাকওয়ার ধারণার বিকৃতি। উপরের বিষয়গুলো আমাদের মনে এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে যে, প্রকৃত মুসলিমের ব্যক্তিত্ব, তাকওয়া, বেলায়াত ও বুজুর্গী সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই উলটো হয়ে গিয়েছে। আমরা পাগড়ি, টুপি, যিক্‌র, দস্তরখান ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। কিন্তু ঈমান, বান্দার হক, হালাল উপার্জন, মানব সেবা সম্পর্কে উদাসীন। কেউ হয়ত গীবত, অহংকার, বান্দার হক নষ্ট, হারাম উপার্জন ইত্যাদিতে লিপ্ত, কিন্তু টুপি, পাগড়ি, তাহাজ্জুদ, যিক্‌র ইত্যাদি অষ্টম পর্যায়ের ইবাদতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। আমরা এ ব্যক্তিকে মুত্তাকী পরহেযগার বা ধার্মিক মুসলিম বলে মনে করি। এমনকি আল্লাহর ওলী বা পীর মাশায়েখ বলেও বিশ্বাস করি। অপর দিকে যদি কেউ মানব সেবা, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকেন তাকে আমরা আল্লাহর ওলী বলা তো দূরের কথা ধার্মিক বলেই মানতে রাজি হব না।

অনেক ধার্মিক মানুষ দস্তরখান বা পাগড়ী নিয়ে অতি ব্যস্ত হলেও হালাল মালের খাদ্য ও পোশাক কি-না তা বিবেচনা করছেন না। লোকটির টুপি, পাগড়ি বা জামা কোন্ কাটিংএর তা খুব যত্ন সহকারে বিবেচনা করলেও তিনি বান্দার হক নষ্ট করছেন কিনা, ফরযসমূহ পালন করছেন কিনা, মানুষের ক্ষতি বা অকল্যাণ থেকে বিরত আছেন কিনা, কবীরা গোনাহগুলো থেকে বিরত আছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় আমরা বিবেচনায় আনছি না।

(চ) আমরা সর্বশেষ পর্যায়ের নফল মুস্তাহাব কাজগুলোকে দলাদলি ও ভ্রাতৃত্বের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছি। মূলত সকল মুমিন মুসলমান একে অপরকে ভালবাসবেন। বিশেষত যাঁদের মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় পাওয়া যায় তাঁদেরকে আমরা আল্লাহর ওলী ও মুত্তাকী বান্দা হিসেবে আল্লাহর ওয়াস্তে বিশেষভাবে ভালবাসব। নফল মুস্তাহাব বিষয় কম-বেশি যে যেভাবে পারেন করবেন। এ সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা হবে, কিন্তু দলাদলি হবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখি যে, আমরা টুপি, জামা, পাগড়ি, দস্তরখান ইত্যাদির আকৃতি, প্রকৃতি রঙ, যিক্‌র, দু'আ, সালাত, সালাম ইত্যাদির পদ্ধতি ও প্রকরণ ইত্যাদিকেই দলাদলির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করি। ফলে প্রথম ছয়টি পর্যায় যার মধ্যে সঠিকভাবে বিরাজমান নেই, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমাদের সাথে মিল রাখেন তাকে আমরা আপন মনে করে দ্বীনি ভাই বা মহব্বতের ভাই বলে মনে করি। আর যার মধ্যে প্রথম ছয়টি পর্যায় বিরাজমান, অথচ অষ্টম পর্যায়ে আমার সাথে ভিন্নতা রয়েছে তাকে আমরা কাফির মুশরিকের মতো

ঘৃণা করি বা বর্জন করি। এভাবে আমরা ইসলামের মূল মানদণ্ড উল্টে ফেলেছি। আমরা ইসলামের জামা উল্টে পরেছি।

১. ৩. বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি

মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের কাছে আবৃত্তি করেন, তাদেরকে 'তাযকিয়া' (পরিশোধন) করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাত) শিক্ষা দেন।"[১] অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে যে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা, কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া ও 'তাযকিয়া' বা পরিশোধন করাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল মিশন।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: "সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে 'তাযকিয়া' (পবিত্র) করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"[২] আরো বলা হয়েছে: "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে 'যাকাত' (পবিত্রতা) অর্জন করে। এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।"[৩] এ থেকে জানা যায় যে, তাযকিয়া, তাযকিয়া নফস বা আত্মশুদ্ধি-ই সফলতার মূল।

'তাযকিয়া'-র ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, তাযকিয়া শব্দটি 'যাকাত' থেকে গৃহীত। যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এ সকল আয়াতে 'তাযকিয়া' অর্থও পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুমিনগণকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এভাবেই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আনুগত্য, ইখলাস ও নির্ভেজাল তাওহীদের মাধ্যমে তাদের তাযকিয়া করেন। তাবিয়ী ইবনু জুরাইজ বলেন, তিনি তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করেন।[৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দীনের সকল কর্মই 'তাযকিয়া'-র অন্তর্ভুক্ত; কারণ সকল কর্মই মুমিনকে কোনো না কোনভাবে পবিত্র করে এবং তার সাওয়াব, মর্যাদা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। তবে এক্ষেত্রে হার্দিক বা মানসিক বিষয়গুলোর প্রতি কুরআন-হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। কুরআনকে সকল মনোরোগের চিকিৎসা বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা।"[৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি সংশোধিত হয় তবে পুরো দেহই সংশোধিত হয় আর যদি তা নষ্ট হয় তবে পুরো দেহই নষ্ট হয়। জেনে রাখ তা অন্তকরণ।"[৬]

এথেকে আমরা দেখি যে, বেলায়াতের পথের ৮টি পর্যায়ই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পর্যায় ও কর্ম। আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রেও ফরয ও নফল এবং করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম রয়েছে। শিরক, কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছন্দকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এগুলো বর্জনীয় মানসিক কর্ম। মনকে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণকামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। এগুলো করণীয় মানসিক কর্ম। এগুলোর ফরয ও নফল পর্যায় আছে। আমরা বুঝতে পারিছ যে, শির্ক, আত্মপ্রেম ইত্যাদিতে মন ভরে রেখে পাশাপাশি সবর, শোকর, ক্রন্দন ইত্যাদি গুণ অর্জনের চেষ্টা করা বিভ্রান্তি ও ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

১. ৪. যিক্র, বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধি

যিক্র আরবী শব্দ। বাংলায় এর অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাব যে, যে কোনো প্রকারে মনে, মুখে, অন্তরে, কর্মের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ পালন করে বা নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধিবিধান, তাঁর পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা করানোকে ইসলামের পরিভাষায় যিক্র বা আল্লাহর যিক্র বলা হয়। তবে কুরআন ও সুন্নাহে 'যিক্র' বলতে সাধারণভাবে কোনো না কোনোভাবে মুখের ভাষায় 'আল্লাহর স্মরণ' করাকে বুঝানো হয়। মুখের সাথে মনের ও কর্মের স্মরণ থাকতে হবে। শুধু কর্মের স্মরণ বা শুধু মনের স্মরণও যিক্র। তবে কুরআন ও হাদীসে যিক্রের নির্দেশের ক্ষেত্রে, যিক্রের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিক্র বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বত্র মূলত মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ বুঝানো হয়েছে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় তা বিস্তারিত দেখতে পাব।

উপর্যুক্ত ব্যাপক অর্থে ঈমান ও নেককর্ম সবই 'যিক্র' বলে গণ্য। এ জন্য প্রশস্ত অর্থে বেলায়াতের পথের উপরোল্লিখিত আট পর্যায়ের সকল কর্মকেই এক কথায় 'যিক্র' বলে অভিহিত করা যায়। এভাবে যিক্র ও বেলায়াত পরস্পরে অবিচ্ছেদ্য বা প্রায় সমার্থক।

আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথের কর্ম দু পর্যায়ের: ফরয ও নফল। নফল পর্যায়ের যিক্রকে বেলায়াতের পথে অন্য সকল নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে হাদীস শরীফে। সর্বোপরি, আত্মশুদ্ধির জন্য কুরআন-হাদীসে যিক্রের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এজন্য আমরা এ গ্রন্থে বেলায়াতের পথের বর্ণনায় 'যিক্র' বিষয়েই সবচেয়ে বেশি আলোচনা করব। আল্লাহর কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যত প্রার্থনা করছি।

---

১. ৫. যিক্‌রের পরিচয়ে অস্পষ্টতা

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণের সুন্নাতের উপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র শাব্দিক অর্থ বা ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা, অভিরুচি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের অর্থ বা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হই। এধরনের অজ্ঞতা বা মনগড়া ব্যাখ্যার কারণে আমরা যিক্‌রের ক্ষেত্রে তিন প্রকার বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হই :

প্রথম, অনেক সময় অনেক আবেগী ধার্মিক মানুষ তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি শাব্দিক যিক্‌রের প্রতি অবজ্ঞা করে বলেন যে, 'আল্লাহর হুকুম মানাই তো বড় যিক্‌র ... ' ইত্যাদি।

দ্বিতীয়, অনেক সময় অনেক ধার্মিক মানুষ যিক্‌র বলতে শুধুমাত্র তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি শাব্দিক যিক্‌রই বুঝেন। তিনি মনে করেন এ সকল যিক্‌র না করে যিনি আল্লাহর বিধানাবলী সাধ্যমত পালন করেন তিনি কখনই যাকির নন। উপরন্তু অনেকে আল্লাহর ফরয বিধানাবলী – সালাত, সিয়াম, যাকাত, ইত্যাদি যথাযথ পালন না করে শুধুমাত্র কিছু সুন্নাত-সম্মত অথবা বিদ'আত পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত 'যিক্‌র' নামক কর্ম করে নিজেকে যাকির বলে দাবি করেন বা মনে করেন।

তৃতীয়, অনেক ধার্মিক ও যাকির মানুষ 'আল্লাহর যিক্‌র' বা 'আল্লাহর নামের যিক্‌র' বলতে সুন্নাত সম্মত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের আচরিত যিক্‌র না বুঝে সমাজে প্রচিলত বিভিন্ন বানোয়াট পদ্ধতির বানোয়াট যিক্‌র বুঝেন। তাঁরা আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলতের আয়াত ও হাদীসগুলো গ্রহণ করেন। কিন্তু এগুলোর পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত নিয়ে মাথা ঘামান না।

এসকল বিভ্রান্তির মূল কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের শিক্ষা, কর্ম ও ব্যবহার না জেনে, দুই একটি আয়াত বা হাদীস পড়ে মনোমতো ব্যাখ্যা করা। ইসলামের অন্যতম রুকন 'সালাত'। 'সালাত' অর্থ প্রার্থনা। আমরা বাংলা ভাষায় ফার্সি 'নামায' শব্দ ব্যবহার করি। ইংরেজিতে সালাতকে prayer-ই বলা হয়। এখন কল্পনা করুন, একজন নতুন ইংরেজি ভাষাভাষী মুসলিম আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে prayer বা প্রার্থনা কায়েম করতে চায়। এজন্য সে দাঁড়িয়ে বা বসে আবেগের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে বলে যে, আল্লাহর নির্দেশমতো সে prayer বা সালাত কায়েম করছে। আপনি তাকে এভাবে প্রার্থনা বা সালাত কায়েম করতে নিষেধ করলে বিরক্ত হয়ে আপনাকে ইসলাম বিরোধী ও সালাত বিরোধী বলে আখ্যায়িত করল।

জাপানি ও অন্যান্য বিদেশী সাক্ষাৎ হলে তাদের 'সালাম' হিসাবে Bow (বাউ) করে বা মাথা নিচু করে সম্ভাষণ জানায়। এখন একজন জাপানি ইসলাম গ্রহণ করে 'ইসলামী সালাম' শিখেছেন। তিনি অনুরূপ Bow (বাউ) করে বা মাথা ঝুঁকিয়ে আপনাকে 'আসসালামু আলাইকুম' বললেন। আপনি তাকে Bow (বাউ) করতে নিষেধ করলে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে সালাম করতে নিষেধ করছেন? সালাম সুন্নাত, সালামে এত ফযীলত, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি কী করবেন? আপনি কি তাকে বুঝাতে পারবেন যে, আপনি সালাম করতে নিষেধ করছেন না, আপনি শুধুমাত্র Bow (বাউ) করে সালাম করতে নিষেধ করছেন। আপনি কি তাকে বুঝাতে পারবেন যে, আপনি তাকে সুন্নাত শব্দে ও সুন্নাত পদ্ধতিতে সালাম করতে বলছেন?

আমাদের দেশের যাকিরগণ অবিকল একই সমস্যায় নিপতিত। আল্লাহর যিক্‌র, যিক্‌র, আল্লাহর নামের যিক্‌র ইত্যাদি শব্দ বিকৃত ও সুন্নাত বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। আপনি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে যিক্‌র করতে অনুরোধ করেন তাহলে তারা আপনার কথার ভুল অর্থ করে আপনি যিক্‌র করতে নিষেধ করছেন বলে আপনার বিরোধিতা করবেন।

এজন্য আমাদেরকে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কুরআন ও হাদীসে যিক্‌রের যে অগণিত নির্দেশনা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সেসব নির্দেশনা পালনের এবং ফযীলত অর্জনের জন্য আমরা কি মনগড়াভাবে প্রয়োজন, ইচ্ছা বা অভিরুচি মত যিক্‌র বা যিক্‌র-পদ্ধতি বানিয়ে নিতে পারব? নাকি আমাদের এ সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অনুসরণ করতে হবে? যিক্‌র মানেই তো স্মরণ। আমরা কি তাহলে দেশ, যুগ, ভাষা, রুচি, প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারে ইচ্ছামত শব্দে ও ইচ্ছামত পদ্ধতিতে যিক্‌র বা স্মরণ করতে পারব ? না শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ যখন, যেভাবে, যে শব্দে ও যে পদ্ধতিতে যিক্‌র করেছেন অবিকল সেভাবেই আমাদের যিক্‌র করতে হবে?

১. ৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে যিক্‌র

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, আল্লাহর যিক্‌র বা মহান রাব্বুল আ'লামীনের স্মরণই মূলত ইসলাম। মুমিনের সকল কর্মই তো তার প্রতিপালক রাব্বুল আ'লামীনকে কেন্দ্র করে ও তাঁকেই স্মরণ করে। কাজেই, তার সকল কর্মই যিক্‌র। কুরআন ও হাদীসে এভাবে আমরা যিক্‌রকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত দেখতে পাই। ঈমান, কুরআন, সালাত, সিয়াম, হজ্ব ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদতকেই যিক্‌র বলা হয়েছে। আবার এগুলোর অতিরিক্ত তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, দু'আ ইত্যাদিকেও যিক্‌র নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীসের এ সকল ব্যবহারের আলোকে আমরা যিক্‌রকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি: **১.** ইসলামে যে সকল ফরয বা নফল ইবাদতের অন্য ব্যবহারিক নাম রয়েছে, তবে যেহেতু সকল ইবাদতের মূলই আল্লাহর স্মরণ, এজন্য সেগুলোকেও যিক্‌র নামে অভিহিত করা হয়েছে। **২.** যে সকল ফরয বা নফল ইবাদত শুধুমাত্র যিক্‌র নামেই অভিহিত এবং অন্যান্য সকল ইবাদতের অতিরিক্ত শুধুমাত্র আল্লাহর স্মরণের জন্য পালন করা হয়। নিম্নে যিক্‌র শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আলোচনা করা হল :

১. ৬. ১. আল্লাহর আনুগত্যমূলক কর্ম ও বর্জন

মহান আল্লাহ বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

"তোমরা আমার যিক্‌র কর, আমি তোমাদের যিক্‌র করব"।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী-তাবেয়ীগণ বলেন: এখানে যিক্‌র বলতে সকল প্রকার ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজকে বুঝান হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্য করাই বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর যিক্‌র করা। আর বান্দাকে প্রতিদানে পুরস্কার, করুণা, শান্তি ও বরকত প্রদানই আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে যিক্‌র করা।[২] ইমাম তাবারী এ প্রসঙ্গে বলেন: "হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে সকল আদেশ প্রদান করেছি তা পালন করে এবং যা নিষেধ করেছি তা বর্জন করে তোমরা আমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমার যিক্‌র কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে আমার রহমত, দয়া ও ক্ষমা প্রদানের মাধ্যমে তোমাদের যিক্‌র করব।"[৩]

আব্দুল্লাহ ইবনু রাবীয়াহ ইবনু আব্বাস (রা)-কে বলেন: "আল্লাহর যিক্‌র তাঁর তাসবীহ, তাহলীল, প্রশংসা জ্ঞাপন, কুরআন তিলাওয়াত, তিনি যা নিষেধ করেছেন তাঁর কথা স্মরণ করে তা থেকে বিরত থাকা– এ সবই আল্লাহর যিক্‌র।" ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: "সালাত, সিয়াম ইত্যাদি সবই আল্লাহর যিক্‌র।"[৪]

প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী উম্মে দারদা (রা) বলেন :

فَإِنْ صَلَّيْتَ فَهُوَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِنْ صُمْتَ فَهُوَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَكُلُّ خَيْرٍ تَعْمَلُهُ فَهُوَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَكُلُّ شَرٍّ تَجْتَنِبُهُ فَهُوَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَأَفْضَلُ ذَلِكَ تَسْبِيْحُ اللهِ

"তুমি যদি সালাত আদায় কর তাও আল্লাহর যিক্‌র, তুমি যদি সিয়াম পালন কর তবে তাও আল্লাহর যিক্‌র। তুমি যা কিছু ভাল কাজ কর সবই আল্লাহর যিক্‌র। যত প্রকার মন্দ কাজ তুমি পরিত্যাগ করবে সবই আল্লাহর যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। তবে সেগুলির মধ্যে উত্তম আল্লাহর তাসবীহ ('সুবহানাল্লাহ' বলা)।"[৫]

মহান আল্লাহ বলেন:

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

"(আল্লার ঘরে আল্লাহর যিক্‌রকারী মানুষগণকে) কোনো ব্যবসা বা কেনাবেচা আল্লাহর যিক্‌র থেকে অমনোযোগী করতে পারে না।"[৬]

এ আয়াতে 'আল্লাহর যিক্‌রের' ব্যাখ্যায় তাবেয়ী কাতাদা বলেন: "এ সকল যাকির বান্দা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতেন। যখনই আল্লাহর কোনো পাওনা বা তাঁর প্রদত্ত কোনো দায়িত্ব এসে যেত তাঁরা তৎক্ষণাৎ তা আদায় করতেন। ব্যবসা বা বেচাকেনা তাঁদেরকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত রাখত না।"[৭]

তাবেয়ীগণ মুখের যিক্‌রের গুরুত্ব দিতেন। তবে এগুলো নফল যিক্‌র। কর্মে আল্লাহর বিধিবিধান না মেনে এসকল যিক্‌র পালন করাকে তাঁরা মূল্যহীন বলে গণ্য করতেন। তাবেয়ী সাঈদ বিন জুবাঈর (৯৫ হি) বলেন :

اَلذِّكْرُ طَاعَةُ اللهِ، فَمَنْ أَطَاعَ اللهَ فَقَدْ ذَكَرَهُ، وَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ فَلَيْسَ بِذَاكِرِ اللهِ، وَإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيْحَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ

"আল্লাহর আনুগত্যই আল্লাহর যিক্‌র। যে তাঁর আনুগত্য করল সে তাঁর যিক্‌র করল। আর যে আল্লাহর আনুগত্য করল না বা তাঁর বিধিনিষেধ পালন করল না, সে যত বেশিই তাসবীহ পাঠ করুক আর কুরআন তিলাওয়াত করুক সে 'যাকির' হিসেবে গণ্য হবে না।"[৮]

এ অর্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত। তাবেয়ী খালিদ ইবনু আবী ঈমরান (১২৫ হি) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ أَطَاعَ اللهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللهَ وَإِنْ قَلَّتْ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ وَمَنْ عَصَى اللهَ فَقَدْ نَسِيَ اللهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلاَوَتُهُ الْقُرْآنَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করল সে আল্লাহর যিক্‌র করল, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াত কম হয়। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করল সে আল্লাহকে ভুলে গেল, যদিও তার সালাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াত বেশি হয়।"[৯]

আল্লামা আব্দুর রাউফ মানাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন : 'এ থেকে বুঝা যায় যে, যিক্‌রের হাকীকত আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর

আদেশ পালন করা ও নিষেধ বর্জন করা।' এজন্য কোনো কোনো ওলী বলেছেন : 'যিক্‌রের মূল আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা বা পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকেও মুখে আল্লাহর যিক্‌র করে সে মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে উপহাসে লিপ্ত এবং আল্লাহর আয়াত ও বিধানকে তামাশার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে।'[১]

তাবেয়ী হাসান বসরী বলেন : 'আল্লাহর যিক্‌র দুই প্রকার: প্রথম প্রকার যিক্‌র– তোমার নিজের ও তোমার প্রভুর মাঝে মুখে জপের মাধ্যমে তাঁর যিক্‌র করবে। এ যিক্‌র খুবই ভাল এবং এর সাওয়াবও সীমাহীন। দ্বিতীয় প্রকার যিক্‌র আরো উত্তম ; আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তার কাছে তাঁর যিক্‌র করা। অর্থাৎ, আল্লাহর কথা স্মরণ করে তাঁর নিষেধ করা কর্ম থেকে বিরত থাকা।'[২]

তাবেয়ী বিলাল ইবনু সা'দ বলেন: 'যিক্‌র দু প্রকার: প্রথম প্রকার জিহ্বার যিক্‌র, এ যিক্‌র ভাল। দ্বিতীয় প্রকার হালাল-হারাম ও বিধিনিষেধের যিক্‌র। সকল কর্মের সময় আল্লাহর আদেশ নিষেধ মনে রাখা। এ যিক্‌র সর্বোত্তম।'[৩]

তাবেয়ী মাসরূক বলেন : 'যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির ক্বলব আল্লাহর স্মরণে রত আছে, ততক্ষণ সে মূলত সালাতের মধ্যে রয়েছে, যদিও সে বাজারের মধ্যে থাকে।'[৪] অন্য তাবেয়ী আবু উবাইদাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন: 'যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির অন্তর আল্লাহর স্মরণে রত থাকে, ততক্ষণ সে মূলত সালাতের মধ্যেই রয়েছে। যদি এর সাথে তার জিহ্বা ও দুই ঠোঁট নড়াচড়া করে (অর্থাৎ, মনের স্মরণের সাথে সাথে যদি মুখেও উচ্চারণ করে) তাহলে তা হবে খুবই ভাল, বেশি কল্যাণময়।'[৫]

১. ৬. ২. সালাত আল্লাহর যিক্‌র

সকল প্রকার ইবাদতের মধ্য থেকে সালাতকে বিশেষভাবে যিক্‌র হিসেবে কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي

"এবং আমার যিক্‌রের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।"[৬]

হজ্বের কর্মকাণ্ডের বর্ণনার সময় কুরআন করীমে বলা হয়েছে :

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

"তোমরা আরাফাত থেকে ফিরে আসার পরে মাশআরুল হারামের নিকট (মুযদালিফায়) আল্লাহর যিক্‌র করবে।"[৭]

আমরা জানি, মুযদালিফায় হাজীগণের জন্য প্রচলিত তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি কোনো যিক্‌র করা ফরয-ওয়াজিব নয়। শুধুমাত্র মাগরিব ও ঈশা'র সালাত একত্রে আদায় করা ও ফজরের সালাত আদায় করাই হাজীগণের হজ্ব সংক্রান্ত বিধান। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে 'আল্লাহর যিক্‌র' বলতে সালাত বুঝানো হয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন : "তোমরা যখন আরাফাত থেকে ফিরে মুযদালিফায় চলে আসবে তখন আল্লাহর যিক্‌র করবে, এখানে যিক্‌র বলতে মাশআরুল হারামের নিকট সালাত ও দু'আ করাকে বুঝান হয়েছে।"[৮]

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

"যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে জাগাবে এবং দু'জনে মিলে দু রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করবে আল্লাহর দরবারে তারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যাকিরীন বা সর্বাধিক যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীগণের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৯]

তাহলে দেখুন তাহাজ্জুদের সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। দুই রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায়কারী আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠ যাকির হওয়ার মর্যাদা পেলেন।

১. ৬. ৩. সকাল-বিকালে আল্লাহর নামের যিক্‌র

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

"এবং সকালে ও বিকালে তোমার প্রভুর নাম যিক্‌র কর।"[১০]

এর ব্যাখ্যায় ইবনু যাইদ বলেন : "সকালের যিক্‌র ফজরের সালাত এবং বিকালের যিক্‌র যোহরের সালাত।[১১] ইমাম তাবারী বলেন : 'হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার প্রভুর নামের যিক্‌র করুন। সকালে ফজরের সালাতে এবং বিকালে যোহর ও আসরের সালাতের মধ্যে আপনি

তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকুন।"[১]

আল্লামা কুরতুবী বলেন: 'সকালে ও বিকালে আপনার প্রভুর নামের যিক্‌র করুন, অর্থাৎ দিনের প্রথমে ফজরের সালাত ও দিনের শেষে যোহর ও আসরের সালাত আপনার প্রভুর জন্য আদায় করুন। আর রাতে তাঁর জন্য সাজদা করুন অর্থ মাগরিব ও ঈশা'র সালাত আদায় করুন। আর দীর্ঘ রাত্র তাঁর তাসবীহ করুন অর্থ রাতে নফল সালাত আদায় করুন।'[২] তাফসীরে জালালাইনের ভাষায়: "আপনি আপনার প্রভুর নাম যিক্‌র করুন সালাতের মধ্যে সকালে ও বিকালে অর্থাৎ ফজর, যোহর ও আসরের সালাতে।"[৩]

১. ৬. ৪. হজ্ব আল্লাহর যিক্‌র

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

"জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার বিধান দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠার জন্য।"[৪]

১. ৬. ৫. ওয়ায-নসীহত আল্লাহর যিক্‌র

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, যিক্‌র শব্দের অর্থ স্মরণ করা বা করানো। কাউকে কোনোভাবে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধান বা আল্লাহর সহিত সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় স্মরণ করানোকে বিশেষভাবে কুরআন করীম ও হাদীস শরীফে যিক্‌র নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُون

"যখনই তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো নতুন যিক্‌র আসে, তখনই তারা খেলাচ্ছলে তা শ্রবণ করে।"[৫]
মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ

"যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট থেকে কোনো নতুন যিক্‌র আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"[৬]
এ দুটি স্থানে এবং এরূপ আরো অনেক স্থানে যিক্‌র বলতে ওয়ায ও উপদেশ বুঝানো হয়েছে।
মহান আল্লাহ বলেছেন :

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

"যখন শুক্রবারের দিন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের দিকে ধাবিত হও।"[৭]

এখানে আল্লাহর যিক্‌র বলতে জুমু'আর সালাতের খুত্‌বা বা ওয়ায বুঝান হয়েছে বলে অধিকাংশ মুফাসসির ও ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এ মতের উপরেই নির্ভর করেছেন। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, এখানে 'আল্লাহর যিক্‌র' অর্থ জুমু'আর সালাত। ইমাম তাবারী (রহ) বলেন : 'আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাগণকে যে যিক্‌রের দিকে দৌড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন সে যিক্‌র খুত্‌বার মধ্যে ইমামের ওয়ায নসীহত ...।' ইমাম মুজাহিদ, সাঈদ ইবনুল মুসাইইব প্রমুখ তাবেয়ী মুফাসসির এরূপ বলেছেন।[৮]

আল্লামা কুরতুবী বলেন : 'আল্লাহর যিক্‌র অর্থাৎ সালাত।' সাঈদ ইবনু জুবাইর প্রমুখ বলেছেন : 'আল্লাহর যিক্‌র অর্থ খুত্‌বা ও ওয়ায।'[৯]

প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুফাসসির আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনু আলী জাসসাস (৩৭০ হি) বলেন: 'এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর যিক্‌র অর্থাৎ ইমামের খুত্‌বা ও ওয়ায শোনার জন্য গমন করা ফরয।'[১০]

সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে ওয়ায নসীহতকে যিক্‌র হিসেবে চিহ্নিত করা হত। ওয়ায নসীহতের মাজলিসকে যিক্‌রের মাজলিস বলা হতো।[১১]

১. ৬. ৬. কুরআন 'আল্লাহর যিক্‌র' ও 'আল্লাহর নামের যিক্‌র'

কুরআন কারীমের অন্যতম নাম 'যিক্‌র' ও 'আল্লাহর যিক্‌র'। কুরআনই যিক্‌র, কুরআনই ওয়ায, কুরআনই উপদেশ। আল্লাহ বলেন:

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ

"আমি এটি আপনার উপর তিলাওয়াত করি যা আয়াতসমূহের অংশ এবং প্রজ্ঞাময় যিকর।"[১]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমিই যিক্‌র নাযিল করেছি এবং আমিই তাকে রক্ষা করব।"[২]

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"এবং আমি আপনার প্রতি যিক্‌র নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে।"[৩]

وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ

"এবং এটি একটি বরকতময় যিক্‌র যা আমি নাযিল করেছি।"[৪]

এভাবে আরো অনেক স্থানে কুরআনকে যিক্‌র, আল্লাহর যিক্‌র, উপদেশ ও ওয়ায হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

"ধ্বংস তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর যিক্‌র থেকে কঠিন।"[৫]

এখানেও যিক্‌র বলতে কুরআন বুঝানো হয়েছে। ইমাম তাবারী বলেন: আল্লাহর যিক্‌র অর্থ কুরআন, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন এবং তার দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়েছেন ও উপদেশ প্রদান করেছেন।'[৬]

কুরআন কারীমের একাধিক স্থানে মসজিদগুলোকে "আল্লাহর নামের যিক্‌রের" স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ইরশাদ করা হয়েছে:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

"সে ঘরগুলোতে (মসজিদসমূহে) যেগুলোকে উচ্চ করার ও যেগুলোর মধ্যে আল্লাহর নামের যিক্‌র করার অনুমতি আল্লাহ প্রদান করেছেন ...।"[৭]

এর তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: "আল্লাহর নামের যিক্‌র করা হয় অর্থ আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করা হয়।"[৮]

১. ৬. ৭. আল্লাহর নাম আবৃত্তি বা জপ করার যিক্‌র

এতক্ষণের আলোচনায় আমার দেখেছি যে, আল্লাহর সকল প্রকার স্মরণই আল্লাহর যিক্‌র ও আল্লাহর নামের যিক্‌র। এ কারণে সকল ইবাদতকেই কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহর যিক্‌র হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে সকল ইবাদত যিক্‌র হলেও এ সকল ইবাদতের পৃথক পৃথক নাম আছে। এছাড়া আল্লাহর নামের গুণগান বারবার উচ্চারণ, আবৃত্তি বা 'জপ' করাকে বিশেষভাবে কুরআন ও সুন্নাহে "আল্লাহর যিক্‌র" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন, হাদীস, উসূলুল ফিকহ, ফিকহ, তাসাউফ সকল ক্ষেত্রে বা এককথায় ইসলামী পরিভাষায় সাধারণভাবে 'যিক্‌র', 'আল্লাহর যিক্‌র', 'আল্লাহর নামের যিক্‌র' ইত্যাদি বলতে এ প্রকারের যিক্‌র বুঝানো হয়।

১. ৭. যিক্‌র বনাম মাসনূন যিক্‌র

আমরা এ গ্রন্থে মূলত এসব 'আল্লাহর নাম জপ' জাতীয় যিক্‌রের বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ। সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা আল্লাহর যিক্‌র, আল্লাহর নামের যিক্‌র ইত্যাদির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, মর্যাদা ও অফুরন্ত সাওয়াবের বিষয়ে আলোচনা করব। তবে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, আমরা মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কর্তৃক আচরিত ও প্রচারিত যিক্‌রগুলো আলোচনা করব।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা আল্লাহর যিক্‌রের অফুরন্ত সাওয়াব ও মর্যাদার কথা জানতে পারব। কেউ যদি মনে করেন যে, যিক্‌র মানে তো স্মরণ করা বা জপ করা। আমি ইচ্ছামতো যেভাবে পারি আল্লাহর স্মরণ করব বা তাঁর নাম জপ করব। এখানে আবার মাসনূন শব্দ বা পদ্ধতি শিক্ষার প্রয়োজন কি। তাহলে তার জন্য এ গ্রন্থ বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না। আর যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য সকল ইবাদতের মতো যিক্‌রও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়াভাবে কিছু না করে অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের অনুকরণে, তাঁদের আচরিত ও প্রচারিত শব্দে, পদ্ধতিতে ও তাঁদের সুন্নাত অনুসারে যিক্‌র

করব তাহলে তাকে বিশেষভাবে এ বইটি পড়তে অনুরোধ করব।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে কোনো ভাষায়, যে কোনোভাবে, যে কোনো নামে ও যে কোনো শব্দে আল্লাহর কথা মুখে বা মনে স্মরণ করলে তা ভাষাগতভাবে 'যিক্‌র' বলে গণ্য হবে। এভাবে স্মরণকারী হয়ত যিক্‌রের জন্য উল্লেখিত কিছু সাওয়াবের অধিকারীও হতে পারেন। এতে তার "যিক্‌রের" দায়িত্ব নূন্যতমভাবে পালিত হতেও পারে অথবা নাও হতে পারে।

কেউ যদি মুখে বা মনে: আল্লাহ আল্লাহ, রব্ব রব্ব, মালিক মালিক, দয়াল দয়াল, Lord Lord, Creator Creator, ইত্যাদি শব্দ আওড়ায় তাহলে ভাষাগত দিক থেকে একে যিক্‌র বলা হবে। এতে আল্লাহর স্মরণ করার কিছু সাওয়াব মিলতেও পারে। এতে তার যিক্‌রের ইবাদত পালিত হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে সুন্নাত পালন হবে না। এজন্য ভাষাগত বা সাধারণ যিক্‌র (স্মরণ বা জপ) ও মাসনূন বা সুন্নাত-সম্মত যিক্‌রের মধ্যে পার্থক্য বুঝা আমাদের জন্য খুবই জরুরি। এখানে কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করছি :

১. ৭. ১. পশু জবেহ করার সময় আল্লাহর নামের যিক্‌র

কুরআন কারীমে প্রায় দশ স্থানে পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নামের যিক্‌র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ বলেন:

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

"এবং তাদেরকে আল্লাহ যে সকল পশু রিযিক হিসেবে প্রদান করেছেন সেগুলোর উপরে আল্লাহর নামের যিক্‌র করবে।"[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

"যার উপর আল্লাহর নাম যিক্‌র করা হয়েছে তা থেকে ভক্ষণ কর।"[২]

وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

"যার উপর আল্লাহর নামের যিক্‌র করা হয়নি তা ভক্ষণ করবে না।"[৩]

এভাবে কুরআন-হাদীসে বারবার পশু জবাইয়ের সময় পশুর উপর আল্লাহর নামের যিক্‌র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন যদি কেউ পশু জবাই করার সময় যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো বাক্যে বা শব্দে আল্লাহর যে কোনো নাম- আল্লাহ, রাহীম, দয়াবান, স্রষ্টা, রব্ব, প্রতিপালক, খোদা, Lord বা যে কোনো নাম উচ্চারণ করে জবাই করেন তাহলে তার যিক্‌রের নূন্যতম দায়িত্ব পালিত হবে বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন।[৪] তবে সুন্নাত-সম্মত যিক্‌রের দায়িত্ব পালিত হবে না। সুন্নাত 'বিসমিল্লাহ' বা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা।

১. ৭. ২. বাড়িতে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময়ে আল্লাহর যিক্‌র

জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ

"যখন কেউ তার বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর যিক্‌র করে এবং খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিক্‌র করে, তখন শয়তান বলে : এখানে তোমাদের (শয়তানদের) কোনো খাবার নেই রাত যাপনের জায়গাও নেই। আর যখন কেউ আল্লাহর যিক্‌র না করে তার বাড়ি প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলে : তোমরা রাত যাপনের জায়গা পেয়ে গিয়েছ। আর যদি কেউ খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর যিক্‌র না করে, তাহলে শয়তান বলে : এখানে তোমরা খাবার ও রাত যাপনের জায়গা সবই পেয়েছ।"[৫]

বাড়িতে প্রবেশের সময় ও খাদ্য গ্রহণের সময় কোন্ শব্দ দ্বারা আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন। কেউ যদি এখানে শুধু আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে বা অন্য কোনো ভাষায় ও শব্দে আল্লাহর কোনো নাম বা গুণবাচক নামের জপ বা উচ্চারণ করে তাহলে হয়ত আল্লাহর স্মরণের মূল ফযীলত কিছু তার অর্জিত হলেও মাসনূন যিক্‌রের মর্যাদা থেকে সে বঞ্চিত হবে।

১. ৭. ৩. সালাতের শুরুতে আল্লাহর নামের যিক্‌র

আল্লাহ তাঁর নামের যিক্‌র করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"এবং তাঁর রবের নামের যিক্‌র করে সালাত আদায় করল।"[৬]

এখানে যদি কেউ উপরের মতো একবার বা অনেকবার "আল্লাহ" বলে বা আরবী বা অন্য কোনো ভাষায় আল্লাহর কোনো নাম পাঠ করে সালাত শুরু করেন তাহলে ভাষাগতভাবে তার কাজকে 'আল্লার নাম যিক্র করে সালাত পড়ল' বলা হবে। কিন্তু শরীয়তের বিধানে তার যিক্রের ইবাদত পালন হবে না। তার সালাত হবে না। এখানে "আল্লাহর নামের মাসনূন যিক্র" অর্থ "আল্লাহু আকবার"। ইমাম আবূ ইউসূফ ও অন্যান্য ইমামের মতে এখানে অন্য কোনো যিক্র, এমনকি শ্রেষ্ঠ যিকর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে সালাত শুরু করলেও তার যিক্রের দায়িত্ব পালন হবে না। ইমাম আবূ হানীফা বলেছেন, 'আররাহমান আ'যম', 'আররহীমু আ'জাল্ল', ইত্যাদি আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশক বাক্যের যিক্র দ্বারা সালাতের তাহরীমা বাঁধা জায়েয। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর নাম যিক্র করলে এক্ষেত্রে যিক্রের দায়িত্ব কোনোভাবেই পলিত হবে না।[১]

১. ৭. ৪. আইয়ামে তাশরীকে আল্লাহর যিক্র

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

"যখন তোমরা হজ্বের আহকাম সম্পন্ন করবে তখন আল্লাহর যিক্র করবে, যেভাবে তোমাদের পিতা-পিতামহদের যিক্র করতে বা তার চেয়েও বেশি।"[২]

হজ্বের শেষে হাজীদের বিশেষ তাকবীর-তাহলীল করতে হয়, যেমন :

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ" মুফাসসির ও ফকীহগণ বলেছেন যে, এখানে আল্লাহর যিক্র বলতে এ সকল যিক্রকে বুঝান হয়েছে।[৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ

"তোমরা সুনির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর যিক্র কর।"[৪]

এখানেও যিক্র বলতে উপরের সুনির্দিষ্ট তাকবীর তাহলীল বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের উপর নির্ভর করেই ঈদুল আযহার আগে পরে ৩/৪ দিন সালাতের পরে আমরা তাকবীর বলে থাকি। এখানে যদি কেউ আল্লাহর যিক্র বলতে শুধুমাত্র তাঁর নাম যিক্র করেন তাহলে তাঁর ইবাদত পলিত হবে না।

১. ৮. জায়েয, সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত ও বিদআত

এভাবে আমরা আভিধানিক যিক্র ও মাসনূন যিক্র এবং জায়েয ও সুন্নাতের পার্থক্য বুঝতে পারছি। আমরা দেখছি যে, শুধু আল্লাহর মহান নাম "আল্লাহ" বা অন্য কোনো গুণবাচক নাম বা অন্য কোনো ভাষায় তাঁর নাম জপ বা স্মরণ করলে তা 'জায়েয' হতে পারে এবং যিক্রের নূন্যতম পর্যায় পলিত হতে পারে। কিন্তু এ প্রকারের গাইর মাসনূন যিক্রকে আমরা রীতি হিসাবে গ্রহণ করতে পারব না। সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে নিয়মিত পালনের রীতি হিসেবে বা নিয়মিত ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করলে তা 'বিদ'আতে' পারিণত হবে এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে অপছন্দ ও অবজ্ঞা করা হবে।

সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত ও বিদআতের মধ্যে পার্থক্য জানতে এবং জায়েয কিভাবে বিদআতে পরিণত হয় তা জানতে পাঠককে **'এহইয়াউস সুনান'** বইটি পড়তে অনুরোধ করছি। এখানে সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলি উল্লেখ করছি:

১. ৮. ১. সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামগ্রিক জীবন পদ্ধতিই সুন্নাত। যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয হিসাবে করেছেন তা ফরয হিসেবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি নফল হিসেবে করেছেন তা নফল হিসেবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি সর্বদা নিয়মিতভাবে করেছেন তা সর্বদা নিয়মিতভাবে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা মাঝে মাঝে করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি কখনো করেননি, অর্থাৎ সর্বদা বর্জন করেছেন তা সর্বদা বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত। যা তিনি মাঝে মাঝে বর্জন করেছেন তা মাঝে মাঝে বর্জন করাই তাঁর সুন্নাত।

যেসব কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো পরিস্থিতিতে, সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে ঐসব শর্তসাপেক্ষে বা নির্দেশনা সাপেক্ষে পালন করাই সুন্নাত। যা তিনি উন্মুক্তভাবে বা সাধারণভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন, কোনো বিশেষ সময়, স্থান, পরিস্থিতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি তাকে কোনোরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা পরিস্থিতি বা স্থান নির্ধারণ ব্যতিরেকে উন্মুক্তভাবে পালন করাই সুন্নাত।

১. ৮. ২. খেলাফে সুন্নাত

কোনো কর্ম পালন বা বর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব, পদ্ধতি, ক্ষেত্র, সময়, স্থান ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে সুন্নাতের বেশি, কম বা ব্যতিক্রম

করা হলে তা 'খেলাফে সুন্নাত' অর্থাৎ সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা সুন্নাতের বিরোধী হয়। যেমন:

(১) যা তিনি ফরয হিসেবে করেছেন তা নফল মনে করে পালন করা
(২) যা তিনি নফল হিসাবে করেছেন তা ফরযের গুরুত্ব দিয়ে পালন করা
(৩) যা তিনি নিয়মিত করেছেন তা মাঝেমধ্যে করা
(৪) যা তিনি মাঝে মাঝে করেছেন তা সর্বদা করা
(৫) যা তিনি কখনই করেননি তা সর্বদা বা মাঝেমাঝে করা
(৬) যা তিনি কোনো শর্তসাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট কোনো সময়ে, স্থানে বা পদ্ধতিতে করেছেন বা করতে বলেছেন তাকে শর্তহীন উন্মুক্তভাবে পালন করা
(৭) যা তিনি উন্মুক্তভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন- যার জন্য কোনো বিশেষ সময়, স্থান বা পদ্ধতি নির্ধারণ করেননি- তা পালনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি, সময় বা স্থান নির্ধারণ করা
(৮) যা তিনি বর্জন করেছেন তা পালন করা... ইত্যাদি সবই খেলাফে সুন্নাত।

১. ৮. ৩. বিদআত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ যা বলেন নি, করেন নি, বলতে বা করতে উৎসাহ বা নির্দেশনা দেন নি সে কথা, কর্ম বা পদ্ধতিকে দীনের অন্তর্ভূক্ত করাই বিদআত। খেলাফে সুন্নাত হলেই তা 'না-জায়েয' বা 'বিদআত' নয়। খেলাফে সুন্নাত কর্ম বা পদ্ধতি সুন্নাতের অন্যান্য দলীলের আলোকে জায়েজ বা না-জায়েয হতে পারে, তবে তা কখনোই দীন বা ইবাদতের অংশ হতে পারে না। খেলাফে সুন্নাত কর্ম বা পদ্ধতিকে ইবাদত মনে করলে, সুন্নাত থেকে উত্তম মনে করলে বা রীতিতে পরিণত করলে তা বিদআতে পরিণত হয়।

উপরে আলোচিত নমুনাগুলি বিবেচনা করুন। পশু জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বা 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত। শুধু 'আল্লাহ' বলে জবাই করা খেলাফে সুন্নাত, তবে অনেক ফকীহ তা জায়েয বলেছেন। যদি কেউ বিভিন্ন দলীল দিয়ে এ 'জায়েয' কর্মটিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বা সুন্নাতের সমকক্ষ বলে মনে করেন অথবা সর্বদা 'আল্লাহ' বলে জবাই করার রীতি উদ্ভাবন করেন তবে তা বিদআতে পরিণত হবে। কারণ এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করবেন যে, এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে যিক্‌র শিখিয়েছেন তা পরিপূর্ণ সাওয়াব, বরকত ও বেলায়াতের জন্য যথেষ্ঠ নয় বা তিনি তা পছন্দ করতে পারছেন না।

অনুরূপভাবে বাড়িতে প্রবেশের সময়, খাদ্য গ্রহণের সময়, সকাল, বিকাল, সন্ধ্যায়, রাতে, সারাদিন, বাজারে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে ও এরূপ সকল স্থানে কেউ যদি মাসনূন যিক্‌র বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর নাম, নামের অর্থ, গুণবাচক নাম ইত্যাদি জপ করে বা এক স্থানের যিক্‌র অন্য স্থানে করেন তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জায়েয হলেও সুন্নাতের খেলাফ হবে। আর এ সকল খেলাফে সুন্নাত যিক্‌র সুন্নাতের চেয়ে উত্তম মনে করলে বা রীতি হিসেবে গ্রহণ করলে সুন্নাতকে অবহেলা ও অপছন্দ করা হবে। তখন তা বিদআতে পরিণত হয়।

অন্য দিকে সালাত শুরুর মাসনূন যিকর 'আল্লাহু আকবার' ও খাদ্য গ্রহণের মাসনূন যিকর 'বিসমিল্লাহ'। জবাই করার মাসনূন যিকর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'-কে দলীল হিসেবে পেশ করে সালাতের শুরুতে বা খাদ্য গ্রহণের শুরুতে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলাকে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বা শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলার সমান সাওয়াব বা তার চেয়ে উত্তম মনে করেন অথবা মাসনূন যিকর পরিত্যাগ করে এ দলীল নির্ভর যিকরকে সালাত বা খাদ্য গ্রহণের সময় বলা রীতিতে পরিণত করেন তবে তা বিদআতে পরিণত হবে।

১. ৮. ৪. সুন্নাত-মুক্ত দলীল-ই বিদআতের ভিত্তি

উপরের উদাহরণ থেকে আমরা দেখছি যে, কুরআন-হাদীসের দলীল দিয়েই বিদআত উদ্ভাবন করা হয়। দলীল ও সুন্নাতের সমন্বয় না করা বা এক ইবাদতের দলীলকে অন্য ইবাদতে প্রয়োগ করাই বিদআতের মূল কারণ।

মনে করুন আমি একজন পীর সাহেবের মুরীদ। আমি দেখতে পেলাম যে আমার পীর মাঝে মাঝে কালো পাগড়ি ও মাঝে মাঝে সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। আমি ভালকরে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তিনি শুক্রবারে জুম'আর সালাতের জন্য সাদা পাগড়ী ব্যবহার করেন। অন্যান্য দিনে তিনি কালো পাগড়ি ব্যবহার করেন। এখন একজন ভক্ত অনুসারী হিসাবে যদি আমিও হুবহু তাঁর মতো শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্যান্য দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমাকে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী বলা হবে। কিন্তু আমি যদি এখানে নিজের বিবেক ও বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি তাহলে আমার অন্যান্য পীরভাই স্বভাবতই আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলবেন না এবং আমাকে পীরের কর্মের বিরোধিতার জন্য প্রশ্ন করবেন। তাদের প্রশ্নের জবাবে আমি বলতে পারব, শুক্রবার হচ্ছে সর্বোত্তম দিন এবং এ দিনে আমার পীর সাদা পাগড়ি ব্যবহার করেন। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কালো পাগড়ি ব্যবহারের চেয়ে সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম। পীর নিজে অন্যান্য দিনে কালো পাগড়ি ব্যবহার করতেন অমুক বা তমুক কারণে, তবে তিনি নিজের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সর্বদা সাদা পাগড়ি ব্যবহারই উত্তম। তাই আমি সকল দিনেই সাদা পাগড়ি ব্যবহার করি। আমার যুক্তি ও দলিল যতই অকাট্য হোক আমার পীর ভাইয়েরা আমাকে পূর্ণ অনুসারী বলে মানবেন না, বরং যিনি পীরের হুবহু অনুকরণ করে শুক্রবারে সাদা পাগড়ি ও অন্য দিনে কালো পাগড়ি পরেন তাকেই হুবহু অনুসরণকারী বলবেন। আমাকে উদ্ভাবনকারী বলবেন। হয়ত কেউ বলেও বসবেন, তুমি এভাবে সাদা পাগড়ির ফযীলত আবিষ্কার করলে, অথচ তোমার পীর তা বুঝতে পারলেন না, তুমি কি তাঁর চেয়েও বেশি বুঝ?

সুন্নাতের আলোকে একটি উদাহরণ বিবেচনা করুন। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় বিশেষ নিয়ামত লাভ করলে বা সুসংবাদ পেলে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য 'শুকরিয়া সাজদা' করতেন। এখন যদি কেউ এসকল হাদীসের আলোকে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে নিয়মিত একটি করে 'শুকরিয়া সাজদা' দেওয়ার প্রচলন করেন তবে তাকে কখনোই

অনুসারী বলা যাবে না। তাকে উদ্ভাবক বলতে হবে। তিনি হয়ত অনেক অকাট্য দলিল পেশ করবেন। তিনি হয়ত বলবেন: (১) শুকরিয়া সাজদার প্রমাণে হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থে ১০০টি 'অকাট্য' দলীল বিদ্যমান, (২) যে কোনো নিয়ামত লাভের পরেই শুকরিয়া সাজদা করা সুন্নাত, (৩) মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত সালাত আদায়ের তাওফীক, (৪) এ নিয়ামত লাভের পরে যে শুকরিয়া সাজদা করে না সে অকৃতজ্ঞ বান্দা, (৫) যে বান্দা সন্তান লাভের সংবাদে অথবা চাকরি পাওয়ার সংবাদে শুকরিয়া করে অথচ জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত সালাত আদায়ে তৌফিক পেয়ে সাজদা করে না সে অকৃতজ্ঞ বান্দা !

তিনি হয়ত বলবেন, (১) এ সাজদা যে নিষেধ করে সে বেয়াকুফ, আবু জাহল বা ইয়াযিদের অনুসারী! কারণ সে, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাতে বান্দাকে নিষেধ করছে, (২) কোথাও কি আছে যে, বিশেষ কোনো নিয়ামতের জন্য সাজদায়ে শুক্‌র আদায় করা যাবে না? (৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কখনো সালাতের পরে শুকরানা সাজদা করতে নিষেধ করেছেন? (৪) এছাড়া সাজদার সময়ে দু'আ কবুল হয় তা প্রমাণিত, (৫) সালাতের পরে দু'আ কবুল হয় তাও প্রমাণিত। কাজেই, প্রত্যেক সালাতের পরে সাজদা করা ও সাজদার মধ্যে দু'আ করা সুন্নাত।

এরূপ অনেক কথাই তিনি বলতে পারবেন। অগণিত 'অকাট্য' প্রমাণ তিনি প্রদান করবেন। কিন্তু কখনই আমরা তাঁকে সুন্নাতে নববীর অনুসারী বলতে পারব না। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন আদায় করেছেন, তাঁর সাহাবীগণও করেছেন, কিন্তু কেউ কখনোই সালাত আদায়ের নিয়ামত লাভের পর শুকরিয়ার সাজদা করেননি। কাজেই, সালাতের পরে শুকরানা সাজদা না করাই তাঁদের সুন্নাত। সাজদার প্রথা এ সুন্নাতকে মেরে ফেলবে। অনুকরণপ্রিয় সুন্নাত প্রেমিকের প্রশ্ন: আমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও বেশি কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাই? এ সকল অকাট্য দলিলের মাধ্যমে আমরা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকেই অকৃতজ্ঞ ও হেয় বলে প্রমাণিত করছি না?

১. ৮. ৫. উদ্ভাবন ও বিদ'আত বনাম কিয়াস ও ইজতিহাদ

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যে, সুন্নাতই কি সব? তাহলে ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ ইত্যাদির অবস্থান কোথায়? বস্তুত সুন্নাতের ক্ষেত্র ও ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে সুন্নাত নেই সেখানেই ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদ প্রয়োজন। মূলত ইজতিহাদের ক্ষেত্র তিনটি:

(ক) মাসনূন কর্মের গুরুত্ব নির্ধারণ। যেমন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মাতকে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কোন কাজটি ফরয, কোনটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বিস্তারিত বলেন নি। সুন্নাতের আলোকে মুজতাহিদ তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন।

(খ) একাধিক সুন্নাতের সমন্বয়। যেমন সালাতের রুকুর সময় হাত উঠানো অথবা না উঠানো, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা অথবা না করা ইত্যাদি। এরূপ অনেক বিষয়ে একাধিক সুন্নাত বিদ্যমান, কিন্তু চূড়ান্ত সমন্বয় সুন্নাতে নেই। এক্ষেত্রে মুজতাহিদ প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি ও কিয়াসের ভিত্তিতে এগুলোর সমন্বয় দেওয়ার চেষ্টা করেন।

(গ) নতুন বিষয়ের বিধান দান। মাইক, টেলিফোন, প্লেন ইত্যাদি নববী যুগের পরে উদ্ভাবিত বিষয়ে কুরআন-হাদীসে কিছু বলা হয় নি। কুরআন-হাদীসের প্রাসঙ্গিক নির্দেশাবলির আলোকে কিয়াস ও ইজতিহাদের মাধ্যমে এগুলোর বিধান অবগত হওয়ার চেষ্টা করেন মুজতাহিদ। কোনো ইজতিহাদী বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত হলে তাকে 'ইজমা' বা ঐকমত্য বলা হয়।

এভাবে আমরা দেখি যে, কুরআন-সুন্নাহে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে সে বিষয়ে কোনো কিয়াস বা ইজতিহাদের সুযোগ নেই। আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ) যে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সে বিষয়ে আবার ইজতিহাদ, কিয়াস বা ইজমার কোনো প্রয়োজনের কথা কোনো মুমিন চিন্তাও করতে পারেন না।

আর এজন্যই কিয়াস, ইজমা বা ইজতিহাদ দ্বারা কোনো ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতি তৈরি, উদ্ভাবন, পরিবর্তন বা সংযোজন করা যায় না। যেমন ইজতিহাদ বা কিয়াসের মাধ্যমে জোরে বা আস্তে 'আমীন' বলার বিষয়ে বিধান, গমের উপর কিয়াস করে চাউলের বিধান, প্লেন, মাইক ইত্যাদির বিধান প্রদান করা যায়। কিন্তু সালাতের মধ্যে আস্তে আমীন বলার উপর কিয়াস করে ঈদুল আযহার দিনগুলোতে সালাতের পরের তাকবীর 'আস্তে' বলার বিধান দেওয়া যায় না, সালাতের মধ্যে জোরে আমীন বলার উপর কিয়াস করে সালাতের পরে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি জোরে পড়ার বিধান দেওয়া যায় না, সফরে সালাত কসর করার উপর কিয়াস করে সিয়াম কসর বা অর্ধেক করার বিধান দেওয়া যায় না, হজ্জের সময় ইহরাম পরিধানের উপর কিয়াস করে সালাতের মধ্যে ইহরাম পরিধানের বিধান দেওয়া যায় না... ।

প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হুবহু অনুকরণ করতে হবে। এমনকি রামাদান মাসে জামাতে সালাতুল বিতর আদায়ের উপর কিয়াস করে কেউ অন্য সময়ে জামাতে বিত্‌র আদায়ের বিধান দিতে পারেন না। বিতরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দু'আ করার উপর কিয়াস করে সালাতের পরের দু'আ করার সময় দাঁড়ানোর বিধান দিতে পারেন না। দাঁড়িয়ে সালাত আদায়ের উপর কিয়াস করে দাঁড়িয়ে যিক্‌র বা কুরআন তিলাওয়াতকে উত্তম বলতে পারেন না।

অনুরূপভাবে ইজমা, কিয়াস বা ইজতিহাদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যুগে ছিল না এমন কোনো কিছুকে দীনের অংশ বানানো যায় না। যেমন ইজহিতাদের মাধ্যমে প্লেনে চড়ে হজ্জে গমন, মাইকে আযান দেওয়া ইত্যাদির বিষয়ে জায়েয বা না-জায়েয বিধান দেওয়া যায়, কিন্তু প্লেনে চড়ে হজ্জে গমন বা মাইকে আযান দেওয়াকে দীনের অংশ বানানো যায় না। কেউ বলতে পারেন না যে, প্লেন ছাড়া অন্য বাহনে হজ্জে গমন করলে সাওয়াব বা বরকত কম হবে বা বাইতুল্লাহর সাথে আদবের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা থাকবে। অনুরূপভাবে কেউ বলতে পারেন না যে, মাইকে আযান না দিলে আযানের ইবাদত অপূর্ণ থাকবে। সকল ইজতিহাদী বিষয়ই এরূপ।

সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমগণ ইজমা-কিয়াস এবং বিদআতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রক্ষা করেছেন। সালাতুল বিতরের রাক'আত, সালাতের মধ্যে হাত উঠানো, আমীন বলা, সূরা ফাতিহা পাঠ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন পদ্ধতির বিধান ইত্যাদি অগণিত বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ কিয়াস ও ইজতিহাদ করেছেন এবং মতভেদ করেছেন। এ বিষয়ক মতভেদের কারণে তাঁরা

কাউকে নিন্দা করেন নি বা বিদ'আতী বলেন নি।

পক্ষান্তরে ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতির মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পদ্ধতির সামান্যতম ব্যতিক্রম করলে তাতে আপত্তি করেছেন এবং বিদ'আত বলেছেন। এ জাতীয় অনেক ঘটনা বিস্তারিত তথ্যসূত্র সহ 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, দলবদ্ধভাবে গণনা করে যিক্‌র করতে দেখে কঠিনভাবে আপত্তি করেছেন ইবনু মাসউদ (রা)। আযানের পরে মিনারায় উঠে ডাকাডাকি করতে দেখে কঠিন আপত্তি করেছেন ইবনু উমার (রা)। হাঁচির পরে দু'আর মধ্যে 'আল-হামদু লিল্লাহ'-এর সাথে 'দরূদ' পাঠ করতে আপত্তি করেছেন ইবনু উমার (রা)। সালাতের পরে সশব্দে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার' বলতে দেখে আপত্তি করেছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আবীদাহ ইবনু আমর। এরূপ অগণিত ঘটনা আমরা হাদীসের গ্রন্থগুলোতে দেখতে পাই।

এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, ইবাদত পালনের পদ্ধতির সাথে ইজমা, কিয়াস বা ইজতিহাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে সুন্নাতের পরিপূর্ণ ও হুবহু অনুসরণই ইবাদত কবুল হওয়ার ও সাওয়াব বেশি হওয়ার মূল পথ। এ বিষয়ক আয়াত ও হাদীসসমূহ 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের আগ্রহেই আমরা এ পুস্তক রচনা করছি। যিকর-আযকার ও বেলায়াতের পথে তাযকিয়ায়ে নাফস বা আত্মশুদ্ধির সকল কর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণই আমাদের এ বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য। তিনি কখন কোন ইবাদত কী-ভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন তা জানতে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করব এবং হুবহু তার অনুসরণের চেষ্টা করব। তাঁর সুন্নাতকে কেন্দ্র করে উদ্ভাবনা থেকে বিরত থাকব।

আমরা দেখেছি যে, জ্ঞান যেরূপ সুন্নাতের অনুসরণের দিকে ধাবিত করে, অনুরূপভাবে সুন্নাতের জ্ঞান অনেক সময় সুন্নাত পরিত্যাগ করে নতুন উদ্ভাবনার দিকেও ধাবিত করে। মুসলিম বিশ্বে সকল সুন্নাত-বিরোধী বা সুন্নাত-অতিরিক্ত-উদ্ভাবনার পিছনে সমর্থন যুগিয়েছেন কিছু প্রাজ্ঞ আলিম ও পণ্ডিত। উদ্ভাবনমুখী জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর জ্ঞানের উপর আস্থাশীল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুন্নাতকে এত বেশি গভীরভাবে বুঝেছেন যে, এখন এর উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করার ক্ষমতা তাঁর অর্জিত হয়েছে। অপর দিকে অনুসরণকারী সরল প্রেমিক। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সমগ্র হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন। ভালবাসেন তাঁর সুন্নাতকে। তাঁর সুন্নাতকেই একমাত্র নাজাত, বেলায়াত, কামালাত ও সকল নিয়ামতের উৎস মনে করেন। তাই হুবহু তাঁর অনুসরণ করতে চান। তিনি তাঁর জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নন। তাই তিনি উদ্ভাবনের চেয়ে অনুসরণকে নিরাপদ মনে করেন।

মুহতারাম পাঠক, আমিও আমার জ্ঞানের উপর বা অন্য কারো জ্ঞানের উপর অতবেশি আস্থাশীল নই, যেরূপ আস্থাশীল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর। আমিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণকেই নিরাপদ বলে মনে করি। একেই আমি নাজাত, কামালাত ও সকল নিয়ামতের একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করি। এ পুস্তকটিও এ ধরনের সরল অনুসারীদের জন্য লেখা, যারা উদ্ভাবনের চেয়ে হুবহু অনুসরণ করাকেই নিরাপদ মনে করেন।

সুন্নাতের বাইরে ইবাদত বন্দেগি কবুল হবে না বলে অনেক হাদীসে বলা হয়েছে। যদিও পরবর্তী অনেক প্রাজ্ঞ আলিম আশ্বাস দিয়েছেন যে, খেলাফে সুন্নাত অনেক কর্মই আল্লাহ কবুল করে বিশেষ সাওয়াব দিবেন, কিন্তু অনেক মুমিনের মন এতে স্বস্তি পায় না। তাঁরা সুন্নাতের বাইরে যেতে চান না। ক্ষণস্থায়ী এ জীবন। ইবাদত বন্দেগি কতটুকুই বা করতে পারি। এ সামান্য কাজও যদি আবার বাতিল হয়ে যায় তাহলে তো তা সীমাহীন দুর্ভাগ্য। এজন্য তাঁরা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত সম্মত আমল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাঁদের উদ্দেশ্যেই এ পুস্তক লেখা।

১. ৮. ৬. শব্দ বনাম বাক্য

আমরা বুঝতে পারছি যে, আল্লাহর যিক্‌র একটি ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্তারিতভাবে এ ইবাদতের সকল পদ্ধতি ও বাক্য শিখিয়েছেন। তিনি যেখানে যে বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন সেখানে তা বললেই প্রকৃত আল্লাহর যিক্‌রের ইবাদত আদায় হবে। হজ্জের মাঠের আল্লাহর যিক্‌র, ঈদের দিনগুলোর আল্লাহর যিক্‌র, ঘরে প্রবেশের আল্লাহর যিক্‌র, খাবার গ্রহণের আল্লাহর যিক্‌র, সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্‌র ... ইত্যাদি সবই আল্লাহর যিক্‌র। কিন্তু প্রত্যেক প্রকার যিক্‌রের জন্য পৃথক পৃথক মাসনূন বাক্য রয়েছে। মনগড়াভাবে বানানো যিক্‌র করলে, বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষার বাইরে মনগড়াভাবে মহান আল্লাহর নাম জপ করলে, অথবা এক স্থান বা সময়ের যিক্‌র অন্য স্থানে ব্যবহার করলে সুন্নাতের বিরোধিতা করা হবে। আমরা সদা সর্বদা তাঁর সুন্নাতের হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করব।

এখানে উল্লেখ্য যে, অগণিত হাদীসে ও সাহাবীগণের জীবনের অগণিত ঘটনায় আমরা অসংখ্য যিক্‌র-আযকার দেখি। এ সকল যিক্‌রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য এগুলো সবই 'বাক্য' যা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। অগণিত হাদীসের একটিতেও এবং সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনে আচরিত অগণিত ঘটনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই না যে, শুধুমাত্র একটি শব্দ বা শুধুমাত্র আল্লাহর নাম জপ করে যিক্‌র করতে বলা হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর নামের স্তুতিকেই যিক্‌র বলা হয়েছে। মাসনূন যিক্‌রের মূল বৈশিষ্ট্য শুধু আল্লাহর নাম জপ নয়, আল্লাহর নামের স্তুতি, প্রশংসা, মহিমা ও মর্যাদা জপ করা বা বারবার উচ্চারণ ও আবৃত্তি করা।

মহান, মহাপবিত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান নামের প্রশংসা, মর্যাদা, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ব ইত্যাদি প্রকাশক বাক্য বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করাকে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যিক্‌র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত এ সকল জপমূলক বাক্যাদির মূল চারটি বাক্য : 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। পঞ্চম বাক্য - 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। এছাড়া এগুলোর সমন্বয় ও প্রাসঙ্গিক আরো অনেক বাক্য কুরআন ও হাদীসে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী সময়ে মাসনূন জপমূলক যিক্‌রের প্রকার ও শব্দাবলী আলোচনা করব। এ সকল বাক্যাদি বারবার নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা অনির্দিষ্টভাবে অগণিতবার জপ করা বা আওড়ানোকে বিশেষভাবে কুরআন ও হাদীসে যিক্‌র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অগণিত হাদীস আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখব। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করছি – যে হাদীসে 'আল্লাহর যিক্‌র' অর্থ কী তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلاَلِ اللهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَحْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِىٌّ كَدَوِىِّ النَّحْلِ يُذَكِّرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ أَلاَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لاَ يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللهِ شَىْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ

"আল্লাহর মর্যাদায় যারা আল্লাহর যিক্‌র করেন: তাঁর তাসবীহ 'সুবহানাল্লাহ', তাহমীদ 'আল-হামদু লিল্লাহ', তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' ও তাহলীল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জপ করেন তাঁদের এ সকল যিক্‌র আরশের পাশে জড়িয়ে থাকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো গুনগুন করে যাকির-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন। তোমাদের কেউ কি চায় না যে, কোনো কিছু সর্বদা আল্লাহর কাছে তার কথা স্মরণ করাতে থাকবে।"[১]

১. ৯. আল্লাহর যিক্‌রের সাধারণ ফযীলত

আমরা উপরে যিক্‌রের প্রকার ও প্রকরণ জেনেছি। যিক্‌রের ফযীলতের মধ্যে সকল প্রকারের যিক্‌রই এসে যায়। তবে হাদীসে সাধারণত বিশেষ যিক্‌র বা তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে যিক্‌রের ফযীলত বিষয়ক অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন: "باب فضل ذكر الله" "আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলতের অধ্যায়"। আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী এ নামের ব্যাখ্যায় বলেন: "আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলত"– এখানে যিক্‌র অর্থ সে সকল শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা যা বললে সাওয়াব হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে ; যেমন – 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুল্লিাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' বলা। এসকল বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বাক্য , যেমন: 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', 'বিসমিল্লাহ', 'হাসবুনাল্লাহ', 'ইস্তিগফার' ইত্যাদি বলা, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা, সবই যিক্‌র। এছাড়া যে কোনো ফরয বা নফল কাজ নিয়মিত করাকেও যিক্‌র বলে গণ্য করা হয়। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত করা, হাদীস পাঠ করা, জ্ঞান চর্চা করা, নফল সালাত আদায় করা।

অপরদিকে যিক্‌র শুধুমাত্র জিহ্বার দ্বারাও হতে পারে। জিহ্বার উচ্চারণের কারণে উচ্চারণকারী সাওয়াব পাবেন। উচ্চারণের সময় উচ্চারিত বাক্যের অর্থ মনের মধ্যে উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। তবে শর্ত যে, উক্ত উচ্চারিত বাক্যের বিপরীত কোনো অর্থ তার উদ্দেশ্য হবে না। মুখের উচ্চারণের সাথে সাথে যদি অন্তরের স্মরণ (ক্বলবী যিক্‌র) সংযুক্ত হয় তাহলে তা হবে উত্তম ও পরিপূর্ণতর। আর যদি এর সাথে যিক্‌রের বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণরূপে মনের মধ্যে উপস্থিত থাকে, তাহলে তা আরো পূর্ণতা পাবে। সালাত, জিহাদ বা যে কোনো ফরয ইবাদতে যদি এরূপ অবস্থা উপস্থিত থাকে তাহলে তাও পূর্ণতা পাবে। সর্বোপরি পরিপূর্ণ ইখলাস, আন্তরিকতা ও অন্তরের পরিপূর্ণ তাওয়াজ্জুহ যদি আল্লাহর প্রতি হয় তাহলে তা হবে সর্বোত্তম কামালাত ও সর্বোচ্চ পূর্ণতা।

ফাখরুদ্দীন রাযী (রহ) যিক্‌রকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। মুখের বা জিহ্বার যিক্‌র 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুল্লিাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ করা। ক্বালবের বা মনের যিক্‌র আল্লাহর জাত, গুণাবলী, বিধানাবলী, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করা। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যিক্‌র সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সদা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে রত থাকা। আর এজন্যই সালাতকে কুরআনে যিক্‌র বলা হয়েছে। কোনো কোনো বুজুর্গ বলেছেন: যিক্‌র ৭ ভাবে করা হয় – চোখের যিক্‌র ক্রন্দন, কানের যিক্‌র মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর কথা শ্রবণ করা, মুখের যিক্‌র আল্লাহর প্রশংসা করা, হাতের যিক্‌র দান করা, দেহের যিক্‌র আল্লাহর বিধান পালন করা, ক্বলবের যিক্‌র আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়া ও আল্লাহর রহমতের আশা করা এবং আত্মার যিক্‌র আল্লাহর তাকদীর ও ফয়সালার উপর পরিপূর্ণ রাজি ও সন্তুষ্ট হওয়া।[২]

মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) বলেন : আল্লামা ইবনুল জাযারী (৮০৮ হি) বলেছেন: "যিক্‌রের ফযীলত শুধু তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং যিনিই আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত বা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোনো কর্মে লিপ্ত আছেন তিনিই যিক্‌রে লিপ্ত আছেন বা তিনিই যাকির। সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র কুরআন কারীম, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে যিক্‌রের বিধান দিয়েছেন সেখানে সেই যিক্‌রই উত্তম, যেমন রুকু ও সাজদার অবস্থায়। অন্য সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ যিক্‌র কুরআন।"[৩]

মোল্লা আলী কারী অন্যত্র বলেন: "আল্লাহর যিক্‌র অর্থ ঐ সকল যিক্‌র যা জপ করলে বা পাঠ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত পাঠ, তাসবীহ-তাহলীল, পিতামাতার জন্য দু'আ বা অনুরূপ যিক্‌রাদি। আর আল্লাহর যিক্‌রকারী বলতে তাঁকে বুঝান হয় যিনি হাদীসে বর্ণিত মাসনূন যিক্‌রগুলো সকল সময়ে ও অবস্থায় পালন করেন।"[৪]

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, যিক্‌রের ফযীলত-জ্ঞাপক হাদীসসমূহে সাধারণত যিক্‌র বলতে তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি আযকার বুঝানো হয়েছে। এছাড়া সকল প্রকারের ইবাদত ও আনুগত্যই যিক্‌রের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এখানে যিক্‌রের ফযীলত-জ্ঞাপক কিছু সহীহ বা হাসান হাদীস আলোচনা করব। দু-একটি যয়ীফ হাদীস প্রসঙ্গত উল্লেখ করলে আমি তার দুর্বলতা বর্ণনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ। আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

হাদীস শরীফে কয়েকভাবে যিক্‌রের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে: (১). সাধারণভাবে যিক্‌রের ফযীলত, (২). প্রত্যেক প্রকার

যিক্‌রের জন্য বিশেষ ফযীলত এবং (৩). বিশেষ সময়ের বিশেষ যিক্‌রের ফযীলত। প্রথমে আমরা যিক্‌রের সাধারণ ফযীলত বিষয়ক কিছু হাদীস আলোচনা করব।

(১). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ ... الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيْراً

"নিঃসঙ্গ একাকী মানুষেরা এগিয়ে গেল।" সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল, মুফাররাদ বা একাকী মানুষেরা কারা ?" তিনি বলেন : "আল্লাহর বেশি বেশি যিক্‌রকারীগণ।"[১]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন :

الْمُسْتَهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللهِ يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافًا

"একাকী অগ্রগামীগণ যারা সর্বদা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিক্‌র করেন ও যিকরে মত্ত থাকেন। যিক্‌রের কারণে তাঁদের (গোনাহের) বোঝা হাল্কা হয়ে যাবে। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁরা হাল্কা হয়ে হাজির হবেন।"[২]

(২). মুআয ইবনু জাবাল (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার সর্বশেষ যে কথাটি হয়েছিল, যে কথাটি বলে আমি তাঁর থেকে শেষ বিদায় নিয়েছিলাম তা হলো, আমি প্রশ্ন করেছিলামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় আমল (কর্ম) কোনটি? তিনি বলেনঃ

أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম যে, তুমি যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনো তোমরা জিহ্বা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকবে।"[৩]

অর্থাৎ, সদা সর্বদা মুমিন মুখে আল্লাহর যিক্‌র করবে। এরূপ হলে তাঁর যখন মৃত্যু হবে তখনো তাঁর জবান যিক্‌রেই ব্যস্ত থাকবে।

(৩). আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) বলেনঃ এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য বেশি হয়ে গিয়েছে। আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকব। তিনি বলেন :

لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللهِ (مِنْ ذِكْرِ اللهِ) عَزَّوَجَلَّ

"তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকে।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

(৪). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ ৭ প্রকারের মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। তাঁদের মধ্যে এক শ্রেণীঃ

رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

"যে ব্যক্তি একাকী আল্লাহর যিক্‌র করেছেন আর তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর ধারা নেমেছে।"[৫]

(৫). আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র হয় না তাদের তুলনা জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"[৬]

(৬). আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ... تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, এরপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকবে। এরপর সে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব পাবে, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব)।" হাদীসটি হাসান।[৭]

এ অর্থে আরো অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট অধ্যায়ে আমারা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

(৭). আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন :

أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَنْ

تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ذِكْرُ اللهِ. وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مَا عَمِلَ امْرُؤٌ بِعَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

"আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোন্‌টি? তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের জন্য সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করতে করতে শাহাদত বরণ করার থেকেও উত্তম কর্ম কি তা-কি তোমাদেরকে বলব? সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, সেই কর্মটি কী? তিনি বললেন : 'আল্লাহর যিক্‌র।' মুআয ইবনু জাবাল (রা) বলেন: "আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিক্‌র থেকে উত্তম কোনো আমল কোনো মানুষ করে নি।" হাদীসটি সহীহ।[১]

(৮). আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন:

أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُقَالَ إِنَّهُ مَجْنُونٌ

"তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র কর যেন মানুষেরা তোমাদেরকে পাগল বলে।" হাদীসটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সহীহ বা হাসান বলে গণ্য করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বলে প্রমাণ করেছেন।[২]

(৯). একটি অত্যন্ত যয়ীফ হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত:

أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ تعالى حَتّى يَقولَ الْمُنافِقُونَ إنّكُمْ مراؤُونَ

"তোমরা এমনভাবে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করবে যেন মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা রিয়াকারী।"[৩]

(১০). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন:

أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

"আমার বান্দা যতক্ষণ আমার যিক্‌র করে এবং আমার জন্য তার দু ঠোঁট নড়াচড়া করে ততক্ষণ আমি তাঁর সাথে আছি।"[৪]

(১১). আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَيَذْكُرَنَّ اللهَ قَوْمٌ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعُلَى

"অনেক মানুষ দুনিয়াতে সুন্দর পরিপাটি বিছানায় আল্লাহর যিক্‌র করবেন, যিক্‌র তাঁদেরকে উচ্চ জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবে।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে হাইসামী হাদীসটির সনদ হাসান বলেছেন।[৫]

(১২). মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ. قَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنقَطِعَ

"আযাব থেকে রক্ষার জন্য কোনো মানুষ আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে উত্তম কোনো আমল কখনো করতে পারেনি (আযাব থেকে রক্ষার জন্য যিক্‌রের চেয়ে উত্তম আমল আর কিছুই নেই)। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি যিক্‌রের চেয়ে উত্তম নয়? তিনি বলেন : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও যিক্‌রের চেয়ে উত্তম নয়, তবে যদি সে তাঁর তরবারি দ্বারা আঘাত করতে করতে শেষ হয়ে যায় (তাহলে তা যিক্‌রের চেয়ে উত্তম হতে পারে)।"[৬] জাবির (রা) থেকেও একই অর্থে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে।[৭]

(১৩). আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَوْ أَنَّ رَجُلاً فِي حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرَ يَذْكُرُ اللهَ كانَ الذَّاكِرُ للهِ أَفْضَلَ

"যদি কোনো ব্যক্তির কাছে কিছু টাকা থাকে এবং সে তা দান করতে থাকে আর অপর ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র করে, তাহলে আল্লাহর যিক্‌রকারীই উত্তম বলে গণ্য হবে।"[৮]

(১৪). আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ما صَدَقَةٌ (مِنْ صَدَقَةٍ) أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى

"আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে উত্তম কোনো সাদকাহ বা দান নেই।"[৯]

(১৫). মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, আমাকে ওসীয়ত করুন। তিনি বললেন :

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ مَااسْتَطَعْتَ وَاذْكُرِ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَحدِثْ عِنْدَهَا تَوْبَةً السِّرَّ بِالسِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةَ بِالْعَلاَنِيَةِ

"তুমি যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া আঁকড়ে ধরে) চলবে। প্রত্যেক পাথর ও গাছের নিকট আল্লাহর যিক্‌র করবে। কোনো পাপ বা অন্যায় করলে নতুন করে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে; গোপনের জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যের জন্য প্রকাশ্যে।"[১]

(১৬). ইবনু আব্বাস ও আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ عَجزَ مِنْكُم عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ وَبَخِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ (فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"তোমাদের মধ্যে যে রাত জেগে ইবাদত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, কৃপণতার কারণে সম্পদ দান করতে পারে না, কাপুরুষতার কারণে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে অক্ষম হয়, সে যেন বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করে, সে যেন বেশি বেশি করে বলে: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী। কারণ, তা আল্লাহর নিকট স্বর্ণের পাহাড় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার চেয়েও অধিক প্রিয়।" হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহী পর্যায়ের ।[২]

(১৭) সহীহ হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন:

مَنْ جَبُنَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ وَالْعَدُوِّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"তোমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা ও কাপুরুষতার কারণে রাত জেগে ইবাদত করতে ও শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে অপারগ হয় এবং কৃপণতার কারণে সম্পদ ব্যয় করতে অসমর্থ হয় সে যেন বেশি বেশি করে বলে: সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহ আকবার।"[৩]

পাঠক, আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, এগুলো সবই নফল সালাত, নফল জিহাদ, নফল দান ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এ সকল হাদীস নির্দেশ করে যে, অন্যান্য নফল ইবাদতের চেয়ে নফল যিকরের গুরুত্ব অনেক বেশি।

(১৮). মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَيسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ عَزَّوَجَلَّ فِيهَا

"জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবেন না, শুধুমাত্র যে মুহূর্তগুলো আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সেগুলোর জন্য তাঁরা আফসোস করবেন।"[৪]

(২০). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشًى (وَمَا مِنْ رَجُلٍ مَشَى طَرِيقًا) فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، وَمَا آوَى أَحَدٌ (وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى) إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً.

"যদি কয়েকজন মানুষ কোথাও একত্রে বসে কিন্তু সে বৈঠকে তারা আল্লাহর যিক্‌র না করে তবে তা তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। যদি কোনো মানুষ সামান্য পরিমাণও হাঁটে এবং হাঁটার মধ্যে সে আল্লাহর যিক্‌র না করে, তাহলে তা তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যদি কোনো মানুষ বিছানায় শোয় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র না করে তাহলে তা তার জন্য ক্ষতিকর হবে।" হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫]

(২১). হারিস আল-আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ ইয়াহইয়া (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেন, যেগুলো তিনি পালন করবেন এবং বনী ইসরাঈলকে সেগুলো পালনের শিক্ষা দিবেন: আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা, সালাত (নামায) আদায়কালে মন বা চোখকে এদিক সেদিক না নেয়া, সিয়াম পালন করা, দান করা এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করা। যিক্‌র সম্পর্কে তিনি বলেন :

وَأَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللهِ كَثِيرًا وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَتَى حِصْنًا حَصِينًا فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ.

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বেশি বেশি আল্লাহর যিকর্িি.ধিংঁহহধযঃঁংঃ.পড়স্র করার। আল্লাহর যিক্‌রের উদাহরণ লাএমন যে, এক ব্যক্তিকে শক্রগণ ধাওয়া করে তার পিছে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় লোকটি একটি সুসংরক্ষিত দুর্গে এসে পৌছ এবং সে দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করল। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পায় না।" হাদীসটি সহীহ।[১]

(২২). এ অর্থে একটি যয়ীফ হাদীসটি আনাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত:

إِنَّ الشَّيْطَانَ وَاضِعٌ خَطْمَهُ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ، وَإِنْ نَسِيَ الْتَقَمَ قَلْبَهُ

"শয়তান তার মুখ আদম সন্তানের ক্বলবের উপর রেখে দেয়। যদি আদম সন্তান আল্লাহর যিক্‌র করে, তাহলে শয়তান পিছিয়ে যায়। আর যদি সে আল্লাহর কথা ভুলে যায়, তাহলে শয়তান তার ক্বলবকে গিলে ফেলে।"[২]

এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন :

الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ

"শয়তান আদম সন্তানের ক্বলবের উপর আসন গেড়ে বসে। যখন সে আল্লাহর যিক্‌র করে তখন শয়তান পিছিয়ে সংকুচিত হয়ে যায়। আর যখন সে বেখেয়াল হয়, তখন সে ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে।"[৩]

(২৩). আরেকটি যয়ীফ হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনু আমরের (রা) সূত্রে বর্ণিত:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةً وَإِنَّ صِقَالَةَ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ

"নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুর সাফাই বা পালিশ (করার ব্যবস্থা) আছে। আর ক্বলবের ছাফাই বা পালিশ আল্লাহর যিক্‌র।" হাদীসটির সনদ যয়ীফ।[৪]

দু'টি ভুল ধারণা:

এ হাদীসটি সমাজে অতি পরিচিত। এখানে দু'টি বিষয় ভুল বুঝা হয়:

(ক) 'আল্লাহর যিক্‌র' বলতে ' আল্লাহ, আল্লাহ,... ' যিক্‌র বুঝা।

আমরা দেখেলাম যে, কুরআন-হাদীসে আল্লাহর যিক্‌র বলতে শুধু আল্লাহর নাম জপ করা বা 'আল্লাহ আল্লাহ' যিক্‌র করা বুঝানো হয় নি। বরং আল্লাহর নামের মর্যাদা জপ করা বুঝানো হয়েছে। শুধু আল্লাহ নামটি জপ করলে আভিধানিকভাবে তা 'যিক্‌র' বলে গণ্য হতে পারে, তবে তা মাননূন বা সুন্নাত পদ্ধতি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই সকালে, সন্ধ্যায়, অন্য কোনো সময়ে, নির্দিষ্ট সংখ্যায় বা বেশি বেশি করে শুধু 'আল্লাহ' নামটি জপ করেন নি বা করতে শিক্ষা দেন নি। সাহাবীগণও অনুরূপ কিছু করেন নি। এখন যদি কেউ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর যিক্‌রের জন্য যে সকল বাক্যাদি শেখালেন ও পালন করলেন সেসকল যিক্‌রে ক্বলব সাফ হবে না, আল্লাহর নামের মহিমা, মর্যাদা, গুণগান ইত্যাদি জপ করলে ক্বলব সাফ হবে না বরং সকল মর্যাদা, প্রশংসা, স্তুতি, মহিমা ও গুণগান জ্ঞাপক শব্দ বাদ দিয়ে শুধু তাঁর 'নামটি' জপ করলেই ক্বলব সাফ হবে, তবে ধারণাটি ঠিক হবে না। দুনিয়াতে আমরা কোনো সম্মানিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলে "ন্যাংটো নাম" বা "শুধু নাম" না বলে তার আগে বা পরে 'সম্মান প্রকাশক' কোনো "সিফাত" বা বিশেষণ উল্লেখ করি। সুন্নাতের নির্দেশনা হলো, মহান আল্লাহর নামটি "শুধু" উচ্চারণ না করে "আল্লাহ" নামটির সাথে তাঁর মর্যাদা বা প্রশংসা জ্ঞাপক কোনো শব্দ যোগ করে যিকর করতে হবে।

মহা মহিমান্বিত আল্লাহর পবিত্র নাম মুমিনের হৃদয়ে সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাঁর নামেরই যিক্‌র করতে হবে। তাঁর মহান "আল্লাহ" নামে বা যে কোনো নামে যে কোনো ভাষায় তাঁর স্মরণ করলেই তাঁর যিক্‌রের সাওয়াব মিলবে, ইন্‌শা আল্লাহ। তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে মাসনূন-ভাবে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর যিক্‌র করার। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পরি যে, শুধু নাম জপ করে নয়, বরং তাঁর নামের মহিমা প্রকাশ করে যিক্‌র করতে হবে। তিনি উম্মতকে শত শত প্রকারের যিক্‌র শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজেও পালন করেছেন। কিন্তু শুধু "আল্লাহ" নাম জপ করতে হবে একথা তিনি কোথাও শেখাননি। তাঁর শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দু'আর ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম ধরে তাঁকে ডাকতে হবে, দু'আ করতে হবে, তাঁর সকল মহান নাম ও বিশেষ করে 'ইসমে আযম' ধরে তাঁর কাছে দু'আ করতে হবে। আর যিক্‌রে তাঁর নামের মহিমা, মর্যাদা, গুণগান, স্তুতি প্রকাশক বাক্যাদি জপ করে তাঁর যিক্‌র করতে হবে।

(খ) অনেকে মনে করেন, ক্বলব সাফ করতে হলে যিক্‌রের শব্দ দিয়ে জোরে জোরে ক্বলবে ধাক্কা মারা বা আঘাত করার কল্পনা করতে হবে। এ ধারণাটিও ভুল ও সুন্নাত পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে অগণিত যিক্‌র শিক্ষা দিয়েছেন। কখনো কোথাও যিক্‌রের সময় এ ধরনের শব্দ করতে বা আঘাত করতে শেখাননি। বরং নীরবে ও অনুচ্চস্বরে যিক্‌র করতে শিখিয়েছেন। একেবারে শেষ যুগের কোনো কোনো

যাকির মনোযোগ অর্জনের জন্য এ সকল পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। আবার অনেকে তার বিরোধিতা করেছেন। মুজাদ্দিদ আলফ সানী (রাহ) কোনো প্রকার যিক্রের সময় কোনো প্রকার শব্দ করতে বা শরীর, মাথা ইত্যাদি নাড়াতে নিষেধ করেছেন। সর্বাবস্থায় এ সকল কাজের সাথে যিক্রের কোনো সম্পর্ক নেই। যে কোনো মাসনূন পদ্ধতিতে আল্লাহর স্মরণ করলে মুমিন আল্লাহর যিক্রের উপরে বর্ণিত মর্যাদা, ফযীলত, উপকার সবই অর্জন করবেন।

১. ১০. বিশেষ যিক্রের বিশেষ ফযীলত

এভাবে আমরা যিক্রের গুরুত্ব ও ফযীলত জানলাম। কোনো মুমিন মুখে, মনে বা কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করলে উপরের হাদীসগুলোতে বর্ণিত অপরিমেয় ফযীলত লাভ করবেন বলে আমরা আশা করি। যিক্রের ফযীলত বিষয়ে আরো অগণিত হাদীস রয়েছে, যেগুলোতে যিক্রের বিশেষ বিশেষ বাক্য উল্লেখ করে সে বাক্য দ্বারা যিক্র করলে মুমিন কী পরিমাণ মর্যাদা, রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জন করবেন তা বলা হয়েছে। এ সকল হাদীস আমরা দু ভাগ করতে পারি: (ক) কিছু হাদীসে সর্বদা বেশি বেশি পালন করার জন্য কিছু যিক্র ও তার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। (খ) অন্যান্য হাদীসে বিশেষ সময়ে পালনের জন্য কিছু যিক্রের কথা উল্লেখ করে তার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসগুলো আমরা সময় নির্ধারিত যিক্রের আলোচনার সময় উল্লেখ করব, ইন্শা আল্লাহ। এখানে আমরা সাধারন যিকরগুলো আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ১১. মাসনূন যিক্রের শ্রেণীবিভাগ

'মাসনূন' অর্থ সুন্নাত-সম্মত বা সুন্নাত নির্দেশিত। রাসূলুল্লাহﷺ উম্মাতকে শুধু যিক্রের উৎসাহ দিয়েছেন তাই নয়, কিভাবে কখন কোন্ শব্দ উচ্চারণ করে আল্লাহর যিক্র করতে হবে তাও বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। উম্মতের কাজ শুধু তার অনুসরণ করা।

আমরা দেখেছি যে, মাসনূন যিক্র সবই বাক্য, শুধু নাম বা শব্দ জপ করে কোনো যিক্র সুন্নাতে বর্ণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আচরিত বা নির্দেশিত এ যিক্রসমূহকে আমরা নিম্নরূপে বিভক্ত করতে পারি :

১. আল্লাহর একত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি
২. আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাদি
৩. আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যাদি
৪. আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি
৫. আল্লাহর উপর নির্ভরতা জ্ঞাপক বাক্যাদি
৬. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি
৭. আল্লাহর নিকট সাধারণ প্রার্থনা, দু'আ বা জাগতিক ও পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ কামনা করা বিষয়ক বাক্যাদি
৮. আল্লাহর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সালাত-সালাম প্রার্থনা জ্ঞাপক বাক্যাদি
৯. আল্লাহর কালাম বা কুরআন পাঠের মাধ্যমে যিক্র।

১. ১২. একত্ব, পবিত্রতা, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্বের যিকর

১. ১২. ১. আল্লাহর ইবাদতের একত্ব প্রকাশক বাক্যাদি

প্রথম চার প্রকারের যিকরের বিষয়ে হাদীস শরীফে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রথম প্রকারের বাক্যগুলোতে মহান আল্লাহর ইবাদতের একত্বের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় কয়েকটি বাক্য:

যিক্র নং ১ : তাহলীল

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)।

এটি এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম যিক্র। অনেক আবেগী মানুষ 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কে যিক্র হিসাবে পালন করা অযৌক্তিক বলে মনে করেন। তারা বলেন, এ কালেমাই ঈমান। একবার সর্বান্তকরণে বললেই হলো। এরপরের কাজ নিজের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠা করা। বারবার আউড়ে কী হবে? বিবাহের কালেমা ও ইজাব কবুল তো একবারই বলা হয়। এতেই আজীবন স্বামীর ঘর করতে হয়। বারবার আউড়ানোর কোনো প্রয়োজন হয় না।

কথাটি শুনতে খুব যৌক্তিক মনে হলেও কিছুটা বিভ্রান্তিকর ও সুন্নাহ বিরোধী। কালেমার ঘোষণার মাধ্যমে ঈমান আনার পর আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে একথা অবশ্যই ঠিক। কেউ যদি তার উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব পালন না করে নফল যিক্রে রত থাকেন তাহলে তার এ কর্ম বাতুলতা ও ইসলামের শিক্ষা বিরোধী। কিন্তু এজন্য এ কালেমার যিক্রকে অর্থহীন বললে মহানবী ﷺ-কেই অবমাননা করা হয়। কারণ, তিনি নিজেই এ কালেমাকে বেশি বেশি পাঠ করে যিক্র করতে বলেছেন।

'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যটি বারবার জপ করার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্র করার নির্দেশনায় এবং এ যিক্রের অচিন্ত্যনীয় ফযীলতের ঘোষণায় অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১] আসলে ঈমান আনার পরে ঈমানকে মজবুত করতে ও নবায়ন করতে এ যিক্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে সুন্নাতের আলোকে আমরা জানতে পারি। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

Contents

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

"সর্বোত্তম যিক্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ আলহামদুলিল্লাহ।" হাদীসটি সহীহ।[১]

অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তরকে যিক্রের সাথে আলোড়িত করার চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন :

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

"কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভকারী সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে-ই হবে, যে তাঁর অন্তরের পরিপূর্ণ একাগ্রতা দিয়ে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।" [২]

উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"আমি এমন একটি বাক্য জানি, যে বাক্যটি যদি কেউ তাঁর অন্তর থেকে সত্যিকারভাবে বলে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে জাহান্নাম তাঁর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বাক্যটি: 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

কাজেই মুমিন সর্বান্তকরণে অন্তরের সকল আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে সর্বদা এ বাক্যটি বলবেন, যেন মৃত্যুর আগে এ বাক্যটি তাঁর শেষ বাক্য হয়। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ .... أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"তোমাদের ঈমানকে নবায়ন কর।" তাঁকে প্রশ্ন করা হলো: "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিভাবে আমরা আমাদের ঈমানকে নবায়িত করবো?" তিনি বললেন: "তোমরা বেশি বেশি 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।[৪]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যার সর্বশেষ কথা হবে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

বস্তুত, যে ব্যক্তি সর্বদা এ যিকরে তাঁর জিহ্বাকে রত রাখবেন, ইন্শা আল্লাহ, এ বাক্য তাঁর জীবনের শেষ বাক্য হবে। আমরা পরবর্তী আলোচনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যিকর সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস দেখব, ইনশা আল্লাহ।

যিক্র নং ২ : বিশেষ তাহলীল

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: "নেই কোন মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

এ যিক্রটির ফযীলতে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সকালে সন্ধ্যায় ১ বার, ১০ বার, ১০০ বার বা ২০০ বার বলতে, প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পরে বলতে ও সাধারণভাবে এ যিক্রটি বলতে নির্দেশ দিয়ে অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আবু আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ قَالَ: (لا إله ... قدير) كَانَ كَعَدْلِ مُحَرَّرٍ أَوْ مُحَرَّرَيْنِ

"যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ... কাদীর' যিক্রটি একবার বলবে, সে একজন বা দু'জন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সাওয়াব পাবে।" হাদীসটি হাসান।[৬] এ অর্থে বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ যিক্রটি ১০ বার বলবে, সে ৪ জন ইসমাঈল বংশীয় ক্রীতদাসকে মুক্ত করার সাওয়াব অর্জন করবে।[৮]

এ মহান সাওয়াব অর্জন করতে অবশ্যই হৃদয়কে অর্থের সাথে আলোড়িত করে যিক্র আদায় করতে হবে। এ মর্মে একটি হাদীস নিম্নরূপ

مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ ... مُخلصًا بِهَا رُوحُهُ مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ نَاطِقاً بِهَا لِسَانُهُ، إِلاَّ فُتِقَ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يَنْظُرَ اللهُ إِلَى قَائِلِهَا، وَحُقَّ لِعَبْدٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ.

"যদি কোনো ব্যক্তি কখনো এ বাক্যগুলো বলে এবং বলার সময় তাঁর আত্মা এই বাক্যগুলোর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তাঁর অন্তর এগুলোর সত্যতায় আস্থা রাখে এবং তাঁর জিহ্বা তা উচ্চারণ করে, তাহলে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ছেদ করে জমিনের এ যাকিরের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। আর আল্লাহ যাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁর জন্য নিশ্চিত যে আল্লাহ তাঁর অভিলাষ পূরণ করবেন।"[১]

যিক্‌র নং ৩ : বিশেষ তাহ্‌লীল

উপরের যিক্‌রটি মাসনূন যিক্‌রগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অন্য যিক্‌রের সাথে বা শুধু এ যিক্‌রটি আমরা বারবার দেখতে পাব। কোনো কোনো হাদীসে যিক্‌রটির মধ্যে তিনটি বাক্য বৃদ্ধি করে বলা হয়েছেঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ (يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوت بِيَدِهِ الْخَيْرُ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল হামদ, [**ইউ'হ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুআ হাইয়ুন লা ইয়ামুত, বিইয়াদিহিল খাইরু**] ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

অর্থ : "নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। (**তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব অমর। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ**) এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" আমরা দেখব যে, অনেক বর্ণনায় শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি (ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু) সংযুক্ত করে বলা হয়েছে।

১. ১২. ২. আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপক বাক্যাদি

যিক্‌র নং ৪ : তাহ্‌মীদ

اَلحَمْدُ للهِ

উচ্চারণ : আল 'হামদু লিল্লাহ। **অর্থ :** "প্রশংসা আল্লহর জন্য।"

১. ১২. ৩. আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক বাক্যাদি

দ্বিতীয় প্রকার যিক্‌র আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক। এ যিক্‌রের মূল বাক্য (সুব'হা-নাল্লাহ)। এছাড়াও হাদীসে এ অর্থে বিভিন্ন বাক্য শিক্ষা দান করা হয়েছে।

যিক্‌র নং ৫ : তাসবীহ

سُبْحَــانَ اللهِ

উচ্চারণ : 'সুব'হা-নাল্লা-হ', **অর্থ :** আল্লাহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

যিক্‌র নং ৬ : বিশেষ তাসবীহ

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم

উচ্চারণ : সুবা'হা-নাল্লা-হিল আযীম।

অর্থ : "মহামহিমান্বিত আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"

যিক্‌র নং ৭ : বিশেষ তাসবীহ

سُــبُّــوحٌ قُــدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِــكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ : সুব্বু'হুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূ'হ।

অর্থ: "মহাপবিত্র, মহামহিম, ফিরিশতাগণের এবং পবিত্রাত্মার প্রভু।"

যিক্‌র নং ৮ : বিশেষ তাসবীহ-তাহ্‌মীদ

سُبْحَــانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী।

অর্থ : " ঘোষণা করছি আল্লাহর পবিত্রতার এবং তাঁর প্রশংসা-সহ।"

যিক্‌র নং ৯: বিশেষ তাসবীহ-তাহ্‌মীদ

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ : সুবাহা-নাল্লা-হিল আযীম ওয়া বি'হামদিহী ।

অর্থ : "মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করছি ।"

১. ১২. ৪. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক বাক্যাদি

যিক্‌র নং ১০ : তাকবীর

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার । **অর্থ : "**আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ।"

উপরের ৪ প্রকার যিক্‌রের মূল বাক্য চারটি **:** ১, ৪, ৯ ও ১০ নং যিক্‌র । ইতপূর্বে আমরা দেখেছি যে, হাদীস শরীফে "আল্লাহর যিক্‌র" বলতে এগুলোকেই বুঝানো হয়েছে । আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব যে, এ চারটি অর্থ এবং এই বাক্যগুলোই অধিকাংশ মাসনূন যিক্‌রের মূল । পৃথকভাবে বা একত্রে এগুলোর সাথে অন্যান্য বাক্য সংযুক্ত হয়েছে ।

১. ১২. ৫. মানব জীবনে এ সকল যিক্‌রের প্রভাব

আমরা একটু চিন্তা করলেই অফুরন্ত সাওয়াবের পাশাপাশি এ সকল যিক্‌রের বিশেষ প্রভাব আমাদের জাগতিক জীবনে অনুভব করতে পারি ।

প্রতিটি মানুষের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য সাধারণ ও বিশেষ নিয়ামত রয়েছে, যা তার জীবনকে ধন্য করেছে । এর পাশাপাশি প্রত্যেকের জীবনেই কিছু কষ্ট, বেদনা ও সমস্যা আছে । যেগুলো আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের তুলনায় অতি নগণ্য । কিন্তু সাধারণত মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা এসকল কষ্ট ও বেদনার অনুভূতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত হই । শত নিয়ামতের বিপরীতে দুই চারটি কষ্ট আমাদের পুরো মনকে ব্যথিত করে তোলে । ব্যর্থতা, কষ্ট, বেদনা, ক্রোধ ইত্যাদি অনুভূতি আমরা লালন করি । এসকল অনুভূতির স্থায়িত্ব আমাদের মনকে কলুষিত ও অপবিত্র করে, মানসিক শক্তি ও প্রেরণাকে ব্যহত করে, আমাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট করে, আমাদের জীবনকে গ্লানিময় করে এবং সর্বোপরি আল্লাহর রহমত ও অফুরন্ত নিয়ামত লাভের পথ থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যায় ।

আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে যেভাবে মনে করবে, সেভাবেই তাঁকে তার পাশে পাবে । জীবনের প্রতি না-বোধক অনুভূতি আল্লাহর রহমত থেকে বান্দাকে নিরাশ করে, যা কঠিনতম পাপ ও অবিশ্বাস । অপরদিকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ নিয়ামত বাড়িয়ে দেন ।

এজন্য মুমিনকে নিজের মন কৃতজ্ঞতা দিয়ে আবাদ করতে হবে । সকল কষ্ট, বেদনা, ব্যর্থতা ও উৎকণ্ঠা থেকে মনকে সাফ করে আল্লাহর অশেষ নিয়ামতের কথা স্মরণ করে এগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে ভরতে হবে । আর অবিরত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বলতে হবে : 'আল-হামদু লিল্লাহ ।' এ যিক্‌র যাকিরের মনকে ভারমুক্ত করবে, গ্লানিমুক্ত করবে, শক্তিশালী করবে এবং আল্লাহর রহমত, নিয়ামত ও বরকত তাঁর জীবন ভরে তুলবে ।

অনুরূপভাবে 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', ইত্যাদি যিক্‌র যাকিরের হৃদয়কে আল্লাহর পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতিতে ভরে দেবে । পৃথিবীতে অন্য কারোর মহত্ত্ব, শক্তি বা বড়ত্ব তাঁকে প্রভাবিত করবে না । সকল ভয় ও হীনমন্যতার অনুভূতি থেকে এ হৃদয় পবিত্র হবে ।

'সুব'হা-নাল্লাহ' বাক্যটি আরবী ভাষার বাক্য-বিন্যাসের ফলে একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করে, যা অনেকটা জয়ধ্বনি বা জিন্দাবাদ ঘোষণার মতো । দেশ প্রেমিক যেমন বারবার নিজের দেশের জিন্দাবাদ বলে নিজের মনে দেশপ্রেমের আবেগ জাগিয়ে তোলে তেমনি আবেগে আল্লাহ প্রেমিক বারবার তাঁর প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ প্রেমের আবেগে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে ।

১. ১২. ৬. যিক্‌রগুলো সার্বক্ষণিক পালনের ফযীলত ও নির্দেশ

উপরের চার প্রকার যিক্‌রের মূল চারটি বাক্য : ১, ৪, ৯ ও ১০ নং যিক্‌রের একত্রে উল্লেখ করে এগুলোর বেশি বেশি জপ করার উৎসাহ প্রদান করে ও তার অপরিমেয় সাওয়াব বর্ণনা করে অনেক হাদীস বর্ণিত । এ বিষয়ক সহীহ হাদীস সংকলিত করলেই একটি বড় বই হয়ে যাবে । এ সকল অগণিত হাদীস থেকে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত গুরুত্বের সাথে এ সকল যিক্‌র সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ফযীলত বর্ণনা করেছেন । আমি নিম্নে এ বিষয়ক কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি ।

সামুরা ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَحَبُّ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি : 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' । তুমি ইচ্ছামতো এই বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার । (বাক্যগুলোর সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বা ফযীলত নেই ।)"[১]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ

"আমি 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতে এত বেশি পছন্দ করি যে, এগুলো বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নিচে যা কিছু আসে সবকিছু থেকে বেশি প্রিয়।"[১]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قُلْتُ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহে যাবে বা তা অতিক্রম করবে তখন তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেন: মসজিদসমূহ। আমি বললাম: বিচরণ ও ভক্ষণ কি? তিনি বললেন: 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'।" হাদীসটি হাসান।[২]

অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে (রা) বলেন :

أَلاَ تَرْتَعُ فِيْ رَوْضَةِ الْجَنَّةِ...

"তুমি কি জান্নাতের বাগানে ফল ভক্ষণ করবে না?" তিনি প্রশ্ন করেন: "হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানের ফল ভক্ষণ কি?" তিনি বলেন: "'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'।"[৩]

এভাবে বিভিন্ন সহীহ ও হাসান হাদীসে এ বাক্যগুলোর অপরিমেয় সাওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু মাস'উদ, সালমান ফারিসী, আবু হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (ﷺ) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ বাক্য চারটির প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয়।[৪]

আবু যার (রা) ও আয়েশা (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "এ বাক্যগুলোর প্রত্যেক বাক্য একবার যিক্র করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য।"[৫] আবু সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "এ বাক্যগুলো কিয়ামতের দিনে বান্দার আমলনামায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।"[৬] আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এ বাক্যগুলোই জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল।"[৭] আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলো ঝরে যায় অনুরূপভাবে এ যিক্রগুলো বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়।"[৮]

আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) উভয়ে নবীয়ে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: "আল্লাহ এ চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এ বাক্যগুলোর যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করতেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিক্র করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে।"[৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَات

"এ চারটি বাক্য যিক্রকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন।"[১০]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "নূহ (আ) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর পুত্রকে যে ওসীয়ত করেন তাতে তিনি বলেন :

آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ... وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلاَةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ،

"আমি তোমাকে দু'টি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি এবং দু'টি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর আদেশ প্রদান করছি। কারণ সাত আসমান ও জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লহু' অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ভারী হবে ... এবং আমি তোমাকে 'সুব'হা-নাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী' -এর নির্দেশ দিচ্ছি (অর্থাৎ, এ দু'টি যিক্র বেশি বেশি আদায় করতে নির্দেশ প্রদান করছি।) এ যিক্র সকল সৃষ্টির দু'আ ও সালাত এবং এর ওসীলাতেই সকল সৃষ্টি রিযিক প্রাপ্ত হয়।

আর আমি তোমাকে শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি।"[১]

সাহাবীগণও এ সকল বাক্য বেশি বেশি করে যিক্‌র করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন :

لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَدَدِهَا دَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللهِ

"'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-'হামদু লিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'- বলা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় সমসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার চেয়ে বেশি প্রিয়।"[২]

তিনি আরো বলেন: "আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যেভাবে সম্পদের রিযিক বণ্টন করেছেন তেমনভাবে তোমাদের স্বভাব বণ্টন করেছেন। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন ও যাকে পছন্দ করেন না সকলকেই সম্পদ দেন। তবে ঈমান তিনি শুধু তাকেই প্রদান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে কৃপণতা বোধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় পায় এবং রাত জেগে ইবাদত করতে আলসেমি বোধকরে, সে যেন বেশি বেশি লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল-হামদু লিল্লাহ ও সুব'হা-নাল্লাহ বলে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩]

বিশেষ তাসবীহ-তাহমীদের ফযীলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العظِيمِ

"দু'টি বাক্য জিহ্বায় উচ্চারণের জন্য খুবই হালকা, আর কিয়ামতের দিন কর্ম পরিমাপের পাল্লায় খুবই ভারী এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় : সুব'হা-নাল্লাহি ওয়া বি'হামদিহী, সুবহানাল্লাহিল 'আযীম।"[৪]

১. ১২. ৭. ব্যাপক অর্থের বিশেষ যিকর

যিক্‌র নং ১১

الْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ للهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ للهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ للهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ للهِ مِلْءَ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ، وَالْحَمْدُ للهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

উচ্চারণ : (১) আল-'হামদু লিল্লা-হি 'আদাদা মা- আ'হসা কিতাবুহু, (২) ওয়া আল-'হামদু লিল্লা-হি মিলআ মা- আ'হসা কিতাবুহু, (৩) ওয়া আল-'হামদু লিল্লা-হি 'আদাদা মা- আ'হসা খালকুহু, (৪) ওয়া আল-হামদু লিল্লাহি মিলআ মা- ফী খালকিহী, (৫) ওয়া আল-হামদু লিল্লা-হি মিলআ সামাওয়া-তিহী ওয়া আর্‌দিহী, (৬) ওয়া আল-হামদু লিল্লা-হি 'আদাদা কুল্লি শাইয়িন, (৭) ওয়াল'হাম্‌দু লিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি শাইয়িন।

অর্থ : "(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে সে পরিমাণ, (২) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তা সব পূর্ণ করে, (৩) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর সৃষ্টি যা গণনা করে সে পরিমাণ, (৪) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকিছু আছে তা পূর্ণ করে, (৫) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁর আসমন ও জমিন পূর্ণ করে, (৬) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সকল কিছুর সংখ্যার সমপরিমাণ, (৭) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সব কিছুর উপর।"

আবু উমামা (রা) বলেন :

رَآنِيْ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُحَرِّكُ شَفَتَيَّ فَقَالَ لِيْ بِأَيِّ شَيْءٍ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ، يَا أَبَا أُمَامَةَ فَقُلْتُ أَذْكُرُ اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَكْثَرَ وَأَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تَقُوْلُ..

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দেখেন যে আমি আমার ঠোঁট নাড়াচ্ছি। তিনি আমাকে বলেন : হে আবু উমামাহ, তুমি কী বলে তোমার ঠোঁট নাড়াচ্ছ ? আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহর যিক্‌র করছি। তিনি বললেন : আমি কি তোমার রাতদিন যিক্‌রের চেয়েও উত্তম (যিক্‌র) তোমাকে শিখিয়ে দেব? আমি বললাম: হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিন বলেন: তুমি বলবে ...... (উপরের যিক্‌রগুলো তিনি শিখিয়ে দিলেন)। এরপর বললেন:

وَتُسَبِّحُ مِثْلَ ذَلِكَ وَتُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ

"উপরে যেভাবে (আল-হামদু লিল্লাহ) বলেছ ঠিক অনুরূপভাবে অনুরূপভাষায় তাসবীহ 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলবে এবং অনুরূপভাবে

তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' বলবে।" অর্থাৎ, উপরের ৭ টি বাক্যে 'আল-হামদু লিল্লাহ'- স্থলে 'সুব'হা-নাল্লাহ' দ্বারা ও 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা ৭ বার করে বলতে হবে। হাদীসটি হাসান।"[১]

আমরা সকাল সন্ধ্যার যিক্‌রের আলোচনায় এ ধরনের আরো ব্যাপক অর্থবোধক তাসবীহ্ তাহলীলের আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

যিক্‌র নং ১২ :

اَلْحَمْدُ لله حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ

উচ্চারণ : আল-'হামদু লিল্লা-হি 'হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি।

অর্থ : "সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক অনেক প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা"।

কয়েকটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাগুলোর অত্যন্ত প্রশংসা করেন।[২] এছাড়া একাধিক সহীহ হাদীসে বর্ণিত, বান্দা যখন এ যিক্‌রগুলো বলেন তখন আল্লাহও তার সাথে সাড়া দেন। কাজেই, মনোযোগ ও আদব-সহ আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভূতি নিয়ে যিক্‌র করতে হবে।[৩]

১. ১২. ৮. নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিকর আদায়ের ফযীলত ও নির্দেশ

উপরের হাদীসগুলো থেকে যিক্‌রের মহান চারটি বাক্য বা উক্ত বাক্যগুলোর অর্থের সমন্বয়ে ব্যপকার্থক বিভিন্ন বাক্য দ্বারা যিক্‌রের অপরিমেয় সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদার কথা আমরা জানতে পেরেছি। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুমিন সর্বদা সুযোগ মতো যত বেশি পারবেন এসকল বাক্যের যিক্‌র করবেন। যত বেশি তিনি যিক্‌র করবেন তত বেশি সাওয়াব, বরকত ও মর্যাদা তিনি লাভ করবেন।

তবে মুমিন হয়ত সর্বদা যিক্‌র করতে অপারগ হয়ে পড়েন। সে ক্ষেত্রে অন্তত নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিক্‌র করলে তিনি বিশেষ মর্যাদা ও সাওয়াব অর্জন করবেন। আমরা বিভিন্ন হাদীসে উপরের বাক্যগুলোর নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করলে বিশেষ সাওয়াবের উল্লেখ দেখতে পাই। কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক যিক্‌রের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা সে সকল হাদীস পরবর্তী অধ্যায়ে সকাল সন্ধ্যার যিক্‌র বা সময় নির্ধারিত যিক্‌রের আলোচনায় উল্লেখ করব। কোনো কোনো হাদীসে সাধারণভাবে রাতদিনে যে কোনো সময়ে এসকল যিক্‌র নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করলে বিশেষ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের দু প্রকারের যিকর এখানে উল্লেখ করছি।

(ক). 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' ১০০ বার

আবু তালহা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَأَرْبَعاً وَعِشْرِيْنَ أَلْفَ حَسَنَةٍ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذاً لاَ يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدٌ قَالَ بَلَى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَجِيْءُ بِالْحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جَبَلٍ أَثْقَلَتْهُ ثُمَّ تَجِيْءُ النِّعَمُ فَتَذْهَبُ بِتِلْكَ ثُمَّ يَتَطَاوَلُ الرَّبُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ

"যদি কেউ ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লহি ওয়া বি'হামদিহী' বলে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১,২৪,০০০ সাওয়াব লিখবেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে তো আমাদের কেউই বিপদে পড়বে না (জাহান্নামে কাউকেই যেতে হবে না।) তিনি বলেন : হাঁ। তোমাদের অনেকেই এত বেশি সাওয়াব নিয়ে কিয়ামতের দিন হাজির হবে যে, পাহাড়ের উপরে দিলেও পাহাড় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু এরপর আল্লাহ তাঁকে যে নিয়ামত দিয়েছিলেন তা এসে সব সাওয়াব নিয়ে চলে যাবে। এরপর মহান প্রতিপালক রহমত নিয়ে এগিয়ে আসবেন।"[৪]

এ থেকে জানা যায় যে, যার উপর আল্লাহর নিয়ামত যত বেশি তার তত বেশি সাওয়াবের কাজ করা প্রয়োজন। আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামতের শুকরিয়া প্রকাশের তাওফিক প্রদান করুন এবং সকল অবহেলা ও পাপ ক্ষমা করে দিন।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"যদি কেউ দিনের মধ্যে ১০০ বার 'সুব্'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী' বলে তাঁর সকল গোনাহ ক্ষমা করা হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।"[৫]

(খ). চার প্রকারের যিকর ১০০ বার

১০০ বার 'সুব'হানাল্লাহ', ১০০ বার 'আল-'হামদু লিল্লাহ', ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' ও ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে পালন করতে পারব। তিনি বলেন : "তুমি ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলবে, তাহলে ১০০ টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে। তুমি ১০০ বার 'আল হামদু লিল্লাহ' বলবে, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০ টি সাজানো ঘোড়ায়

মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে। তুমি ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তাহলে ১০০ টি মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। তুমি ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে, তাহলে তোমার সাওয়াবে আসমান ও জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে [এবং তোমার কোনো পাপই বাকি থাকবে না : দ্বিতীয় বর্ণনায়]। যে ব্যক্তি তোমার এ যিক্‌রগুলোর সমপরিমাণ যিক্‌র করবে সে ছাড়া কেউই সে দিনে তোমার চেয়ে বেশি বা উত্তম আমল আল্লাহর দরবারে পাঠাতে পারবে না।" হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সনদগুলো হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[১]

আবু উমামা (রা) থেকে এ অর্থে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে ১০০ বার করে উক্ত যিক্‌রগুলো আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুরূপ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। হাদীসটি হাসান।[২]

১. ১৩. নির্ভরতা জ্ঞাপক যিকর

পঞ্চম প্রকারের যিকর নির্ভরতা জ্ঞাপক। এ প্রকারের যিকরের শ্রেষ্ঠ বাক্য:

যিক্‌র নং ১৩

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ)

উচ্চারণ : লা- 'হাওলা ওয়া লা- কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ (বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযীম)

অর্থ : "কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (যিনি সর্বোচ্চ-সুমর্যাদাময়)।"

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ... التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

"তোমরা বেশি বেশি করে 'চিরস্থায়ী নেককর্মগুলো' কর। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন: এগুলো কি? তিনি বললেন ... : তাকবীর 'আল্লাহু আকবার', তাহলীল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু', তাসবীহ 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-'হামদু লিল্লাহ' এবং 'লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৩]

আবু মুসা, আবু হুরাইরা, আবু যার, মু'আয, সা'দ ইবনু উবাদাহ (ﷺ) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে, কারণ এ বাক্যটি জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর মধ্যে একটি ভাণ্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা।[৪]

আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাত্রিতে ইবরাহীম (আ) আমাকে বলেন: আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন বেশি করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করে...। জান্নাতের বৃক্ষ রোপণ লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا عَلَى الأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِلاَّ كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

"পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়।" হাদীসটি হাসান।[৬]

১. ১৪. ক্ষমা প্রার্থনার যিকর

উপরের ৫ প্রকারের যিকরে বান্দা তার মহান প্রভুর মহত্ব, একত্ব, পবিত্রতা, ক্ষমতা ইত্যাদি জপ করে মহান স্রষ্টার প্রতি তার মনের আবেগ, আকুলতা ও নির্ভরতা প্রকাশ করে ও তাঁকে স্মরণ করে নিজের হৃদয় মনকে পবিত্র ও উদ্ভাসিত করে। এগুলোতে সে প্রভুর কাছে বাহ্যত কিছু চায় না।

আমরা ইতপূর্বে দেখেছি যে, আল্লাহর কাছে চাওয়াও আল্লাহর যিক্‌র। মহান প্রতিপালকের নিকট তাঁর করুণা, বরকত, ক্ষমা, জাগতিক, আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক কল্যাণ চাওয়া আল্লাহর যিক্‌রের অন্যতম প্রকরণ।

আল্লাহর নিকট বান্দা সবই চাইবে। নিজের জন্য চাইবে এবং অন্যদের জন্যও চাইবে। সব চাওয়াই যিক্‌র। তবে প্রথমে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহর ক্ষমা লাভের উপরেই নির্ভর করছে বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন সকল উন্নতি ও কল্যাণ। দ্বিতীয় প্রকার চাওয়া জাগতিক বা বা পারলৌকিক কোনো কিছু তাঁর কাছে চাওয়া। তৃতীয় প্রকার চাওয়া অন্যের জন্য চাওয়া।

মানব প্রকৃতির অন্যতম দিক যে, সে কোনো না কোনোভাবে নিয়মভঙ্গ করবে। তার মহান স্রষ্টা তার জাগতিক ও পারলৌকিক

কল্যাণের জন্য যে নির্ধারিত নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রদান করেছেন তার বাইরে সে প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে চলে যায়। এভাবে প্রতিনিয়ত মানুষ পাপ করতে থাকে। একদিকে তার মানবীয় দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির টান ও পারিপার্শিক পরিবেশ অপরদিকে শয়তানের প্রতিনিয়ত প্ররোচনা।

পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে। তাকে তার মহান স্রষ্টার করুণার পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়। মহান রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত ভালবেসে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। পাপ যেন মানুষকে কলুষিত করতে না পারে সে জন্য তিনি ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাওবা ও ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার ফলে বান্দা শুধু পাপমুক্তই হয় না, উপরন্তু সে অশেষ সাওয়াব ও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়। যে কোনো মানুষ যখন পাপের জন্য আল্লাহর কাছে সর্বান্তকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন সে আল্লাহর ক্ষমা লাভে সক্ষম হয়। উপরন্তু এই ক্ষমা প্রার্থনা, অনুতাপ ও ক্রন্দনের কারণে তার হৃদয় আরো পবিত্র ও মুক্ত হয়। সে আল্লাহর আরো বেশি নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জন করে।

মহান আল্লাহ কুরআনে বান্দাকে যে কোনো পাপের পরেই ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারীগণের জন্য নিশ্চিত ক্ষমা, অফুরন্ত সাওয়াব ও জান্নাতের অনন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন শতাধিকবার ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তিনি উম্মতকে সদা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন।

১. ১৪. ১. ইস্তিগফারের মূলনীতি

১. ১৪. ১. ১. তাওবা বনাম ইসতিগফার

আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার দুটি দিক রয়েছে: (১) তাওবা এবং (২) ইসতিগফার। তাওবা অর্থ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা এবং ইসতিগফার অর্থ ক্ষমা পার্থনা করা। উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ইসতিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা তাওবা বা ফিরে আসার একটি অংশ। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে যে কোনো পাপ থেকে তাওবার অর্থ ও শর্ত নিম্নরূপ:

(১) পাপ পরিত্যাগ করা এবং আর কখনো পাপ না করার আন্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

(২) পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া

(৩) পাপের সাথে কোনো মানুষের বা সৃষ্টির অধিকার জড়িত থাকলে তা ফেরত দেওয়া অথবা ক্ষমা চেয়ে নেয়া

(৪) মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া

শর্তগুলি পূরণ করে তাওবা করলে মুমিন সকল পাপের ক্ষমার নিশ্চিত আশা করতে পারেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমার চাওয়া তাওবার একটি প্রকাশ। তবে অন্যান্য শর্তগুলো পূরণ ছাড়া শুধু ইসতিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়াতে পরিপূর্ণ তাওবা হয় না। কেউ যদি শর্তগুলো পূরণ না করে বলেন: 'আমি তাওবা করছি' তাহলে তা অতিরিক্ত একটি মিথ্যাচার বলে গণ্য হয় এবং পাপের বোঝা বাড়ে। কারণ বান্দা বলছেন যে, আমি আল্লাহর কাছে ফিরে আসছি, অথচ কার্যত তিনি ফিরে আসছেন না। তিনি আল্লাহর নির্দেশ মত বান্দার হক্ক ফিরিয়ে দেন নি এবং পুনরায় পাপ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন নি। কাজেই ফিরে আসার বিষয়ে তার ঘোষণাটি মিথ্যা ও পাপ বলে গণ্য।

১. ১৪. ১. ২. সৃষ্টির প্রতি অন্যায়ের তাওবা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি যে, পাপ পরিত্যাগ, পাপের জন্য অনুতাপ ও পুনরায় পাপ না করার সিদ্ধান্ত সহ 'ইসতিগফার' বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারলে তাওবা পূর্ণতা পায় এবং মুমিন ক্ষমা লাভের আশা করতে পারেন। কিন্তু এরূপ ইস্তিগফারের মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি অন্যায় ক্ষমা হয় না।

আল্লাহ যা কিছু বিধান প্রদান করেছেন তা তাঁর নিজের জন্য নয়, সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। এ সকল বিধান দু প্রকার। প্রথম প্রকার বিধান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। এগুলোকে সাধারণত হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিধান মানুষের সামাজিক জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য। এগুলোকে হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির অধিকার বলা হয়।

প্রথম প্রকার বিধান লঙ্ঘন করলে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর জাগতিক, মানসিক, আত্মিক ও পারলৌকিক উন্নতি ব্যাহত বা ধ্বংস হয়। যেমন,– সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যিক্‌র ইত্যাদি নির্দেশিত কর্মে অবহেলা করা অথবা শিরক, মদপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার বিধান লঙ্ঘন করলে মানুষ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও তার আশপাশের কোনো মানুষ বা কোনো সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, কাউকে গালি, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, কারো সম্পদ, অর্থ, সম্মান বা জীবনের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা। ফাঁকি, ধোঁকা, সূদ, ঘুষ, জুলুম, খুন, ধর্ষণ সবই এ জাতীয় পাপ। কেউ যদি অন্য কাউকে কোনো ব্যক্তিগত পাপে প্ররোচিত করে, যেমন সালাত ত্যাগ, মদপান ইত্যাদি কর্মে অন্য কাউকে প্ররোচিত করে তাহলে তাও এ প্রকারের পাপে পরিণত হবে। এছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি অন্য মানুষের কিছু দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন। স্বামীর প্রতি দায়িত্ব, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, কর্মদাতার দায়িত্ব, কর্মচারীর দায়িত্ব, সহকর্মীর দায়িত্ব, দরিদ্রের প্রতি দায়িত্ব, অসহায়ের প্রতি দায়িত্ব, বিধবা ও এতিমদের প্রতি দায়িত্ব, পালিত পশুর প্রতি দায়িত্ব ও অন্যান সকল দায়িত্ব। এগুলো পূর্ণভাবে পালন না করলে তা হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির অধিকার নষ্টের পাপ হবে।

প্রথম প্রকারের পাপের জন্য পূর্ণ তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের পাপের মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে : **প্রথম,** আল্লাহর বিধানের অবমাননা এবং

Contents

দ্বিতীয়, আল্লাহর কোনো সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা। এরূপ পাপে নিজেকে কলুষিত করার পরে বান্দা যখন আন্তরিকভাবে সাথে অনুতপ্ত হয়ে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তাঁর বিধান অবমাননার দিকটি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত বিচার দিনের মহান ন্যায়বিচারক তাঁর কোনো সৃষ্টির প্রাপ্য ক্ষমা করেন না। তার পাওনা তিনি বুঝে নেবেন ও তাকে বুঝে দেবেন। এজন্য এ জাতীয় পাপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকার নষ্ট বা সংকুচিত হয়েছে তাদের অধিকার ফেরত না দিলে বা তাদের নিকট থেকে ক্ষমা না নিলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাত-সিয়াম পরিত্যাগকারী, মদ্যপ, শূকরের মাংস ভক্ষণকারী বা এধরনের যে কোনো পাপীর জন্য ক্ষমালাভ সহজ। কিন্তু ভেজালদাতা, ফাঁকি দাতা, ধোঁকাপ্রদানকারী, যৌতুক গ্রহণকারী, এতিম, দুর্বল ও বিধবাদের সম্পদ দখলকারী, ঘুষ, সুদ ও জুলুম, চাঁদাবাজি ইত্যাদি দুর্নীতির মাধ্যমে কারো সম্পদ গ্রহণ বা অধিকার হরণকারীগণের ক্ষমালাভ খুবই কষ্টকর। এজন্য প্রতিটি যাকিরকে সদা সর্বদা চেষ্টা করতে হবে, দ্বিতীয় প্রকার পাপ থেকে সর্বদা দূরে থাকার। যদি কোনো মুসলিমের পূর্ব জীবনে এধরনের পাপ সংঘঠিত হয়ে থাকে, তাহলে যথাশীঘ্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির থেকে ক্ষমা গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে বেশি করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি, ক্ষমা ও সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে, যেন তিনি এগুলো থেকে ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

১. ১৪. ১. ৩. সকল পাপই বড়

ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় মুমিন-মনের উপলব্ধি। মানব মনের একটি অতি আকর্ষণীয় কাজ অন্যের অন্যায়গুলো বড় করে দেখা ও নিজের অন্যায়কে ছোট ও যুক্তিসঙ্গত বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া। আমরা একাকী বা একত্রে যখনই চিন্তাভাবনা বা গল্প করি, তখনই সাধারণত অন্যের অন্যায়গুলো আলোচনা করি। মুমিনের আত্মিক জীবন ধ্বংসে এটি অন্যতম কারণ। মুমিনকে সদা সর্বদা নিজের পাপের কথা চিন্তা করতে হবে। এমনকি আল্লাহর অগণিত নিয়ামতের বিপরীতে তাঁর ইবাদতের দুর্বলতাকেও পাপ হিসাবে গণ্য করে সকাতরে সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সকল প্রকার পাপকে কঠিন, ভয়াবহ ও নিজের জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে বারবার ক্ষমা চাইতে হবে। এ পাপবোধ নিজেকে সংকুচিত করার জন্য নয়। এ পাপবোধ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেকে ভারমুক্ত, পবিত্র, উদ্ভাসিত ও আল্লাহর নৈকট্যের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বলেছেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ لَهُ هكَذَا فَطَارَ.

"মুমিন ব্যক্তি তাঁর পাপকে খুব বড় করে দেখেন, যেন তিনি পাহাড়ের নিচে বসে আছেন, ভয় পাচ্ছেন, যে কোনো সময় পাহাড়টি ভেঙ্গে তাঁর উপর পড়ে যাবে। আরা পাপী মানুষ তার পাপকে খুবই হালকাভাবে দেখেন, যেন একটি উড়ন্ত মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, হাত নাড়ালেই উড়ে যাবে।"[১]

১. ১৪. ২. কয়েকটি মাসনূন ইসতিগফার

মুমিন যে কোনো ভাষায় ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারেন। ভাষা বা বাক্যের চেয়ে মনের অনুশোচনা ও আবেগ বেশি প্রয়োজনীয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো বাক্য ব্যবহার করা উত্তম। সাধারণভাবে বিভিন্ন হাদীসে ইসতিগফারের জন্য 'আসতাগফিরুল্লাহ' (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি) এবং কখনো এর সাথে 'ওয়া আতূবু ইলাইহি' (এবং আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি) বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি মাসনূন বাক্য উল্লেখ করছি যেগুলির ফযীলত ও তথ্যসূত্র পরবর্তী আলোচনায় উল্লেখ করা হবে:

যিক্‌র নং ১৪

أَستَغْفِرُ اللهَ

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হ। **অর্থ:** আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যিক্‌র নং ১৫

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে ফিরে আসছি।

যিক্‌র নং ১৬

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ (أَنْتَ) التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (الغَفُوْرُ)

উচ্চারণ : রাব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম। দ্বিতীয় বর্ণনয় "রাহীম"-এর বদলে: 'গাফূর'।

অর্থ: "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়। দ্বিতীয় বর্ণনায়: তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী।"

যিক্র নং ১৭ : (৩ বার)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (الْعَظِيْمَ) الَّذِيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ (‘আযীমাল্) লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুআল ‘হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ: “আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।”

যিক্র নং ১৮: (সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাক্বতানী, ওয়াআনা ‘আবদুকা, ওয়াআনা ‘আলা- ‘আহদিকা ওয়াওয়া‘অ্দিকা মাস তাতা‘অ্তু। আ‘উযু বিকা মিন শাররি মা- স্বানা‘তু, আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়্যা, ওয়াআবূউ লাকা বিযামবি। ফাগ্‌ফিরলী, ফাইন্নাহু লা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ: “হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেরেছি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নিয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আমার পাপ-সহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।”

১. ১৪. ৩. তাওবা-ইস্তিগফারের ফযীলত ও নির্দেশনা

কুরআন কারীমে মুমিনগণকে বারবার তাওবা ও ইসতিগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাওবা ও ইসতিগফারের জন্য ক্ষমা, পুরস্কার ও মর্যাদা ছাড়াও জাগতিক উন্নতি ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসে ইসতিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ইসতিগফার আল্লাহর অন্যতম যিক্র। যিক্রের সাধারণ ফযীলত ইস্তিগফারকারী লাভ করবেন। এ ছাড়াও ইস্তিগফারের অতিরিক্ত মর্যাদা ও সাওয়াব রয়েছে। এ বিষয়ক কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি :

(১). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً.

“আল্লাহর কসম! আমি দিনের মধ্যে ৭০ বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি।”[১]

(২). আগার আল-মুযানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ (وَاسْتَغْفِرُوهُ) فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ (وَأَسْتَغْفِرُهُ) فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

“হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তাওবা করি বা ইস্তিগফার করি।”[২]

(৩). আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক মাজলিসেই (একবারের যে কোনো বৈঠকের মধ্যে) মাজলিস ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার: ‘রাব্বিগ্ ফিরলী ... গাফূর’ (উপরের ১৬ নং যিক্র) বলতেন।[৩]

(৪). আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা আল্লাহর নিকট তাওবা করলে (পাপ থেকে ফিরে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে) আল্লাহ সীমাহীন খুশি হন। তার খুশির তুলনা, এক ব্যক্তি জনমানবশূন্য মরুভূমিতে থেমেছে। তার সাথে তার বাহন, যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সে একটু বিশ্রাম করতে যেয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, তার বাহন হারিয়ে গিয়েছে। মরুভূমির প্রচণ্ড রোদ্র ও পিপাসায় সে ক্লান্ত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে মেনে নিয়ে একসময় অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে উঠে সে দেখতে পায় যে তার উট তার পাশে দাড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে এতই খুশি হয় যে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে: ‘হে আল্লাহ, আপনি আমার দাস, আমি আপনার প্রভু।’ আনন্দের আতিশয্যে সে ভুল করে ফেলে। উট ফিরে আসাতে এ ব্যক্তি যত আনন্দিত হয়েছে কোনো পাপী বান্দা পাপ থেকে ফিরে আসলে বা তাওবা করলে আল্লাহ তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন।[৪]

সুব‘হা-নাল্লাহ! কত ভালবাসেন আল্লাহ তাঁর পাপী বান্দাকে!! এ সুযোগ শুধু পাপীদের জন্যই। আমাদের কি আগ্রহ হয় না যে মহান প্রভুকে এভাবে আনন্দিত করব!

(৫). আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন: হে আদম সন্তান, তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার করুণার আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তুমি যাই কর না কেন, কোনো কিছুই পরোয়া করব না। হে আদম

সন্তান, যদি তোমার পাপ আসমান স্পর্শ করে এরপরও তুমি ইস্তিগফার কর বা ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করব, কোনো পরোয়া করব না। হে আদম সন্তান, তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার কাছে হাজির হও, কিন্তু শির্ক থেকে মুক্ত থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা তোমাকে প্রদান করব।[১]

(৬). আবদ ইবনু বুসর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

"সেই সৌভাগ্যবান যে তার আমলনামায় অনেক ইস্তিগফার পেয়েছে।"[২]

(৭). অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: যদি কেউ উপরে লিখিত ১৭ নং যিক্‌রের বাক্যগুলো তিন বার বলে, তাহলে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো কঠিন পাপও করে থাকে।" হাদীসটিকে হাকিম, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস সহীহ বলেছেন।[৩]

১. ১৪. ৪. পিতামাতা ও সকল মুসলিমের জন্য ইস্তিগফার

মুমিন যেমন নিজের জন্য আল্লাহর ক্ষমা ভিক্ষা করবেন, তেমনি মুসলিম উম্মাহর সকল সদস্যের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। বিশেষত নিজের পিতামাতা, আত্মীয় ও বন্ধুগণ ও পূর্ববর্তী মুসলিমগণের জন্য। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, পরবর্তী যুগের মুসলিম প্রজন্মরা বলে:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ালু।"[৪]

এভাবে সকল মুসলিমের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা ফিরিশতা ও নবীগণের সুন্নাত। কুরআন কারীমে এ ধরনের অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে।

পিতামাতার জন্য ইস্তিগফারের ফযীলতে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি সহীহ হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

"জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে: কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, এজন্য তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।"[৫]

১. ১৫. দু'আ বা প্রার্থনা জ্ঞাপক যিক্‌র

এতক্ষণ আমরা ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে কিছু জানলাম। এখন আমরা সাধারণ প্রার্থনা বা দু'আ সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ১৫. ১. দু'আর পরিচয় ও ফযীলত

দু'আ বলতে আমরা সাধারণভাবে বাংলায় প্রার্থনা করা বুঝি। এ অর্থে আরবীতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়: (১). **سؤال** অর্থাৎ চাওয়া বা যাচ্ঞা করা (ask, pray, beg) ও (২). **دعاء** অর্থাৎ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, invoke)। এছাড়া আরেকটি শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়: **مناجاة** 'মুনাজাত' বা চুপেচুপে কথা বলা (whisper to each other)।

আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, যিক্‌র ও প্রার্থনাকেই 'মুনাজাত' বলা হয়। হাদীসে সালাতকে মুনাজাত বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

"যখন কেউ সালাতে থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাতে' (গোপন কথাবার্তায়) রত থাকে।"[৬]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنَّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ (فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيهِ بِهِ)

"যখন কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন যে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে রত থাকে; অতএব কিভাবে এবং কী বলে মুনাজাত করছে সে দিকে যেন সে খেয়াল রাখে (বুঝে ও মনোযোগ সহকারে সালাত পড়ে)।" হাদীসটি সহীহ।[১]

আল্লাহর সাথে কথাবার্তা, প্রার্থনা ও দু'আকে মুনাজাত বলা হয়, কারণ তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছে। তাঁর সাথে বান্দার কথা গোপনে ও চুপেচুপে হয়। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে :

أَقَرِيْبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيْهِ أَمْ بَعِيْدٌ فَنُنَادِيْهِ

"আমাদের প্রভু কি আমাদের কাছে, না দূরে? যদি কাছে হন তবে আমরা তাঁর সাথে মুনাজাত করব বা চুপেচুপে কথা বলব। আর যদি তিনি দূরে হন তাহলে আমরা জোরে জোরে তাঁকে ডাকব।" জবাবে আল্লাহ কুরআন কারীমের সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াত নাযিল করেন: "এবং যখন আমার বান্দাগণ আপনাকে আমার বিষয়ে প্রশ্ন করে, (তখন তাদের বলুন) আমি তাদের নিকটবর্তী।"[২]

আমরা দেখেছি যে, দু'আ বা প্রার্থনা যিক্‌রের অন্যতম প্রকরণ। সকল দু'আই যিক্‌র; তবে সকল যিক্‌র দু'আ নয়। কারণ দু'আর মধ্যে বান্দা আল্লাহর স্মরণ করার সাথে সাথে নিজের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। আর শুধু যিক্‌রে বান্দা আল্লাহর গুণাবলী, মর্যাদা, প্রশংসা ইত্যাদি স্মরণ করেন।

মুমিন আল্লাহর দরবারে যে কোনো বিষয়ে কোনো প্রার্থনা করলে তিনি আল্লাহর যিক্‌রের ফযীলত ও সাওয়াব অর্জন করবেন। কাজেই, সাধারণ যিক্‌রের ফযীলতের মধ্যে দু'আও রয়েছে। তবে কুরআন ও হাদীসে দোওয়ার জন্য বিশেষ ফযীলত, মর্যাদা ও নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে তার কিছু উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি। আল্লাহর তাওফীক ও কবুলিয়ত প্রার্থনা করছি।

(১). আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ বলেন:

يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاستَهدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاستَطعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ... يَا عِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كما يَنْقصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ ...

"হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে পথ দেখাই সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ঠ। অতএব, তোমরা আমার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে হেদায়েত দান করব। হে আমার বান্দাগণ, শুধুমাত্র আমি যাকে খাইয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত। অতত্রব, তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করব। হে আমার বান্দাগণ, আমি যাকে পোশাক পরিধান করিয়েছি সে ছাড়া তোমরা সকলেই উলঙ্গ। অতএব, তোমরা আমরা কাছে বস্ত্র প্রার্থনা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা রাতদিন অন্যায় ও পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ছ আর আমি সকল গোনাহ ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার কাছে গোনাহের ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব। ... হে আমার বান্দাগণ, যদি সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বিন একত্রে দাঁড়িয়ে আমার কাছে (তাদের সকল প্রয়োজন) প্রার্থনা করে এবং আমি প্রত্যেককে তার প্রার্থনা পূর্ণভাবে দান করি, তাহলেও আমার ভাণ্ডার থেকে অতটুকুই কমবে, মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি সূতা ভিজালে সমুদ্রের পানি যতটুকু কমবে (অর্থাৎ, কিছুই কমবে না)।"[৩]

(২). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

"আমার বান্দা আমার বিষয়ে যেরূপ ধারণা করে আমি সেখানেই থাকি। আমার বান্দা যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার সাথে থাকি।"[৪]

(৩). নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী ﷺ বলেছেন :

اَلدُّعَاءُ هُوَ اَلْعِبَادَةُ... وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"দু'আ বা প্রার্থনাই ইবাদত।" একথা বলে তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন: "তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে ডাক (দুআ কর), আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদত (দুআ) থেকে অহংকার করে তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ

করবে[১]।" হাদীসটি সহীহ।[২]

সুনানে তিরমিযীতে এ মর্মে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

اَلدُّعَاءُ مُخُّ اَلْعِبَادَةِ

"দু'আ ইবাদতের মগজ।" এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে উল্লেখ করেছেন যে, তা যয়ীফ। এরপর তিনি উপরের "দু'আই ইবাদত" হাদীসটি বর্ণনা করে তাকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

(৪). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ

"আল্লাহর কাছে দু'আ বা প্রার্থনার চেয়ে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

(৫). উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ

"জমিনের বুকে যে কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে কোনো দু'আ করলে - যে দু'আয় কোনো পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কিছু চায় না - আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করবেনই। তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেন। অথবা তদানুযায়ী তাঁর কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

(৬). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصُبُ وَجْهَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَعْطَاهَا إِيَّاه ، إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ.

"যে কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে মুখ তুলে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাঁকে তা দিবেনই। তাঁকে তা সাথে সাথে দিবেন অথবা (আখেরাতের জন্য) তা জমা করে রাখবেন।"[৬]

(৭). আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ ، وَلاَ قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثٍ : إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُفَّ (يَصْرِفَ) عَنْهُ مِنَ السُّوءِ بِمِثْلِهَا ، قَالُوا : إِذًا نُكْثِرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَكْثَرُ.

"যখনই কোনো মুসলিম পাপ ও আত্মীয়তা নষ্ট করা ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তখনই আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করে তাঁকে তিনটি বিষয়ের একটি দান করেন : হয় তাঁর প্রার্থিত বস্তুই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করেন, অথবা তাঁর প্রার্থনাকে (প্রার্থনার সাওয়াব) তাঁর আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা দু'আর পরিমাণে তাঁর অন্য কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন।" একথা শুনে সাহাবীগণ বলেন : হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করব। তিনি উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি (প্রার্থনা পূরণ করবেন)। হাদীসটি সহীহ।[৭]

যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের দিন যখন বান্দা দু'আর বিনিময়ে সঞ্চিত সাওয়াবের পরিমাণ দেখবে তখন কামনা করবে, যদি তাঁর কোনো প্রার্থনাই দুনিয়াতে কবুল না হতো! সবই যদি আখেরাতের জন্য জমা থাকতো![৮]

(৮). সালমান ফারিসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

"আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"[৯]

(৯). সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ، وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلاَّ الْبِرُّ"، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

"দু'আ ছাড়া আর কিছুই তকদীর উল্টাতে পারে না। মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।" হাদীসটি সহীহ।[১]

(১০). আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ

"যে বিপদ বা মুসিবত নাযিল হয়ে গিয়েছে এবং যা এখনো নাযিল হয়নি (ভবিষ্যতের ভাগ্যে আছে কিন্তু এখনো বাস্তবে আসেনি) এরূপ সকল বিপদ কাটাতে প্রার্থনা উপকারী। অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমাদের দায়িত্ব দুআর ওসীলা গ্রহণ করা।" হাদীসটি হাসান।[২]

(১১). আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন:

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ

"সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি যে দু'আ করতেও অক্ষম। আর সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

(১২). আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বিপদগ্রস্ত মানুষের নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন :

أَمَا كَانَ هَؤُلاَءِ يَسْأَلُونَ اللهَ الْعَافِيَةَ

"এরা কি আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করত না?"[৪]

১. ১৫. ২. অবৈধ খাদ্য বর্জন দুআ কবুলের পূর্বশর্ত

১. ১৫. ২. ১. হালাল উপার্জন বনাম হারাম উপার্জন

দু'আ, যিক্‌র ও ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হালাল উপার্জন নির্ভরতা। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً وإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فقالَ تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ومَلبسُهُ حرامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"হে মানুষেরা, আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র (বৈধ) ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না। আল্লাহ মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি নবী ও রাসূলগণকে দিয়েছেন (বৈধ ও পবিত্র উপার্জন ভক্ষণ করা)। তিনি (রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়ে) বলেছেন : ﴿হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর এবং সৎকর্ম কর, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর তা আমি জানি।﴾[৫] (আর তিনি মুমিনগণকে একই নির্দেশ দিয়ে বলেছেন) : ﴿হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে রিযিক প্রদান করেছি তা থেকে পবিত্র রিযিক ভক্ষণ কর﴾[৬]।" এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি (হজ্ব, উমরা ইত্যাদি পালনের জন্য, আল্লাহর পথে) দীর্ঘ সফরে রত থাকে, ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দু'আ করতে থাকে, হে পভু! হে প্রভু !! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার পানীয় হারাম এবং হারাম উপার্জনের জীবিকাতেই তার রক্তমাংস গড়ে উঠেছে। তার দু'আ কিভাবে কবুল হবে!"[৭]

প্রিয় পাঠক, আমরা দেখব যে, এ ব্যক্তি দু'আ কবুল হওয়ার অনেকগুলো আদব পালন করেছে। সে মুসাফির অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসাফিরের দু'আ কবুল হয়। সে ধূলি ধূসরিত ও অসহায় অবস্থায় দু'আ করেছে এবং বিনয়, আকুতি ও অসহায়ত্ব প্রকাশকারীর দু'আ কবুল করা হয়। সে হাত তুলে দু'আ করেছে, যা দু'আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। এত কিছু সত্ত্বেও তার দু'আ কবুল হবে না। কারণ তার উপার্জন হারাম। হারাম জীবিকার উপর নির্ভরকারীর কোনো প্রার্থনা কবুল করা হয় না।

এ হাদীসে আমরা দেখি যে, – হালাল, বৈধ ও পবিত্র জীবিকার উপর নির্ভর করা সকল যুগের সকল নবী, রাসূল ও বিশ্বাসীগণের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সকল যুগের সকল নবী ও তাঁদের উম্মতগণের জন্য তাওহীদের পরেই ইসলামের মৌলিক সর্বজনীন বিধান হালাল ও বৈধ উপার্জনের উপর নির্ভর করা।

আমরা আরো দেখি যে, সৎকর্ম করার নির্দেশ বৈধ জীবিকা অর্জনের নির্দেশের পরে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, উপার্জন ও

জীবিকা বৈধ না হলে কোনো সৎকর্মই কবুল হবে না। উপরের হাদীসে বিশেষভাবে দু'আর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য অনেক হাদীসে সকল ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। একটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ

"পবিত্র (হালাল) ছাড়া কোনো কিছু আল্লাহর কাছে উঠে না।"[১]

প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বসরার প্রশাসক আব্দুল্লাহ ইবনু আমিরকে তার অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান। ইবনু আমির বলেন: ইবনু উমার, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। ইবনু উমার তার জন্য দু'আ করতে অসম্মত হন। কারণ তিনি ছিলেন আঞ্চলিক প্রশাসক। আর এ ধরনের মানুষের জন্য হারাম, জুলুম, অতিরিক্ত কর, সরকারি সম্পদের অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে নিপতিত হওয়া সম্ভব। একারণে ইবনু উমার (রা) উক্ত তার জন্য দু'আ করতে অস্বীকার করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ

'ওযু-গোসল ছাড়া কোনো সালাত কবুল হয় না, আর অবৈধ সম্পদের কোনো দান কবুল হয় না।" আর আপনি তো বসরার গভর্নর ছিলেন।[২]

কত কঠিন সিদ্ধান্ত! অবৈধ ও দুর্নীতিযুক্ত উপার্জনে লিপ্ত মানুষের জন্য তাঁরা দু'আ করতেও রাজি ছিলেন না! এ বিষয়ে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অগণিত মতামত আমরা দেখতে পাই। তাঁরা একবাক্যে বলেছেন যে, জুলুম, অত্যাচার, দুর্নীতি, ফাঁকি বা অন্য কোনো প্রকার অবৈধ উপার্জনের অর্থ দিয়ে বা বৈধ সম্পদের মধ্যে এরূপ অবৈধ সম্পদ সংমিশ্রিত করে তা দিয়ে যদি কেউ হজ্ব, উমরা, দান, মসজিদ নির্মাণ, মাদ্রাসা নির্মাণ, জনকল্যাণমূলক কর্ম, আত্মীয়স্বজন ও অভাবী মানুষদের সাহায্য, ইত্যাদি নেক কর্ম করে তাহলে তাতে তার পাপই বৃদ্ধি হবে, কোনো প্রকার সাওয়াবের অধিকারী সে হবে না। এমনকি এ ধরনের জুলুম, প্রবঞ্চনা, দুর্নীতি বা অবৈধ উপার্জনের অর্থে তৈরি কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ব্যবহার করতেও তাঁরা নিষেধ করেছেন।[৩]

হারাম বা নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করা দুই প্রকারে হতে পারে। প্রথম এরূপ কিছু ভক্ষণ করা যা আল্লাহ স্থায়ীভাবে মুমিনের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন ; যেমন, শূকরের মাংস, মৃত জীবের মাংস, মদ, প্রবাহিত রক্ত, ইত্যাদি। এগুলো ইসলামে স্থায়ী হারাম। কেউ এগুলোকে হালাল ভাবলে তার ঈমান নষ্ট হবে এবং সে অমুসলিম বলে বিবেচিত হবে। আর হারাম জেনেও কোনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে খেলে গোনাহ হবে। তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে জীবন রক্ষার জন্য খেলে কোনো গোনাহ হবে না। এ ধরনের হারাম দ্রব্য 'হারাম উপার্জনের' মধ্যে ধরা হয় না। এগুলো 'কবীরা গোনাহ' ও আল্লাহর অবাধ্যতার অন্তর্ভুক্ত, বান্দা অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। দ্বিতীয় প্রকারের হারাম ভক্ষণ হলো অবৈধ ও নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জন করে তা ভক্ষণ করা। এ প্রকারের হারাম ভক্ষণে অনেক মুসলিম লিপ্ত হন। এতে তার ধর্মজীবন ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১. ১৫. ২. ২. সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন হারাম উপার্জন

হারাম থেকে দূরে থাকার চেষ্টা অন্যতম যিক্‌র। অপর পক্ষে যদি যাকির হারাম সম্পদ বর্জন করতে না পারেন তাহলে তার সকল যিক্‌র ও সকল ইবাদত অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য এখানে আমি আমাদের সমাজের হারাম উপার্জনগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাচ্ছি। ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম উপার্জনের মূল উৎসগুলো সংক্ষেপে নিন্মরূপ :

(ক) সুদ : কুরআনে সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু আল্লাহ বলেছেন, যারা আল্লাহর বিধান প্রদানের পরেও সুদের মধ্যে লিপ্ত থাকবে তাদের সাথে আল্লাহ ও রাসূলের অনন্ত যুদ্ধ ঘোষিত থাকবে।[৪] হাদীসে সকল প্রকার সুদকে কঠিনভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুদভিত্তিক উপার্জনের সাথে জড়িত সকলকে: সুদ গ্রহিতা, দাতা, লেখক ও সুদি লেনদেনের সাক্ষী সবাইকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ বা লা'নত প্রদান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৫]

এভাবে ইসলামী শরীয়তে সুদের মাধ্যমে উপার্জিত সকল সম্পদ কঠিনতম হারাম উপার্জন। সুদখোর, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঋণ, বিনিয়োগ বা অনুদান ইত্যাদির নামে নগদ অর্থ ঋণ প্রদান করে এবং গ্রহীতার নিকট থেকে উক্ত অর্থের জন্য সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করে তার উপার্জন যেমন হারাম, তেমনি সুদ-দাতা, অর্থাৎ যিনি সুদে ঋণ গ্রহণ করেন এবং সময়ের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেন তিনিও কঠিন হারাম কর্মে লিপ্ত।

সুদের বিভিন্ন প্রকার আছে। প্রধান প্রকার – ঋণ বা অর্থ প্রদান করে সময়ের উপর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ। আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোর সকল প্রকার লেনদেন ও লাভ, বিভিন্ন বন্ড, সঞ্চয় পত্র ইত্যাদির লাভ সবই সুদ। ব্যাংক, এন.জি.ও., সমিতি ইত্যাদির ঋণও সুদভিত্তিক। বীমা কোম্পানীগুলোর দেওয়া লাভ ও বীমাও সুদ। ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক ব্যাংক, এন. জি. ও. ও বীমা পরিচালনার চেষ্টা করা হচ্ছে। যথাযথ ইসলামী শরীয়ত মত চলছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে মুমিন এরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে পারেন।

মহান আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ বেচাকেনা বা ব্যবসা বৈধ করেছেন এবং সুদ অবৈধ করেছেন।"[১] ইসলামী শরীয়তে সুদ ও ব্যবসায়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যের অন্যতম যে, সুদ অর্থের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ অথবা কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের বিনিময়ে অতিরিক্ত পণ্য গ্রহণ। আর ব্যবসা পণ্যের বিনিময়ে অর্থ বা অর্থের বিনিময়ে পণ্য গ্রহণ। বেচাকেনা বা ব্যবসায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। যেমন নগদ ব্যবসা, বাকি ব্যবসা ও অগ্রিম ব্যবসা। নগদ ব্যবসায়ে পণ্য ও মূল্য হাতেহাতে লেনদেন হয়। বাকি ব্যবসায়ে পণ্য আগে গ্রহণ করে পরে মূল্য প্রদান করা হয়। আর অগ্রিম ব্যবসায়ে মূল্য আগে গ্রহণ করা হয় এবং পণ্য পরে প্রদান করা হয়। বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের মূল বাজার দরের চেয়ে কিছু বেশি রাখা এবং অগ্রিম বিক্রয়ের জন্য পণ্যের মূল্য বাজার দর থেকে কিছু কম রাখা অবৈধ নয় বা সুদ নয়। তবে এরূপ ব্যবসায়ের জন্য অনেক শর্ত রয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই পণ্য, মূল্য, মূল্য প্রদানের সময় ইত্যাদি সুনির্ধারিত হতে হবে। নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রমের কারণে নির্ধারিত মূল্য বা পণ্যের মধ্যে আর কোনো কমবেশি বা হেরফের করা যাবে না। এ সকল শর্ত ও পার্থক্য হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থ থেকে বা আলিমদের নিকট থেকে ভালভাবে জেনে মুমিন এ জাতীয় লেনদেন করতে পারেন। সকল ক্ষেত্রে সুদ ও অবৈধ ক্রয়বিক্রয় থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

অনেক সময় বৈধ ব্যবসায় ও সুদের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য মুমিনকে ধোঁকা দিতে পারে। ৫০০০ টাকা নগদ গ্রহণ করে দু-এক বছরের কিস্তিতে ৬০০০ টাকা প্রদান সুদ। পক্ষান্তরে ৫০০০ টাকা মূল্যের একটি সাইকেল বাকিতে ৬০০০ টাকায় বিক্রয় করা বৈধ। বাকির মেয়াদ এবং একবারে বা কিস্তিতে প্রদানের বিষয় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, উভয় বিষয় তো একই। কাজেই একটি বৈধ ও অন্যটি অবৈধ হওয়ার কারণ বা যুক্তি কি হতে পারে? বস্তুত একটি বৈধ ও অন্যটি অবৈধ হওয়ার অনেক যুক্তি ও কারণ রয়েছে, যেগুলোর আলোচনা এ পুস্তকের পরিসরে সম্ভব নয়। তবে মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, বিলাল (রা) উন্নত মানের বুরনি খেজুর এনে দেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। তিনি বলেন, বেলাল, তুমি এ খেজুর কোথা থেকে পেলে? তিনি বলেন, আমাদের নিকট খারাপ খেজুর ছিল, আমি প্রতি দু সা' খারাপ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' ভাল খেজুর হিসেবে খারাপ খেজুর বিক্রয় করে এ ভাল খেজুর কিনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আহা! এই তো সুদ! তোমার প্রয়োজন হলে, তুমি খারাপ খেজুর নগদ টাকায় বিক্রয় করে সেই টাকায় ভাল খেজুর ক্রয় করবে।"[২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, ২০ টাকা কেজি মূল্যের ৩ কেজি ভাল চাউলের বিনিময়ে ১৫ টাকা কেজি মূল্যের ৪ কেজি খারাপ চাউল প্রদান বা গ্রহণ করলে তা সুদ হবে। অথচ উক্ত চার কেজি কমা চাউল নগদ বিক্রয় করে ৩ কেজি ভাল চাউল নগদ ক্রয় করলে তা সুদ হবে না। এখন যদি কেউ লেনদেনের ফলাফল একই বলে দাবি করেন তবে মুমিন তা গ্রহণ করবেন না। বরং উভয়ের পার্থক্য অনুধাবনের চেষ্টা করবেন এবং সর্বাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ পালন করবেন।

আমাদের দেশের বন্ধকী ব্যবস্থাও মূলত সুদ নির্ভর। বন্ধকী ব্যবস্থায় ঋণদাতা ঋণের নিশ্চয়তার জন্য জমি বা দ্রব্য বন্ধক রাখতে পারেন। তবে সে বন্ধকি জমি বা দ্রব্যের মালিকানা ঋণ গ্রহীতা মালিকেরই থাকবে। এ জমি বা দ্রব্য ঋণদাতা ব্যবহার করতে পারবেন না। শুধুমাত্র জামানত হিসেবে তার নিকট রক্ষিত থাকবে। মালিকের অনুমতিতে তা ব্যবহার করলে তাকে ব্যবহারের জন্য ভাড়া বা বিনিময় দিতে হবে। যদি প্রদত্ত ঋণ ঠিক থাকে আবার ঋণদাতা কোনো বিনিময় ছাড়া উক্ত জমি বা দ্রব্য ব্যবহার করেন তাহলে তা সুদ হবে।

(খ) ঘুষ : ঘুষকে হাদীসে কঠিনভাবে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও দালাল সবাইকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কাজের জন্য যদি কর্মচারী বা কর্মকর্তা সরকার বা কর্মদাতার নিকট থেকে বেতন বা ভাতা গ্রহণ করেন, তাহলে এ কাজের জন্য সেবা-গ্রহণকারীর নিকট থেকে কোনোরূপ হাদিয়া, পুরস্কার বা সাহায্য গ্রহণ করাই ঘুষ। চেয়ে অথবা না চেয়ে, আগে অথবা পরে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, খুশি হয়ে বা বাধ্য হয়ে, টাকায় অথবা দ্রব্যে অথবা সুযোগে যেভাবেই এ অর্থ, উপহার বা সুযোগ গ্রহণ করা হোক না কেন তা সন্দেহাতীতভাবে ঘুষ বলে গণ্য হবে এবং হারাম উপার্জন হিসাবে উক্ত গ্রহীতার সাথে তার প্রভুর সম্পর্ক ছিন্ন করবে। শিক্ষকগণ বেতনের বিনিময়ে যে শিক্ষা ও সেবা প্রদানে চুক্তিবদ্ধ, ডাক্তারগণ বেতনের বিনিময়ে যে চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ সে শিক্ষা, চিকিৎসা বা সেবার বিনিময়ে ছাত্র বা রোগীর নিকট থেকে অতিরিক্ত কোনো সুবিধা, উপহার বা অর্থ গ্রহণও একই ধরনের ঘুষ। এছাড়া কর্মী, কর্মচারী, কর্মকর্তা বা প্রশাসককে পদের কারণে উপহার-হাদীয়া প্রদান করাকেও ঘুষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে। এমনকি কারো জন্য কোনো বৈধ সুপারিশ বা সাহায্য করার পরে সে জন্য তার থেকে হাদীয়া, উপহার বা মিষ্টি গ্রহণ করাকেও হাদীস শরীফে অবৈধ উপার্জন বলে গণ্য করা হয়েছে।

(গ) জুয়া : ইসলামে জুয়াকে হারাম উপার্জনের অন্যতম উৎস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সাধারণভাবে জুয়া আমাদের পরিচিত। সকল প্রকার প্রচলিত লটারি জুয়া। এছাড়া সকল প্রকার বাজি জুয়া, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করে এবং বিজয়ী পক্ষ সকল অর্থ গ্রহণ করে। বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ খেলাধুলাও এভাবে জুয়ার মাধ্যমে আয়োজিত হচ্ছে। কিশোরগণও এখন জুয়া নির্ভর হয়ে গিয়েছে! খেলাধুলা বা বৈধ প্রতিযোগিতায় ৩য় পক্ষ পুরস্কার দিতে পারে।

(ঘ) জুলুম, জোর করা বা কেড়ে নেয়া : কুরআন ও হাদীসে জোর বা অনিচ্ছার মাধ্যমে কারো অর্থ গ্রহণ করাকে হারাম উপার্জনের অন্যতম দিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে কোনো প্রকারে কারো নিকট থেকে কোনো প্রকারের অর্থ, উপহার, সুবিধা বা কোনোকিছু গ্রহণ করাই হারাম। এভাবে যা কিছু গ্রহণ করা হয় সবই অপবিত্র উপার্জন। সকল প্রকার চাঁদা, যৌতুক, জবরদস্তিমূলক

উপহার, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি এ জাতীয় হারাম উপার্জন। কিছু ক্রয় করে প্রভাব দেখিয়ে মূল্য কম দেওয়া, শক্তি ও প্রভাবের কারণে রিকশা, গাড়ি, শ্রমিক ইত্যাদির ভাড়া বা পারিশ্রমিক কম দেওয়া একই শ্রেণীর জুলুম। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের প্রাপ্য টাকাপয়সা, সরকারি অনুদান, সম্পত্তি ইত্যাদি পুরো বা আংশিক চাপ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে গ্রহণ করাও এ পর্যায়ের উপার্জন। এ ধরনের সকল উপার্জনই হারাম, তবে সবচেয়ে নোংরা হারাম উপার্জন যৌতুক। এ জাতীয় অন্যতম আরেকটি জুলুম পিতার মৃত্যুর পরে পিতার সম্পত্তির শরীয়তসম্মত অংশ বোনদেরকে, এতিম বা দুর্বল প্রাপকদেরকে না দিয়ে দখল করা। কুরআন করীমে এধরনের ব্যক্তিদেরকে সুস্পষ্টভাবে জাহান্নামী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(ঙ) ফাঁকি, ধোঁকা, ওজনে কম-বেশি, ভেজাল, খেয়ানত বা দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ : এগুলো সবই কঠিনতম হারাম উপার্জন। কুরআন ও হাদীসে এ সকল বিষয়ে বারবার সাবধান করা হয়েছে। কর্মস্থলে ফাঁকি দেওয়া, কর্মচারী বা কর্মদাতাকে চুক্তির চেয়ে কম কর্ম প্রদান করাও এ শ্রেণীর হারাম উপার্জন। সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার সবাই নিজ নিজ কর্ম চুক্তি অনুসারে পূর্ণ কর্ম প্রদান করতে ইসলামী শরীয়ত মতে বাধ্য। যদি কারো অসুবিধা হয় তাহলে কর্ম ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু কর্মরত অবস্থায় কর্মে অবহেলা হারাম ও এভাবে উপার্জিত বেতন হারাম। যিক্‌র, ওয়ায, দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অযুহাতে কর্মে অবহেলা করলেও একইরূপ হারাম হবে। চিকিৎসা ছুটি নিয়ে হজ্ব ,উমরা করাও হারাম উপার্জনের মধ্যে। হয় সুস্পষ্ট ও সঠিক কারণ দেখিয়ে ছুটি নিতে হবে, না হলে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা বলে বা নিজেকে উপস্থিত দেখিয়ে কর্মের বেতন গ্রহণ করা এবং সে সময়ে অন্য কর্ম করা জায়েয নয়। এভাবে উপার্জিত বেতন সন্দেহাতীতভাবে হারাম উপার্জন।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যলয়, মাদ্রাসা ইত্যাদির শিক্ষকগণ, ডাক্তারগণ নির্ধারিত সময় চাকুরি স্থলে অবস্থান করতে ও নির্ধারিত সেবা প্রদান করতে বাধ্য। যদি চাকুরির চুক্তি ও সুবিধাদি অপছন্দ হয় তাহলে বাদ দিতে পারেন। পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু চাকুরিরত অবস্থায় দায়িত্বে অবহেলা, কম পড়ানো, কম চিকিৎসা করা, ছাত্র বা রোগীকে অতিরিক্ত সেবা গ্রহণের জন্য নিজস্ব কোচিং বা ক্লিনিকে যেতে উৎসাহিত করা – সবই হারাম এবং এভাবে উপার্জিত অর্থ হারাম।

ডাক্তারগণ ঔষধ কোম্পানি এবং ডায়াগনস্টিক প্রতিষ্ঠান থেকে যে কমিশন বা হাদিয়া গ্রহণ করেন তাও এ পর্যায়ের। এ অর্থ তাদের উপার্জিত নয়, বরং কোনো সেবা ছাড়া তা গ্রহণ করা হয়। উপরন্তু এ অর্থের মাধ্যমে তাদেরকে কোনো না কোনোভাবে অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয়। প্রয়োজন ছাড়া পরীক্ষা করানো, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা করানো, নিম্ন মানের বা বেশি দামের ঔষধ কেনার ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট জুলম ও পাপের সাথে জড়িত। সকল প্রকার ভেজাল ও ধোঁকামূলক ব্যবসা হারাম। কোনো দ্রব্যের কোম্পানির বা প্রস্তুতকারকের নাম, ক্রয়মূল্য ইত্যাদি মিথ্যা বলে বিক্রয় করাও একইরূপ হারাম।

প্রিয় পাঠক, আমরা প্রত্যেকে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আছে এমন সকল হারাম জীবিকা অর্জন করতে দ্বিধা করি না। তবে আমাদের সাধ্যের বাইরে যেসকল হারাম উপার্জন তা আমরা ঘৃণা করি। যেমন, স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মে ফাঁকি দিয়ে হারাম উপার্জন করেন, তবে তিনি মন্ত্রী, সচিব ও নেতাদের কর্মে অবহেলার নিন্দা করেন। সাধারণ ধার্মিক পিতা ও যুবক অতীব আগ্রহের সাথে যৌতুকের মাধ্যমে হারাম উপার্জন গ্রহণ করেন, তবে রাজনৈতিক নেতাদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, দুর্নীতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। সুযোগ পেলে নিজের বোন ও এতিম ভাতুষ্পুত্র, ভাগ্নে ও অন্যান্যদের সম্পত্তি, অর্থ ইত্যাদি অনেকেই আত্মসাৎ করেন, অথবা স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ বা ছোটখাট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অর্থ কিছুটা এদিক সেদিক করে হজম করে নেন। তবে তিনি তার সাধ্যের বাইরে বড় বড় দুর্নীতি ও আত্মসাতের ঘটনায় বিচলিত হন।

অনেক সময় আমরা আবার এসকল হারাম উপার্জনকে যুক্তিসঙ্গত করতে চাই। সরকার আমাদের ঠিকমতো বেতন দেয় না, ঠিকমতো পড়াবো কেন ? ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করব কেন ? বেতনে পেট চলে না তাই মিথ্যা তথ্য দিয়ে কিছু ভাতা নিয়ে নিলাম, ইত্যাদি। হারামকে হারাম জেনে ও মেনে তাতে লিপ্ত হলে ঈমান কিছুটা বাকি থাকে ও তাওবার সুযোগ থাকে। কিন্তু এধরনের যুক্তি দিয়ে হারামকে হালাল করে নিলে তাও থাকে না। কর্মদাতা যদি চুক্তি অনুযায়ী বেতন দেন, তাহলে কর্মী চুক্তি অনুযায়ী পূর্ণ কর্ম প্রদানে বাধ্য। চুক্তিতে অন্যায় থাকলে তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, অথবা চুক্তির কর্ম ছেড়ে দিতে হবে। চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় চুক্তির কর্মে ফাঁকি দিয়ে যে বেতন গ্রহণ করা হবে তা নিঃসন্দেহে হারাম উপার্জন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের এ অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ

"মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ নির্বিচারে যা পাবে তাই গ্রহণ করবে। হালাল সম্পদ গ্রহণ করছে না হারাম সম্পদ গ্রহণ করছে তা বিবেচনা করবে না।"[১]

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে :

فَإِذْ ذَلِكَ لاَ تُجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ

"তখন তাদের কোনো দু'আ কবুল করা হবে না।"[২]

মুহতারাম পাঠক, এ সকল হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, হারাম জীবিকা বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। মানুষ যত পাপী হোক, মহান প্রভুর সাথে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁধন দু'আর সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। যখনই প্রভুর অবাধ্যতায় লিপ্ত এ মানুষটি বিপদে আপদে বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রভুর দরবারে হাত উঠায়, তখন তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। কিন্তু হারাম জীবিকা বান্দার সাথে প্রভুর এই ঘনিষ্টতম ও শ্রেষ্ঠতম সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। কী কঠিন পরিণতি!

প্রশ্ন হলো, সব পাপেরই তো ক্ষমা আছে, এ পাপের কি ক্ষমা নেই? উত্তর হলো, সকল পাপের ক্ষমাই তাওবার মাধ্যমে হয়। তবে সাধারণ যে কোনো কঠিন পাপের তাওবা যত সহজ হারাম উপার্জনের তাওবা তত সহজ নয়। একজন মদ্যপ, ব্যভিচারী, বে-নামাযী এমনকি কাফির যে কোনো সময় তার পাপে অনুতপ্ত হয়ে তার প্রভুর কাছে বেদনার্ত ও ব্যথিত মনে অনুতাপ করে আর পাপ করব না বলে সিদ্ধান্ত নিলেই তার তাওবা হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন বলে কুরআন করীমে ও অগণিত হাদীসে বলা হয়েছে।

কিন্তু যে পাপের সাথে কোনো বান্দার হক জড়িত সে পাপের ক্ষেত্রে তাওবার অন্যতম শর্ত অনুতাপ, ক্রন্দন ও পাপ পরিত্যাগের সিদ্ধান্তসহ যার অধিকার নষ্ট করা হয়েছে তার নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করতে না পারলে তাদের অংশ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন।

সকল হারাম উপার্জনের মূল কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী, সমাজ বা রাষ্ট্রের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করা। হারাম উপার্জন থেকে তাওবার জন্য **প্রথমে** গভীরভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। **দ্বিতীয়,** সকল প্রকার অবৈধ উপাজন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। **তৃতীয়,** যাদের নিকট থেকে অবৈধভাবে সম্পদ গ্রহণ করা হয়েছে তাদেরকে, বা তাদের উত্তরাধিকারীগণকে তা ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা নিতে হবে। – এ তৃতীয় শর্তটিই সবচেয়ে কঠিন। এতে অক্ষম হলে অবৈধভাবে উপার্জিত সকল অর্থ ও সম্পদ যাদের সম্পদ তাদের নামে বিলিয়ে দিতে হবে, বেশি করে তাদের জন্য দু'আ করতে হবে, বেশি করে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হবে, যেন তাদের এ হক আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। সর্বোপরি খুব বেশি করে সাওয়াবের কাজ করতে হবে, যেন পাওনাদারদের দেওয়ার পরেও নিজের কিছু থাকে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর দরবারে নিজের অসহায়ত্ব, আকুতি ও বেদনা পেশ করে সদা সর্বদা তাওবা করতে হবে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেছেন, এসব কিছুর পরও তার আখেরাতের নিরাপত্তার বিষয়ে কিছুই বলা যাবে না।

মুহতারাম পাঠক, অবৈধ উপার্জনকারীর সকল কর্ম, সকল প্রার্থনা অর্থহীন হওয়ার পাশাপাশি তার অবৈধ উপার্জনের জন্য আখেরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এক হাদীসে আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো মুসলিমের কোনো সম্পদ আত্মসাৎ করবে তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম নিশ্চিত করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করা হবে।" এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : হে আল্লাহর রাসূল, যদি সামান্য কোনো জিনিস অবৈধভাবে গ্রহণ করে? তিনি উত্তরে বলেন : যদি 'আরাক' গাছের একটুকরা খণ্ডিত ডালও কেউ অবৈধভাবে গ্রহণ করে তাহলে তারও এ শাস্তি।"[১]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যদি কেউ কাউকে জুলুম করে থাক বা ক্ষতি করে থাক তাহলে জীবদ্দশায় তার নিকট থেকে ক্ষমা ও মুক্তি নেবে। কারণ আখেরাতে টাকাপয়সা থাকবে না, তখন অন্যায়কারীর নেক আমলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত কে প্রদান করা হবে। যখন নেক আমল থাকবে না তখন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পাপগুলো অন্যায়কারীর কাঁধে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে।"[২]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তোমরা কি জান কপর্দকহীন অসহায় দরিদ্র কে?" আমরা বললাম: "আমাদের মধ্যে যার কোনো অর্থ-সম্পদ নেই সেই কপর্দকহীন দরিদ্র।" তিনি বললেন: "সত্যিকারের কপর্দকহীন দরিদ্র আমার উম্মাতের সে ব্যক্তি যে, কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম, যাকাত, ইত্যাদি নেককর্ম নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারো সম্পদ বা অর্থ অবৈধভাবে গ্রহণ করেছে, কাউকে আঘাত করেছে, কারো রক্তপাত করেছে। তখন তার সকল নেককর্ম এদেরকে দেওয়া হবে। যদি হক আদায়ের পূর্বেই নেককর্ম শেষ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিদের পাপ তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৩] আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

১. ১৫. ৩. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ

দু'আ কবুলের আরেকটি পূর্বশর্ত সাধ্যমত সমাজের মানুষদেরকে সৎকাজে আদেশ করা ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোনো মুসলিম সমাজের মানুষ এ ইবাদত পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ সে সমাজের খারাপ মানুষদেরকে সমাজের কর্ণধার বানিয়ে দেবেন এবং ভাল ও নেককার মানুষদের দু'আও কবুল করবেন না। একটি হাদীসে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেছেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

"যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই ভালকাজে মানুষদেরকে নির্দেশ প্রদান করবে এবং অবশ্যই অন্যায় থেকে মানুষদেরকে নিষেধ করবে। যদি তা না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি প্রেরণ করবেন। এরপর

তোমরা তাঁর নিকট প্রার্থনা করলেও তিনি তা কবুল করবেন না।" হাদীসটি হাসান।[১]

এ অর্থে আয়েশা (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২]

১. ১৫. ৪. দু'আর কতিপয় মাসনূন নিয়ম ও আদব

১. ১৫. ৪. ১. সুন্নাতের অনুসরণ

সুন্নাতের গুরুত্ব ও বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে। আমরা দেখেছি যে, সুন্নাত অনুসারে সামান্য ইবাদত বিদ'আত মিশ্রিত অনেক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। সুন্নাতের বাইরে বা সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না, ইবাদতকারী যত ইখলাস ও আবেগসহ তা পালন করুন না কেন। যিক্‌র, দু'আ ইত্যাদিও এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর সুন্নাতের অনুসরণ দুআ কবুল হওয়ার বিশেষ কারণ। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَسْتَحِي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مُسَدَّداً لَزُوماً لِلسُّنَّةِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلا يُعْطِيه

"কোনো বয়স্ক মুসলিম যদি সৎকর্মশীল এবং সুন্নাতের কঠোর অনুসারী হন তাহলে তিনি কোনো কিছু আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহ তাঁর প্রার্থিত বস্তু না দিতে লজ্জা পান।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[৩]

১. ১৫. ৪. ২. সর্বদা দু'আ করা

মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ দিক আনন্দের সময়ে আল্লাহকে ভুলে থাকা কিন্তু বিপদে পড়লে বেশি বেশি দু'আ করা। নিঃসন্দেহে এ আচরণ মহান প্রতিপালকের প্রকৃত দাসত্বের অনুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ স্বভাবের নিন্দা করা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ

"যখন আমি মানুষকে নিয়ামত প্রদান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন কোনো অমঙ্গল বা কষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে লম্বা চওড়া দু'আ করে।"[৪]

মুমিনের উচিত সকল অবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। নিয়ামতের মধ্যে থাকলে তার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করা ও সকল অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। কোনো অসুবিধা থাকলে তার কাছে আশ্রয় ও মুক্তি চাওয়া। এ মুমিনের চরিত্র। মুমিনের অন্তর এভাবে শান্তি পায়। আর এরূপ অন্তরের দু'আই আল্লাহ কবুল করেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرْ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ

"যে ব্যক্তি চায় যে কঠিন বিপদ ও যন্ত্রণা-দুর্দশার সময় আল্লাহ তার প্রার্থনায় সাড়া দিবেন, সে যেন সুখশান্তির ও সচ্ছলতার সময় বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দু'আ করে।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

১. ১৫. ৪. ৩. বেশি করে চাওয়া

দুনিয়া ও আখেরাতের সবকিছুই আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং বেশি করে চাইতে হবে। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ

"তোমাদের কেউ যখন কামনা বা প্রার্থনা করবে তখন সে যেন বেশি করে চায়; কারণ সে তো তার মালিকের কাছে চাচ্ছে (কাজেই, কম চাইবে কেন, তিনি তো অপারগ নন কৃপণও নন)।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৬]

১. ১৫. ৪. ৪. শুধুই মঙ্গল কামনা

অনেক সময় আমরা আবেগ, বিরক্তি, রাগ, কষ্ট ইত্যাদির কারণে মনে মনে নিজের বা অন্যের ক্ষতিকর কোনো কিছু কামনা করি। বিষয়টি খুবই অন্যায়। অন্তরকে নিয়ন্ত্রিত করুন। সর্বদা কল্যাণময় বিষয় কামনা করুন। কষ্ট বা রাগের কারণে অকল্যাণজনক কিছু কামনা না করে এমন কল্যাণময় কিছু কামনা করুন যা কষ্ট, বেদনা বা রাগের কারণ চিরতরে দূরী করবে।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّاهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أُمْنِيَّتِهِ

"যখন তোমাদের কেউ কামনা বা প্রার্থনা করে তখন সে যেন কি চাচ্ছে তা ভাল করে চিন্তা করে দেখে; কারণ তার কোন্ কামনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না। (এমন কিছু যেন কেউ কামনা বা প্রার্থনা না করে যার জন্য পরে আফসোস

করতে হয়) ।" হাদীসটি সহীহ ।[১]

অন্য হাদীসে উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

"তোমরা নিজেদের উপর কখনো ভাল ছাড়া খারাপ দুআ করবে না; কারণ ফিরিশতাগণ তোমাদের দু'আর সাথে 'আমীন' বলেন ।"[২]

আরেক হাদীসে জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدعُوا عَلَى أَوْلادِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَموَالِكُمْ لا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

"তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের মালসম্পদের অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদদু'আ করবে না । কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সে সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ্ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন । এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন ।"[৩]

১. ১৫. ৪. ৫. ফলাফলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া

দু'আর ফল লাভে ব্যস্ত হওয়া মানবীয় প্রকৃতির একটি ক্ষতিকারক দিক । বিশেষত বিপদে, সমস্যায় বা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে আমরা যখন দু'আ করি তখন তৎক্ষণাৎ ফল আশা করি । দুচার দিন দু'আ করে ফল না পেলে আমরা হতাশ হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দি । এ হতাশা ও ব্যস্ততা ক্ষতি ও গোনাহের কারণ । কখনোই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না । আমাদের বুঝতে হবে যে, দু'আ করা একটি ইবাদত ও অপরিমেয় সাওয়াবের কাজ । আমি যত দু'আ করব ততই লাভবান হব । আমার সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর সাথে আমার একান্ত রহমতের সম্পর্ক তৈরি হবে । সর্বোপরি আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করবেনই । তবে তিনিই ভাল জানেন কিভাবে ফল দিলে আমার বেশি লাভ হবে ।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ

"বান্দা যতক্ষণ পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কোনো কিছু প্রার্থনা না করে ততক্ষণ তার দু'আ কবুল করা হয়, যদি না সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ।" বলা হলো : "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ব্যস্ততা কিরূপ?" তিনি বলেন : "প্রার্থনাকারী বলতে থাকে – দু'আ তো করলাম, দু'আ তো করলাম ; মনে হয় আমার দু'আ কবুল হলো না । এভাবে সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং তখন দু'আ করা ছেড়ে দেয় ।"[৪]

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قَالُوا وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي

"বান্দা যতক্ষণ না ব্যস্ত ও অস্থির হয়ে পড়ে ততক্ষণ সে কল্যাণের মধ্যে থাকে ।" সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: ব্যস্ত হওয়া কিরূপ? তিনি বলেন: সে বলে – আমি তো দু'আ করলাম কিন্তু দু'আ কবুল হলো না ।" হাদীসটি হাসান ।[৫]

১. ১৫. ৪. ৬. মনোযোগ ও কবুলের দৃঢ় আশা

আমরা ইতপূর্বে দেখেছি যে, বান্দা যেভাবে তার প্রভুর প্রতি ধারণা পোষণ করবে, তাঁকে ঠিক সেভাবেই পাবে । কাজেই প্রত্যেক মুমিনের উপর দায়িত্ব, আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও ভালবাসার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখা । আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং তিনি আমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন । এ দৃঢ় প্রত্যয় মুমিনের অন্যতম সম্বল ও মহোত্তম সম্পদ ।

প্রার্থনার ক্ষেত্রেও এ প্রত্যয় রাখতে হবে । অন্তরের গভীর থেকে মনের আকুতি ও সমর্পণ মিশিয়ে নিজের সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হবে । সাথে সাথে সুদৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, আল্লাহ অবশ্যই আমার প্রার্থনা শুনবেন ।

ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَيُّهَا النَّاسُ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ

"হে মানুষেরা, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে চাইবে; কারণ কোনো বান্দা অমনোযোগী অন্তরে দু'আ করলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেন না ।" হাদীসটি হাসান ।[৬]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاهٍ

"তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করার সময় দৃঢ়ভাবে (একীন) বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ নিশ্চয় কবুল করবেন। আর জেনে রাখ, আল্লাহ কোনো অমনোযোগী বা অন্য বাজে চিন্তায় রত মনের প্রার্থনা কবুল করেন না।"[১]

১. ১৫. ৪. ৭. নিজের জন্য নিজে দু'আ করা

অনেকে নিজের জন্য নিজে আল্লাহর দরবারে দু'আ চাওয়ার চেয়ে অন্য কোনো বুজুর্গের কাছে দু'আ চাওয়াকেই বেশি উপকারী বলে মনে করেন। পিতামাতা, উস্তাদ, আলিম বা নেককার কোনো জীবিত মানুষের কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয। তবে নিজের দু'আ নিজে করাই সর্বোত্তম। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা গোনাহগার, আমাদের দু'আ কি আল্লাহ শুনবেন? আসলে গোনাহগারের দু'আই তো তিনি শুনেন। আমার মনের বেদনা, আকুতি আমি নিজে আমার প্রেমময় মালিকের নিকট যেভাবে জানাতে পারব সেভাবে কি অন্য কেউ তা পারবেন। এছাড়া এ দু'আ আমার জন্য সাওয়াব বয়ে আনবে এবং আমাকে আল্লাহর প্রেম ও করুণার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আয়েশা (রা) বলেন: আমি প্রশ্ন করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, সর্বোত্তম দু'আ কি?" তিনি উত্তরে বলেন :

دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ

"মানুষের নিজের জন্য নিজের দু'আ।"[২]

১. ১৫. ৪. ৮. অন্যের জন্য দু'আর শুরুতে নিজের জন্য দু'আ

মুমিন সর্বদা নিজের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। অন্য কারো জন্য দু'আ করলে তখন সে সুযোগে নিজের জন্য দু'আ করা উচিত। যেমন, কারো রোগমুক্তির জন্য দু'আ করতে হলে বলা উচিত : 'আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করুন এবং তাঁকেও সুস্থতা দান করুন।' অথবা, কেউ বললেন : 'আমরা জন্য দু'আ করুন।' তখন বলা উচিত : 'আল্লাহ আমার কল্যাণ করুন ও আপনার কল্যাণ করুন।' **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত কারো জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা।** আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا بَدَأَ بِنَفْسِهِ

"নবী ﷺ যখন দু'আ করতেন তখন নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন।"[৩]

কোনো নবীর কথা উল্লেখ করলে তিনি প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করে এরপর সেই নবীর জন্য দু'আ করতেন। বলতেন :

رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا.. رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى

"আমাদের উপর আল্লাহর রহমত এবং আমাদের অমুক ভাইয়ের উপর।" যেমন, বলতেন: "আমাদের উপর আল্লাহর রহমত এবং মূসার উপর।"[৪]

১. ১৫. ৪. ৯. অনুপস্থিতদের জন্য দু'আ করা

প্রত্যেক মুমিনের উচিত, আল্লাহর কাছে দুআ করার সময় শুধু নিজের জন্য দু'আ না করে অন্যান্য মুসলিম ভাইবোনের জন্যও দু'আ করা। বিশেষ করে যাদেরকে তিনি আল্লাহর জন্য মহব্বত করেন, যারা কোনো সমস্যা বা বিপদে আছে বলে তিনি জানেন বা যারা তার কাছে দু'আ চেয়েছেন। সকল বিশ্বের নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য দু'আ করা প্রয়োজন। কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে উক্ত দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন এবং প্রার্থনাকারীকেও উক্ত নিয়ামত দান করবেন বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।

তাবেয়ী সাফওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে (আমার শ্বশুর) আবু দারদার (রা) বাসায় দেখা করতে গেলাম। তিনি বাসায় ছিলেন না। (আমার শাশুড়ি) উম্মু দারদা আমাকে বললেন: তুমি কি এ বছর হজ্ব করতে যাচ্ছ? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: তাহলে আমাদের জন্য দু'আ করবে। একথা বলে তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

"কোনো মুসলিম যখন তার কোনো অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। তার মাথার কাছে একজন ফিরিশতা নিয়োজিত থাকেন। যখনই সে মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য কোনো কল্যাণ বা মঙ্গল চায়, তখনই ফিরিশতা বলেন: আমীন, এবং আপনার জন্যও অনুরূপ (আল্লাহ আপনাকেও প্রার্থিত বিষয়ের অনুরূপ দান করুন)।"[৫]

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

"যখন কোনো মানুষ যখন তার কোনো অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করে, তখন ফিরিশতাগণ বলেন: আমীন, এবং আপনার

জন্যও অনরূপ।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্যাতিত মুসলমিদের জন্য মাঝে মাঝে ফজর, মাগরিব বা অন্য সালাতের শেষ রাকাতের রুকুর পরে দু'আ করতেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন :

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ', 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলে নাম উল্লেখ করে করে অনেকের জন্য দু'আ করতেন। তিনি বলতেন : আল্লাহ, আপনি ওলীদ ইবনুল ওলীদ, সালামাহ ইবনু হিশাম, আইয়াশ ইবনু আবী রাবীআহ এবং দুর্বল মুমিনদেরকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ আপনি মুদার গোত্রকে কঠিনভাবে পাকড়াও করুন এবং ইউসূফ (আ)-এর দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষের মধ্যে নিপতিত করুন।"[২]

বুখারী-মুসলিমের এ বর্ণনার বিপরীতে অন্য বর্ণনা নিম্নরূপ :

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَفَعَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ خَلِّصْ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী বসা অবস্থায় মাথা উঠিয়ে বলেন: আল্লাহ সালামাহ ইবনু হিশাম, আইয়াশ ইবনু আবী রাবিয়াহ, ওলীদ ইবনু ওলীদ ও দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন, যারা থেকে বেরিয়ে চলে আসার কোনো পথ পাচ্ছে না।" এ বর্ণনার বিষয়ে হাইসামী বলেন: "রাবী 'ইবনু জাদআন' বিতর্কিত। অন্যান্য রাবী নির্ভরযোগ্য।"[৩]

১. ১৫. ৪. ১০. আল্লাহর নাম ও ইসম আ'যমের ওসীলায় দু'আ

মুমিনের উচিত যে কোনো দু'আর আগে বেশি বেশি করে আল্লাহর প্রশংসা ও হামদ-সানা করা, মহান আল্লাহর পবিত্র নামসমূহ ধরে তাঁকে ডেকে এবং তাঁর পবিত্র নাম ও গুণাবলির ওসীলা দিয়ে দু'আ করা। এ বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দু'আর আগে এভাবে হামদ সানা ও আল্লাহর মহান নামসমূহ ধরে দু'আ করলে একদিকে যেমন মনে আল্লাহর প্রতি আবেগ, ভালবাসা আসে, তেমনি দু'আতে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। এভাবে দু'আ করলে দু'আ কবুল হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلِلّٰهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এবং আল্লাহর আছে সুন্দরতম নামসমূহ ; কাজেই তোমরা তাঁকে সে সকল নামে ডাকবে। যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই তাদেরকে প্রদান করা হবে।"[৪]

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"আল্লাহর ৯৯টি নাম আছে, ১০০-র একটি কম, যে এ নামগুলোর হিসাব রাখবে (মুখস্থ রাখবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৫]

এ হাদীসে নামগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়নি। ৯৯ টি নাম সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন।[৬] কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস উক্ত বিবরণকে যয়ীফ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী নিজেই হাদীসটি সংকলন করে তার সনদের দুর্বলতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন, ৯৯ টি নামের তালিকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত নয়। পরবর্তী রাবী এগুলো কুরআনের আলোকে বিভিন্ন আলিমের মুখ থেকে সংকলিত করে হাদীসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। কুরআনে উল্লেখিত অনেক নামই এ তালিকায় নেই। কুরআনে মহান আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ডাকা হয়েছে 'রাব্ব' নামে। এ নামটিও এ তালিকায় নেই।[৭] কেউ কেউ তিরমিযী সংকলিত তালিকাটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৯৯টি নাম হিসাব রাখতে নির্দেশনা দিলেন কিন্তু নামগুলির নির্ধারিত তালিকা দিলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আলিমগণ বলেন যে, কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আংশিক গোপন রাখা হয়, মুমিনের কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য। যেমন, লাইলাতুল কদর, জুম'আর দিনের দু'আ কবুলের সময়, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে নামের নির্ধারিত তালিকা না বলে আল্লাহর নাম সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন বান্দা আগ্রহের সাথে কুরআনে আল্লাহর যত নাম আছে সবই পাঠ করে, সংরক্ষণ করে এবং সেসকল নামে আল্লাহকে

ডাকতে থাকে ও সেগুলির ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করে।[১]

যিক্‌র নং ১৯: আল্লাহর নামের ওসীলার দুআ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِي، وَنُوْرَ بَصَرِيْ (وَنُورَ صَدْرِي)، وَجَلاَءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আবদুকা, ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়াবনু আমাতিকা, না-সিয়াতি বিইয়াদিকা, মা-দিন ফিইয়্যা হুকমুকা, 'আদলুন ফিইয়্যা 'কাদাউকা, আসআলুকা বিকুল্লি ইসমিন হুআ লাকা, সাম্মাইতা বিহী নাফসাকা, আউ আনযালতাহু ফী কিতা-বিকা, আউ 'আল্লামতাহু আহাদাম মিন খালকিকা, আউ ইসতা-সারতা বিহী ফী 'ইলমিল 'গাইবি 'ইনদাকা আন তাজ'আলাল কুরআ-না রাবী'আ কালবী, ওয়া নূরা বাসারী [অন্যান্য বর্ণনায়: নূরা বাসারীর পরিবর্তে: নূরা সাদরী], ওয়া জালা-আ হুযনী, ওয়া যাহা-বা হাম্মী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দা, আপনার (একজন) বান্দার পুত্র, (একজন) বান্দীর পুত্র। আমার কপাল আপনার হাতে। আমার বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কার্যকর। আমার বিষয়ে আপনার বিধান ন্যায়ানুগ। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সকল নাম ধরে বা নামের ওসীলা দিয়ে, যে নামে আপনি নিজেকে ভূষিত করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন, অথবা যে নাম আপনি আপনার কোনো সৃষ্টিকে শিখিয়েছেন, অথবা যে নাম আপনি গাইবী জ্ঞানে আপনার একান্ত নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন (সকল নামের ওসীলায় আমি আপনার কাছে চাচ্ছি যে,) আপনি কুরআন কারীমকে আমার অন্তরের বসন্ত, চোখের আলো (অন্যান্য বর্ণনায়: হৃদয়ের আলো), বেদনার অপসারণ ও দুশ্চিন্তার অপসারণ বানিয়ে দিন। (কুরআনের ওসীলায় আমাকে এগুলো দান করুন)।"

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ ، أَوْ حُزْنٌ ... إِلاَّ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنِهِ فَرَحًا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَلَّمَ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ، قَالَ : أَجَلْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ

"যে কোনো ব্যক্তি যদি কখনো দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠাগ্রস্ত অবস্থায় বা দুঃখ বেদনার মধ্যে নিপতিত হয়ে উপরের বাক্যগুলি বলে দু'আ করে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করবেনই এবং তার বেদনাকে আনন্দে রূপান্তরিত করবেনই।" উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন : তাহলে আমাদের উচিত এ বাক্যগুলো শিক্ষা করা। তিনি বললেন : "হাঁ, অবশ্যই, যে এগুলো শুনবে তার উচিত এগুলো শিক্ষা করা।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[২]

বি. দ্র. মহিলারা এ দুআ পাঠ করলে দুআর শুরুতে বলবেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَمَتُكَ وبِنْتُ عَبْدِكَ وبِنْتُ أَمَتِك

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আমাতুকা, ওয়া বিনতু আবদিকা ওয়া বিনতু আমাতিকা ...", অর্থাৎ: হে আল্লাহ আমি আপনার বান্দী, আপনার (একজন) বান্দার কন্যা, আপনার এক বান্দীর কন্যা ....।

বিশেষ করে আল্লাহর 'ইসমে আ'যম' বা শ্রেষ্ঠতম নাম ধরে দু'আ করতে হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ' ইসমে আ'যম '-এর ওসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ করলে আল্লাহ দু'আ কবুল করবেন। কিন্তু 'ইসমে আ'যম' কী সে বিষয়ে একাধিক সহীহ ও যয়ীফ রেওয়ায়েত রয়েছে। এখানে কয়েকটি সহীহ হাদীস এ বিষয়ে উল্লেখ করছি :

যিক্‌র নং ২০ : মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম-১

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اَللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اْلأَحَدُ اَلصَّمَدُ اَلَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলূকা বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আনতাললা-হু, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতাল আ'হাদুস সামাদুল লাযী লাম ইয়ালিদ, ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুআন আ'হাদ।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনিই একক, অমুখাপেক্ষী, যিনি জন্মদান করেননি ও জন্মগ্রহণ করেননি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

বুরাইদাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেন যে, এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় দু'আয় উপরের কথাগুলো বলছে। তখন তিনি

বলেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, নিশ্চয় এ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমু আ'যম ধরে প্রার্থনা করেছে, যে নাম ধরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম ধরে চাইলে তিনি প্রদান করেন।" হাদীসটি সহীহ।[১]

যিক্‌র নং ২১: মহান আল্লাহর ইসমু আ'যম-২

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ (يَا) بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ،

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদা, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, [আল-মান্নানু], [ইয়া-] বাদী'আস সামাওয়া-তি ওয়াল আরদি, ইয়া- যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম, ইয়া- হাইউ ইয়া- কাইউম।

অর্থ: "হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি (এই বলে) যে, সকল প্রশংসা আপনার, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, হে মহাদাতা, হে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক, হে মহত্ত্ব ও সম্মানের মালিক, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বকর্তৃত্বময় অভিভাবক।"

আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বৃত্তাকারে বসে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি সালাত আদায় করছিল। সে সালাতের তাশাহহুদের পরে দু'আর মধ্যে উপরের কথাগুলো বলল। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لَقَدْ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"নিশ্চয় সে আল্লাহর কাছে তাঁর ইসমে আ'যম ধরে দু'আ করেছে, যে নামে ডাকলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নামে চাইলে তিনি প্রদান করেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২]

যিক্‌র নং ২২ : ইসমু আ'যম-৩, দু'আ ইউনূস

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা সুব'হা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যা-লিমীন

অর্থ: আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয় আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সা'দ ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইউনূস (আ) যে কথা বলে দু'আ করেছিলেন সেটি আল্লাহর ইসমু আ'যাম, যা দিয়ে ডাকলে আল্লাহ সাড়া দেন এবং যদ্দ্বারা চাইলে আল্লাহ প্রদান করেন। হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৩] তবে অন্য হাদীসে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ... الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ

"যুন্নুন (ইউনূস আ) মাছের পেটে যে দু'আ করেছিলেন: (লা ইলাহা ইল্লা আনতা ... যালিমীন)- এ দু'আ দ্বারা যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে দু'আ করবে, আল্লাহ অবশ্যই তার দু'আ কবুল করবেন।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

আল্লাহর নামের ওসীলা দিয়ে দু'আ চাওয়া বিষয়ে অগণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মুমিন তাঁর নেক কর্ম ইত্যাদির ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাইতে পারে বলে ২/১ টি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। যেমন,– "হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমি অমুক কর্মটি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, সে ওসীলায় আমার প্রার্থনা কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমি গোনাহগার, আমার কোনো উল্লেখযোগ্য নেক আমল নেই যে, তার ওসীলা দিয়ে আমি আপনার পবিত্র দরবারে দু'আ চাইব। শুধুমাত্র আপনার হাবীব নবীয়ে মুসতাফা ﷺ-এর সামান্য মহব্বত হৃদয়ে ধারণ করেছি, এ মহব্বতটুকুর ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমার কিছুই নেই, শুধুমাত্র আপনার নবীয়ে আকরাম ﷺ-এর সুন্নাতের মহব্বতটুকু হৃদয়ে আছে, সেই ওসীলায় আমাকে ক্ষমা করুন, আমার দু'আ কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমি কিছুই আমল করতে পারিনি, তবে আপনার পথে অগ্রসর ও আমলকারী নেককার বান্দাদেরকে আপনারই ওয়াস্তে মহব্বত করি, তাদের পথে চলতে চাই, আপনি সেই ওসীলায় আমার দু'আ কবুল করুন ...।" ইত্যাদি।

১. ১৫. ৪. ১১. দু'আর শুরুতে ও শেষে দরুদ পাঠ

দু'আ কবুলের অন্যতম ওসীলা দু'আর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা। আমরা এ বিষয়ে কিছু পরে আলোচনা

করব; ইন্‌শা আল্লাহ ।

১. ১৫. ৪. ১২. 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলা
যিক্‌র নং ২৩

يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام

উচ্চারণ: ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম ।

অর্থ: হে মর্যাদা ও উদারতার অধিকারী

আল্লাহর নাম নিয়ে দু'আর ক্ষেত্রে বিশেষ একটি নাম 'যুল জালালি ওয়াল ইকরাম' । দু'আর মধ্যে এ নাম বেশি বেশি বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন । রাবীয়া ইবনু আমের (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

"তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'-কে সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকবে (দু'আয় বেশি বেশি বলবে) ।"[১]

১. ১৫. ৪. ১৩. মুনাজাত শেষে নির্দিষ্ট বাক্য সর্বদা বলা

এ হাদীস থেকে দু'আর মধ্যে বা শেষে 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলার ফযীলত জানতে পারছি । এজন্য অনেকে সর্বদা দু'আ বা মুনাজাতের শেষে 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলেন ।

এ বাক্য দ্বারা মুনাজাত শেষ করা ভাল ও ফযীলতের কাজ । তবে 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... ' ছাড়া অন্য সকল দু'আ ও মুনাজাতের শেষে সর্বদা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম" বাক্যটি বলা উচিত হবে না । কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা এ বাক্য দিয়ে দু'আ শেষ করতেন না । সুন্নাতের নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুকে সর্বদা করণীয়-রীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয় । অনেকে সর্বদা 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' বলে দু'আ শেষ করেন । হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'আল-হামদু লিল্লাহ' সর্বোত্তম দু'আ । এছাড়া কুরআন করীমে জান্নাতের অধিবাসীগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদের শেষ দু'আ 'আল-হামদু লিল্লাহ' । এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে দু'আর মধ্যে ও শেষে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন' – বলা ভাল ও ফযীলতের । তবে সর্বদা বলা উচিত নয় । কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা এভাবে সকল দু'আ বা মুনাজাত এ বাক্য দ্বারা শেষ করেননি ।

আমরা "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা অধিকাংশ সময় করেছেন তাও সবসময় করতে নিষেধ করেছেন ইমাম আবু হানীফাসহ সাহাবী-তাবেয়ী যুগের ইমাম ও ফকীহগণ (রাহ) । কারণ, এতে খেলাফে সুন্নাত হবে এবং মাঝে মাঝে যা করেছেন সে সুন্নাত বাদ দেওয়া হবে । এজন্য আমাদের উচিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসনূন বাক্য, দু'আ ও মুনাজাত ব্যবহার করে দু'আ করা ।

আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রচলিত অভ্যাস দু'আর শেষে কালেমাহ তাইয়্যেবাহ "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলে দু'আ বা মুনাজাত শেষ করা । কালেমাহ তাইয়্যেবাহ আমাদের ঈমানের ভিত্তি । "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু" সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র । তবে দু'আর শেষে এ কালেমাহ পাঠের কোনো ভিত্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণের শিক্ষা বা কর্মের মধ্যে অর্থাৎ সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবার মধ্যে নেই । দু'আ বা মুনাজাতের শেষে বা অন্য কোনো সময়ে এগুলো পাঠ করা কখনই না-জায়েয নয় । কিন্তু সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে রীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয় । কখন কোন্ কালেমা, যিক্‌র ও দু'আ পড়তে হবে তারও সুন্নাত রয়েছে । সাধারণ ফযীলত বিষয়ক হাদীসের উপর নির্ভর করে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা রীতি তৈরি করলে তা সুন্নাত অবহেলা করার মতো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আজীবন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সর্বদা দু'আ ও মুনাজাত করেছেন । তাঁদের দু'আ বা মুনাজাতের সকল খুঁটিনাটি শব্দ, বাক্য, সময়, অবস্থা ইত্যাদি আমরা জানতে পারছি । আমরা দেখছি যে, নিয়মিত তো দূরের কথা, কখনোই তাঁরা 'কালেমাহ তাইয়্যেবা' দিয়ে মুনাজাত শেষ করেননি । এর ফযীলতেও কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি । 'কালেমাহ তাইয়্যেবা'-র ফযীলত তাঁদের চেয়ে বেশি কেউ জানত না । মুনাজাতের গুরুত্বও তাঁদের চেয়ে কেউ বেশি দেননি । তা সত্ত্বেও তাঁরা এভাবে মুনাজাত করেননি । আমাদের উচিত তাঁদের সুন্নাতের মধ্যে থাকা ।

তাবিয়ী আ'মাশ (১৪৮ হি) বলেন, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবরাহীম নাখ'য়ীকে (৯৬হি) জিজ্ঞাসা করা হলো, ইমাম যদি সালাতের সালাম ফেরানোর পরে বলে:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"আল্লাহর সালাত মুহাম্মাদের উপর, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই ।" তবে তার বিধান কি ? তিনি বলেন :

مَا كَانَ مَنْ قَبْلَهُمْ يَصْنَعُ هَكَذَا

"এদের পূর্ববর্তীগণ (নবী ﷺ ও সাহাবীগণ) এভাবে বলতেন না ।"[২]

সুবহানাল্লাহ! মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুটি যিক্‌র – 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' ও সালাত পাঠ । এ দুটি যিক্‌রের ফযীলতের বিষয়ে ইবরাহীম নাখ'য়ী ও সকল তাবেয়ী একমত । কিন্তু সালতের সালামের পরে তা বলতে তাদের আপত্তি । কারণ সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি বা

কাজে তাঁদের আগ্রহ ছিল না। তাঁদের একমাত্র আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ। যেহেতু তাঁরা সালামের পরে এ যিক্র দুটি এভাবে বলতেন না এজন্য তিনি এতে আপত্তি করেছেন।

১. ১৫. ৪. ১৪. দু'আ কবুলের অবস্থাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা

যে সকল অবস্থায় দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন বলে বর্ণিত হয়েছে সে সকল অবস্থায় বেশি বেশি দু'আ করা উচিত। যেমন,– সফর, হজ্ব, সিয়াম, ইফতার ইত্যাদি অবস্থার দু'আ। ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক, মাজলুম, মুসাফির, পিতা-মাতা, প্রমুখের দু'আ কবুল হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

১. ১৫. ৪. ১৫. বারবার চাওয়া বা তিনবার চাওয়া

দু'আর একটি মাসনূন আদব আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইলে অনেকটা নাছোড়বান্দা করুণাপ্রার্থীর মতোই একই সময়ে বারবার চাওয়া, বিশেষত তিনবার চাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন:

وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاَثًا. وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاَثًا

"নবীজী (ﷺ) যখন দু'আ করতেন তখন তিনবার দু'আ করতেন এবং তিনি যখন চাইতেন বা প্রার্থনা করতেন তখন ৩ বার করতেন।"[২]

১. ১৫. ৪. ১৬. দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া

ওযু বা ওযুহীন অবস্থায়, যে কোনো দিকে মুখ করে বা দাঁড়ানো, বসা বা শোয়া অবস্থায় মুমিন যিক্র ও দু'আ করতে পারেন। তবে কিবলার দিকে মুখ করে দোওয়া করা উত্তম, বিশেষত যখন বিশেষভাবে আগ্রহ সহকারে দু'আ করা হয়। হাদীসে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে দু'আর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়েছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বৃষ্টির জন্য দু'আর সময়, যুদ্ধের ময়দানের আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু'আর সময়, আরাফা, মুযাদালিফা ও অন্যান্য স্থানে দু'আর সময়, বিশেষ আবেগ ও বেদনার সময়, কখনো কখনো কোনো কোনো সাহাবীর জন্য দু'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য অবস্থা থেকে ঘুরে বিশেষভাবে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেছেন।[৩]

এছাড়া সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় কিবলামুখী হয়ে বসার জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّداً وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةُ الْقِبْلَةِ

"প্রত্যেক বিষয়ের সাইয়্যেদ বা নেতা আছে। বসার নেতা কিবলামুখী হয়ে বসা।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৪]

এ সকল হাদীসের আলোকে যাকিরের জন্য সম্ভব হলে যিক্র ও দু'আর জন্য কিবলামুখী হওয়া উত্তম। তবে যে কোনো ফযীলতের হাদীস পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কিভাবে তা পালন করেছেন তা লক্ষ্য রাখতে হবে। ফযীলতের হাদীসের উপর ভিত্তি করে নিজেদের মনমত আমল বা রীতি তৈরি করে নিলে বিদআতে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দু'আর অন্যান্য আদব ও কিবলামুখী হয়ে দু'আর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা উত্তম হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা দু'আর সময় কিবলামুখী হতেন না। অনেক সময় যে অবস্থায় রয়েছেন ঐ অবস্থায় দু'আ করতেন। অনেক সময় তিনি ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ করেছেন। এথেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি: **প্রথমত,** যে সকল দু'আর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়ে দু'আ করেছেন, সে সময় কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা সুন্নাত। **দ্বিতীয়ত,** যে সময় ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে ঘুরে দু'আ করেছেন, সে সময়ে ঘুরে দু'আ সুন্নাত। অন্য সময়ে কিবলামুখী হওয়া উত্তম, কিন্তু মুস্তাহাব পর্যায়ের উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলা থেকে ঘুরে বা কিবলার দিকে পিছন ফিরে যিক্র ও দু'আ করতেন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহ) সালাম ফেরানেরা পরে ইমামের কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বা দু'আ করা 'মাকরুহ' বলেছেন।[৫] হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল্লামা সারাখসী লিখেছেন: যদিও কিবলামুখী হয়ে বসা শ্রেষ্ঠতম বসা বা সকল বৈঠকের নেতা, কিন্তু সালাতের সালাম ফেরনোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসা ইমামের জন্য মাকরুহ, কারণ সাহাবী-তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামের জন্য সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বিদ'আত।[৬]

১. ১৫. ৪. ১৭. দু'আর সময় হাত উঠানো

আমরা দেখেছি যে, মুমিন বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে বা যে কোনো অবস্থায় দু'আ করতে পারেন। তবে দু'আর একটি বিশেষ আদব দুই হাত বুক পর্যন্ত বা আরো উপরে ও আরো বেশি এগিয়ে দিয়ে, হাতের তালু উপরের দিকে বা মুখের দিকে রেখে, অসহায় করুণাপ্রার্থীর ন্যায় কাকুতি মিনতির সাথে দু'আ করা। দু'আর সময় হাত উঠানোর বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিছু হাদীস হাত উঠানোর ফযীলত

সম্পর্কিত। অন্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কখনো কখনো দু'আর জন্য হাত উঠাতেন।

ইতোপূর্বে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো বান্দা হাত তুলে দু'আ করলে আল্লাহ সে হাত খালি ফিরিয়ে দিতে চান না। অন্য হাদীসে মালিক ইবনু ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا

"তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন হাতের পেট বা ভিতরের দিক দিয়ে চাইবে, হাতের পিঠ দিয়ে চাইবে না।" হাদীসটি হাসান।[১]

সালমান ফারিসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَهُ شَيْئاً إِلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَى اللهِ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا

"যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য তাদের হাতগুলোকে উঠাবে, তখনই আল্লাহর উপর হক্ক বা নির্ধারিত হয়ে যাবে যে তিনি তারা যা চেয়েছে তা তাদের হাতে প্রদান করবেন।"[২]

এছাড়া কয়েকটি হাদীসে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কোনো কোনো সময়ে দু'আ করতে দুই হাত তুলে দু'আ করতেন।

আয়েশা (রা) বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَدْعُو حَتَّى إِنِّي لأَسْأَمُ لَهُ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর হস্তদ্বয় উঠিয়ে দু'আ করতেন, এমনকি আমি তাঁর (বেশি বেশি) হাত উঠিয়ে দু'আ করাতে ক্লান্ত-বিরক্ত হয়ে পড়তাম।"[৩]

অনুরূপ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বৃষ্টির জন্য দু'আর সময়, আরাফাতের মাঠে দু'আর সময়, যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার সময় ও অন্যান্য কোনো কোনো সময়ে দু'আর জন্য তিনি হাত তুলেছেন।[৪] ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'ইসতিসকা' বা বা 'বৃষ্টি প্রার্থনা' অধ্যায়ে আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে জুমার খুতবার সময় বৃষ্টির জন্য দুআ বিষয়ক একটি হাদীস কয়েকটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসে আনাস (রা) বলেন:

أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ (فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا) فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ، قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا

"মরুভূমির এক বেদুঈন শুক্রবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে। তখন তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি বলে: হে আল্লাহর রাসূল, (অনাবৃষ্টিতে) জীবজন্তুগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার পরিজন ও মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কাজেই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি বৃষ্টি দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর হস্তদ্বয় উঠিয়ে দুআ করলেন এবং মানুষেরাও তাঁর সাথে তাদের হাতগুলো তুলে দুআ করল। আনাস (রা) বলেন, ফলে মসজিদ থেকে বেরোনোর আগেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।"[৫]

এভাবে আমরা দুআর সময় হস্তদ্বয় উঠানোর ফযীলত ও সুন্নাত জানতে পারছি। এক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এ ফযীলত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণই পূর্ণতম আদর্শ। তাঁদের সুন্নাতের আলোকেই আমাদের এ ফযীলত পালন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে দু'আ করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এ ফযীলত পালনের ক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের কর্ম ছিল কখনো কখনো হাত তুলে দু'আ করা এবং সাধারণ ক্ষেত্রে হাত না তুলে শুধুমাত্র মুখে দু'আ করা। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, হাত উঠানো দু'আর আদব এবং একান্ত মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নাত, অর্থাৎ পালন করলে ভাল, না করলে কোনো দোষ নেই। একে বেশি গুরুত্ব দিলে, হাত না উঠালে 'কিছু খারাপ হলো' মনে করলে – তা খেলাফে সুন্নাত হবে।

যেখানে ও যে দু'আয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত উঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত উঠানো সুন্নাত। যেখানে উঠাননি বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত না উঠানো সুন্নাত। চলাফেরা, উঠাবসা, খাওয়াদাওয়া, মসজিদে প্রবেশ, মসজিদ থেকে বের হওয়া, ওযুর পরে, খাওয়ার পরে, আযানের পরে, সালাতের পরে ইত্যাদি দৈনন্দিন মাসনূন দু'আর ক্ষেত্রে হাত না তুলে স্বাভাবিক অবস্থায় মুখে দু'আ করাই সুন্নাত। যে সকল দু'আ মাসনূন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ যে সকল দু'আ বা যে সকল সময়ে দু'আ করেছেন, অথচ তাঁরা হাত উঠিয়েছেন বলে বর্ণিত নেই, সেসকল স্থানে নিয়মিত হাত উঠনোকে রীতি বানিয়ে নেয়া বা হাত উঠানোকে উত্তম মনে করা আমাদেরকে বিদ'আতে নিপতিত

করবে। বাকি সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো ও না উঠানো উভয়ই জায়েয। আবেগ, আগ্রহ ও বিশেষ দু'আর সময় হাত তুলে আকুতির সাথে দু'আ করা উত্তম।

উল্লেখ্য যে, আমরা সর্বদা দুই হাত তুলে প্রার্থনা করাকে মুনাজাত বলে মনে করি। মুখে কোনো দু'আ পাঠ বা মুখে মুখে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করাকে কখনই মুনাজাত বলে মনে করি না। এটি একেবারেই ভিত্তিহীন বরং সত্যের বিপরীত। আমরা উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারি যে, 'মুনাজাত' অর্থ সকল প্রকার যিক্‌র, দু'আ, প্রার্থনা। হাত উঠানো হোক বা না হোক, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে চলতে বা যে কোনো সময় বান্দা যখন আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাঁকে ডাকে, তাঁর কাছে কিছু চায় বা এক কথায় তাঁর সাথে সঙ্গোপনে কথা বলে তখন বান্দা মুনাজাতে রত থাকে। তেমনি হাত উঠানো হোক বা না হোক, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে বা যে কোনো অবস্থায় বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে বা তাঁর কাছে কিছু চায় সে তখন দু'আয় রত থাকে। মুনাজাত ও দু'আ মূলত একই বিষয়। আর হাত উঠানো, কিবলামুখী হওয়া, বসা, ইত্যাদি দু'আ বা মুনাজাতের বিভিন্ন আদব। এগুলোসহ বা এগুলো ব্যতিরেকে বান্দা 'মুনাজাতে' রত থাকবেন।

১. ১৫. ৪. ১৮. দু'আর শেষে মুখমণ্ডল মোছা

দু'আ বা মুনাজাতের সময় হাত উঠানোর বিষয়ে যেরূপ অনেকগুলি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, দু'আ শেষে হাত দু'টি দ্বারা মুখমণ্ডল মোছার বিষয়ে তদ্রূপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে দুই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল সনদে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

إِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ

"দু'আ শেষ হলে তোমরা হাত দু'টি দিয়ে তোমদের মুখ মুছবে।" হাদীসটি আবু দাউদ সংকলিত করে বলেন: "এ হাদীসটি কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সবগুলোই অত্যন্ত দুর্বল ও একেবারেই অচল। এ সনদটিও দুর্বল।"[১]

অন্য হাদীসে উমার ইবনু খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দুআয় হস্তদ্বয় তুলতেন তখন হস্তদ্বয় দ্বারা মুখ না মুছে তা নামাতেন না।"[২]

তৃতীয় হিজরীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুর'আ (মৃ. ২৬৪ হি) বলেন: হাদীসটি মুনকার বা একেবারেই দুর্বল। আমার ভয় হয় হাদীসটি ভিত্তিহীন বা বানোয়াট। একারণে কোনো কোনো আলিম দু'আর পরে হাত দু'টি দিয়ে মুখ মোছাকে বিদ'আত বলেছেন। কারণ এ বিষয়ে একটিও সহীহ, হাসান বা অল্প দুর্বল কোনো হাদীস নেই। এছাড়া দু'আর সময় হাত উঠানো সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল, কিন্তু দু'আ শেষে হাত দিয়ে মুখ মোছার কোনো প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না।[৩]

অপরদিকে ইবনু হাজার আসকালানী (৮৫২ হি) বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল হলেও অনেকগুলো সূত্রে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে মূল বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য বা হাসান বলা উচিত।[৪] সুনানে তিরমিযীর কোনো কেনো পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় যে ইমাম তিরিমিযী হাদীসটি হাসান বা সহীহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম নববী (৬৭৬ হি) বলেন যে, সুনানে তিরমিযীর সকল নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত কপি ও পাণ্ডুলিপিতে ইমাম তিরমিযীর মতামত হিসেবে উল্লেখ আছে যে, হাদীসটি গরীব। ইমাম নববীও এ বিষয়ক সকল হাদীস যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম বাইহাকী (৫৬৮ হি) বলেন: দু'আ শেষে দু হাত দিয়ে মুখ মোছার বিষয়ে হাদীস যয়ীফ, তবে কেউ কেউ সে হাদীসের উপর আমল করে থাকে।"[৬]

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সান'আনী (২১১ হি) তার উস্তাদ ইমাম মা'মার ইবনু রাশিদ ১৫৪ হি) থেকে ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (১২৫ হি) থেকে বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন: কখনো কখনো আমার উস্তাদ মা'মার এভাবে দু'আর শেষে মুখ মুছতেন এবং আমিও কখনো কখনো তা করি।[৭] এ থেকে বুঝা যায় যে তাবিয়ীগণের যুগে কেউ কেউ দু'আ শেষে এভাবে মুখ মুছতেন।

এভাবে আমরা দেখি যে, দু'আর সময় হাত উঠানো যেরূপ প্রমাণিত সুন্নাত, দু'আ শেষে হাত দুটি দিয়ে মুখমণ্ডল মুছা অনুরূপ প্রমাণিত বিষয় নয়। এ বিষয়ে দু'একটি দুর্বল হাদীস আছে, যার সম্মিলিত রূপ থেকে কোনো কোনো আলিমের মতে এভাবে মুখ মোছা জায়েয বা মুস্তাহাব। আল্লাহই ভাল জানেন।

১. ১৫. ৪. ১৯. দু'আর সময় শাহাদত আঙ্গুলির ইশারা

দু'আর আরেকটি মাসনূন পদ্ধতি দু'আর সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুলি উঠিয়ে কিবলার দিকে ইশারা করা। সালাতের মধ্যে ও সালাতের বাইরে দু'আর সময় এভাবে ইশারা করার বিষয়ে কতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَالابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ

جَمِيعًا

"প্রার্থনা করা এই যে, তুমি তোমার দুই হাত তোমার দুই কাঁধ বরাবর বা কাছাকাছি উঠাবে। আর ইস্তিগফার এই যে, তুমি তোমার একটি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে। আর ইবতিহাল বা কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করা এই যে, তুমি তোমার দু হাতই সামনে এগিয়ে দেবে।" হাদীসটি সহীহ।[১]

বিভিন্ন হাদীসে শুধু একটি আঙ্গুল, ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে কিবলার দিকে ইশারা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইশারার সময়, বিশেষত সালাতের মধ্যে দু'আর সময় আঙ্গুলটি সোজা কিবলামুখী করে রাখতেন এবং নিজের দৃষ্টিকে আঙ্গুলের উপরে রাখতেন। তিনি এ সময় আঙ্গুল নাড়াতেন না।[২]

১. ১৫. ৪. ২০. দু'আর সময় দৃষ্টি নত রাখা

দু'আর মধ্যে বিনয়ের একটি দিক দৃষ্টি নত রাখা। বেয়াদবের মতো উপরের দিকে তাকিয়ে দু'আ করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষত সালাতের মধ্যে দু'আর সময় উপরের দিকে নজর করতে হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

"যে সমস্ত মানুষেরা সালাতের মধ্যে দু'আর সময় উপরের দিকে দৃষ্টি দেয় তারা যেন অবশ্যই এ কাজ বন্ধ করে, নাহলে তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করা হবে।"[৩] অন্য বর্ণনায় 'সালাতের মধ্যে' কথাটি নেই, সব দু'আতেই দৃষ্টি ঊর্ধ্বে উঠাতে নিষেধ করা হয়েছে।[৪]

১. ১৫. ৪. ২১. দু'আর সাথে 'আমীন' বলা

"আমীন" অর্থ: "হে আল্লাহ, কবুল করুন"। কেউ দুআ করলে তার দুআর সাথে "আমীন" বলা একটি সুন্নাত রীতি। আমরা সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহার পরে এভাবে আমীন বলি। সূরা ফাতিহা ছাড়াও সালাতের মধ্যে কুনুতে এবং সালাতের বাইরে দুআর সময় শ্রোতাদের আমীন বলা একটি মাসনূন রীতি। হাবীব ইবনু মাসলামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلا أَجَابَهُمُ اللَّهُ

"কিছু মানুষ একত্রিত হলে যদি তাদের কেউ দোয়া করে এবং অন্যরা 'আমীন' বলে তবে আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন।" হাদীসটি দুর্বল।[৫]

১. ১৫. ৫. শুধু আল্লাহর কাছেই চাওয়া

১. ১৫. ৫. ১. লৌকিক ও অলৌকিক প্রার্থনা

প্রার্থনা বা চাওয়ার বিষয়বস্তু দুই প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য-সহযোগিতা যা মানুষ স্বাভাবিকভাবে করতে পারে। এ সকল বিষয় প্রকৃতিগতভাবে একজন মানুষ আরেকজনের নিকট চেয়ে থাকে এবং মানুষ জাগতিকভাবে তা প্রদান করতে পারে। যেমন, কারো কাছে টাকাপয়সা চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, পানিতে পড়ে গেলে উঠানোর জন্য সাহায্য চাওয়া, মাথার বোঝা পড়ে গেলে উঠাতে সাহায্য চাওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি অগণিত। জাতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলেই এ ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করে।

দ্বিতীয় প্রকার প্রার্থনা অলৌকিক বা অপার্থিব। জাগতিক মাধ্যম ও উপকরণ ছাড়া অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি প্রার্থনা করা। এ জাতীয় প্রার্থনা শুধুমাত্র কোনো "ধর্মের অনুসারী" বা "বিশ্বাসী" করেন। "বিশ্বাসী" শুধুমাত্র আল্লাহ, ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করেন, অথবা যার সাথে 'ঈশ্বরের' বিশেষ সম্পর্ক ও যার মধ্যে 'ঐশ্বরিক' ক্ষমতা আছে, তার কাছেই প্রার্থনা করেন। এ প্রকারের প্রার্থনা আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে করার অর্থ - আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করা। কারণ, এতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী (অলৌকি সাহায্য, ক্ষমতা, ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক শক্তি) কল্পনা করা হয়। আর আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুকে কোনো গুণ, ক্ষমতা বা কর্মে আল্লাহর মতো মনে করা বা কারো মধ্যে আল্লাহর গুণাবলী আরোপ করাই শিরক।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, মানুষ, প্রাকৃতিক বিষয়ের মধ্যে কোনো অলৌকিক বা অপার্থিব কল্যাণ বা অকল্যাণের বিশ্বাসই সকল প্রকার শিরকের মূল। এজন্য কুরআন কারীমে মুশরিকদের শিরকের প্রতিবাদ করতে যেয়ে বিভিন্ন স্থানে বারংবার, প্রায় ১৫/১৬ স্থানে, ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনো প্রকার মঙ্গল, অমঙ্গল, কল্যাণ, অকল্যাণ, ক্ষতি বা উপকার করার কোনোরূপ ক্ষমতা নেই বা আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেননি।

বস্তুত, মুশরিকগণের দাবি ছিল যে, আল্লাহ এ সকল সৃষ্টিকে ভালবেসে এদেরকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তাদের কাছে প্রার্থনা করলে তারা আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতাবলে বা আল্লাহর নিকট থেকে প্রার্থনা করে ভক্তদের মনবাঞ্ছনা পূরণ করতে পারেন। তারা বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা বা কারামত ও মু'জিযাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করত। মুশরিকগণ ও খৃস্টানগণ ঈসা মসীহ বা 'যীশু খৃস্টের' মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করতে থাকে। তাদের দাবি ছিল, তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছেন, এতে

প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণের ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে। তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা করত, সাহায্য চাইত এবং তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করত। এছাড়া তাঁর মাতা মরিয়মকেও তারা সেন্ট বা সাধ্বী রমণী হিসেবে ঐশ্বরিক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করত এবং তার কাছে প্রার্থনা করত, তাঁর মূর্তি বা সমাধিতে সাজদা করত এবং তাঁর নামে মানত, উৎসর্গ ইত্যাদি ইবাদত করত।

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এই শির্কের প্রতিবাদ করা হয়েছে। মাসীহ বা তাঁর মাতার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না বা নেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এক স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে: "মরিয়ম-তনয় মসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি! আরো দেখ, তারা কিভাবে সত্য-বিমুখ হয়! বল, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার কোনোই ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার?"[১]

১. ১৫. ৫. ২. লৌকিক প্রার্থনা লোকের কাছে করা যায়

প্রথম প্রকার 'প্রার্থনা' জাগতিকভাবে যে কোনো মানুষের কাছে করা যায়। এগুলি একান্তই জাগতিক বা লৌকিক সাহায্য সহযোগিতা। কেউ এই জাতীয় সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করা উচিত ও দায়িত্ব। মনে করুন আমার গরুটি পালিয়ে যাচ্ছে। আমি সামনে কোনো মানুষের আভাস পেয়ে চিৎকার করে বললাম, ভাই, আমার গরুটি একটু ধরে দেবেন! অথবা আমি পথ চিনতে পারছি না, তাই কোনো মানুষকে দেখে অথবা কোনো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরে মানুষ আছে অনুমান করে চিৎকার করে বলছি, ভাই অমুক স্থানে কোন দিক দিয়ে যাব একটু বলবেন!

এখানে আমি লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি। সে মানুষের মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা ঐশ্বরিক গুণ কল্পনা করছি না। ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিচয়ও আমার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। আমি জানি যে, স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ একটি গরু ধরতে পারে বা উক্ত স্থানের একজন বাসিন্দা স্বাভাবিকভাবে পথটি চিনবে বলে আশা করা যায়। এজন্য আমি তার থেকে এই লৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করছি।

যদি কোথাও এ প্রকারের জাগতিক সমস্যা হয় এবং সেখানে কোনো মানুষজন না থাকে তাহলে উপস্থিত অদৃশ্য ফিরিশতাগণের নিকটও সাহায্য চাওয়া যায়। মুমিন জানেন যে, আল্লাহর অগণিত ফিরিশতাগণ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন। এছাড়া অদৃশ্য সৃষ্টি জীনেরাও বিভিন্ন স্থানে চলাচল করে। উপরের পরিস্থিতিতে যদি কোনো দৃশ্যমান মানুষকে না দেখে তিনি অদৃশ্য ফিরিশতা বা জ্বিনের কাছে লৌকিক সাহায্য চান তাহলে তা জায়েয হবে। কারণ তিনি কোনো নির্দিষ্ট সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরত্ব বা অলৌকিকত্ব কল্পনা করছেন না। তথায় কোন্ ফিরিশতা আছেন বা কোন্ জ্বিন রয়েছেন তাও তিনি জানেন না বা জানা তার কাছে কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তিনি জানেন যে, এখানে কোনো ফিরিশতা বা জ্বিন থাকতে পারেন। আল্লাহর অন্য কোনো বান্দাকে দেখছি না, কাজেই এখানে উপস্থিত আল্লাহর অদৃশ্য বান্দাদের কাছে একটু সাহায্য চেয়ে দেখি কী হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন:

إِنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلاَئِكَةً سِوَى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُوْنَ مَا سَقَطَ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ فَلْيُنَادِ: أَعِيْنُوْا عِبَادَ اللهِ، يَرْحَمُكُمُ اللهُ تَعَالَى

"বান্দার সাথে তার সংরক্ষণে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ ছাড়াও আল্লাহর অনেক ফিরিশতা আছেন যারা সারা বিশ্বে কোথায় কোন গাছের পাতা পড়ছে তাও লিখেন। যদি তোমাদের কেউ কোনো নির্জন প্রান্তরে আটকে পড়ে বা অচল হয়ে পড়ে তাহলে সে ডেকে বলবে: হে আল্লাহর বান্দাগণ তোমরা সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদের রহমত করুন।"[২]

১. ১৫. ৫. ৩. অনুপস্থিতের কাছে লৌকিক প্রার্থনা শিরক

লৌকিক বা জাগতিক সাহায্য প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত কাউকে ডাকা বা অনুপস্থিত কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। যেমন, কারো রিকশা উল্টে গেছে বা গাড়িটি খাঁদে পড়েছে, তখন স্বাভাবিক লৌকিক কর্ম যে, সে কাউকে দেখতে পাক বা না পাক, সে চিৎকার করে সাহায্য চাইবে: কে আছ একটু সাহায্য কর। এখানে সে লৌকিক সাহায্য চাচ্ছে।

কিন্তু যদি সে এ সময়ে সেখানে অনুপস্থিত কোনো জীবিত বা মৃত মানুষকে বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে ডাকতে থাকে তবে সে শিরকে লিপ্ত হবে। কারণ সে মনে করছে, অনুপস্থিত অমুক ব্যক্তি সদা সর্বদা সবত্র বিরাজমান বা সদা সর্বদা সকল স্থানের সবকিছু তার গোচরিভূত। কাজেই, তিনি দূরবর্তী স্থান থেকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন বা আমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন এবং দূর থেকে অলৌকিকভাবে আমার বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার মতো "অলৌকিক" ক্ষমতা তার আছে। এভাবে সে একটি নির্দিষ্ট 'মাখলূকের' মধ্যে অলৌকিকত্ব, ঐশ্বরিক শক্তি বা মহান আল্লাহর গুণাবলী আরোপ করে শিরকে নিপতিত হয়েছে। এছাড়াও সে মহান আল্লাহর ক্ষমতাকে ছোট বলে মনে করেছে।

এ প্রার্থনাকারী বা আহ্বানকারী সে বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে যে ক্ষমতা বা গুণ কল্পনা করেছে তা একান্তভাবেই মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত গুণাবলী। এ প্রার্থনাকারী এ গুণাবলীকে শুধুমাত্র আল্লাহর বলে মনে করে না। সে বিশ্বাস করে যে, এ ক্ষমতার মধ্যে আল্লাহর শরীক আছে। এ ক্ষমতাটি যেমন আল্লাহর আছে, তেমনি অমুক ব্যক্তিরও আছে। তবে সে সম্ভবত তার কল্পনার মানুষটির ক্ষমতাকে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্ষমতার চেয়ে অধিক বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই সে আল্লাহকে না ডেকে তাকে ডেকেছে।

এক্ষেত্রে মুশরিকদের দাবি যে, এসকল বাবা, মা, সান্তা, সেন্ট, ফিরিশতা বা জ্বিনদেরকে আল্লাহই ক্ষমতা প্রদান করেছেন। ক্ষমতা মূলত আল্লাহরই, তিনি এদেরকে কিছু বা সকল ক্ষমতা প্রদান করেছেন। মক্কার কাফিররাও এ দাবি করত বলে কুরআন কারীমে ও হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কঠিনভাবে প্রতিবাদ করা হয়েছে।

মুসলিম-অমুসলিম সকল সমাজেই এজাতীয় অনেক মিথ্যা কাহিনী, কিংবদন্তী বা জনশ্রুতি রয়েছে। "অমুক ব্যক্তি বিপদে পড়ে বাবা অমুক, মা অমুক, সেন্ট বা সান্তা অমুককে ডেকেছিল, অমনি সে তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে।" এগুলোর উপর ভিত্তি করে মানুষ শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়।

১. ১৫. ৫. ৪. লৌকিক-অলৌকিক সকল প্রার্থনা আল্লাহর কাছে

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জাগতিক ও লৌকিক সাহায্য সহযোগিতা আল্লাহর সৃষ্টির কাছে চাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও এ ধরনের বিষয়ও কারো কাছে না চেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে চাওয়ার জন্য উম্মতকে শিক্ষা প্রদান করেছেন উম্মতের রাহবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। জাগতিক ও সৃষ্টিজগতের সাধ্যাধীন বিষয়ে একে অপরের সাহায্য প্রর্থনা জায়েয আর আল্লাহর কাছে চাওয়া ইবাদত ও সাওয়াব। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের সাহায্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া হারাম ও শিরক আর আল্লাহর কাছে চাওয়া ইবাদত ও সাওয়াব।

কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে দু'আর অন্যতম দিক যে, বান্দা তার সকল বিষয় শুধুমাত্র তার প্রভু, প্রতিপালক, পরম করুণাময় আল্লাহর কাছেই চাইবেন। আমরা কুরআন কারীমের আয়াতে দেখেছি আল্লাহ বান্দাগণকে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি তাদের সকল প্রার্থনায় সাড়া দিবেন বলে জানিয়েছেন। যারা তাঁর কাছে দু'আ করবে না ,বা তাঁকে ডাকবে না ,তাদের জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জাগতিক ও ধর্মীয় সকল কাজে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। লবণের দরকার হলেও আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَه شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ، وَحَتَّى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ

"তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও তাঁর কাছেই চাইবে। এমনকি লবণও তাঁর কাছেই চাইবে।" হাইসামী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[১]

আয়েশা (রা) বলেন:

سَلُوا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشِّسْعَ فَإِنَّ اللهَ إِنْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ

"তোমরা সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইবে। এমনকি জুতার ফিতাও আল্লাহর কাছে চাইবে। কারণ আল্লাহ ব্যবস্থা না করলে জুতার ফিতাও মিলবে না।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[২]

যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কিছু না চান, তা যত ক্ষুদ্র জাগতিক বিষয়ই হোক, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জান্নাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করবেন। সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً ، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

"কে আছে, যে দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সে কারো কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করব।" সাওবান বলেন : "আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি।" এরপর সাওবান (রা) কারো কাছে কিছুই চাইতেন না। অনেক সময় উটের পিঠে থাকা অবস্থায় তাঁর লাঠি পড়ে যেত। তিনি কাউকে বলতেন না যে, আমার লাঠিটি উঠিয়ে দিন। বরং তিনি নিজে উটের পিঠ থেকে নেমে নিজের হাতেই লাঠিটি উঠাতেন। হাদীসটি সহীহ।[৩]

আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "তুমি কি আমার কাছে বাই'আত (প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করবে, যদি কর তাহলে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত।" আমি বললাম : "হাঁ এবং আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উপর শর্তারোপ করলেন :

أَنْ لا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَلاَ سَوْطَكَ إِنْ يَسْقُطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ.

"মানুষের কাছে কিছুই চাইতে পারবে না। আমি বললাম : হাঁ। তিনি বললেন : তোমার ছড়িও যদি হাত থেকে পড়ে যায় তাহলে তা কারো কাছে চাইতে পারবে না। নিজে নেমে তা তুলে নেবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

আউফ ইবনু মালিক বলেন, আমরা ৭, ৮ বা ৯ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে বসেছিলাম। আমরা কিছু পূর্বেই বাই'আত গ্রহণ করেছি। তখন তিনি বললেন: তোমরা বাই'আত গ্রহণ করবে না? আমরা বললাম: আমরা তো ইতোমধ্যেই বাই'আত গ্রহণ করেছি।

তিনি ৩ বার একই কথা বললেন। তখন আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাদের মধ্য থেকে একজন বলল: আমরা কিসের উপর বাই'আত গ্রহণ করব? তিনি বললেন:

أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً قَالَ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো শিরক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রাষ্ট্রের আনুগত্য করবে ... এবং মানুষের নিকট কিছুই চাইবে না।" হাদীসের রাবী বলেন : "সে মানুষগুলো তাঁদের ছড়িটি পড়ে গেলেও কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না।"[১]

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাইবে কেন মুমিন ? কেউ তো তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার নূন্যতম ক্ষমতা রাখে না। তিনিই তো সব ক্ষমতার মালিক। আমি কেন অন্যের কাছে চেয়ে নিজেকে হেয় ও আমার মহান দয়ময় প্রভুর প্রতি আমার আস্থাকে কমিয়ে ফেলব?

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন:

يَا غُلامُ، إِنِّي أعلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ اللهَ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ

হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে (তাঁর বিধানাবলীকে) হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্যের প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলো উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে।" হাদীসটি সহীহ।[২]

সাধারণ বিপদ-আপদ, কষ্ট-দুঃখ বা সমস্যার কথা আমরা অনেক সময় অন্য কোনো মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করি বা অন্তত মনকে হাল্কা করি। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের অভ্যাস, কোনো বান্দার কাছে কোনো ব্যথার কথা না বলে তার সকল ব্যথা, বেদনা ও কষ্টের কথা তাঁর মালিকের কাছে পেশ করা। একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন। আর তিনি না করলে তো কারো কিছু করার নেই। শতবার ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তাঁর দরজাই মুমিনের গন্তব্যস্থল। আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ (بِمَوتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِل)

"যদি কোনো ব্যক্তি কষ্ট-অভাবে পতিত হয়ে তার অভাবের কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তাহলে তার অভাব মিটবে না। আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহর নিকট পেশ করে তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা দূরবর্তী রিযক প্রদান করবেন (অন্য সহীহ বর্ণনায়: দ্রুত মৃত্যু বা দ্রুত সচ্ছলতা প্রদান করবেন।)।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

১. ১৫. ৬. দু'আ কবুলের সময় ও স্থান

১. ১৫. ৬. ১. রাত, বিশেষত শেষ রাত

মুমিন সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। তবে হাদীস শরীফে কিছু কিছু সময়কে দু'আ কবুলের জন্য বিশেষ করে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বোত্তম সময় রাত। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাত মুমিনের দু'আ ও একান্ত ইবাদতের সময়। শরীয়তের পরিভাষায় মাগরিবের শুরু থেকে ফজরের ওয়াক্তের শুরু পর্যন্ত রাত। শীতের সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে আমাদের দেশে রাত প্রায় ১২ ঘণ্টা থাকে (সন্ধ্যা ৫.৩০ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত)। অপরদিকে জুন/ জুলাই মাসে রাত প্রায় ৯ ঘণ্টা হয়ে যায় (সন্ধ্যা ৭ টা থেকে ভোর ৩.৪৫ টা পর্যন্ত)। রাতের এই সময়টুকুকে হাদীসের আলোকে আমরা **চারটি** পর্যায়ে ভাগ করতে পারি :

(১). প্রথম তৃতীয়াংশ (প্রথম ৩/৪ ঘণ্টা): এ সময়ের ফযীলতে বিশেষ কোনো উল্লেখ নেই। জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيهِ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ.

"আল্লাহ প্রত্যেক রাতে সর্বনিকট আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন: কোনো প্রার্থনাকারী বা যাচ্ঞাকারী কেউ কি আছে? যদি কেউ কিছু চায় তাহলে আমি তাকে তা প্রদান করব। ক্ষমা চাওয়ার কেউ কি আছে? যে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব। এভাবে প্রভাতের উন্মেষ পর্যন্ত।" হাদীসটি সহীহ।[১]

এ হাদীসে রাত বলতে পুরো রাতই বুঝা যায়। এতে রাতের প্রথম অংশও ফযীলতের মধ্যে এসে যায়। তবে অন্যান্য বিভিন্ন হাদীসে এ ফযীলত রাতের পরবর্তী অংশগুলোর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেছেন, আমি নবীজী ﷺ -কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

"নিশ্চয় রাতের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যে সময় কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে পার্থিব, জাগতিক বা পারলৌকিক যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দিবেন। এভাবে প্রতি রাত্রেই।"[২]

এ সময়ও রাতের প্রথম মুহূর্ত থেকে যে কোনো সময় হতে পারে। তবে অন্যান্য হাদীসের আলোকে এ সময় শেষ রাতে বলে বুঝা যায়।

(২). প্রথম তৃতীয়াংশের পর থেকে পরবর্তী মাঝ রাত এবং পরবর্তী সারা রাত : রাত ৯.৩০/ ১০ টা থেকে ১১.৩০/১২ টা পর্যন্ত, এরপর বাকি রাত। এ সময়ে আল্লাহ দু'আ কবুল করেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) ও আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ هَبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَزَلْ فِيهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، يَقُولُ: أَلاَّ تَائِبٌ، أَلاَ سَائِلٌ يُعْطَى، أَلاَ دَاعٍ يُجَابُ، أَلاَ مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرَ لَهُ، أَلاَ سَقِيمٌ يَسْتَشْفِي فَيُشْفَى.

"আমার উম্মাতের কষ্ট না হলে ইশা'র সালাত রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করতাম। কারণ রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে আল্লাহ সর্বনিকট আসমানে নেমে আসেন। প্রভাতের শুরু পর্যন্ত তিনি এভাবে থাকেন। তিনি বলেন: কেউ কি চাইবে যাকে দেওয়া হবে? কেউ কি ডাকবে যার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে? কোনো পাপী কি আছে যে ক্ষমা চাইবে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে? অসুস্থ কেউ আছে কি? যে রোগমুক্তি চাইবে ফলে তাকে সুস্থতা প্রদান করা হবে।"[৩]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ

"মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাতে, রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসে এবং বলেন : আমিই বাদশাহ, আমিই মালিক। কে আছ আমাকে ডাকবে? ডাকলেই আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে আছ আমার কাছে চাইবে? চাইলেই আমি তাকে প্রদান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? চাইলেই আমি তাকে ক্ষমা করব। এভাবেই বলতে থাকেন প্রভাতের আলোর বিকীরণ হওয়া পর্যন্ত।"[৪]

(৩). মধ্য রাত থেকে (রাত ১১.৩০ টা বা ১২ টা থেকে) রাতের শেষ তৃতীয়াংশের শুরু পর্যন্ত এবং বাকি রাত: উপরের হাদীসের আলোকে রাতের এ অংশ স্বভাবতই দু'আ কবুলের সময়। এ ছাড়া এ অংশ সম্পর্কে বিশেষ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উসমান ইবনু আবীল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى، هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّجُ عَنْهُ، فَلاَ يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلاَّ زَانِيَةً تَبْغِي بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا.

"মধ্য রাতে আসমানের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকেন: 'কোনো প্রার্থনাকারী আছ কি? যদি কেউ প্রার্থনা করে তাহলে তা কবুল করা হবে। কোনো যাচ্ঞাকারী আছ কি? যদি কেউ কিছু চায় তাহলে তাকে তা দেওয়া

হবে। কোনো বিপদগ্রস্ত আছ কি? বিপদ মুক্তি চাইলে তার বিপদ কাটানো হবে।' এ সময়ে যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে প্রার্থনা করুক, আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করবেন। শুধুমাত্র দেহ ব্যবসায়ী ব্যভিচারিণী ও টোল আদায়কারী (নাগরিকদের কষ্ট দিয়ে যে টোল খাজনা ইত্যাদি আদায় করে) বাদে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১]

(৪). রাতের সবচেয়ে মুবারক অংশ (রাত ১ টা বা ২ টা থেকে বাকি রাত): যাকিরের সবচেয়ে বড় সম্পদ, প্রার্থনাকারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ, আল্লাহ প্রেমিকের জীবনের সর্বোত্তম ক্ষণ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। রাত আনুমানিক ১টা বা ২ টা থেকে বাকি রাত। এ সময়ের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"আমাদের মহান মহিমান্বিত প্রভু প্রতি রাতে, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে তখন নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন : কেউ যদি আমাকে ডাকে, তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কেউ যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে তা প্রদান করব। কেউ যদি আমার কাছে ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব।"[২]

আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) প্রশ্ন করা হলো: "কোন দু'আ সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয় ? তিনি উত্তরে বলেন :

جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

"রাত্রের শেষ অংশ ও ফরয সালাতের পরে।" হাদীসটি হাসান।[৩]

আমর ইবনু আম্বাসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فِيْ سُجُودِهِ، وَإِذَا قَامَ يُصَلِّي فِيْ ثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

"বান্দা তার প্রভুর সবচেয়ে নৈকট্য-লাভ করে যখন সে সাজদায় থাকে এবং যখন সে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। অতএব, রাতের সে সময়ে যারা আল্লাহর যিক্‌র করেন, তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, তাহলে তা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

কেউ হয়ত ভাববেন, আমরা দেখছি, কোনো হাদীসে রাতের এক তৃতীয়াংশ এবং কোনো হাদীসে রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে আসেন। এখানে তো বৈপরীত্য দেখা দিল। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টিতে কোনো বৈপরীত্য নেই। আল্লাহর অবতরণ, আগমন এগুলোর পদ্ধতি আমাদের বোধগম্য নয়। তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেভাবে বলেছেন আমরা সেভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তবে আমরা এতটুকু দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারি যে, আল্লাহ এ সময়ে তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষ নৈকট্য প্রদান করেন, যা অন্যান্য নৈকট্য থেকে ভিন্ন ও মর্যাদাময়। আমাদের দায়িত্ব এ মহান সময়ের বরকতময় সুযোগ গ্রহণ করা। মহান রাব্বুল আলামীনের এগিয়ে দেওয়া রহমতের, বরকতের ও কবুলিয়্যতের খাঞ্চাকে অবহেলায় ফিরিয়ে না দেওয়া। বরং পরম আগ্রহে ও গভীর আবেগে এ দান গ্রহণ করা।

আমাদের চেষ্টা করতে হবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ইবাদত ও দু'আ করার চেষ্টা করা। যখন সকলেই ঘুমিয়ে থাকবেন তখন বান্দা তার মনের সকল আবেগ উজাড় করে তার প্রভুকে ডাকবে, তার মনের সকল বেদনা, আকুতি, কষ্ট ও আবেগ সে পেশ করবে তার প্রভুর দরবারে, যিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান মহাকরুণাময় পরম দয়ালু ও দাতা। তিনিই, শুধু তিনিই তো পারেন তাঁর আরজি পূরণ করতে। আনন্দ, বেদনা ও প্রেমের অশ্রু দিয়ে যাকির তার এ সময়ের ইবাদত ও দু'আকে সুষমাময় করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন।

এ সময়ে সম্ভব না হলে অন্তত রাতের একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে, রাত ১০/১১ টার দিকে, ঘুমাতে যাওয়ার আগে অন্তত কিছু সময় দু'আয় কাটানো প্রয়োজন। অযু করে, কয়েক রাকাত নফল সালাতসহ বিতিরের সালাত আদায় করে এই সময়ে কিছু সময় যিক্‌র ও দু'আয় কাটানো খুবই প্রয়োজন।

১. ১৫. ৬. ২. পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পর

আমরা উপরে আবু উমামা (রা) বর্ণিত হাদীসে এর বিবরণ দেখেছি। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের পরে পালন করার জন্য অনেক যিক্‌র ও দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। যা আমরা পরে আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

১. ১৫. ৬. ৩. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়

দু'আ কবুলের অন্যতম সময় আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, আযানের সময় ও ইকামতের সময়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এ সময়ের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন। সুন্নাতের নির্দেশ আযানের সময় মুয়াযযিন যা বলেন তা বলতে হবে (হাইয়া আলা-র সময় লা হাওলা ..)। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সালাত (দরূদ) পাঠ করতে হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা ও মর্যাদা চাইতে হবে। এরপর মুমিন নিজের দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবেন।

আনাস (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الدُّعَاءُ (الدَّعْوَةُ) بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لاَ يُرَدُّ (تُرَدُّ)، فَادْعُوا

"আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ ফেরত দেওয়া হয় না। অতএব, তোমরা এ সময়ে প্রার্থনা করবে।" হাদীসটি সহীহ।[১]

অন্য হাদীসে সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ- أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ- الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ (حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ)، وَعِنْدَ الْبَأْسِ (عِنْدَ الصَّفِّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ) حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا

"দুটি দু'আ কখনো ফেরত দেওয়া হয় না, বা খুব কমই ফেরত দেওয়া হয়: আযানের সময় দু'আ [দ্বিতীয় বর্ণনা: ইকামতের সময় দু'আ] এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের সময় দু'আ, যখন (মুসলিম ও কাফির) উভয়পক্ষ মুখোমুখী হয় এবং একে অপরের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি যুদ্ধে মিশে যায়।" হাদীসটি সহীহ।[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, একব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মুয়াযযিনগণ আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা অর্জন করছেন। তখন তিনি বলেন:

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ

"মুয়াযযিনগণ যা বলে তুমি তা বল (আযানের জবাব দাও)। যখন শেষ করবে, তখন আল্লাহর কাছে চাও; তুমি যা চাইবে তোমাকে তা দেওয়া হবে।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৩]

১. ১৫. ৬. ৪. জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে

উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, এ সময় দু'আ কবুল হয়।

১. ১৫. ৬. ৫. দু'আ কবুলের অন্যান্য সময়

দু'আ কবুলের অন্যান্য বিশেষ সময় : রমযান মাস, ফরয বা নফল সিয়াম অবস্থায়, ইফতারের সময়, যমযমের পানি পান করার সময়, ইত্যাদি।

১. ১৫. ৬. ৬. সালাতের মধ্যে দু'আ

সালাতের মধ্যে, সাজদার মধ্যে ও সালামের পূর্বে দুআ করলে আল্লাহ কবুল করেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বারবার বলা হয়েছে। বিষয়টি মুতাওয়াতির। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে তা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

১. ১৫. ৬. ৭. শুক্রবারের বিশেষ মুহূর্ত

শুক্রবারের দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে যে সময়ে বান্দা আল্লাহর নিকট যা প্রার্থনা করবে তাই আল্লাহ তাকে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"নিশ্চয় শুক্রবারে একটি সময় আছে, যে সময় কোনো মুসলিম দাঁড়িয়ে সালাতরত অবস্থায় আল্লাহর কাছে যে কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা প্রদান করবেন।"[৪]

সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে অধিকাংশ আলিমই বলেছেন যে, শুক্রবারের দিন সূর্যাস্তের পূর্বের মুহূর্ত দু'আ কবুলের সময়। এ সময়ে যদি কোনো মুসলিম মাগরিবের সালাতের প্রস্তুতি নিয়ে সালাতের অপেক্ষায় বসে দু'আয় মশগুল থাকে তবে আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করবেন। কোনো বর্ণনায়: ইমামের খুতবা প্রদান শুরু করা থেকে তাঁর সালাতের সালাম ফেরানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ মুহূর্তটি রয়েছে।[৫]

১. ১৫. ৬. ৮. দু'আ কবুলের স্থান বিষয়ে হাদীসের মর্মবাণী

দু'আ সম্পর্কিত সকল হাদীস পাঠ করলে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মতকে দু'আর আদব, পদ্ধতি, শব্দ ইত্যাদি সব শিক্ষা দিয়েছেন। কখন কী-ভাবে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন তা বিস্তারিত শিক্ষা দিয়েছেন। দু'আ কবুলের সময় সম্পর্কে আমরা অনেক হাদীস দেখতে পাই। কিন্তু দু'আ কবুলের স্থান সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা আমরা পাই না বললেই চলে। 'অমুক সময়ের দুআ আল্লাহ কবুল করেন' বা 'অমুক সময়ে দুআ কর'- মর্মে উপরে আমরা অনেক হাদীস দেখলাম। কিন্তু "অমুক স্থানে গিয়ে দু'আ কর" এরূপ কোনো নির্দেশনা আমরা কোনো হাদীসে পাই না। শুধুমাত্র হজ্ব ও আল্লাহর ঘর কেন্দ্রিক কয়েকটি হাদীসে পাওয়া যায়, যেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই দুর্বল। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, বাইতুল্লাহর দরজার কাছে মুলতাযামে, সাফা ও মারওয়ার উপরে, তাওয়াফের সময়, আরাফাতের মাঠে দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন। এছাড়া দু'আর স্থান নির্দেশ করে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। সম্ভবত এর কারণ ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত বিধান। সকল যুগের সকল স্থানের মানুষই ইচ্ছা করলে সহজেই দু'আর জন্য মুবারক সময়গুলির সুযোগ নিতে পারবেন। কিন্তু দু'আ কবুলের কোনো বিশেষ স্থান থাকলে হয় সেখানে যাওয়া অনেকের জন্য সম্ভব হতো না। এজন্য আল্লাহ তাঁর সকল বান্দার জন্য দু'আ দরজা খুলে দিয়েছেন।

আমাদের দেশের অগণিত মুসলিম আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য অগণিত সহীহ হাদীসে নির্দেশিত সময়ের প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখেন না। কিন্তু তারা দু'আর জন্য "স্থান" খুঁজে বেড়ান। বিশেষত অনেক মুসলমানের বদ্ধমূল ধারণা ওলী বুজুর্গগণের মাযারে যেয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে দু'আ তাড়াতাড়ি কবুল হয়। এ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ধারণার ফলে মাযারগুলো আজ মুসলিমের ঈমান হরণের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মাযারগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভণ্ড ব্যবসায়ীদের জমজমাট ব্যবসা। যেখানে অগণিত সরল মুসলিম টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল ইত্যাদির সাথে নিজের ঈমানও রেখে চলে আসেন।

অথচ একটি হাদীসও বর্ণিত হয়নি যে, কোনো ওলী বুজুর্গের মাযারে গিয়ে দু'আ করলে আল্লাহ সে দু'আ কবুল করবেন। আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

"যদি আমার বান্দাগণ আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তাদের নিকটবর্তী। প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে (আমাকে ডাকে) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দি (প্রার্থনা কবুল করি)।"[১]

আল্লাহ বললেন তিনি কাছে আছেন। ডাকলেই সাড়া দেবেন। আর আপনি তাঁর কথা বিশ্বাস না করে আর কোথায় দৌড়ে বেড়াচ্ছেন। কেন দৌড়াচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কখনো কোথাও বলেছেন যে, কোনো ওলী বা বুজুর্গের কবরে বা মাযারে যেয়ে দু'আ করলে তা কবুল হবে ? কোথাও বলেননি। কাজেই আপনার অস্থিরতা মূলত মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) ওয়াদা ও শিক্ষার প্রতি আপনার অবিশ্বাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে দু'আর সকল নিয়ম ও আদব শিখিয়ে গেলেন, অথচ এ কথাটি শিখালেন না! সাহাবীগণ প্রশ্ন করেছেন, কিভাবে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন। তিনি বিভিন্ন সময়, পদ্ধতি ও বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কখনো ঘুণাক্ষরেও বলেননি যে, ওলী আওলিয়ার মাযারে বা কবরে যেয়ে দু'আ করলে কবুল হবে। বরং তিনি বিভিন্ন হাদীসে শুধুমাত্র যিয়ারত অর্থাৎ কবরস্থ ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া ও তার জন্য দু'আ করা ছাড়া কবরের কাছে অন্য কোনো ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন।

সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগের অনেক পরে মানুষের মধ্যে বুজুর্গগণের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে নিজের হাজত প্রয়োজন প্রার্থনার রীতি ক্রমান্বয়ে দেখা যেতে থাকে। ইসলামী শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার ও জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস ইত্যাদি ছিল এর কারণ। জনশ্রুতি আছে – অমুক বুজুর্গের কবরের কাছে দু'আ করলে তা কবুল হয়। ওমনি কিছু মানুষ ছুটলেন সেখানে দু'আ করতে। পরবর্তী যুগের অনেক জীবনী গ্রন্থে এমন অনেক জনশ্রুতির কথা পাবেন। সরলমনা অনেক আলিম ও নেককার মানুষও এসকল বিষয়ে জড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক, আপনি আপনার প্রেমময় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করছেন। যিনি তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) মাধ্যমে দু'আর সময় ও নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে অবিশ্বাস করে ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) শিক্ষায় অনাস্থা এনে মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে কোথাও দৌড়ে বেড়াবেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) শিক্ষার মধ্যে নিরাপদে অবস্থান করুন। আর কোনো কিছুরই আপনার প্রয়োজন নেই।

১. ১৫. ৭. আল্লাহর কাছে প্রার্থনা পরিত্যাগের পরিণাম

উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা সুস্পষ্ট বুঝতে পারি যে, দু'আ করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ। দু'আ করা ইবাদত। দু'আ না করা অপরাধ ও আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বা দু'আ না করার তিনটি অবস্থা ও পর্যায় রয়েছে। আমরা নিচে এ তিনটি অবস্থার আলোচনা করছি। আল্লাহর তাওফীকই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল।

১. ১৫. ৭. ১. আল্লাহর যিক্‌রের কারণে দু'আ পরিত্যাগ

যদি কেউ দু'আর বদলে অনবরত আল্লাহর যিক্‌রে নিমগ্ন থাকেন তাহলে তা দু'আর মতোই ইবাদত হিসেবে আল্লাহর দরবাবে কবুল হবে বলে হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি। যয়ীফ একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উমার (রা) বা জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেছেন :

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي ، عَن مَسْأَلَتِي أَعْطَيْته فَوْقَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ.

"আমার যিক্‌রে ব্যস্ত থাকার কারণে যে ব্যক্তি আমার কাছে চাইতে পারেনি, আমি প্রার্থনাকারীদের যা প্রদান করি তাঁকে তার চেয়ে উত্তম (পুরস্কার) প্রদান করি।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[১]

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন:

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ

"যাকে কুরআন ও আমার যিক্‌র আমার নিকট প্রার্থনা থেকে ব্যস্ত রাখে আমি প্রার্থনাকারীদের যা প্রদান করি তাঁকে তার চেয়ে উত্তম প্রদান করি।"[২]

আমরা দেখেছি যে, সকল দু'আই যিক্‌র। তবে সকল যিক্‌র দু'আ নয়। বিভিন্ন বাক্যে নিজের জন্য কিছু না চেয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর মর্যাদা প্রকাশ করা দু'আ বিহীন যিক্‌র। অনেক সময় বান্দা বিপদে আপদে মনপ্রাণ আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে শুধু তাঁর যিক্‌র করতে থাকেন। এ যিক্‌র দু'আ-পরিত্যাগ নয়। বরং অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের দু'আ। আল্লাহ জানিয়েছেন যে, ইউনূস (আ) মাছের পেটের মধ্যে ভয়ঙ্করতম বিপদে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আপনি মহাপবিত্র, সুমহান!, আমি তো সীমালংঘনকারী।"

এখানে আমরা দেখছি যে, কোনো প্রার্থনা নেই, শুধুমাত্র যিক্‌র। কিন্তু আল্লাহ এ যিক্‌রকেই দু'আ বা নিদা (ডাকা) নামে অভিহিত করেছেন এবং তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তার কারণ এ আকুতিময় যিক্‌রই দু'আ। আর উপরের হাদীসে এধরনের যিক্‌রের কথা বলা হয়েছে। আমরা ইসমু আযম বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "ইউনূস (আ)-এর এ দু'আ পড়ে যে কোনো মুসলিম যে কোনো বিষয়ে দু'আ করলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন ও প্রার্থনা পূরণ করবেন।"

যিক্‌র নং ২৪

يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ

উচ্চারণ: ইয়া 'হাইয়্যু হয়া ক্বাইয়্যুম। **অর্থ:** হে চিরঞ্জীব হে সর্বসংরক্ষক।

আলী (রা) বলেন:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ ثُمَّ جِئْتُ مُسْرِعًا لأَنْظُرَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقِتَالِ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

"বদরের যুদ্ধের দিনে আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করছেন তা দেখার জন্য তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসলাম। এসে দেখি তিনি সাজাদা রত অবস্থায় রয়েছেন এবং শুধু বলছেন: **'ইয়া হাইউ ইয়া কাইউম' (হে চিরঞ্জীব, হে সর্বসংরক্ষক)**, এর বেশি কিছুই বলছেন না। এরপর আমি আবার যুদ্ধের মধ্যে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার আসলাম। দেখি তিনি সাজদা রত অবস্থায় ঐ কথাই বলছেন। এরপর আমি যুদ্ধে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে আসলাম। এসে দেখি তিনি সে কথাই বলছেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে বিজয় দান করেন।" হাইসামী হাদীসটির সনদ হাসান বলেছেন।[৩]

এ হাদীসেও আমরা দেখছি, কিভাবে যিক্‌রের মাধ্যমে দু'আ করা হয়। এরূপ সমর্পিত যিক্‌র সর্বোত্তম দু'আর ফল এনে দেয়।

যিক্‌র নং ২৫ : দুশ্চিন্তা বা বিপদগ্রস্তের দু'আ-১

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

উচ্চারণ: "লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামাওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরদি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।"

অর্থ: "নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান, মহাধৈর্যশীল মহা বিচক্ষণ, নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি মহান আরশের প্রভু, নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, যিনি আসমানসমূহের, জমিনের ও সম্মানিত আরশের প্রভু।"

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদ বা কষ্টের সময় এ কথাগুলো বলতেন।[৪] আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

আমাকে কোনো কষ্ট বা বিপদে পড়লে উপরের এ দু'আ পড়তে শিখিয়েছেন।[১] এখানে আমরা দেখছি যে, এ দু'আ মূলত শুধুমাত্র যিক্‌র। এখানে কোনো দু'আ নেই। কিন্তু আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেই দু'আ করা হচ্ছে।

যিক্‌র নং ২৬ : দুশ্চিন্তা বা বিপদগ্রস্তের দু'আ-২

اَللهُ اللهُ رَبِّيْ لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

উচ্চারণঃ আল্লা-হু, আল্লা-হু রাব্বী, লা- উশরিকু বিহী শাইআন।

অর্থঃ আল্লাহ, আল্লাহ, আমার রব, তার সাথে কাউকে শরীক করি না।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে বলতেনঃ "তোমাদের কেউ কখনো দুশ্চিন্তা বা বিপদের মধ্যে নিপতিত হলে এ কথা বলবে।" হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল হলেও অন্যান্য কয়েকটি সনদে একই দু'আ বর্ণিত হয়েছে। এজন্য হাদীসটি হাসান।[২]

এ দু'আও মূলত যিক্‌র। বিপদগ্রস্ত মুমিন-হৃদয় এভাবে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহর করুণা সন্ধান করেন।[৩]

১. ১৫. ৭. ২. তাওয়াক্কুল করে দু'আ পরিত্যাগ

আমরা দেখলাম যে, দুআ না করার প্রথম অবস্থা হলো দুআর বদলে যিকরে ব্যস্ত থেকে আল্লাহর কাছে মনের আকুতি জানানো। এতে আল্লাহর কাছে দুআ পরিত্যাগ করা হয়না। দুআ না করার দ্বিতীয় অবস্থা আল্লাহ দেখছেন বলে দু'আ না করা বা আল্লাহর তাকদীরের উপর নির্ভর করে দু'আ থেকে বিরত থাকা। এভাবে দুআ পরিত্যাগ কঠিন অপরাধ ও সুন্নাত বিরোধী কর্ম। সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া আল্লাহর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত এবং একটি অতিরিক্ত ইবাদত। সুন্নাতের আলোকে আমরা একটি ঘটনাও খুঁজে পাব না, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ না করে তথাকথিত 'তাওয়াক্কুল' করেছেন। অথবা আল্লাহ তো আল্লাহ আমার অবস্থা দেখছেন কাজেই দু'আর কী দরকার? – একথা বলে দু'আ করা থেকে বিরত থেকেছেন এমন একটি ঘটনাও আমরা খুঁজে পাব না।

মুহতারাম পাঠক, সাহাবীগণের যুগের পর থেকে, অনেক নেককার মানুষের ঘটনা আপনি বিভিন্ন গ্রন্থে পাবেন, যেখানে তাঁরা বিপদে আপদে দু'আ করেননি। দু'আ করতে বলা হলে তাঁরা বলেছেন, "আল্লাহ তো আমার অবস্থা দেখছেন, অথবা আল্লাহই আমার বিপদ দিয়েছেন আমি কেন তাঁর কাছে বিপদ কাটাতে বলব, ইত্যাদি।" কেউ হয়ত বলেছেন, দু'আর চেয়ে তাওয়াক্কুলই উত্তম।

এ সকল বুজুর্গের কর্ম, কারামত ও ঈমানের এই দৃঢ়তা দেখে আমরা বিমোহিত হয়ে মনে করি, এটিই বুঝি ঈমানের ও তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ স্তর! আমরা ভুলে যাই যে, ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর। তার পরেই তাঁর সাহাবীগণ। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের একটি ঘটনাও পাব না যে, তিনি কখনো কোনো সমস্যায় বা প্রয়োজনে দু'আ না করে তাওয়াক্কুল করেছেন। তিনি সর্বদা দু'আ করেছেন ও দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। দু'আই ইবাদত, দু'আই তাওয়াক্কুল এবং দু'আই ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। উপরিউক্ত বুজুর্গগণের স্তর এর নিচে। তাঁরা ক্বলবের বিশেষ হালতে এসকল কথা বলেছেন।

ইবাদত, বন্দেগি, নির্জনবাস, যিক্‌র আযকার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমাদের এ বিষয়টি খুব বেশি মনে রাখতে হবে। অগণিত বুজুর্গের অগণিত আকর্ষণীয় বিবরণ আমরা দেখতে পাব। এগুলো হয়ত ভাল। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শই অনুকরণীয় আদর্শ।

বানোয়াট একটি গল্প আমাদেরকে ভুল বুঝতে সাহায্য করে। এ গল্পে বলা হয়েছেঃ ইবরাহীমকে (আ) যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে বলেনঃ আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলুন। তিনি বলেনঃ আপনার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। জিবরাঈল (আ) বলেনঃ তাহলে আপনি আপনার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন। তখন ইবরাহীম (আ) বলেনঃ

حَسْبِيْ مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِي

"তিনি আমার অবস্থা জানেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, অতএব আমার আর কোনো প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।"

এ কাহিনীটি ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা।[৪] কুরআনে ইবরাহীম (আ)-এর অনেক দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কখনো কোনো প্রয়োজনে দু'আ করেননি এরূপ কোনো ঘটনা কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

সর্বোপরি দু'আ পরিত্যাগ করা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার বিপরীত। উপরের বিভিন্ন হাদীসে দু'আ করার নির্দেশ আমরা দেখেছি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সকল বিষয় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে তাও দেখেছি। উপরন্তু না চাইলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ

"কেউ আল্লাহর কাছে না চাইলে আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।"[৫]

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর কাছে দু'আ না করার ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা ঘোষণা করে আল্লাহ বলেছেনঃ "এবং তোমাদের প্রভু বললেনঃ

তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর আমি তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে তারা লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" আমরা দেখেছি যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: দু'আই ইবাদত। আল্লাহর কাছে দু'আ না করাই আল্লাহর ইবাদত থেকে অহঙ্কার করা।

১. ১৫. ৮. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ

আল্লাহর কাছে দু'আ না করার সর্বশেষ অবস্থা আল্লাহর কাছে দু'আ না করে অন্যের কাছে দু'আ করা। বিশেষ বিপদে বা বড় বড় সমস্যায় আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া। বাকি ছোটখাট বা সাধারণ বিপদ আপদ, সমস্যা, হাজত, প্রয়োজন ইত্যাদির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা। এটি ভয়ঙ্কর শিরক।

১. ১৫. ৮. ১. আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনাই শিরকের মূল

কুরআন কারীমের আলোকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, যুগে যুগে অধিকাংশ কাফির মুশরিক আল্লাহর উপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বিশ্বাস করার পরেও এই দু'আর কারণেই মুশরিক হয়ে গিয়েছে।

কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারি, মক্কার মুশরিকগণ বিশ্বাস করতো যে – আল্লাহই এ বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, সর্বময় ক্ষমতার মালিক, তাঁর উপরে কারো ক্ষমতা নেই, তিনিই একমাত্র রিযিক দাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তারা একবাক্যে তা স্বীকার করতো। কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে একথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।[১] অর্থাৎ, তারা বিশ্বাস করতো যে,– 'লা খালিকা ইল্লাল্লাহ', 'লা রাব্বা ইল্লাল্লাহ', 'লা রাযিকা ইল্লাল্লাহ', 'লা মালিকা ইল্লল্লাহ' ইত্যাদি। কিন্তু তারা এ বিশ্বাস সত্ত্বেও আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি অন্যান্য নবী, ফিরিশতা, প্রতিমা, পাথর, গাছ ইত্যাদির ইবাদত বা পূজা করত। অর্থাৎ, তারা 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' মানত না।[২]

শিরকের উৎপত্তি আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের কারণে নয়। শিরকের উৎপত্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ, ফিরিশতা, গাছ, পাথর বা প্রাকৃতিক শক্তিকে অলৌকিক বা অপার্থিব কল্যাণ ও অকল্যাণের ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাদের ইবাদত বা পূজা করা। বিশেষত তাদের কাছে সাহায্য, কল্যাণ, আশ্রয় ও বিপদমুক্তি প্রার্থনা করা। হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রিয়, নেককার ওলী, বুজুর্গ, নবী বা ফিরিশতাগণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, অতিভক্তি ও তাদেরকে মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতার অধিকারী মনে করার কারণে মানব সমাজে শিরক প্রবেশ করেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। হাদীস থেকে শুধুমাত্র মুসলিম সমাজে শিরক প্রবেশের দু'টি কহিনী আলোচনা করছি।

প্রথম ঘটনা : প্রথম মানব সমাজ ছিল তাওহীদবাদী মুমিন মুসলিম। আদম (আ)-এর পরে কয়েক শতাব্দী এভাবেই মানুষ তাওহীদ ও ঈমানের উপর ছিল। এরপর আওলিয়া কেরামের ক্ষেত্রে অতিভক্তির কারণে ক্রমান্বয়ে সমাজে শিরকের শুরু হয়। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে, তাফসীরে তাবারী ও অন্যান্য তাফসীরের গ্রন্থে এ বিষয়ক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ সকল বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: আদম সন্তানদের মধ্যে ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক ও নাসর – এ পাঁচ ব্যক্তি খুব নেককার বুজুর্গ মানুষ ছিলেন। তাঁদের অনেক অনুসারী, ভক্ত ও মুরীদ ছিলেন, যারা তাঁদের বেলায়াতের বিষয়ে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বিষয়ে অতিভক্তিকারী কোনো কোনো মু'তাকীদ বলেন: আমরা যদি এঁদের ছবি বানিয়ে রেখে দিই তাহলে তা আমাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতে উৎসাহিত করবে। এরপর যখন এরাও মারা গেল তখন ইবলিস পরবর্তী যুগের মানুষদেরকে ওয়াসওয়াসা দিতে লাগল, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তো এঁদের শুধু শুধু ছবি করে রাখেননি। তারা তো তাঁদের ইবাদত করত এবং তাঁদের ডাকার ফলেই তো তারা বৃষ্টি পেত। তখন সে যুগের মানুষেরা এঁদের পূজা করা শুরু করল।[৩]

দ্বিতীয় ঘটনা: তাওহীদের অন্যতম সিপাহসালার ছিলেন ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)। তঁদেরই বংশধর আরব জাতি। তারাও তাওহীদের উপর ছিল। তাদের মধ্যে শিরকের প্রচলন সম্পর্কে ইবনু ইসহাক তার "সীরাতুন্নবী" গ্রন্থে বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ীর সূত্রে লিখেছেন: এরা বলেন যে, ইসমাঈলের বংশে আরবদের মধ্যে শিরক প্রচলনের কারণ ছিল, এরা কাবাঘরের খুবই ভক্তি করত। তারা কাবাঘর ছেড়ে যেতে চাইতেন না। যখন তাদের বাধ্য হয়ে কাবাঘর ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হতো, তখন তারা সাথে করে কাবাঘরের তাযীমের জন্য কাবাঘরের কিছু পাথর নিয়ে যেতেন। তারা যেখানেই যেতেন সেখানে এই পাথরগুলো রেখে তার তাওয়াফ করতেন ও সম্মান করতেন। পরবর্তী যুগে ক্রমান্বয়ে এ সকল পাথর ইবাদত করার প্রচলন হয়ে যায়। পরে মানুষেরা খেয়াল খুশি মতো বিভিন্ন পাথর পূজা করতে শুরু করে। এছাড়া আরবদের নেতা আমর ইবনু লুহাঈ তার কোনো কাজে সিরিয়ায় গমন করেন। সেখানের মানুষেরা মূর্তি পূজা করত। তিনি তাদের বলেন : এসকল মূর্তি তোমরা কেন পূজা কর? তারা বলে : আমরা এদের পূজা করি। এদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করি। তখন এরা আমাদের বৃষ্টি দান করে। বিপদে আমরা এদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন এরা আমাদের সাহায্য করে। তখন তিনি তাদের থেকে কয়েকটি মূর্তি এনে মক্কায় স্থাপন করেন এবং মক্কাবাসীকে এদের তাযীম করতে নির্দেশ দেন।"[৪]

১. ১৫. ৮. ২. ফিরিশতা ও নবী-ওলীদের নিকট প্রার্থনার দলিল

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি ছিল দুটিঃ

প্রথম যুক্তিঃ এরা সবাই আল্লাহর প্রিয়, আল্লাহর নবী বা ফিরিশতা অথবা আল্লাহর পুত্রকন্যা। এদের ইবাদত করলে আল্লাহ নিশ্চয় খুশি হবেন এবং এভাবে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারব। আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহণ করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যেন এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে।" [১]

দ্বিতীয় যুক্তিঃ আল্লাহই একমাত্র প্রভু , প্রতিপালক এবং সকল ক্ষমতার মালিক। তবে কিছু মানুষ ও ফিরিশতা আছেন যারা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়, তাদের সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করেন। এ সকল ফিরিশতা ও মানুষের ইবাদাত করলে, এরা খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে মানুষের বিপদ কাটিয়ে দেন, প্রয়োজন পূরণ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী শাফায়াতকারী। আপনি বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে ? সুবহানাল্লাহ! তিনি সুমহান, সুপবিত্র এবং তোমাদের শিরক থেকে তিনি উর্ধ্বে।" [২]

মুশরিকগণ যদিও মনে করত যে, একমাত্র আল্লাহই সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং এসকল উপাস্য আল্লাহর নিকট থেকেই সুপারিশ করে এনে দেন, তবুও তাদের ধারণা ছিল আল্লাহর সাথে এদের যে সম্পর্ক তাতে এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলতে পারবেন না। এভাবে এদের মধ্যে 'মানুষের মঙ্গল বা অমঙ্গল করার এক ধরনের ক্ষমতা' আছে বলেই তারা মনে করত। অর্থাৎ, তারা মনে করতো যে, মূল ক্ষমতা আল্লাহরই। তবে এদেরকে তিনি (আল্লাহ) কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এজন্য কুরআন করীমে বিভিন্ন স্থানে ইহুদি, নাসারা ও কাফিরদের শিরকের প্রতিবাদে আল্লাহ বারবার উল্লেখ করেছেন যে, "এরা আল্লাহকে ছাড়াও যে সকল নবী, ফিরিশতা, ওলী বা প্রতিমার ইবাদত বা পূজা করে তারা কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গলের ক্ষমতা রাখে না।" [৩]

তাহলে শিরকের ভিত্তি ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নবী, ফিরিশতা, ওলী বা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে অপার্থিব ও অলৌকিক মঙ্গল ও অমঙ্গলের ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বা তাদের সাথে আল্লাহর সরাসরি বিশেষ সম্পর্ক ও সুপারিশের বিশেষ অধিকার আছে মনে করে এদের কাছে প্রার্থনা করা। দু'আ বা প্রার্থনাই মূলত সকল শিরকের মূল। উৎসর্গ, কুরবানি (sacrifice), নযর, মানত, ফুল, সাজদা, গড়াগড়ি ইত্যাদি সবই মূলত দু'আর জন্যই। যেন পূজিত ব্যক্তি বা বস্তু এ সকল ভেট বা উৎসর্গে খুশি হয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা পূরণ করেন বা হাজত মিটিয়ে দেন সে জন্যই বাকি সকল প্রকারের ইবাদত ও কর্ম। অপরদিকে এদের কাছে প্রার্থনা মূলত জাগতিক। ফসল, রোগব্যাধি, বিপদাপদ, সন্তান, বিবাহ, ইত্যাদি জাগতিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়ার জন্যই এদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। জান্নাত বা স্বর্গ লাভ, ক্ষমা, স্রষ্টার প্রেম, আখেরাতের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে এদের কাছে চাওয়া হয় না।

এজন্য আমরা কুরআন করীমের বিবরণ থেকে দেখতে পাই যে, মুশরিকরা ফিরিশতা, নবী, প্রতিমা ইত্যাদির ইবাদত করত মূলত দু'আর মাধ্যমে। সাধারণভাবে মুশরিকদের শিরকই ছিল যে, তারা আল্লাহকেও ডাকত বা আল্লাহর কাছে দু'আ চাইত, আবার আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য নবী, ফিরিশতা, বুজুর্গ, পাথর, প্রতিমা ইত্যাদির কাছেও দু'আ চাইত। এজন্য কুরআন করীমে এদের শিরককে অধিকাংশ স্থানে 'দু'আ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রায় ৭০ এরও অধিক স্থানে মুশরিকদের শিরককে 'দু'আ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১. ১৫. ৮. ৩. সাধারণ হাজত বনাম বড় হাজত

মুশরিকদের এসকল দু'আ-প্রার্থনা সবই ছিল মূলত পার্থিব ও জাগতিক সমস্যাদি কেন্দ্রিক। রোগ, ব্যধি, বৃষ্টিপাত, সন্তান, বাণিজ্যে উন্নতি, বরকত, বিপদমুক্তি, রিযিক বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েই মুশরিকগণ এসকল উপাস্যের কাছে প্রার্থনা করত, যেন তারা আল্লাহর নিকট থেকে তাদের হাজত পূর্ণ করে দেয়। আখেরাতের মুক্তি, জান্নাত, কামালাত ইত্যাদির জন্য এদের কাছে কেউ যেত না। মূলত অধিকাংশ মুশরিক আখেরাতে অবিশ্বাস করতো।

জাগতিক এ সকল প্রার্থনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুশরিকের সাধারণ নিয়ম ছিল, ছোটখাট বিপদ আপদ প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যদের কাছে চাওয়া। আর খুব কঠিন বিপদে আল্লাহর কাছে চাওয়া। সম্ভবত তারা ভাবতো, ছোটখাট বিষয়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে বিরক্ত করার কী দরকার। এজন্য তো আল্লাহর প্রিয় ফিরিশতা, নবী, আল্লাহর মেয়ে, স্ত্রী ইত্যাদি রয়েছে। একান্ত যে সকল কঠিন বিপদে এরা কূল পান না, সেখানে মহাপ্রভু সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে ডাকা যেতে পারে।

কুরআন কারীমে এ বিষয়ে অনেক স্থানে বলা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে যে, মুশরিকগণ যখন কঠিন বিপদে পড়ে, নদীতে বা

সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে, বা আল্লাহর আযাব বা প্রাকৃতিক গজব এসে উপস্থিত হয় তখন মনেপ্রাণে আল্লাহর নিকট বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। অথচ সাধারণ হাজত প্রয়োজনে তারা তাদের অন্যান্য উপাস্যদের নিকট প্রার্থনা করে।[১]

কুরআনের বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ মুশরিকই এভাবে চলত। সূরা হজ্বের একটি বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, কিছু মানুষ সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত করত। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তাদের আস্থা ও ঈমানের দৃঢ়তা খুবই কম। এজন্য কঠিন বিপদে পড়লে তারা ঈমান হারিয়ে ফেলত এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ত। তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যর কাছে চাওয়া শুরু করত।[২]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো নবী, ওলী, ফিরিশতা বা কারো কাছে প্রার্থনা করা শিরকের মূল। এবং একারণেই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও শিরকে লিপ্ত হয়। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"অধিকাংশ মানুষই শিরকে রত অবস্থায় আল্লাহর উপর ঈমান আনে।"[৩]

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনু আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, ইকরিমাহ, আমির, ইবনু সিরীন, হাসান বসরী, কাতাদাহ, ইবনু যাইদ প্রমুখ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী, মুফাস্‌সির বলেছেন যে, মুশরিকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা, প্রতিপালক এবং রাব্বুল আলামীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে তার সাথে শিরক করে।[৪]

১. ১৫. ৮. ৪. মুসলিম সমাজের 'দু'আ কেন্দ্রিক শিরক'

দু'আর আলোচনার মধ্যে উপরের 'দু'আ কেন্দ্রিক শিরক'-এর আলোচনার উদ্দেশ্য এ শিরক থেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকা। আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, বিভিন্ন মুসলিম সমাজে পূর্বতন ধর্মের প্রভাবে, ইসলামের মূলনীতি ও বিশ্বাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, বিপদে আপদে মূর্ত কাউকে আঁকড়ে ধরে মনের আকুতি জানানোর মানবীয় দুর্বলাতার কারণে, আল্লাহর প্রতি আস্থার অভাবে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে দু'আ কেন্দ্রিক শিরক ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের সমাজেও অগণিত মুসলিম বিপদে আপদ, রোগব্যাধি, ফসল, সন্তান, বিবাহ ইত্যাদি জাগতিক সমস্যাদির জন্য দেশের অগণিত মাযারে গিয়ে মাযারে শায়িত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করেন। তাদের নিকট সমস্যা মেটানোর আব্দার করেন। তারা যেন খুশি হয়ে সমস্যা মেটানোর ব্যবস্থা করেন এই আশায় প্রার্থনার পূর্বে নযর, মানত, উৎসর্গ, ভেট, টাকা-পয়সা, সাজদা, ক্রন্দন ইত্যাদি পেশ করা হয়। এ কঠিন শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা মুমিনের অন্যতম কাজ। শিরক থেকে মুক্ত হতে না পারলে বাকি সকল কর্মই ব্যর্থ। অনন্ত ধ্বংস থেকে মুক্তির কোনো উপায় থাকবে না।

এখানে লক্ষণীয় যে কাফির মুশরিক ও পৌত্তলিক সমাজের মতো আমাদের দেশের মানুষেরাও সাধারণত কোনো পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি বা মর্যাদার জন্য এ সকল কবর, মাযার বা দরবারে যান না। আপনার সমাজের আনাচে কানাচে ছড়ানো অগণিত মাযারে গিয়ে দেখবেন সকলেই পার্থিব বিপদ আপদ, সন্তান, রোগব্যধি, মামলা ইত্যাদি জাগতিক সমস্যার দ্রুত নিস্পত্তি ও হাজত পূরণের জন্য এ সকল স্থানে নযর, মানত ইত্যাদি নিয়ে হাজিরা দেন। দু'চার জন মানুষ যারা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যিয়ারত করেন, তাঁরা নযর, মানত ইত্যাদির ধার ধারেন না। নীরবে যিয়ারত করে চলে যান।

এ বইয়ের পরিসরে কবরে দু'আ কেন্দ্রিক শিরকের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। আমার "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি।[৫] এছাড়া "কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা" বইটিতে শিরক বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৬] এখানে এতটুকুই বলতে চাই যে, উপরের অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। কোথাও কখনো ঘুণাক্ষরেও বলেননি যে, কোনো প্রকার বিপদে অথবা ছোটখাট প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে তোমরা প্রার্থনা করবে, অথবা কারো কবরে গিয়ে আল্লাহর কাছে চাইবে। উপরন্তু কঠিনভাবে বারবার নিষেধ করেছেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাইতে। বিশেষ করে কবর-কেন্দ্রিক ইবাদত থেকে অত্যন্ত কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। কবরকে কেন্দ্র করেই যে শিরক প্রসার লাভ করে, – তা বিশেষভাবে জানিয়েছেন। এ ধরনের মানুষদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।

সমাজে অনেক কথা প্রচলিত আছে। অমুক ব্যক্তি বিপদে পড়ে অমুক বুজুর্গকে ডেকেছিল, তিনি তাকে উদ্ধার করে দিয়েছেন। অমুক ব্যক্তি অমুকের মাযারে গিয়ে দু'আ করে বিপদ কেটে গিয়েছে। এগুলোতে কান দেবেন না। হিন্দু, খ্রিষ্টান ও সকল মুশরিক সমাজেই এ ধরনের কথা প্রচলিত।

ভাবতে বড় অবাক লাগে, এ সকল লোকমুখের কথা অনেক মুসলমান কত সহজে বিশ্বাস করেন! অথচ কুরআন ও হাদীসের কথায় তাঁদের আস্থা আসে না। আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ অগণিত ঘটনায় বলেছেন যে,– অমুক, অমুক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বিপদ মুক্ত হয়েছে। ইউনূস (আ) মাছের পেটে কঠিনতম বিপদে আল্লাহকে ডেকে বিপদ মুক্ত হলেন। এ কথায় আস্থা রেখে এরা আল্লাহকে ডাকতে চান না। অস্থির হয়ে শিরকের মধ্যে নিপতিত হন।

প্রিয় পাঠক, কুরআন ও হাদীসের বিবরণে আস্থা রাখুন। শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকুন। তাঁর রহমত থেকে আস্থা হারাবেন না।

আল্লাহ আমাদেরকে শিরকের ভয়াবহ অন্ধকার থেকে রক্ষা করুন।

১. ১৬. রাসূলুল্লাহর ﷺ সালাত-সালাম জ্ঞাপক যিকর

আল্লাহর যিক্‌র-এর একটি বিশেষ প্রকরণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর উপর সালাত (দরুদ) ও সালাম পাঠ করা। সালাত ও সালাম প্রার্থনা মূলক যিক্‌রের অন্যতম। এতে মুমিন আল্লাহর স্মরণ করেন এবং প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ করেন। সালাত-সালাম পাঠকারী যিক্‌রের সাধারণ ফযীলত অর্জন করবেন। উপরন্তু সালাত ও সালামের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে, যা আমরা এ অনুচ্ছেদে আলোচনার চেষ্টা করব।

১. ১৬. ১. সালাত ও সালাম : অর্থ ও অভিব্যক্তি

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ইসলামী শব্দের ফার্সী প্রতিশব্দ ব্যবহারের ফলে অনেক সময় আমরা কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত মূল আরবী পরিভাষা হারিয়ে ফেলি। এ সকল পরিভাষার অন্যতম 'সালাত'। মুসলিম জীবনের অন্যতম দু'টি ইবাদত 'সালাত' নামে পরিচিত; প্রথমটি: ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ, ইসলামের অন্যতম ইবাদত 'সালাত', যা আমরা বাংলায় ফার্সী প্রতিশব্দ 'নামায' বলে অভিহিত করি। দ্বিতীয়টি: মানবতার মুক্তির দূত, আল্লাহর প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য 'সালাত' প্রেরণ করা, যাকে আমরা বাংলায় ফার্সী শব্দে 'দরুদ' বলে থাকি।

চতুর্থ হিজরী শতকের প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে দুরাইদ: আবু বকর মুহাম্মাদ বিন হুসাইন (৩২১ হি) লিখেছেন : 'সালাত' শব্দের মূল: দু'আ বা প্রার্থনা। **صلِّ عليه** "সাল্লি আলাইহি" অর্থাৎ, "তার জন্য দু'আ কর"।[১]

এ শতকের অন্য ভাষাবিদ আহমদ ইবন ফারিস (৩৯৫হি) বলেন: "এ ধাতুটির ২টি মূল অর্থ রয়েছে: একটি অর্থ আগুন বা আগুন জাতীয় উত্তাপ ... ইত্যাদি বোধক। দ্বিতীয় অর্থ এক ধরনের উপাসনা। ... দ্বিতীয় অর্থে সালাত শব্দের অর্থ দু'আ। ... আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত অর্থ রহমত।..."[২]

এ সময়ের অন্য ভাষাবিদ ইসমাঈল বিন হাম্মাদ জাওহারী (৩৯৮ হি) বলেন: "সালাত শব্দের অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাতের অর্থ: রহমত বা করুণা। এছাড়া আগুনে পোড়ান বা ঝলসানকেও সালাত বলা হয়।"[৩]

অন্যান্য সকল ভাষাবিদ এ কথাগুলোই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, সালাত শব্দের অর্থ রহমত ও বরকতের জন্য দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাতকে (নামায) সালাত নামকরণের কারণ এ ইবাদতের মূল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত প্রদানের অর্থ রহমত, করুণা ও বরকত প্রদান। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ﷺ-কে সালাত প্রদান বা সালাত প্রেরণের অর্থ তাঁকে রহমত প্রদান, সর্বোত্তম মর্যাদা ও প্রশংসা প্রদান। ফিরিশতারা কারো উপর সালাত প্রেরণ করেছেন অর্থ তাঁরা আল্লাহর কাছে উক্ত ব্যক্তির জন্য রহমতের, মর্যাদা ও ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করেছেন। কোনো মানুষ অন্যকে 'সালাত' প্রদান বা প্রেরণ করেছে বলতে বুঝান হয় সে তাঁকে মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছে, তাঁর জন্য রহমত, ক্ষমা ও মর্যাদার দু'আ করেছে।[৪]

১. ১৬. ২. কুরআন করীমে সালাত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহ স্মরণ (যিক্‌র) কর এবং প্রভাতে ও বিকালে তাঁর পবিত্রতা (তাসবীহ) কর। তিনি তোমাদের উপর সালাত প্রদান করেন এবং তাঁর ফিরেশতাগণও; যেন তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন।"[৫]

ইমাম তাবারী বলেন: আল্লাহ সালাত (দরুদ) প্রদান করেন অর্থ: তিনি তাঁদেরকে দয়া করেন, ক্ষমা করেন, তাদের প্রশংসা ছড়িয়ে দেন এবং সম্মানিত করেন। ফিরিশতাগণ মুমিনগণকে সালাত (দরুদ) প্রদান করেন অর্থ: তাঁরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে করুণা, ক্ষমা ও বরকত চেয়ে প্রার্থনা করেন।[৬]

এ ছাড়া কোনো কোনো মুমিনের জন্য বিশেষভাবে সালাতের উল্লেখ রয়েছে। বিপদে আপদে যারা ধৈয-ধারণকারীদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

এ সকল মানুষদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেক 'সালাত'-সমূহ (অগণিত করুণা, ক্ষমা, বরকত ও সু-প্রসংসা[১]) এবং রহমত এবং তাঁরাই সুপথপ্রাপ্ত ।"[২]

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ

"নিশ্চয় আল্লাহ এবং ফিরিশতাগণ সালাত প্রদান করেন (সালাতের) কাতারের ডান দিকে অবস্থানকারীদের উপর ।" হাদীসটি হাসান ।[৩]

সর্বোপরি, আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত প্রদান করেন এবং বিশ্বাসীদেরকে সালাত ও সালামের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ 'সালাত' প্রদান করেন নবীর উপর । হে বিশ্বসীগণ, তোমরা তাঁর উপর 'সালাত' দাও এবং 'সালাম' দাও ।"[৪]

ইমাম তাবারী বলেন: আল্লাহ সালাত প্রদান করেন অর্থ: তিনি তাঁর নবীকে ﷺ রহমত করেন, সর্বোত্তম মর্যাদা প্রদান করেন, বরকত দান করেন, তাঁর সুপ্রশংসা ও মর্যাদা বিশ্বাবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন । আর ফিরিশতাগণ সালাত দেন অর্থ: তাঁরা তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে এগুলোর প্রার্থনা করেন ।"[৫]

এখানে আল্লাহ বিশ্বাসীদের নির্দেশ দিলেন তাঁর প্রিয়তম রাসূলের উপর সালাত ও সালামের । কাউকে সালাম প্রদান করলে তাঁকে সম্মান প্রদান করা হয় । সাহাবীগণ আগে থেকেই তাঁকে সালাম দিয়ে আসছিলেন । সালাম প্রদানের ইসলামী পদ্ধতি তাঁদের সুপরিচিত: "আস-সালামু আলাইকুম ..." । কিন্তু তাঁকে তাঁরা কিভাবে "সালাত" জানাবেন? সালাত তো দু'আ করা । তিনিই তো তাঁদের জন্য দু'আ করবেন, তাঁরা কিভাবে সৃষ্টির সেরা সাইয়েদুল মুরসালীনকে দু'আ করবেন । কিংকর্তব্যবিমূড় হয়ে পড়লেন সাহাবায়ে কেরাম । কিভাবে তাঁরা এ আয়াতের নির্দেশ পালন করবেন । অবশেষে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন ।

যিক্‌র নং ২৭ : দরুদে ইবরাহীমী-১

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ) (النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ) وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ (عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ) (النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ) وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

অর্থ : "হে আল্লাহ আপনি (আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল) (উম্মী নবী) মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ করুন যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহাসম্মানিত । এবং আপনি বরকত প্রদান করুন (আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল) (উম্মী নবী) মুহাম্মাদের উপরে এবং মুহাম্মাদের পরিজনের উপরে যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপরে এবং ইবরাহীমের পরিজনের উপরে । নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহা সম্মানিত ।"

আবূ মাসউদ বদরী (রা), কা'ব বিন আজুরা (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেন, উপরের আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণকে এভাবে সালাত পাঠ শিক্ষা দেন । উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সহীহ হাদীসে "মুহাম্মাদিন"-এর পরে "আবদিকা ওয়া রাসূলিকা (আপনার বান্দা এবং আপনার রাসূল) বিশেষণ বলা হয়েছে । অন্যান্য সহীহ বা হাসান হাদীসে "মুহাম্মাদিন"-এর পরে "আন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি" (উম্মী নবী) শব্দদুটি উল্লেখ করা হয়েছে ।[৬]

যিক্‌র নং ২৮ : দরুদে ইবরাহীমী-২

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

অর্থ: "হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ করুন যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহা প্রশংসিত মহা সম্মানিত । নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহা সম্মানিত । এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপরে এবং মুহাম্মাদের পরিজনের উপরে যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজনের

Contents

উপরে। নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহা সম্মানিত ।"

কা'ব (রা) বলেন, সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে কিভাবে সালাম দিব তা তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর 'সালাত' আমরা কিভাবে প্রদান করব? তখন তিনি বললেন, তোমরা বলবে... তিনি এ বাক্যগুলি শেখান। এ হাদীসে (কামা সাল্লাইতা 'আলা- ইবরাহীমা) ও (কামা- বা-রাকতা 'আলা ইবরাহীমা) বাক্য দু'টি নেই, সরাসরি (আ-লি ইবরাহীমা) বলা হয়েছে।[১]

যিক্‌র নং ২৯ : দরুদে ইবরাহীমী-৩

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা স্বাল্লি 'আলা- মু'হাম্মাদিন ওয়া 'আলা- আযওয়া-জিহী ওয়া যুর্‌রিয়্যা-তিহী কামা- স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ওয়া বা-রিক 'আলা- মু'হাম্মাদিন ওয়া 'আলা আযওয়া-জিহী ওয়া যুর্‌রিয়্যা-তিহী কামা- বা-রাক্‌তা আলা আ-লি ইবরা-হীম।

অর্থ: হে আল্লাহ, সালাত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপরে এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর সন্তানসন্ততিগণের উপরে, যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজনদের উপরে। এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপরে এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর সন্তানসন্ততিগণের উপরে, যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের পরিজনদের উপরে।

আবূ হুমাইদ সায়ীদী (রা) বলেন, সাহাবীগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত পাঠ করব? তখন তিনি এভাবে সালাত পাঠ করতে শিক্ষা দেন।[২]

হাদীস শরীফে আমরা দেখতে পাই আরো অনেক সাহাবীই এ আয়াত নাজিল হওয়ার পরে রাসূলে আকরাম ﷺ-এর কাছে সালাত প্রদানের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা করেছেন।[৩] আর তিনি তাঁদের সকলকেই "দরুদে ইবরাহিমী" শিক্ষা দিয়েছেন। ভাষার ক্ষেত্রে এরূপ সামান্য কম-বেশি আছে।

আল্লামা ইবনুল আসীর মুবারাক বিন মুহাম্মাদ (৬০৬ হি) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয়তম নবীর (ﷺ) উপর সালাত প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু আমরা তো তাঁর মর্যাদা অনুধাবন করতে পারব না, তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্যও পুরো বুঝতে পারব না। তাই আমরা এ দায়িত্ব আবার মহান আল্লাহকেই দিলাম, আমরা বললাম: হে আল্লাহ আপনি তাঁর উপর সালাত প্রদান করুন, কারণ তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আপনিই ভাল অবগত আছেন।" তিনি আরো বলেন: "আমরা যখন বলি: 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ', হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন, তার অর্থ: হে আল্লাহ, দুনিয়াতে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠা করে, তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে, তাঁর শরীয়তকে হেফাজত করে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করুন এবং আখেরাতে তাঁর শাফা'আত কবুল করে, তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করে তাঁকে মর্যাদাময় করুন।"[৪]

১. ১৬. ৩. হাদীস শরীফে সালাত ও সালাম

হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বস্তুত সৃষ্টির সেরা, সকল যুগের সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু, হাবীব, খলীল ও রাসূল ﷺ আজীবন কষ্ট করে আমাদের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের শান্তি ও সফলতার একমাত্র পথ ইসলামকে মানব জাতির জন্য পৌঁছে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর জন্য যে মানব সন্তান আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও রহমতের প্রার্থনা না করবে, তাঁর উপর যে মানুষ সালাম না পাঠাবে সে মানুষ মানব জাতির কলঙ্ক। একজন মানুষের নূন্যতম প্রেরণা হওয়া উচিত যে, সে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি ও শান্তির বার্তাবাহক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর উপর হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করবে, তাঁর শান্তি, মর্যাদা ও রহমতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু মানব সন্তানের দায়িত্ব তাঁর জন্য প্রার্থনা করা।

১. ১৬. ৩. ১. সালাত পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ আমাদের দায়িত্ব। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন আমরা জীবন বিলিয়ে দিলেও তাঁর সামান্যতম প্রতিদান দিতে পারব না। কারণ আমরা হয়ত আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবনটা বিলিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তো আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক অনন্ত জীবনের সফলতার পথ দেখাতে তাঁর মহান জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমাদের নূন্যতম দায়িত্ব যে আমরা সদা সর্বদা তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনের দয়া দেখুন, তাঁর হাবীবের প্রতি তাঁর সম্মান প্রদর্শনের একটি দিক এ-ই যে, যদিও সালাত পাঠ আমাদের দায়িত্ব তবুও এতে মহান আল্লাহ এতো খুশি হন যে এর জন্য অফুরন্ত পুরস্কার দান করেন। সালাতের পুরস্কারসমূহের অন্যতম নিম্নের ৬ প্রকার পুরস্কার:

(১). আল্লাহ দয়া, ক্ষমা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا

"তোমরা আমার উপর সালাত পড়; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ১০ বার সালাত (রহমত) করবেন।"[১]

আবু বুরদা ইবনু নিয়ার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلاَةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ.

"আমার উম্মাতের কেউ যদি অন্তর থেকে ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে একবার সালাত পাঠ করে, আল্লাহ সে সালাতটির বিনিময়ে তার ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, ১০টি সাওয়াব লিখবেন এবং ১০টি গোনাহ ক্ষমা করবেন।"[২]

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ

"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ১০ বার সালাত (রহমত) করবেন, তাঁর ১০টি পাপ ক্ষমা করা হবে এবং তাঁর মর্যাদা ১০টি স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হবে।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩]

আবু তালহা (রা) বলেন, একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অত্যন্ত আনন্দিত-চিত্তে দেখা গেল। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আজ আপনি খুবই আনন্দচিত্ত। তিনি বললেন :

أَجَلْ، أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا

"হাঁ, আমার প্রভুর নিকট থেকে একদূত এসে আমাকে বলেছেন : আপনার উম্মতের কোনো ব্যক্তি যদি আপনার উপর সালাত পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ তাঁর জন্য ১০টি সাওয়াব লিখবেন, তাঁর ১০ টি গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন, তাঁর জন্য দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তাঁর জন্য ঠিক অনুরূপ সালাত (রহমত ও মর্যাদা) ফিরিয়ে দেবেন।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৪]

অন্য হাদীসে আবু তালহা বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত চেহারায় আমাদের কাছে আসলেন। আমরা প্রশ্ন করলে তিনি বললেন: আমার কাছে ফিরিশতা এসে বলেন , আপনার প্রভু বলেছেন –

أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"আপনি কি খুশি নন যে, কেউ আপনার উপর ১ বার সালাত দিলে আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাত দিব। আর কেউ আপনার উপর ১ বার সালাম দিলে আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাম দিব।" হাদীসটি হাসান।[৫]

আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা) বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে যান, আমিও তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি একটি খেজুরের বাগানে প্রবেশ করেন এবং সাজদায় যান। তিনি সাজদা রত অবস্থায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, ফলে আমি ভয় পাই যে, সাজদা রত অবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল কিনা? এজন্য আমি কাছে এসে নজর করি। তিনি মাথা তুলে বলেন : আব্দুর রহমান, তোমার কী হয়েছে? তখন আমি আমার (মনের ভয়ের) কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন : জিবরাঈল আমাকে বললেন: আপনি কি এজন্য খুশি নন যে, আল্লাহ বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ

"আপনার উপর যে সালাত (দরুদ) পাঠাবে আমিও তার উপর সালাত (রহমত, বরকত) পাঠাব, আর যে আপনার উপর সালাম পাঠাবে আমি তার উপর সালাম পাঠাব।" (তিনি বলেন) "আর এ জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সাজদা করি।"[৬]

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে (আযান দিতে) শুনবে তখন সে যা যা বলবে তোমরাও তা বলবে, এরপর তোমরা আমার উপর সালাত পাঠ করবে ; কারণ যে আমার উপর সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাঁকে একটি সালাতের বিনিময়ে ১০ বার সালাত (রহমত, মর্যাদা, বরকত) প্রদান করবেন। এরপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা প্রার্থনা করবে ; ওসীলা জান্নাতের এমন একটি মর্যাদার স্থান যা শুধুমাত্র আল্লাহর একজন বান্দাই লাভ করবেন, আমি আশা করি আমিই তা লাভ করব। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হবে।"[১]

যিক্‌র নং ৩০ : মাসনূন সালাত

اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمات

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিন, 'আবদিকা ওয়া রাসূলিকা, ওয়া সাল্লি 'আলাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-ত, ওয়াল মুসলিমীন ওয়াল মুসলিমা-ত।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি সালাত প্রেরণ করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর, এবং সালাত প্রেরণ করুন সকল মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীর উপর।"

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)বলেছেন :

أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ لَمْ تَكُنْ عِنْدَه صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِيْ دُعَائِهِ... فَإِنَّهَا لَهُ زَكَاةٌ

"কোনো মুসলিমের কাছে যদি দান করার কিছুই না থাকে তবে তার উচিত দু'আর মধ্যে এ কথাগুলো (সালাতটি) বলা; তাহলে এ সালাত তাঁর জন্য যাকাত স্বরূপ গণ্য হবে (সে দান করার সাওয়াব অর্জন করবে)।"

হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও, তা অনুধাবনযোগ্য এবং সাখাবী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[২]

(২). ফিরিশতারা রহমত ও মর্যাদার জন্য দু'আ করবেন

সালাত পাঠের পুরস্কারের আরেকটি দিক আল্লাহর সম্মানিত ফিরিশতাগণ সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করেন। আমির বিন রাবিয়া (রা) বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে খুতবায় বলতে শুনেছি যে :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً لَمْ تَـزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ

"যে ব্যক্তি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করবে, যতক্ষণ যে সালাত পাঠ করতে থাকবে ততক্ষণ ফিরেশতাগণ তাঁর জন্য সালাত (দু'আ) করতে থাকবেন, অতএব কোনো বান্দা চাইলে তা বেশি করে করুক অথবা কম করে করুক।" হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য।[৩]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা) বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلاةً

"কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর একবার সালাত পাঠ করলে আল্লাহ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ তাঁর উপর সত্তর বার সালাত (রহমত ও দু'আ) করেন।"[৪]

(৩). সালাত রাসূলুল্লাহর (ﷺ) কাছে পৌছান হবে

সালাত পাঠের পুরস্কারের ৩য় দিক , সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছান হবে। অন্য কোনো পরলোকগত মানুষের জন্য দু'আ করা হলে তা আল্লাহ হয়ত কবুল করবেন এবং যার জন্য দু'আ করা হয়েছে তাকে বিনিময়ে মর্যাদা বা পুণ্য দান করবেন। কিন্তু তিনি হয়ত দু'আকারীর বিষয়ে বিস্তারিত জানবেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠকারীর সকল পুরস্কারের অতিরিক্ত আনন্দ এ যে, তাঁর নাম ও পরিচয়সহ তাঁর সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পৌছান হবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানি, যে কোনো মুসলিম দুনিয়ার যেখানেই থাক না কেন, দুনিয়ার যে প্রান্ত থেকেই সে সালাত পাঠ করুক না কেন, তাঁর সালাত মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর কবর মুবারাকে পৌছান হবে। উপরন্তু কোনো কোনো হাদীসে এরূপও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করবেন।

আউস বিন আউস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلام وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ قَالَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ

"তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দিন শুক্রবার। এদিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, এদিনেই সিংগা ফুক দেওয়া হবে, এদিনেই কিয়ামত হবে। কাজেই এ দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে সালাত পাঠ করবে, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পেশ করা হবে।" সাহাবীগণ বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কিভাবে তখন আমাদের সালাত আপনার নিকট পেশ করা হবে?" তিনি বলেন : "মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[১]

অন্য একটি হাদীসে আবু হুরাইরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِياً أُبْلِغْتُهُ (أُعْلِمْتُهُ)

"কেউ আমার কবরের নিকট থেকে আমার উপর সালাত বললে আমি শুনতে পাই। আর যদি কেউ দূর থেকে আমার উপর সালাত বলে তবে আমাকে তা জানান হয়।" হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। তবে একাধিক সমার্থক বর্ণনার কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসটিকে হাসান বলে গণ্য করেছেন।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে যে যেখানে অবস্থান করবে সেখানে থেকেই সালাত-সালাম পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের সালাত-সালাম তাঁর কাছে পৌছান হবে বলে নিশ্চিত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রিয়তম নাতী ইমাম হুসাইন, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (রা) তাঁর থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

حَيْثُما كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فإِنَّ صلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي

"তোমরা যেখানেই থাকনা কেন আমার উপর সালাত পাঠ কর, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌছান হবে।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৩]

ইমাম হাসান বিন আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، وَلاَ تَتَّخِذُوا بَيْتِي عِيدًا، صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ وَسَلاَمُكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ.

"তোমরা তোমাদের বাড়িতে বসেই সালাত আদায় করবে, তোমাদের বাড়িগুলোকে কবর বানিয়ে ফেলবে না। আর আমার বাড়িকেও ঈদ (ঈদগাহ বা আনন্দ বা সমাবেশের স্থান) বানিয়ে ফেলবে না। তোমরা (তোমাদের বাড়িতেই) আমার উপর সালাত ও সালাম পাঠাও, কারণ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সালাত ও সালাম আমার কাছে পৌছে যায়।"[৪]

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي

"তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানাবে না এবং তোমাদের বাড়িগুলোকে কবর বানাবে না, যেখানেই থাকনা কেন আমার উপর সালাত পাঠ করবে; কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌছে যাবে।" হাদীসটি হাসান।[৫]

আল্লাহর কত দয়া! বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে, ক'জনের জন্যই বা সম্ভব হবে মদীনায় গিয়ে সালাত ও সালাম পাঠের। তাই তাদের দিলেন অফুরন্ত নিয়ামত। নিজ ঘরে বসে উম্মত সালাম জানাবে, সালাত পাঠ করবে, আর আল্লাহর ফিরিশতাগণ তা রাসূলে আকরাম (ﷺ)-এর পবিত্র কবরে পৌছে দেবেন।

সালাত ও সালাম তাঁর কাছে পৌছানোর নিশ্চয়তার পাশাপাশি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সালাত পাঠকারীর নাম ও পরিচয়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে জানান হয়। আম্মর বিন ইয়াসির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِقَبْرِي مَلَكًا أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلاَئِقِ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ هَذَا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ.

"মহান আল্লাহ আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিয়োগ করছেন, যাকে সকল সৃষ্টির শ্রবণশক্তি প্রদান করা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যখনই কোনো ব্যক্তি আমার উপর সালাত পাঠ করবে তখনই সে ফিরিশতা আমাকে সালাত পাঠকারীর নাম ও তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করে আমাকে তাঁর সালাত পৌছে দিয়ে বলবে: অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর সালাত প্রেরণ করেছে।"

হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে। তবে এ অর্থে আরো কয়েকটি দুর্বল সনদের হাদীস আল্লামা সাখাবী তাঁর সালাত বিষয়ক বই

---

[১] নাসাঈ (১৪-কিতাবুল জুম'আ, ৫-বাব ইকসারিস সালাত..) ২/১০১, নং ১৩৭১, (ভা. ১/১৫৪) ইবন মাজাহ (৫-কিতাবু ইকামাতিস সালাত, ৭৯-বাবুন ফী ফাদলিল জুমুআ) ১/৩৪৫,

"আল-ক্বাওলুল বাদীয়" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যে সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় সালাত পাঠকারীর সালাত যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পেশ করা হয় তখন সালাত পাঠকারীর নাম ও পিতার নামসহ তার পরিচয় তাঁর দরবারে পেশ করা হয়। একই বিষয়ে কয়েকটি দুর্বল বা যয়ীফ হাদীস বর্ণিত হলে বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, যাকে মুহাদ্দিসগণ 'হাসান লিগাইরিহী' বলেন। এ হাদীসটিও এভাবে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য।[১]

আমরা অন্যান্য সহীহ হাদীসের আলোকে জেনেছি যে, আমাদের সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পৌছান হয়। পরের হাদীসগুলোর আলোকে আমরা আরো আশা করছি যে, আমাদের সালাত তাঁর দরবারে পৌছানর সময় আমাদের ও আমাদের পিতাদের নামও তাঁর মুবারক দরবারে উচ্চারিত হয়। আমাদের জন্য এর চেয়ে গৌরবের ও আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে?

(৪). রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাত পাঠকারীর জন্য দু'আ করবেন

কিন্তু প্রিয় পাঠক, এর চেয়েও আনন্দের বিষয় আপনাকে জানাচ্ছি। আনাস বিন মালিক (রা) বলেছেন , রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً

"কেউ আমার উপর একবার সালাত (দরুদ) পড়লে আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাত (দু'আ) করি।" হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[২]

সালাত পাঠকারীর জন্য এর চেয়ে খুশির খবর আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জন্য দু'আ করবেন। শুধু তাই নয় একবর দরুদের জন্য তিনি ১০ বার দু'আ করবেন। সুব'হা-নাল্লাহ ! কত বড় পুরস্কার!!

(৫). রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফায়াত লাভের ওসীলা

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, সালাত পাঠকারীর জন্য আখেরাতের মুক্তি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফায়াত ও জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْراً وَحِينَ يُمْسِي عَشْراً أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর ১০ বার সালাত (দরুদ) পাঠ করবে এবং সন্ধ্যায় ১০ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভের সৌভাগ্য তাঁর হবে।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৩]

যিক্‌র নং ৩১ : আরেকটি মাসনূন সালাত

اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, স্বাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিন, ওয়া আনযিলহুল মাক্ব'আদাল মুক্বাররাবা 'ইনদাকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ।

অর্থ: "হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত (দরুদ) প্রেরণ করুন এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্যপ্রাপ্ত অবস্থানে অবতীর্ণ করুন।"

রুআইফি বিন সাবিত আনসারী (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَالَ ... وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي

"যে ব্যক্তি উপরের কথাগুলো (সালাতটি) বলবে, তার জন্য আমার শাফায়াত পাওনা হবে।" হাদীসটির সনদে একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন, তবে আল্লামা হায়সামী ও মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[৪]

অন্য হাদীসে ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً

"কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্য থেকে সে ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী (আমার শাফায়তের সবচেয়ে বেশি হকদার) হবে, যে সবচেয়ে বেশি আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করে।" হাদীসটি হাসান।[৫] অন্য একটি দুর্বল সনদের হাদীসে বলা হয়েছে :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

"যদি কেউ দিনে ১ হাজার বার আমার উপর সালাত (দরুদ) পাঠ করে তাহলে জান্নাতে তাঁর অবস্থান স্থল না দেখে তাঁর মৃত্যু হবে না (মৃত্যুর পূর্বেই তার জান্নাতের ঘর দেখার সৌভাগ্য হবে)।" হাদীসটির সনদ দুর্বল।[৬]

অন্য হাদীসে সামুরা বিন জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَباً، رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ وَيَحْبُوْ أَحْيَاناً وَيَتَعَلَّقُ أَحْيَاناً، فَجَاءَتْهُ صَلاَتُهُ عَلَيَّ فَأَقَامَتْهُ عَلَى قَدَمَيْهِ وَأَنْقَذَتْهُ

"আমি গত রাতে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম (তাঁর স্বপ্নও ওহী), আমি দেখলাম আমার উম্মতের এক ব্যক্তি পুল-সিরাতের উপর বুকে হেটে চলেছে, কখনো বা হামাগুড়ি দিচ্ছে, কখনো বা ঝুলে পড়ছে, এমতাবস্থায় আমার উপর পাঠকৃত তার সালাত এসে তাকে সোজাভাবে সিরাতের উপর সোজা দু'পায়ে দাঁড় করিয়ে দিল এবং তাকে উদ্ধার করল ।"

ইবনুল কাইয়েম ও সাখাবীর আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বা আলোচনাযোগ্য ।[১]

(৬). আল্লাহ সকল সমস্যা ও দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন

উবাই বিন কাব (রা) বলেন: রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে বলতেন: হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর যিক্‌র কর, কিয়ামত এসে গেছে! কিয়ামত এসে গেছে! মৃত্যু তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে এসে উপস্থিত! মৃত্যু তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে এসে উপস্থিত! আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার উপর অনেক সালাত (দরুদ) পাঠ করি, আমি (আমার সকল দু'আর) কী পরিমাণ অংশ আপনার সালাত (দরুদ) হিসেবে নির্ধারিত করব? তিনি বললেন: তোমার যা ইচ্ছা হয় । আমি বললাম: এক চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে । আমি বললাম: অর্ধেক? তিনি বললেন: তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে । আমি বললাম: দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: তোমার যা ইচ্ছা, তবে যদি আরো বেশি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে । আমি বললাম: আমার সকল প্রার্থনা ও দু'আ আপনার (সালাত পাঠের) জন্যই নির্ধারিত করব । তখন তিনি বললেন :

إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ

"তাহলে তোমার সকল চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করা হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে ।" হাদীসটি সহীহ ।[২]

হাব্বান বিন মুনকিয (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি বলে: হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার সালাতের (দু'আর) এক তৃতীয়াংশ আপনার (সালাত পাঠের) জন্য নির্ধারণ করব কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: হাঁ, যদি চাও । লোকটি বলল : দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: হাঁ, যদি চাও । লোকটি বলল: আমার সকল সালাত (দু'আ) আপনার জন্য নির্ধারিত করি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ مَا أَهَمَّكَ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ

"তাহলে আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাবেন (সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন) ।" হাদীসটির সনদ হাসান ।[৩]

একজন মুসলিম যত পাপীই হোন না কেন, তার পার্থিব বা পারলৌকিক যে কোনো সমস্যা, যে কোনো বিপদ-আপদ, যে কোনো বেদনা ব্যথায় তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন । আল্লাহর রহমতই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল । শত পাপের বোঝা মাথায় নিয়েও আমরা আশা করি মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন এবং আমাদের সকল সমস্যা মিটিয়ে দিবেন, আমাদের বেদনা দূর করবেন এবং আমাদের আনন্দ স্থায়ী করবেন ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর সালাত পাঠ আমাদের প্রার্থনা কবুল হওয়ার অন্যতম ওসীলা । ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন: আমি সালাত আদায় করছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর ও উমার তাঁর সাথে ছিলেন । আমি যখন (সালাতের তাশাহহুদের বৈঠকে) বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করলাম, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ করলাম এবং এরপর আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করলাম । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ

"এখন চাও, তোমার প্রার্থিত বস্তু তোমাকে দেওয়া হবে; চাও, তোমার প্রার্থিত বস্তু তোমাকে দেওয়া হবে ।" তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ ।[৪]

দু'আর আগে দুরুদ শরীফ পাঠে উৎসাহ প্রদান করে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । দু'আর শেষে সালাত পাঠের বিষয়ে আলী (রা) থেকে তাঁর নিজের বক্তব্য হিসেবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত:

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عل النَّبِيِّ

"সকল দু'আ পর্দার আড়ালে থাকবে (আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না) যতক্ষণ না নবীর ﷺ উপর সালাত পাঠ না করবে।" হাদীসটি হাসান।[১] উমার (রা) থেকেও হাসান সনদে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে।[২]

দ্বিতীয় শতাব্দীর তাবে-তাবেয়ী মুহাদ্দিস আবু সুলাইমান আব্দুর রাহমান বিন সুলাইমান আদ দারানী (মৃত্যু ১৯৭ হি) বলেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার কোনো হাজত পেশ করতে চায় তার উচিত, সে যেন দু'আর শুরুতে নবীয়ে রাহমাতের ﷺ উপর সালাত পাঠ করে দু'আ শুরু করে, এরপর তাঁর প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে পেশ করে এবং শেষে পুনরায় সালাত পাঠের মাধ্যমে তার দু'আ শেষ করে। কারণ নবীজীর ﷺ উপর সালাত আল্লাহ কবুল করবেন। আর আশা করা যায়, আল্লাহ সালাতের মধ্যবর্তী প্রার্থনাও দয়া করে কবুল করে নেবেন।"[৩]

যিক্র নং ৩২ : আরেকটি মাসনূন সালাত

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি 'আলা- মু'হাম্মাদিন 'আব্দিকা ওয়া নাবিয়্যিকা ওয়া রাসূলিকান নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি সালাত দিন মুহাম্মাদের উপরে আপনার বান্দা এবং আপনার নবীএবং আপনার রাসূল উম্মী নবী।"

আবূ হুরাইরা (রা) থেকে দুর্বল সনদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ سَنَةً قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْك قَالَ تَقُولُ ...

যদি কেউ শুক্রবারে আমার উপর আশি বার সালাত পাঠ করে তবে তার আশি বছরের পাপ ক্ষমা করা হবে। আমি বললাম: কিভাবে আপনার উপর সালাত পাঠ করতে হবে? তিনি বলেন... উপরের সালাতটি।

হাদীসটি খতীব বাগদাদী ওয়াহব ইবনু দাউদ নামক এক ব্যক্তির সূত্রে উদ্ধৃত করে বলেন, লোকটি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। ইবনুল জাওযী হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল এবং আলবানী হাদীসটিকে জাল বলে গণ্য করেছেন। এ অর্থে আরেকটি হাদীস দারাকুতনী সংকলন করেছেন। দারাকুতনীর হাদীসে জুমুআর দিনে আশি বার সালাত পাঠে আশি বছরের পাপ ক্ষমার কথা বলা হয়েছে, তবে এ হাদীসে সালাতের বাক্যটি নেই। দারাকুতনীর হাদীসটিকে ইমাম ইরাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাসান বলে গণ্য করেছেন। অন্যরা একে যয়ীফ বা দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো গ্রন্থে এ সালাতের শেষে (وسلِّم تَسْلِيْماً كَثِيْراً) 'ওয়া সাল্লিম তাসলীমান কাসীরান..' সংযোজিত। এ অতিরিক্ত সংযোজিত বাক্যটির কোনো সনদ আমি খুঁজে পাই নি।[৪]

১. ১৬. ৩. ২. সালাম পাঠের গুরুত্ব ও ফযীলত

সালাত বা 'দরুদ' ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমাদের আরেকটি কর্তব্য তাঁর প্রতি সালাম জানান। আল্লাহ কুরআন করীমে সালাত ও সালাম একসাথে উল্লেখ করেছেন। আমরাও সাধারণত সালাত ও সালাম একত্রে পড়ে থাকি। উপরে আলোচিত একাধিক হাদীসে সালাতের সাথে সালামের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হাদীসে দেখেছি যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবের সম্মানে বলেছেন যে, " যদি কেউ আপনার উপর ১ বার সালাত পাঠ করে তবে আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাত (রহমত ও দয়া) দান করব। আর যদি কেউ ১ বার আপনার উপর সালাম জানায় আমি তাঁর উপর ১০ বার সালাম জানাই।" অন্য হাদীসে ইবনু মাস'উদ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلامَ

"আল্লাহর কিছু ফিরিশতা আছেন যারা বিশ্বে ঘুরে বেড়ান, আমার উম্মতের সালাম তাঁরা আমার কাছে পৌঁছে দেন।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৫]

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন , রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ

"যখনই কেউ আমাকে সালাম করে তখনই আল্লাহ আমার রূহকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন, যেন আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।"[৬]

১. ১৬. ৩. ৩. সালামের মাসনূন বাক্য

সালাতের মাসনূন বাক্যাদি আমরা দেখেছি। সালামের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো বাক্য আমরা 'আত্তাহিয়্যাতু'-র মধ্যে পাঠ

Contents

করি:

السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"আস-সালামু আলাইকা আইউহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" ।

"হে নবী, আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ ।"

সাহাবীগণ সালাত ও সালাম একই বাক্যে পাঠ করতেন বলে দেখা যায় । আসমা বিনতু আবী বাকর (রা) প্রতিনিয়ত বলতেন:

صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ

"সাল্লাল্লাহু আলা- রাসূলিহী ওয়া সাল্লামা": "আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন ।"[১]

সাহাবী-তাবিয়গণ কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম বা উপাধি উল্লেখ করে এবং অন্যান্য নবী বা ফিরিশতার নাম উল্লেখ করে বলতেন:

عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ

"আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম": "তাঁর উপর সালাত ও সালাম" ।[২]

১. ১৬. ৩. ৪. সালাত ও সালামের বাক্যাবলির রূপরেখা

আমরা দেখেছি, মুমিন যে কোনো ভাষায় ও বাক্যে আল্লাহর যিকর বা প্রার্থনা করলে তিনি মূল ইবাদতের সাওয়াব ও ফল পেতে পারেন । তবে মুমিনের শ্রেষ্ঠ বাসনা সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুকরণ করা । যিকর ও দুআর ক্ষেত্রে তাঁর শেখানো বা আচরিত বাক্যগুলো হুবহু ব্যবহার মুমিনের সর্বোচ্চ কাম্য ও দায়িত্ব । এতে সাওয়াব ও কবুলিয়্যাতের আশা অনেক বেশি । সাহাবী-তাবিয়ীগণ মাসনূন বাক্যাবলি ব্যবহারের পাশাপাশি কখনো কখনো অন্যান্য বাক্য ব্যবহার করতেন । তবে সুন্নাতের ব্যতিক্রম বাক্য দ্বারা যিকর, দুআ বা দরুদ-সালাম পালন রীতিতে পরিণত করলে মাসনূন বাক্যাবলির প্রতি অনীহা এবং এ বিষয়ক সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব জন্ম নেয়, মাসনূন বাক্যাবলি বা সুন্নাতের মৃত্যু ঘটে এবং এভাবে খেলাফে সুন্নাত থেকে বিদআতের জন্ম হয় । এ মূলনীতির ভিত্তিতে মাসনূন বাক্যগুলোর অর্থবোধক যে কোনো বাক্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সালাত ও সালাম জানানো যেতে পারে । তবে মাসনূন বাক্যাবলির ব্যবহার সর্বোত্তম । এসকল বাক্যের আলোকে সালাত-সালাম চার ভাবে আদায় করা যায়:

(ক) প্রার্থনাজ্ঞাপক ক্রিয়া দ্বারা: (اللهم صلِّ..وسلِّم): "আল্লাহুম্মা স্বাল্লি..ওয়া সাল্লিম..": "হে আল্লাহ, আপনি সালাত বা সালাম প্রদান করুন.. ।"

(খ) অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা: (صَلَّى اللهُ ... وسَلَّمَ): "স্বাল্লাল্লাহু ... ওয়া সাল্লামা ...": আল্লাহ সালাত বা সালাম প্রদান করলেন... ।

(গ) বিশেষ্যপদের বাক্য দ্বারা: (صلاة الله ... وسلامه .. على): স্বালাতুল্লাহি ওয়া সালামুহু...'আলা... ": আল্লাহর সালাত ও সালাম ... উপর ।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা: الصلاة والسلام/ صلاة الله/ وسلامه عليك يا رسول الله... আস্বালাতু ওয়াস সালামু.. আলাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ: আপনার উপর সালাত ও সালাম/ আল্লাহর সালাত ও সালাম, হে আল্লাহর রাসূল ।

সালাত-সালাম বিষয়ক বাক্যাবলির ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

(১) সালাতের তাশাহ্হুদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর কবর যিয়ারত: এ তিন ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো সময়ে কোনো সাহাবী-তাবিয়ী, কোনো ইমাম বা প্রথম শতাব্দীগুলোতে কেউ তাঁকে সম্বোধন করে সালাত বা সালাম বলেছেন বলে কোনোভাবে জানতে পারি নি । তাঁরা সর্বদা প্রথম তিন পদ্ধতিতে সালাত ও সালাম প্রদান করতেন ।

(২) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন: আত্তাহিয়্যাতু ... আস-সালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু...

وَهْوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ

"....যখন তিনি আমদের মধ্যে ছিলেন । এরপর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন তখন আমরা বললাম: আস-সালামু আলান নাবিয়্যি"[৩] এভাবে তাঁর ওফাতের পর তাশাহ্হুদেও তাঁরা তাঁকে সম্বোধন করে সালাম পরিত্যাগ করেন ।

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে সম্বোধন করে সালাত-সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে তাশাহ্হুদ, সাক্ষাৎ ও যিয়ারতের সময় সাহাবী-তাবিয়ী ও ইমামগণ শুধু সালাম বলতেন: (আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ) । কোনো সাহাবী, তাবিয়ী, ইমাম বা প্রথম শতাব্দীগুলোর কোনো বুজুর্গ এক্ষেত্রে 'সালাত ও সালাম একত্রে (আস-সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ...) বলেছেন বলে জানতে পরি নি । এ তিন ক্ষেত্র ছাড়া তাঁরা প্রথম তিন পদ্ধতিতে সালাত ও সালাম একত্রে বলতেন ।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো সালাতের বাক্যগুলো, বিশেষত দরুদে ইবরাহীমীর বাক্যগুলি বেশ দীর্ঘ । অনেক সময় মুমিন

বেশি বেশি সালাত পাঠের উদ্দেশ্যে ছোট বাক্যে সালাত আদায় করতে চান। আমরা দেখি যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ কখনো কখনো সংক্ষিপ্ত বাক্যে সালাত আদায় করতেন।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো সালাতের সাথে 'সালাম' সংযুক্ত নয়। এগুলোতে শুধু সালাত পাঠ করা হয়। মুমিন স্বভাবতই একই সাথে সালাত ও সালাম পাঠ করে দু প্রকারের ফযীলত অর্জন করতে চান। আমরা দেখলাম যে, সাহাবী-তাবিয়ীগণ অনেক সময় সালাত ও সালাম একত্রে পাঠ করতেন।

(৫) বিভিন্ন মাসনূন সালাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামের সাথে উপাধি হিসেবে "আন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি" এবং "আবদিকা ওয়া রাসূলিকা" সংযুক্ত। সাহাবী-তাবিয়ীগণ কখনো তাঁর নাম (মুহাম্মাদ), কখনো তাঁর উপাধি (রাসূল, নবী, নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি) এবং কখনো নাম ও উপাধীসমূহ একত্রে (মুহাম্মাদিনিন্‌ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি, রাসূলিহী মুহাম্মাদ...) বলতেন।

(৬) মাসনূন সালাতগুলোতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে তাঁর "আল" অর্থাৎ 'অনুসারী ও পরিজন' এবং 'স্ত্রী ও সন্তানগণ'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবী-তাবিয়ীগণ তাঁদের সালাতে অধিকাংশ সময় এগুলোর উল্লেখ করতেন, কখনো বা শুধু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম উল্লেখ করতেন।

(৭) তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী যুগের ইমাম ও ফকীহগণ সালাতের মধ্যে 'সাহাবীগণ'-এর কথাও উল্লেখ করতেন। "আল" শব্দটি সকল অনুসারীকেই বুঝায়, কিন্তু শীয়াগণ সাহাবীগণকে অভিশাপ দেওয়ার রীতি প্রচলন করার কারণে তাঁরা সালাত-সালামের মধ্যে পৃথকভাবে সাহাবীগণের কথা উল্লেখ করতে থাকেন।

তাঁদের ব্যবহারের আলোকে নিম্নের বাক্যগুলো বলা যায়:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ) مُحَمَّدٍ (النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ) وَآلِهِ (وَأَصْحَابِهِ) وَسَلِّمْ / اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى ... أَصْحَابِه.

"আল্লা-হুম্মা, স্বাল্লি 'আলা ('আব্দিকা ওয়া রাসূলিকা) মু'হাম্মাদিন (আন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি) ওয়া আ-লিহী (ওয়া আসহাবিহী) ওয়া সাল্লিম। অথবা: "আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি ওয়া সাল্লিম 'আলা ..... আস্ব'হা-বিহী"।

صَلَّى اللهُ عَلَى (عَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ) مُحَمَّدٍ (النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ) وَآلِهِ (وَأَصْحَابِهِ) وَسَلَّمَ / صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى .... أَصْحَابِه.

"স্বাল্লাল্লাহু 'আলা ('আব্দিহী ওয়া রাসূলিহী) মু'হাম্মাদিন (আন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি) ওয়া আ-লিহী (ওয়া আসহাবিহী) ওয়া সাল্লাম।" অথবা: স্বাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা 'আলা ..... আস্ব'হা-বিহী।"

صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَى (عَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ) مُحَمَّدٍ (النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ) وَآلِهِ (وَأَصْحَابِهِ)

"স্বালাওয়া-তুল্লাহি ওয়া সালা-মুহু 'আলা ('আব্দিহী ওয়া রাসূলিহী) মু'হাম্মাদিন (আন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি) ওয়া আ-লিহী (ওয়া আসহাবিহী)।"

সব বাক্যের অর্থই আল্লাহর কাছে তাঁর রাসূল (ﷺ), তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের জন্য সালাত এবং সালাম প্রার্থনা করা। এ সকল বাক্যের সাথে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত বিশেষণাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন: স্বাল্লাল্লাহু- সুবহানাহু ওয়া তা'আলা- 'আলা (হাবীবিহী/ খালীলিহী/ নাবিয়্যির রাহমাতি/ ইমামিল মুত্তাকীন/ সাইয়িদিল মুরসালিন..) মু'হাম্মাদিন.. ওয়া আ-লিহী (ওয়া আসহাবিহী) ওয়া সাল্লাম।.... ইত্যাদি।

১. ১৬. ৪. সালাত (দরুদ) না পড়ার পরিণতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর সালাত পাঠ করা আমাদের কর্তব্য। আমরা দেখলাম যে, এ কর্তব্য পালনকারীর জন্য রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার। আর এ দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী নিঃসন্দেহে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞ মানুষ। বিশেষ করে তার কাছে যখন কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উচ্চারণ করে বা কোনোভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামটি তার কানে প্রবেশ করে, তা সত্ত্বেও সে তাঁর জন্য সালাত পড়ে না তার চেয়ে অকৃতজ্ঞ আর কে হতে পারে! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত আমাদের সর্বদা পাঠ করা উচিত। হয়তবা কেউ পার্থিব ব্যস্ততায় তা ভুলে যেতে পারে। কিন্তু যদি কোনো প্রকারে তাঁর নামটি কানে আসে, বা তাঁর কথা মনে আসে তাহলে একজন মুসলমানের হৃদয়ে তাঁর প্রতি যে ভালবাসা থাকা অত্যাবশ্যক সেই ভালবাসার নূন্যতম দাবি যে, সে সাথে সাথে তাঁর জন্য সালাত প্রেরণ করবে। যার হৃদয়ে এতটুকু ভালবাসাও নেই তাকে অকৃতজ্ঞ অপূর্ণ মুমিন বলা ছাড়া উপায় নেই। হাদীস শরীফে তাকে 'কৃপণ' বলা হয়েছে।

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الْبَخِيلُ الذي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"কৃপণ সে ব্যক্তি যার নিকট আমার উল্লেখ করা হলেও সে আমার উপর সালাত পাঠ করল না।" তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১]

এ ধরনের মানুষ শুধু কৃপণই নয়, সে আল্লাহর রহমত থেকেও বঞ্চিত। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"পোড়া কপাল হতভাগা সে ব্যক্তি, যার কাছে আমার কথা স্মরণ করা হলো অথচ আমার উপর সালাত (দরুদ) পড়ল না।" হাদীসটি হাসান।[১]

অন্য হাদীসে কা'ব বিন আজুরাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে উঠার সময় ৩ বার 'আমীন' বলেন। পরে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কারণ উল্লেখ করেন। একটি কারণ তিনি বলেন: "জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন– যার নিকট আপনার নাম নেয়া হলো অথচ আপনার উপর সালাত পড়ল না সে (আল্লাহর রহমত থেকে) দূর হয়ে যাক! আমি (তাঁর এ বদ্‌দু'আয় শরীক হয়ে) বললাম: আমীন।" হাদীসটি সহীহ।[২]

আরেকটি হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَقَالَ ... وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ , قُلْ : آمِينَ , قُلْتُ : آمِينَ.

"জিবরাঈল (আ) আমার নিকট এসে বললেন, ... যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার উপর সালাত পাঠ করল না, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল তাকে যেন আল্লাহ দূর করে দেন", আপনি 'আমীন' বলুন, তখন আমি 'আমীন' বললাম।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৩]

অন্য হাদীসে ইমাম হুসাইন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من ذُكِرتُ عنده فخَطِئَ الصلاة عليَّ خطئ طريق الجنة

"যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আমার উপর সালাত (দরুদ) পড়তে ভুলে গেল, সে জান্নাতের পথ ভুলে গেল।"[৪] হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং হাসান বা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের।[৫]

একজন মুসলিমের ঈমানের দাবি যে, তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও সে আল্লাহকে এবং তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভুলে যাবে না। আমাদের সকল কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা দেন দরবারের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা স্মরণ করা। এমন কখনো হওয়া উচিত নয় যে, আমরা অনেক সময় ধরে কথাবার্তা বলছি, গল্প করছি অথচ মাঝে মাঝে দু'একবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা আমাদের মনে আসছে না। এটি হৃদয়ের খুবই দুঃখজনক অবস্থা। যদি কিছু মানুষ একত্রে বসে যে কোনো বিষয়ে কথাবার্তা বলেন কিন্তু পুরা মজলিসে একবারও আল্লাহর স্মরণ না করেন তাহলে তাদের এই মাজলিসটি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য দুঃখ ও বেদনার কারণ হবে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস রয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ

"যখন কিছু মানুষ একটি মাজলিসে বসে, কিন্তু সে মাজলিসে তারা আল্লাহর স্মরণ করে না এবং তাদের নবীর ﷺ উপর সালাত পাঠ করে না তাহলে এই মজলিসটি তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দিবেন, আর ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করবেন।" অন্য বর্ণনায়:

إِلا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ

"তারা জান্নাতে গেলেও উক্ত মাজলিস তাদের দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে, কারণ যে সাওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হবেন তার জন্য তারা দুঃখ ও আফসোস করবেন।" হাদীসটি সহীহ।[৬]

যিক্‌র বিহীন, দরুদ বিহীন মজলিস দুর্গন্ধময় মজলিস। যে কোনো সময়ে যে কোনো কাজে যে কোনো কথায় একাধিক মুসলমান একত্রিত হলে তাদের দায়িত্ব যে কয় মিনিটের মাজলিসই হোক না কেন, মাজলিসে অন্তত ২/১ বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা মনে করে তাঁর উপর সালাত পাঠ করা। তা না হলে তাদের মজলিসটা হবে দুনিয়ার জঘন্যতম দুর্গন্ধময় মজলিস, যে দুর্গন্ধ যার হৃদয় আছে সে অনুভব করবে। জাবির (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ وَصَلاَةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلاَّ قَامُوا عَنْ أَنْتَنِ جِيفَةٍ.

"যদি কিছু মানুষ একত্রিত হন, এরপর তারা আল্লাহর যিক্‌র ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ না করেই মাজলিস ভেঙ্গে চলে যান, তারা যেন নিকৃষ্টতম পঁচা, দুর্গন্ধময় মৃতলাশ থেকে উঠে গেলেন।" অন্য বর্ণনায়: "যদি কিছু মানুষ একটি মজলিসে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ না করেই মাজলিস ভেঙ্গে চলে যায় তাহলে তারা যেন জঘন্যতম দুর্গন্ধময় পঁচা মৃতদেহ থেকে উঠে গেল।" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[১]

১. ১৭. আল্লাহর কালাম পাঠের যিক্‌র

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র কুরআন তিলাওয়াত, কুরআনের অর্থ অনুধাবন, গবেষণা, কুরআন শিক্ষা, কুরআন শিক্ষা দান, কুরআনের আলোচনা ও কুরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম ও বর্জন।

আমরা আরো দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র: 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'সুব'হানাল্লাহ', ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, এ সকল যিক্‌রের শ্রেষ্ঠত্ব কুরআনের পরে। কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। বাকি যিক্‌রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণও কুরআনের অংশ হওয়া। সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

أَفْضَلُ الْكَلاَمِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ، وَهِيَ مِنَ الْقُرْآنِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

"কুরআনের পরে সর্বোত্তম বাক্য চারটি, এগুলোও কুরআনের অন্তর্ভুক্ত। তুমি চারটির যে বাক্যই প্রথমে বল কোনো ক্ষতি নেই: 'সুব'হানাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ', 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার'। হাদীসটি সহীহ।[২]

১. ১৭. ১. কুরআনী যিক্‌রের বিশেষ ফযীলত

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কুরআনই শ্রেষ্ঠতম যিক্‌র। অন্যান্য যিক্‌রের শ্রেষ্ঠত্বের কারণও কুরআনের অংশ হওয়া। অনেক হাদীসে কুরআন কেন্দিক যিক্‌রের মর্যাদা ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদীসে আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللَّه بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِي الْقُرْآن

"আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে (আল্লাহর নৈকট্য পেতে) তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে তার চেয়ে, অর্থাৎ কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই।" হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৩]

আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ – يَعْنِي الْقُرْآنَ

"বান্দাদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য তাঁর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তার মতো, অর্থাৎ কুরআনের মতো কিছুই নেই।"[৪]

সকল মুহাদ্দিস, ফকীহ ও বুজুর্গ একবাক্যে বলেছেন যে, সকল যিক্‌রের শ্রেষ্ঠ যিক্‌র কুরআন তিলাওয়াত।[৫] সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি) বলেন :

أَفْضَلُ الذِّكْرِ تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ فِيْ الصَّلاَةِ ثُمَّ تِلاَوَةُ الْقُرْآنِ فِيْ غَيْرِ الصَّلاَةِ ثُمَّ الصَّوْمُ ثُمَّ الذِّكْرُ

"সর্বোত্তম যিক্‌র সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত, এরপর সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াত, এরপর সিয়াম, এরপর অন্যান্য যিক্‌র।"[৬]

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেছেন:

فَضْلُ كَلامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

"সকল কথার উপর কুরআনের মর্যাদা ঠিক অনুরূপ যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর মর্যাদা।" হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন।[৭]

১. ১৭. ২. কুরআন শিক্ষার ফযীলত

কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা, গবেষণা, কুরআনের অর্থ চিন্তা করা, অনুধাবন করা, শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া ইবাদত ও সর্বোত্তম যিকর। যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন, আলোচনা, শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি কাজে রত থাকেন তাহলে স্বভাবতই তিনি পূর্বের হাদীসসমূহে বর্ণিত যিক্‌রের ফযীলতসমূহ সর্বোত্তম পর্যায়ে অর্জন করবেন। এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে কুরআন কেন্দ্রিক

যিক্রসমূহের অতিরিক্ত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দানের ফযীলতের বিষয়ে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآن وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দান করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১]

উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন: আমরা মসজিদে নববী সংলগ্ন সুফফাতে ছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এসে বলেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কি চায় যে, প্রতিদিন মদীনার উপকণ্ঠে আকীক প্রান্তরে যেয়ে কোনো পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতি না করে দু'টি বিশাল উঁচু চুট উটনী নিয়ে ফিরে আসবে? আমরা বললাম: আমরা প্রত্যেকেই তা পছন্দ করি। তিনি বলেন :

فَلأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاثٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الإِبِلِ

"তোমাদের কেউ যদি মসজিদে যেয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত শিক্ষা করে তবে তা দু'টি অনুরূপ উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম। তিনটি তিনটির চেয়ে এবং চারটি চারটির চেয়ে উত্তম...।"[২]

আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنْ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ

"(মসজিদে বা কোথাও) যেয়ে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য ১০০ (একশত) রাক'আত সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। (মসজিদে বা কোথাও) যেয়ে ইল্মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমরা জন্য ১০০০ (একহাজার) রাক'আত সালাত আদায় করা থেকে উত্তম।" হাফিয মুনযিরী হাদীসটির সনদ হাসান বলেছেন। কেউ কেউ সনদের দুর্বলতা দেখিয়েছেন।[৩]

স্বভবাতই, এ সকল হাদীসে কুরআন শিক্ষা বলতে কুরআন তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন ও তার বিধানাবলী শিক্ষা করা বুঝান হয়েছে। আমরা আজ ইসলামের মূল প্রেরণা ও শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। একদিন আমার এক বাংলাদেশী বন্ধুকে এক মিশরীয় বন্ধুর সাথে পরিচয় করে দিয়ে বললাম: আমার বন্ধু হাফিজ অমুক। মিশরীয় বন্ধু বললেন: তাই! হাফিজ!! একলক্ষ হাদীস মুখস্থ আছে? আমি বললাম: না, তা নয়। হাফিযে কুরআন। কুরআন মুখস্থ আছে। মিশরীয় বন্ধু বললেন: মুসলিম উম্মাহর আগের দিনে প্রত্যেক আলিম, বরং সকল শিক্ষার্থীই কুরআন মুখস্থ করতেন। কুরআন মুখস্থকারীকে বিশেষভাবে কখনো হাফিজ বলা হতো না। সকলেই তো কুরআন মুখস্থ করেছেন, কাজেই কে কাকে হাফিজ বলবেন। লক্ষাধিক হাদীস মুখস্থ করতে পারলে তাকে হাফিজ বলা হতো। এখন আর কেউ হাদীস মুখস্থ করতে পারি না। অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলিম বরং অধিকাংশ আলিম কুরআনও মুখস্থ করেন না। এজন্য কুরআনের হাফিজকেই হাফিজ বলা হচ্ছে। হয়ত এমন দিন আসবে, যেদিন একপারা কুরআন মুখস্থ করলেই তাকে সসম্মানে হাফিজ বলা হবে!

কুরআন শিক্ষা, তিলাওয়াত, শোনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এ অবস্থা। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশে এবং সাহাবী-তাবেয়ীগণের ভাষায় ও কর্মে এগুলি সবই ছিল অর্থ বুঝা ও হৃদয়ঙ্গম করা ও জীবনকে সে অনুসারে পরিচালিত করার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা কুরআন শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র না বুঝে দেখে দেখে উচ্চারণ শিক্ষাকেই বুঝি। এর চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করি না।

আমরা জানি যে, সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের ভাষা ছিল আরবী। আরবী ভাষা বুঝার ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সকলের শীর্ষে। তা সত্ত্বেও তাঁরা কুরআনের ৫/১০ টি আয়াতের বেশি একবারে শিখতেন না। ৫/১০টি আয়াত শিখে, সেগুলোর অর্থ, ব্যাখ্যা, নির্দেশনা ও কিভাবে তা পালন করতে হবে সবকিছু না শিখে পরবর্তী আয়াত তাঁরা শুরু করতেন না। এমনকি অনেক সাহাবী ১০/১২ বছর ধরে একটি সূরা শিক্ষা করেছেন। অর্থ না বুঝে এবং আমল না করে শুধুমাত্র কুরআন তিলাওয়াত করাকে তাঁরা অন্যায় বলে জেনেছেন। বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

প্রখ্যাত তাবিয়ী আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ যাঁরা আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন তাঁরা বলেছেন:

إِنَّهُمْ كَانُوا يَأخذون مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ آيَاتٍ فَلا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ.

"তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দশটি আয়াত শিখে সেগুলোর মধ্যে যা ইল্ম ও আমল আছে সব না শিখে পরবর্তী দশ আয়াত শেখা শুরু করতেন না।"[৪]

ইবনু মাস'ঊদ, উবাই ইবনু কা'ব, উসমান (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে দশ আয়াত শিক্ষা দিতেন। তাঁরা এ দশ আয়াতের মধ্যে যত প্রকার আমল আছে সব না শিখে পরবর্তী আয়াত শিখতে শুরু করতেন না। এভাবে তিনি তাঁদেরকে কুরআন ও আমল একত্রে শিক্ষা দান করতেন।[১]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) আট বছর ধরে সূরা বাকারাহ শিক্ষা করেন। উমার (রা) বার বছর ধরে সূরা বাকারাহ শিক্ষা করেন। যেদিন সূরাটি শিক্ষা সমাপ্ত হয় সেদিন তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জানাতে একটি উট জবাই করে খাওয়ান।[২]

ইবনু উমার (রা) বলেন, "আমাদের যুগের মানুষেরা কুরআন শিক্ষার পূর্বে ঈমান অর্জন করতেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর কুরআনের কোনো সূরা নাযিল হলে সে সময়ের মানুষ সাথে সাথে সেই সূরার আহকাম, হালাল, হারাম, কোথায় থামতে হবে ইত্যাদি সবকিছু শিখে নিতেন। এরপর এমন মানুষদের দেখছি, যাঁরা ঈমানের আগেই কুরআন শিখছে। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে জানে না কুরআন তাকে কি নির্দেশ প্রদান করছে, কি থেকে নিষেধ করছে এবং কোথায় তাকে থামতে হবে। এরা কুরআনকে শুধু দ্রুত পড়ে যায় যেমন করে বাজে খেজুর ছিটিয়ে দেওয়া হয় তেমনভাবে।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

ইবনু উমার (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণ যারা এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ তাঁদের অনেকেই কুরআনের দু-একটি সূরা মাত্র জানতেন। তবে তাঁরা কুরআন অনুসারে জীবন পরিচালনার তাওফীক পেয়েছিলেন। আর এ উম্মতের শেষ জামানার মানুষেরা ছোট, বড়, অন্ধ সকলেই কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন অনুসারে কর্ম করতে পারবে না।[৪]

মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেনঃ "তোমরা যা ইচ্ছা যত ইচ্ছা ইল্‌ম অর্জন কর। কিন্তু যতক্ষণ না তোমরা ইল্‌মকে কর্মে বা আমলে পরিণত করবে ততক্ষণ আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো পুরস্কার বা সাওয়াব প্রদান করবেন না।[৫]

প্রিয় পাঠক, কুরআন শিক্ষার এ মহান মর্যাদা যদি আমরা পেতে চাই তবে আমাদেরকে প্রথমে এ কুরআনের মর্যাদা হৃদয়পটে আঁকতে হবে। আমরা যদি উপরের হাদীসগুলো সত্যিকারের ঈমান নিয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্যিকার অর্থে আল-আমীন, আস-সাদেক, মহাসত্যবাদী হিসেবে অবচেতন মনের গভীরে সুদৃঢ় বিশ্বাসে মেনে নিয়ে তাঁর উপর্যুক্ত বাণীগুলোকে হৃদয়ের পটে এঁকে রাখতে পারি তাহলেই আমরা পরবর্তী নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নিতে পারব।

প্রথম পদক্ষেপঃ প্রথম পদক্ষেপ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা। আমাদের দেশের হাজার হাজার ধার্মিক মানুষ জীবনের মধ্যপ্রান্তে বা শেষপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন। তারা দীর্ঘদিন বিভিন্ন দরবার, বুজুর্গ, ইসলামী দল বা গ্রুপের সাথে সংযুক্ত আছেন। হয়ত তারা নিজেদেরকে যাকির মনে করেন। কিন্তু তারা কুরআনের একটি সূরাও বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন না। তারা দেখে কুরআন পড়তেও পারেন না। কি দুর্ভাগ্য আমাদের !!

আমরা প্রতিদিন, প্রতিমাসে ও প্রতি বছর শত শত ঘণ্টা সময় গল্প গুজব করে, খবর পড়ে শুনে বা আলোচনা করে, গীবত ও পরচর্চা করে, খেলাধুলা করে বা দেখে নষ্ট করি। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করার সময় পাই না। বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখতে বড়জোর ৪/৫ মাস নিয়মিত প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক ব্যয় করলেই সম্ভব। আমরা অনেকে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় অনেক সময় সুন্নাত-সম্মত বা খেলাফে সুন্নাত যিক্‌র আযকার করে কাটাই। অথচ এ সকল যিক্‌রের চেয়ে বড় যিক্‌র মুমিনের জীবনের অন্যতম নূর কুরআন করীম তিলাওয়াত শিক্ষা করি না। আল্লাহর কালামের প্রতি এ চরম অবহেলা করছেন আল্লাহর যাকিরগণ! আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে আহলে কুরআন হওয়ার তাওফীক দান করেন ; আমীন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ কুরআন বুঝার মতো আরবী ভাষা শেখা। আমি অনেক নও মুসলিমকে দেখেছি তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পরে অতি আগ্রহের সাথে শত ব্যস্ততার মধ্যেও বিভিন্ন বই পুস্তক বা কোর্সের মাধ্যমে আরবী শিক্ষা করেন এবং কিছু সময়ের মধ্যেই কুরআন বুঝার মতো চলনসই আরবী শিখে ফেলেন। আসলে বিষয়টি ভালবাসা ও গুরুত্ব প্রদানের উপর নির্ভর করে।

তৃতীয় পদক্ষেপঃ আরবী ভাষা শিক্ষা করা সম্ভব না হলে অন্তত কুরআনের এক বা একাধিক অনুবাদ গ্রন্থ বা বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় তাফসীর গ্রন্থ সংগ্রহ করে নিয়মিত তিলাওয়াতের সাথে সাথে অর্থ পাঠ করা। এভাবে আমরা অন্তত মূল না বুঝলেও অনুবাদের মাধ্যমে কুরআনের আলোয় নিজেদের আলোকিত করতে পারব। হয়ত আমরা এভাবে কুরআনের সাথী আল্লাহর পরিজন হয়ে যেতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমি এমন অনেক ভাইকে চিনি যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত বা অতি অল্প শিক্ষিত। আরবী মোটেও জানেন না। কিন্তু নিয়মিত কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর পাঠের ফলে তাদের অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, কুরআনের যে কোনো স্থান থেকে তিলাওয়াত করলে তার অর্থ অনুধাবন করতে পারেন। শাব্দিক অর্থ বুঝেন না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সে আয়াতগুলোতে কি বলা হয়েছে তা বুঝতে পারেন।

বিশেষ সাবধানতাঃ আমরা সাধারণত আল্লাহর কিতাবের জন্য এত পরিশ্রম! করার সময় পাই না। এত আগ্রহও আমাদের নেই। কিন্তু যদি কেউ সে তাওফীক পান, তবে শয়তান অন্য পথে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে। শয়তান তার মধ্যে অহঙ্কার প্রবেশ করায়। তিনি মনে করতে থাকেন যে, তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, তিনি সমাজের অন্য অনেকের চেয়ে ইসলাম ভাল জানেন, সমাজের আলিমগণ কুরআন বুঝেন না, আলিমরাই ইসলাম নষ্ট করলেন, ইত্যাদি।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, সকল প্রকারের অহঙ্কারই কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ। সবচেয়ে খারাপ অহঙ্কার জ্ঞান বা ধার্মিকতার অহঙ্কার। বস্তুত মুমিন কুরআন পাঠ করেন ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি পালন করেন একান্তই নিজের জন্য। কুরআন পাঠ করে মুমিন আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার আশা করেন। মুমিন কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য। অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় অন্যের দিকে তাকানোর কারণে। মুমিন কখনোই অন্যের ভুল ধরার জন্য বা অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করার জন্য ইবাদত করেন না। যখনই মনে হবে যে, আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হয়ে কুরআন পড়ি, কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি, অথচ অমুক আলিম বা তমুক ব্যক্তি তা পড়েনি, অথবা সমাজের আলিমগণ কুরআন পড়ে না... ইত্যাদি তখনই বুঝতে হবে যে, শয়তান মুমিনের এত কষ্টের উপার্জন ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বাঁচতে হলে সতর্ক হতে হবে। অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি চিন্তা করা অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। সর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে যে, আল্লাহ যেন কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা ও পালনের ইবাদত কবুল করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ নিয়ামত বহাল রাখেন।

অহঙ্কারের আরেকটি প্রকাশ যে, আল্লাহর তাওফীকে কিছুদিন কুরআন চর্চার পরে নিজেকে বড় আলিম মনে করা এবং বিভিন্ন শরয়ী মাসআলা বা ফাতওয়া প্রদান করতে থাকা। কুরআন চর্চাকে নিজের আখেরাত গড়া ও আল্লাহর দরবারে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে। নিজের জীবন সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। ফাতওয়ার দায়িত্ব আলিমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন পড়বেন, শিখবেন ও চর্চা করবেন নিজের জন্য। তবে প্রত্যেক মুসলিমই বিশেষজ্ঞ আলিম হবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে চিরশত্রু শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন।

১. ১৭. ৩. কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

কুরআনী যিক্‌রের সর্বপ্রথম কাজ তিলাওয়াত। আল্লাহর মহান বাণী তিলাওয়াত করার চেয়ে বড় যিক্‌র বা মহান কর্ম আর কিছুই হতে পারে না। তিলাওয়াত বলতে মূলত কুরআন ও হাদীস বুঝে ও হৃদয় দিয়ে তিলাওয়াত করা বুঝান হয়েছে। তবে আমরা আশা করব, অপারগতার কারণে আমরা না বুঝে তিলাওয়াত করলেও আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে এ সকল সাওয়াব ও পুরস্কার প্রদান করবেন। বিশেষত যদি আমরা তিলাওয়াতের পাশাপাশি অনুবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে থাকি। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"যখন তাঁদের (মুমিনদের) নিকট আল্লাহর (কুরআনের) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।"[১]

আমরা বুঝতে পারি যে, আয়াতের অর্থ যদি হৃদয়কে আলোড়িত না করতে পারে তাহলে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

"আল্লাহ সর্বোত্তম বাণীকে সুসমঞ্জস এবং বারবার আবৃত্তিকৃত গ্রন্থ হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে এই গ্রন্থ থেকে (এ গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করলে) তাদের শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়। এরপর তাদের দেহ ও মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।"[২]

কুরআনের অর্থ হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃদয়কে নাড়া না দিলে শরীর কিভাবে শিহরিত হবে? মন কিভাবে প্রশান্ত হবে? তিলাওয়াতের সাথে সাথে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। এখানে প্রথমে তিলাওয়াতের ফযীলত বিষয়ক কিছু হাদীস উল্লেখ করছি।

(১). ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أقول: ألم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করবে সে একটি পুণ্য বা নেকী অর্জন করবে। পুণ্য বা নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে। আমি বলছি না যে, (আলিফ-লাম-মিম) একটি বর্ণ। বরং 'আলিফ' একটি বর্ণ, 'লাম' একটি বর্ণ ও 'মীম' একটি বর্ণ।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

(২). আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهُ أَجْرَانِ

"যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে সুপারদর্শী সে সম্মানিত ফিরিশতাগণের সাথে। আর কুরআন তিলাওয়াত করতে যার জিহ্বা

জড়িয়ে যায়, উচ্চারণে কষ্ট হয়, কিন্তু কষ্ট করে অপারগতা সত্ত্বেও সে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার।”[১]

(৩). অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُو حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ

“যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে তা তিলাওয়াত করেন তিনি নেককার সম্মানিত ফিরিশতাগণের সাথে। আর যিনি বারবার কুরআন তিলাওয়াত করে তা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন এবং তার জন্য খুব কষ্টকর হচ্ছে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে।”[২]

(৪). আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ

“তোমরা কুরআন পাঠ করবে; কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তার সঙ্গীদের (কুরআন পাঠকারীগণের) জন্য শাফা’আত করবে।”[৩]

(৫). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ

“কিয়ামত দিনে সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য শাফা’আত করবে। সিয়াম বলবে: হে প্রভু, আমি একে দিনের বেলায় খাদ্য ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফা’আত কবুল করুন। কুরআন বলবে: হে প্রভু, আমি রাতের বেলায় তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফা’আত কবুল করুন। তখন তাদের উভয়ের শাফা’আত কবুল করা হবে।” হাদীসটি সহীহ।[৪]

(৬). মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“সকালে ও বিকালে তোমার মনের মধ্যে বিনয়, আকুতি ও ভয়ভীতির সাথে অনুচ্চ শব্দে আল্লাহর যিক্‌র কর এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।”[৫]

তাহলে আল্লাহর যিক্‌র না করলে সে অমনোযোগী এবং অমনোযোগী হওয়া নিষিদ্ধ। রাতে অন্তত কুরআনের ১০০ টি আয়াত তিলাওয়াত করলে বা তাহাজ্জুদে পাঠ করলে বান্দা আল্লাহর দরবারে অমনোযোগী হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ صَلَّى فِيْ لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَة لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى فِيْ لَيْلَةٍ بِمِائَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ

“যে ব্যক্তি রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাতে ১০০ আয়াত পাঠ করবে তাঁকে গাফিল বা অমনোযোগীদের তালিকায় লেখা হবে না। আর যে ব্যক্তি রাত্রের (তাহাজ্জুদের) সালাতে ২০০ আয়াত পাঠ করবে তাঁকে আল্লাহর খাঁটি, মুখলিস নেককার বান্দা হিসেবে লেখা হবে।” হাদীসটি সহীহ।[৬]

অন্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, অন্তত দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলে বা তাহাজ্জুদে পাঠ করলেও বান্দা অমনোযোগী হওয়ার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِى لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত পাঠ করবে তাকে গাফিল বা অমনোযোগীদের দলভুক্ত হিসেবে লেখা হবে না।” হাদীসটি সহীহ।[৭]

(৭). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النُّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُوْحَى إِلَيْهِ لاَ يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ وَلاَ يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَفِيْ جَوْفِهِ كَلاَمُ اللهِ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করল সে ধাপেধাপে নবুয়তের সিঁড়ি বেয়ে নিজের দেহের মধ্যে নবুয়ত গ্রহণ করল। পার্থক্য এটাই যে তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করা হবে না। (অর্থাৎ সে ওহী পেল না, তবে ওহীর বা নবুয়তের জ্ঞান সে গ্রহণ করল)। কুরআনের অধিকারীর উচিত নয় যে, নিজের মধ্যে আল্লাহর কালাম থাকা অবস্থায় সে অন্যান্য মানুষদের মতো আবেগ তাড়িত হবে, অথবা কেউ রাগ করলে বা উত্তেজিত হলে সেও রাগ করবে বা উত্তেজিত হবে।"[১]

স্বভাবতই এসকল হাদীসে কুরআন পাঠ বলতে বুঝে ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে পড়া বুঝানো হয়েছে। তোতাপাখিকে তো আর আলিম বলা যায় না। যিনি অর্থ বুঝে কুরআন পাঠ করেন তিনিই তার হৃদয়ে নবুয়তের ইল্‌ম ধারণ করেন।

(৮). আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَأْهُ وَارْقَهْ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا

"কিয়ামতের দিন কুরআনের সাথীকে বলা হবেঃ তুমি দুনিয়াতে যেভাবে তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে সেভাবে পড় এবং উপরে উঠতে থাক। তোমার পড়া যে আয়াতে শেষ হবে সেখানে তোমার আবাসস্থাল।" হাদীসটি সহীহ।[২]

অর্থাৎ, জান্নাতের উঁচু মর্যাদা লাভের বা উপরে উঠার ধাপ হবে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা অনুসারে। যে ব্যক্তি যত আয়াত পাঠ করতে পারবেন তিনি তত উপরে উঠে উচ্চ মর্যাদায় নিজেকে আসীন করবেন।

১. ১৭. ৪. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত অপরিহার্য

কুরআন তিলাওয়াত অর্থ আরবী ভাষার রীতিতে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুসারে ধীরে ধীরে, পরিপূর্ণ ভালবাসা সহকারে পাঠ করা। আমাদের দেশে সাধারণ ধার্মিক মুসলিম ছাড়াও অনেক আলিম বা 'কুরআন গবেষক'ও 'বাংরবি' ভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করেন। 'হামি টুমাকে ওয়ালোওয়াছি'– কথাটির সকল শব্দ মূলত বাংলা হলেও একে আমরা বাংলা বলতে পারি না। হয়ত 'ইংলা' বা 'বাংলিশ' বলা যেতে পারে। তেমনি বাংলা উচ্চারণে কুরআন পাঠ কখনই আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত বলে গণ্য নয়।

আরবী ভাষায় প্রতিটি বর্ণের নির্দিষ্ট উচ্চারণ স্থল, উচ্চারণ পদ্ধতি, সিফাত বা গুণাবলী, মদ্দ বা দীর্ঘতা ও অন্যান্য উচ্চারণ বিষয়ক নিয়মাবলী রয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমকে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন। আরবী ভাষার রীতি অনুসারে না পড়লে কখনই কুরআন তিলাওয়াত করা হবে না। এ বিষয়ে সাধারণ মুসলিম তো দূরের কথা অধিকাংশ মাদ্রাসাতেও অমার্জনীয় অবহেলা বিরাজমান। সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগে লক্ষ লক্ষ অনারব ইসলামের ছায়াতলে আসেন। তারা কুরআনের বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের বিষয়ে কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করতেন ও উচ্চারণের সামান্যতম বিচ্যুতিকে কিভাবে কঠিন গোনাহ ও ভয়ঙ্কর বেয়াদবী বলে মনে করতেন সে বিষয়ে অনেক বিবরণ আমরা হাদীসের গ্রন্থসমূহে পাই।[৩]

১. ১৭. ৫. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তিলাওয়াত পদ্ধতি

বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণের পাশাপাশি কুরআনকে শান্তভাবে, ধীরে, স্পষ্টকরে ও টেনে টেনে পড়তে হবে। এটি আল্লাহর নির্দেশিত ফরয। এ বিষয়ে আমাদের অপরাধ বড় কঠিন। অধিকাংশ হাফিজই দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করেন। তারাবীহের সালাতে যদি কোনো হাফিজ একটু ধীরে তিলাওয়াত করেন তাহলে মুসল্লীগণ ঘোর আপত্তি শুরু করেন। বাধ্য হয়ে হাফিজ সাহেব এমনভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন যাতে তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা প্রথম ও শেষের কয়েকটি শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে বা বুঝতে পারেন না। কাজেই, সাওয়াব তো দূরের কথা কুরআনের সাথে বেয়াদবীর অপরাধ কঠিন হয়ে পড়ে। আল্লাহ বলেনঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا

"এবং ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন আবৃত্তি করুন।"[৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, হাসান বাসরী, কাতাদাহ ও অন্যান্য সকল সাহাবী ও তাবেয়ী মুফাসসির (রাহ) বলেছেন যে, তারতীল অর্থ কুরআনকে ধীরে ধীরে, শান্তভাবে, সুস্পষ্ট করে ও টেনে টেনে পড়া, যেন তা বুঝা ও তার অর্থ চিন্তা করা সহজ হয়।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এভাবেই তিলাওয়াত করতেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ

كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের সূরা তিলাওয়াত করলে তারতীলসহ বা ধীর ও শান্তভাবে তিলাওয়াত করতেন, ফলে সূরাটি যতটুকু

লম্বা তার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা হয়ে যেত।"[১]

আনাস (রা) রাসূলুল্লাহর (ﷺ) তিলাওয়াত পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন :

كَانَتْ مَدًّا

"তাঁর কিরাআত ছিল টেনে টেনে।"[২]

উম্মু সালামাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তিলাওয়াত সম্পর্কে বলেন:

كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً

"তিনি প্রত্যেক আয়াতে আয়াতে থামতেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

হাফসা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিলাওয়াত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "তোমরা তাঁর মতো তিলাওয়াত করতে পারবে না।" প্রশ্নকারীগণ তবুও একটু শোনাতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি খুব ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করেন। হাদীসটি সহীহ।[৪] অন্য হাদীসে হুযাইফা (রা) বলেন :

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ

"এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি সূরা বাকারাহ শুরু করলেন। আমি ভাবলাম তিনি হয়ত ১০০ আয়াত পাঠ করে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি ১০০ আয়াত পার হয়ে গেলেন। আমি ভাবলাম তিনি হয়ত এ সূরা শেষ করে রুকু করবেন। কিন্তু তিনি সূরা 'নিসা' শুরু করলেন এবং তা পুরোপুরি পাঠ করলেন। এরপর তিনি সূরা 'আলে ইমরান' শুরু করলেন এবং তা শেষ করলেন। তিনি ধীরে ধীরে টেনে টেনে তিলাওয়াত করলেন। যখন তাসবীহের উল্লেখ আছে এমন কোনো আয়াত তিনি পড়ছিলেন তখন তিনি তাসবীহ পাঠ করছিলেন। যখন কোনো প্রার্থনার উল্লেখ আছে এমন কোনো আয়াত পাঠ করছিলেন, তখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন। আবার আশ্রয় চাওয়ার উল্লেখ আছে এমন আয়াত আসলে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। ... ।"[৫]

বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ধীরে ধীরে টেনে টেনে পড়ার সাথে সাথে যথাসম্ভব সুন্দর ও মধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে সাধ্যমতো মধুর ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি হাদীসে বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

"তোমরা কুরআনকে তোমাদের কণ্ঠস্বর দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।" হাদীসটি সহীহ।[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বলেন :

لاَ تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذِّ الشِّعْرِ وَلاَ تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلاَ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّوْرَةِ.

"তোমরা কুরআনকে কবিতার মত আবৃত্তি করবে না বা সস্তা খেজুর ছিটিয়ে দেওয়ার মতো ছিটিয়ে দেবে না। কুরআনের আশ্চর্য বাণী থেমে ও বুঝে পড়বে। কুরআন দিয়ে হৃদয়কে নাড়া দেবে। কখন খতম হবে বা কখন সূরার শেষে পৌঁছাব এ চিন্তা করে কখনো কুরআন তিলাওয়াত করবেন না।"[৭]

১. ১৭. ৬. কুরআনের অর্থ চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার ফযীলত

কুরআন করীমকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন অনুধাবন করার জন্য, না বুঝে তোতাপাখীর মথ তিলাওয়াতের জন্য নয়। কুরআনের তিলাওয়াত যেমন একটি ইবাদত, কুরআন অনুধাবন করা, বুঝা ও কুরআন নিয়ে চিন্তা করা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই তা অনুধাবন করা। উপরের হাদীসগুলো আলোচনা করতে যেয়ে আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছি যে, কুরআন পাঠের ফযীলত মূলত পাঠ করে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য। হৃদয়ঙ্গম করলেই নবুয়তের ইল্‌ম আমাদের মধ্যে সঞ্চিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের যুগে বা ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে এভাবেই কুরআন পাঠ করতেন মুসলিমগণ।

যেসকল অনারব দেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে সেসকল দেশের মানুষও কুরআন বুঝার মতো আরবী শিখে নিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখন না বুঝেই পড়ি। তবুও আশা করব যে, আল্লাহ্ দয়া করে আমাদেরকে কুরআন পাঠের নির্ধারিত সাওয়াব দান করবেন।

মহান আল্লাহ বারবার উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং তা বুঝার জন্য সহজ করেছেন যেন সবাই তা বুঝতে পারে ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 'এ কুরআনে আমি বিভিন্ন উপদেশ, উদাহরণ, বিধান ইত্যাদি উল্লেখ করেছি যেন তারা অনুধাবন করতে ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।' প্রায় ৫০ স্থানে এভাবে বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ

"এক বরকতময় গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন তারা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।"[১]

কুরআন কারীমে চার স্থানে মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি , কে আছে উপদেশ গ্রহণ করার ?"[২]

যারা কুরআন বুঝতে চেষ্টা করে না তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে:

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কুরআনকে অনুধাবন করে না? না কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?"[৩]

বিভিন্ন হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে অনুধাবন করতে ও চিন্তা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনি কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করবে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে না তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে।[৪]

আল্লাহর কিতাব পাঠ করাকে কুরআন কারীমে 'তিলাওয়াত' বলা হয়েছে, কারণ তিলাওয়াত অর্থ অনুসরণ করা। এজন্য কুরআন শুধুমাত্র না বুঝে পাঠ করলে তিলাওয়াত হয় না। বুঝে পাঠ করে তা অনুসরণ করে চললেই তা তিলাওয়াত বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

"যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তাঁরা তা সত্যিকারভাবে তেলাওয়াত করে, তাঁরাই এ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে।"[৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন, দু'টি গুণ থাকলেই তা 'হক্ক তিলাওয়াত' বা 'সত্য তিলাওয়াত' হবে: (১). পঠিত আয়াতের অর্থ বুঝে হৃদয়কে তার সাথে একাত্ম করে তিলাওয়াত করতে হবে। (২). পঠিত আয়াতের সকল বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ ও পালন করতে হবে।

উমার (রা) বলেন: 'হক্ক তিলাওয়াতে পঠিত আয়াতের সাথে হৃদয় আলোড়িত হবে। যে আয়াতে শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেখানে থেমে আল্লাহর কাছে শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। যে আয়াতে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, সেখানে থেমে আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে হৃদয় দিয়ে তিলাওয়াত করলেই তা 'সত্যিকার তিলাওয়াত' বলে গণ্য হবে।[৬]

ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য ইমাম সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের সময়েও আয়াতের অর্থ অনুযায়ী থেমে থেমে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে পছন্দ করতেন। জাহান্নামের কথা আসলে আশ্রয় প্রার্থনা করা, জান্নাতের কথা আসলে জান্নাত চাওয়া, ক্ষমার কথা আসলে ইস্তিগফার করা এবং এভাবে হৃদয়কে আলোড়িত করে সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতে তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, বিশেষত সকল প্রকার সুন্নাত-নফল সালাতে।[৭]

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ, আবু রাযীন, কাইস ইবনু সা'দ, 'আতা, হাসান বাসরী, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, আবুল আলিয়াহ, ইব্রাহীম নাখয়ী প্রমুখ সকল তাবিয়ী, তাবে-তাবিয়ী মুফাসসির বলেছেন যে, সত্যিকার তিলাওয়াতের অর্থ পঠিত সকল আয়াতের সকল প্রকার বিধানাবলী পরিপূর্ণ পালন ও অনুসরণ করা। কুরআনের সহজ সঠিক অর্থ বুঝা ও সকল প্রকার দূরবর্তী ও বিকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা থেকে দূরে থাকা। যারা এভাবে বুঝবেন ও পালন করবেন তারাই শুধু সত্যিকার তিলাওয়াতকারী বলে গণ্য হবেন।[৮]

আমরা কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ও সাহাবীগণের বাণী থেকে জেনেছি, কুরআন তিলাওয়াতের অন্যতম আদব কুরআন দিয়ে অন্তরকে নাড়ানো। অন্তর নড়লেই ঈমান বৃদ্ধি পাবে, শরীর শিহরিত হবে এবং কর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে।

১. ১৭. ৭. কুরআন আলোচনা ও গবেষণার ফযীলত

কুরআনের ‘তাদারুস’ বা পারস্পরিক আলোচনা-গবেষণা পৃথক ইবাদত, বিশেষত মসজিদে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيت مِنْ بُيوتِ اللهِ تَعَالَى، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ (يَقْرَؤُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ كِتَابَ اللهِ)، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ .

“যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত ও শিক্ষাগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে পরস্পরে তা অধ্যয়ন করে, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদের আবৃত করে নেয়, ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে ধরেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকটস্থদের নিকট তাদের যিক্‌র করেন।”[১]

১. ১৭. ৮. কুরআন শ্রবণের ফযীলত

কুরআন তিলাওয়াতের ন্যায় মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করাও একটি বড় ইবাদত ও আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম ওসীলা। আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“এবং যখন কুরআন পাঠ করা হবে, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করবে এবং চুপ করে থাকবে, তাহলে হয়ত তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে।”[২]

ইমাম তাবারী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : মহান আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান করলেন যে, – হে মুমিনগণ, যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ কর, যেন তা ভালভাবে বুঝতে পার এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পার। আর কুরআন পাঠের সময় চুপ করে থাকবে, যেন তা বুঝতে, হৃদয়ঙ্গম করতে ও তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পার। কুরআন পাঠের সময় কথা বলবে না, তাহলে তা বুঝতে অসুবিধা হবে। আর এভাবে কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারলে... তোমরা আল্লাহর রহমত অর্জন করতে পারবে।[৩] কুরআন শ্রবণের ফযীলত ও বরকত প্রমাণের জন্য এ আয়াতই যথেষ্ট। এ বিষয়ক এ হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَلاَهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে, তার জন্য বহুগুণ বর্ধিত সাওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি তা তিলাওয়াত করবে, তার জন্য এ আয়াতটি কিয়ামতের দিন নূরে পরিণত হবে।” হাদীসটির সনদ দুর্বল। তবে একাধিক সনদের কারণে তার নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪]

অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন :

مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً

“যদি কেউ আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতও শ্রবণ করে, তাহলে তা কিয়ামতের দিন তার জন্য নূরে পরিণত হবে।”[৫]

অনেক তাবেয়ী মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা তিলাওয়াতের চেয়েও বেশি সাওয়াবের বলে মনে করতেন। তাবিয়ী খালিদ ইবনু মা'দান (১০৩ হি) বলেন:

إِنَّ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَهُ أَجْرٌ وَإِنَّ الَّذِيْ يَسْتَمِعُ لَهُ أَجْرَانِ

“যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার। আর যিনি তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার।”[৬]

১. ১৭. ৯. কুরআনের মানুষ হওয়ার ফযীলত

‘আহলুল কুরআন’ অর্থাৎ কুরআনের সাথী বা কুরআনের মানুষ হওয়ার অর্থ জীবনকে কুরআন কেন্দ্রিক ও কুরআন অনুসারী করা। আর এ অবস্থা মুমিনের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

“মানুষের মধ্যে আল্লাহর পরিবার পরিজন রয়েছে। সাহাবীগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, তাঁরা কারা? তিনি বলেন: তারা ‘আহলুল

কুরআন' বা কুরআনের অধিকারী। তারাই আল্লাহর পরিজন ও আল্লাহর খাস ওলী।" হাদীসটি সহীহ।[১]

মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া কুরআন কেন্দ্রিক হতে পারা। যাকে আল্লাহ রাতদিন কুরআন চর্চা ও পালন নিয়ে ব্যস্ত থাকার তাওফীক প্রদান করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় নিয়ামত পেয়েছেন। দুনিয়াতে কিছু চাওয়ার থাকলে এ ধরনের নিয়ামতই চাওয়া যায়। হিংসা করার মতো কোনো নিয়ামত থাকলে তা এ নিয়ামত। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآن فَهُوَ يَتْلُوهُ (فَهُوَ يَقُومُ بِهِ) آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ (فِي الْحَقِّ) آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

"শুধু দু ব্যক্তিকেই হিংসা করা যায় (দু ব্যক্তি নিয়ামতের মতো নিয়ামত কামনা করা যায়): যাঁকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন আর সে রাত-দিন শুধু কুরআন তিলাওয়াত বা কুরআন পালনে ব্যস্ত থাকে এবং যাঁকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে রাতদিন সম্পদ হক্ক পথে ব্যয় করতে থাকে।"[২]

কুরআনের মানুষ হলে, জীবনকে কুরআন অনুসারে পরিচালিত করলে এবং সকল কাজে কুরআনকে সামনে রাখলে কুরআন তাঁকে জান্নাতে নিয়ে যাবেই। জাবের (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّارِ.

"কুরআন এমন একজন শাফা'আতকারী যার শাফা'আত কবুল করা হবে, আবার এমন একজন বিবাদী যার অভিযোগ সত্য বলে মেনে নেয়া হবে। যে ব্যক্তি কুরআনকে নিজের জীবনে সামনে রেখে চলবে কুরআন তাঁকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কুরআনকে নিজের পিছে রেখে দেবে কুরআন তাঁকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

কুরআনের মানুষ হলে তার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। মু'আয ইবনু আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যয়ীফ হাদসে বলা হয়েছে :

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا ... فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং কুরআন অনুসারে কর্ম করবে তার পিতা-মাতাকে কিয়ামতের দিন এমন একটি মুকুট পরানো হবে যার জ্যোতি হবে পৃথিবীর সূর্যের জ্যোতির চেয়েও সুন্দরতর। তাহলে যে ব্যক্তি নিজে কর্ম করবে তার পুরস্কার কত হবে তা ভেবে দেখ!" হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।[৪]

বুরাইদা আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَ وَعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجاً مِنْ نُورٍ ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لاَ يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا فَيَقُولاَنِ: بِمَ كُسِينَا هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, কুরআনের ইলম অর্জন করবে ও সে অনুসারে কর্ম করবে, কিয়ামতের দিন তাঁর পিতা-মাতাকে নূরের মুকুট পরানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর মতো এবং তাঁর পিতা-মাতকে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে মূল্যবান একপ্রস্ত পোশাক পরানো হবে। তারা বলবেন: কিসের জন্য আমাদের এসব পরানো হচ্ছে? তাঁদেরকে বলা হবে: তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহণ করার কারণে। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৫]

আলী (রা) থেকে খুবই দুর্বল সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, মুখস্থ করবে, কুরআনের বিধান মেনে কুরআনের হালালকে হালাল হিসেবে পালন করবে ও কুরআনের হারামকে হারাম হিসাবে বর্জন করবে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর পরিবারের দশ ব্যক্তির জন্য তাঁর শাফা'আত কবুল করবেন, যাদের জন্য জাহান্নাম পাওনা হয়ে গিয়েছিল।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটির দুর্বলতা ব্যাখ্যা করেছেন।[৬]

১. ১৭. ১০. কুরআন বুঝে বা না-বুঝে পড়ার অজাচিত বিতর্ক

বর্তমানে আমরা আলিম ও বিদগ্ধ ধার্মিকদের মধ্যে একটি অনাকাঙ্খিত বিতর্ক দেখছি। কেউ বলছেন, কুরআন না বুঝে পড়লে কোনো সাওয়াবই হবে না। এ মত খণ্ডন করতে যেয়ে অন্যরা না-বুঝে পড়াটাকেই ইসলামের মূল শিক্ষা বলে দাবি করছেন। এর পাশাপাশি অনেক আলিম বা ধার্মিক মুমিন কুরআন বুঝে পড়া নিরুৎসাহিত করছেন। তাঁরা ভয় পান যে, কুরআন বুঝে পড়লে বোধহয় মুমিন বিভ্রান্ত হয়ে যাবে! এর বিপরীতের অনেকে কুরআনের তাফসীর-তরজমা পড়ার পরে নিজেকে ফকীহ বা বড় আলিম বলে গণ্য করতে থাকেন। আমরা এখানে এ চারটি বিষয় সংক্ষেপে পর্যালোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে তাওফীক প্রার্থনা করছি।

প্রথম বিষয়: কুরআন না বুঝে পড়লে কোনোরূপ সাওয়াব না হওয়ার দাবিটি সঠিক নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, কুরআনকে অনুধাবন ও অনুসরণের জন্যই নাযিল করা হয়েছে। তবে ইসলামের নির্দেশনাগুলো সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামতের আলোকে অনুধাবন করতে হবে। কুরআনের কমবেশি কিছু কথা তৎকালীন সময়েও অনেকে বুঝতেন না। তাঁরা আলিমদেরকে এ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। আলিমগণ উত্তর দিতেন। তাঁরা কুরআনের অর্থ বুঝতে উৎসাহ দিতেন। তবে না বুঝে তিলাওয়াত করলে তা তিলাওয়াত বলে গণ্য হবে না বলে কেউ বলেন নি। এছাড়া অগণিত অনারব ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সালাতের মধ্যে কুরআনের বিভিন্ন অংশ তিলাওয়াত করেছেন বা ইমামের পিছনে সালাত আদায় করেছেন। কুরআন বুঝতে না পারার কারণে তাদের সালাত বাতিল হয়েছে বলে কেউ বলেন নি। যুক্তি ও বিবেক দাবি করে যে, কেউ যদি কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে আল্লাহর বাণী পাঠের আবেগ নিয়ে তা তিলাওয়াত করতে থাকেন তাহলে তার তিলাওয়াতে আল্লাহর যিকর ও তিলাওয়াতের সাওয়াব হবে।

দ্বিতীয় বিষয়: কুরআন না বুঝে পড়লেও সাওয়াব হবে বলার অর্থ কী? একটি উদাহরণ বিবেচনা করি। এক ব্যক্তি বললেন: টুপি বা জামা ছাড়া সালাত আদায় করলে সালাত হবেই না। তা শুনে একজন আলিমকে আপনি প্রশ্ন করলেন: আমার যদি টুপি বা জামা না থাকে তাহলে আমি কি এগুলো ছাড়া শুধু লুঙ্গি পরে সালাত আদায় করতে পারব? তাকে কি আমার সালাত বৈধ হবে? আমার কি সাওয়াব হবে? উত্তরে আলিম বললেন: হ্যাঁ। উক্ত আলিমের ফাতওয়া থেকে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জীবনে আর কখনো টুপি ও জামার পিছনে সময় নষ্ট করবেন না, সর্বদা এগুলো ছাড়া শুধু লুঙ্গি পরেই সালাত আদায় করবেন।

কুরআনের বিষয়ে আমরা একই ভুল করছি। আমরা জানি, যে কোনো ইবাদত মুমিন সাধ্যমত পালন করলে কিছু সাওয়াবের আশা করতে পারেন। তবে সাওয়াবের নিশ্চয়তা ও পূর্ণতা মূলত সুন্নাত পদ্ধতিতে ইবাদত পালনের মধ্যে। আর যদি সুন্নাতের খেলাফ কোনো পদ্ধতিকে রীতি বানিয়ে নেয়া হয় বা সুন্নাত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করা হয় তাহলে তা বিদআত ও পাপে পরিণত হয়। সালাত, সিয়াম, ইফতার, সাহরী, ওযূ, গোসল, যিকর, ওযীফা ইত্যাদি সকল ইবাদতের ন্যায় কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেও একই বিধান। আমরা অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে সুন্নাত বিবেচনা করলেও তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তা করছি না। কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) কুরআন বুঝে পাঠ করা আল্লাহর নির্দেশ। বুঝে তিলাওয়াত করাই 'হক্ক তিলাওয়াত' এবং এরূপ তিলাওয়াতকারীই মুমিন। আল্লাহ বারবার বলেছেন যে, কুরআনকে অনুধাবন ও উপদেশ গ্রহণের জন্যই নাযিল করা হয়েছে। কুরআন পাঠ করলে শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয় এবং ঈমান বৃদ্ধি পায়। না বুঝে পাঠ করলে তা সম্ভব নয়।

(২) কুরআন বুঝে পাঠ করা, প্রত্যেক আয়াতে থামা, চিন্তা করা ও দুআ করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ ও তাঁর আচরিত সুন্নাত।

(৩) এভাবে প্রত্যেক আয়াত বুঝে, থেমে, চিন্তা করে তিলাওয়াত করা সাহাবীগণের সুন্নাত ও তাঁদের নির্দেশ।

তাহলে, কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশের খেলাফ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাতের খেলাফ। আমরা দস্তরখান, ওযূ, মিসওয়াক, যিকর ইত্যাদি সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে সুন্নাতের গুরুত্ব স্বীকার করলেও তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তা করছি না।

এ কথা ঠিক যে, আমরা অনারব, আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাত মত কুরআন বুঝে পড়া কষ্টকর। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় সুন্নাতকে অবহেলা করা ও গুরুত্বহীন মনে করা। অনারব হওয়া সত্ত্বেও আমরা আরবী নবী (ﷺ)-এর সুন্নাত পোশাক, দস্তরখান, পানাহার পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণের আপ্রাণ চেষ্টা করি, অথচ তাঁর সুন্নাত মত কুরআন তিলাওয়াতের ন্যূনতম চেষ্টাও করি না। অথচ পোশাক, দস্তরখান, পানাহার পদ্ধতি, বসার নিয়ম ইতাদি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহবীগণের নির্দেশ ও তাকীদ পাওয়া যায় না, কিন্তু কুরআন বুঝে তিলাওয়াতের বিষয়ে তাঁদের অনেক নির্দেশ ও তাকীদ পাওয়া যায়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় যে, আমরা তাকীদ বিহীন সুন্নাতগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেও নির্দেশিত ও তাকীদ-কৃত এত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে গুরুত্বহীন ভাবছি ও অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করার চেষ্টা করছি।

কেউ যদি অপারগতার কারণে সুন্নাতের খেলাফ ইবাদত করে তাহলে তার ওজর গ্রহণযোগ্য, তবে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অপারগতা বহাল রাখা, খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ ইবাদত বলে মনে করা, সুন্নাত পদ্ধতির চেয়ে উত্তম মনে করা বা সুন্নাত পদ্ধতিকে অপ্রয়োজনী মনে করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় বিদআত বা বিদআতের রাজপথ।

কুরআন বুঝে পড়া অপ্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ করতে আমরা অনেক সময় উদ্ভট কিছু যুক্তি পেশ করি। আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি বা লক্ষকোটি ব্যক্তি কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করে বা মুখস্থ করে কত বড় বড় "ফায়দা", "বরকত", "আসর" বা ফলাফল পেয়েছেন, কাজেই কুরআন বুঝে তিলাওয়াত করার দাবি অসার ও ভিত্তিহীন!

সম্মানিত পাঠক, সমাজের সকল খেলাফে সুন্নাত কর্ম বা পদ্ধতির পক্ষেই এরূপ যুক্তি পেশ করা হয়। যেমন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দলবদ্ধভাবে, নাচানাচি করে বা অন্য কোনো খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতিতে দরুদ-সালাম পাঠ করে বা যিকির করে অনেকে অনেক "ফায়দা" বা বেলায়াত লাভ করেছেন বলে যুক্তি দিয়ে সুন্নাত পদ্ধতিতে যিকরকে গুরুত্বহীন প্রমাণ করা। দাড়ি না রেখে অন্যান্য ইবাদত করে কত "ফায়দা" ও তাকওয়া অর্জন করেছেন, দাড়ি রেখেও অনেকে বান্দার হক্ক নষ্ট করে, অথচ দাড়ি বিহীন "মুত্তাকী" তার চেয়ে অনেক ভাল... ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে দাড়ির গুরুত্ব অস্বীকার করা। অমুক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ মাদ্রাসায় না পড়েও অনেক বড় মুত্তাকী বা ওলী হয়েছেন বলে যুক্তি দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব অস্বীকার করা। এরূপ হাজারো উদাহরণ দেওয়া যায়। এরূপ যুক্তিগুলো দীনদার মুত্তাকী মুমিনগণ আপত্তিকর বলে বুঝেন, কিন্তু কুরআন বুঝে পড়ার সুন্নাতের বিরুদ্ধে তাঁরাই এরূপ যুক্তি উপস্থাপন করেন।

তৃতীয় বিষয়: কুরআন বুঝা কঠিন বলে দাবি করা অথবা কুরআনের অর্থ পড়লে মুমিন বিভ্রান্ত হতে পারেন বলে দাবি করে কুরআন বুঝতে নিরুৎসাহিত করা ভয়ঙ্কর একটি মহামারি, যাতে অনেক ধার্মিক ও আলিম আক্রান্ত।

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে, তিনি কুরআন অনুধাবন করা সহজ করেছেন। এরপরও কি কোনো মুমিন কল্পনা করতে পারেন যে, কুরআন বুঝা কঠিন? মহান আল্লাহ বারবার বলেছেন যে, তিনি "মুত্তাকীদের" এবং "বিশ্বজগতের" হেদায়াত বা সুপথের দিশারী হিসেবে কুরআন নাযিল করেছেন। এরপরও কি কোনো মুমিন কল্পনা করতে পারেন যে, কুরআন পাঠ করলে কোনো মুমিন বা কোনো কাফির বিভ্রান্ত হতে পারে?

মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুমিনকে কুরআন বুঝে "হক্ক তিলাওয়াত" করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও কুরআন বুঝে তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপরও কি কোনো মুমিন কল্পনা করতে পারেন যে, কুরআন বুঝে তিলাওয়াত করলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাবে?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ "মত"-কেই একমাত্র "ইসলাম" বলে মনে করি এবং নিজ মতের বাইরে গেলেই তা "বিভ্রান্তি" বলে দাবি করি। কুরআন অর্থবুঝে তিলাওয়াত করার পর কোনো মুমিন অন্য কারো সকল বক্তব্য নির্বিচারে গ্রহণ করতে চান না। এজন্য সম্ভবত আমরা সকলেই চাই যে, সাধারণ মুমিনগণ কুরআন-হাদীসের অর্থ না বুঝুন এবং আমরা আলিমগণ বা দায়ীগণ প্রত্যেকে আমাদের পছন্দসই মত বা পথ কুরআন-হাদীসের নামে তাদেরকে বুঝাতে থাকি!

এখানে কয়েকটি বিষয় আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন:

(১) কুরআনের অর্থ বুঝতে গেলে মুমিন ভুল বুঝে বিভ্রান্ত হতে পারেন বলে ধারণা করা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবীগণের নির্দেশ ও বাস্ত ব সত্যের বিপরীত।

মহান আল্লাহ বারবার বলেছেন যে তিনি কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ সহজ করেছেন। প্রত্যেক মুমিনকে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মুমিনের জন্য সালাতে কুরআন পাঠের বিধান দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক মুমিনের জন্য কুরআন শিক্ষা ও হিফজ করার নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন। স্বভাবতই শিক্ষা ও হিফয করা বলতে অর্থ-হৃদয়ঙ্গম করা সহ শিক্ষা ও মুখস্থ করা বুঝানো হয়েছে। অর্থ না বুঝে শিখলে বা তিলাওয়াত করলে সাওয়াব হবে কিনা তা ভিন্ন প্রশ্ন। তবে অর্থ না বুঝে শিক্ষা ও হিফয করার কোনোরূপ নিয়ম সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও ইমামগণের যুগে ছিল না। আরব-অনারব সকলেই অর্থ বুঝেই শিক্ষা ও হিফজ করতেন। আরব, অনারব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, নির্বোধ সকলেই তা কমবেশি অর্থ বুঝে পড়তেন বা শুনতেন। বর্তমান যুগে আরব দেশগুলোতে কুরআনের ভাষা বা 'বিশুদ্ধ আরবী ভাষা' মৃতপ্রায়। কোনো আরব দেশেই তা মাতৃভাষা নয়। যে মুর্খ বা অল্প শিক্ষিত মানুষটি বিশুদ্ধ আরবীতে একটি বাক্যও বলতে পারেন না তিনিও সালাতের মধ্যে বা যে কোনোভাবে কুরআন শুনতে মূল অর্থ বুঝতে পারেন এবং তাঁর হৃদয়ে ব্যাপক আলোড়ন দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায় যে সত্যই কুরআন বুঝা আল্লাহ সহজ করেছেন।

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) কুরআন তিলাওয়াত, শ্রবণ ও হিফজের ক্ষেত্রে কোথাও বলেন নি যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ইলম না শেখা পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াত ও হিফয করা যাবে না। অথবা সাধারণ সালাতগুলোতে নির্দিষ্ট সূরা ছাড়া কোনো সূরা পাঠ করা যাবে না; কারণ অর্থ ভুল বুঝে সাধারণ মুসল্লীরা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। তাহলে কি আমরা মহান আল্লাহর দীনের বিষয়ে তাঁর ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়েও বেশি সতর্ক হতে চেষ্টা করছি?

(২) অনেক সময় আমরা ধারণা করি যে, কুরআনের অনুবাদ করার ক্ষেত্রে হয়ত অনুবাদক ভুল করতে পারে, কাজেই তরজমা কুরআন পাঠ করলে হয়ত মুমিন বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। লক্ষণীয় যে, আমরা অন্যান্য গ্রন্থের তরজমা বা অনুবাদ পড়তে আপত্তি করি না। অথচ অনুবাদকের ভুলের সম্ভাবনা এ সকল গ্রন্থের ক্ষেত্রে বেশি। কুরআন অনুবাদের সময় অনুবাদক ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করেন; কারণ সামান্য ভুল হলেই তাকে কঠিন প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হবে। তারপরও আমরা প্রত্যেক মুমিনকে পরামর্শ প্রদান করি, অজানা বা বিতর্কিত অনুবাদকের অনুবাদ না পড়ে প্রসিদ্ধ আলিমদের অনূদিত তরজমা কুরআন পাঠ করতে এবং সমস্যা অনুভব করলে আলিমদেরকে প্রশ্ন করতে। কিন্তু একটি অবাস্তব সম্ভাবনার অজুহাতে আমরা কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত একটি গুরুত্বপুর্ণ ইবাদত থেকে মুমিনকে নিষেধ করতে পারি না।

(৩) অনেক দীনদার মুমিন বা আলিম কুরআনের তাফসীর বা তরজমা পড়তে নিষেধ করে বলেন যে, তাফসীর করার জন্য অনেক প্রকার ইলম প্রয়োজন! তাঁরা তাফসীর করা ও তাফসীর পড়ার মধ্যে পার্থক্য বুঝেন না। অথবা কুরআন বুঝার মহান ইবাদত থেকে মুমিনকে দূরে রাখার জিদের কারণে পার্থক্য স্বীকার করতে চান না! কুরআনের তাফসীর করার জন্য অনেক প্রকার ইলম প্রয়োজন, কিন্তু তাফসীর পড়তে কোনো প্রকার ইলমেরই প্রয়োজন নেই। কুরআনের তাফসীর বা তরজমা করার যোগ্যতা আছে এমন কোনো আলিমের লেখা তাফসীর বা তরজমা পড়তে কোনো পূর্বশত নেই। দুঃখজনক যে, অনেক সময় আমরা একজন প্রসিদ্ধ আলিমের লেখা বইপত্র

পড়তে পরামর্শ প্রদান করি, অথচ তাঁরই লেখা অনুবাদ বা তাফসীর পড়তে নিষেধ করি!

(৪) কুরআনই সকল হেদায়াতের মূল উৎস। কুরআনকে মুত্তাকীগণের এবং বিশ্বজগতের হেদায়াত বলতে মূলত কুরআনের অর্থকেই বুঝানো হয়েছে। জ্ঞানী, মুর্খ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত যে কোনো মানুষের হৃদয়ে কুরআনের অর্থ প্রবেশ করলে তিনি হেদায়াতের দিশা লাভ করেন। কুরআন ও হাদীস একথারই সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাসের বাস্তবতাও তাই প্রমাণ করে।

(৫) আল্লাহর ইবাদতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে বেলায়াত-কারামত লাভের পরেও কোনো কোনো ওলী বিভ্রান্ত হয়েছেন বলে আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে জানতে পারি। এজন্য কি আমরা আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের চেষ্টা ও বেশি বেশি ইবাদত করার প্রচেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করব? না ইবাদাত ও বেলায়াত অর্জনের চেষ্টা সহ মুমিনকে সতর্কতার পরামর্শ প্রদান করব?

(৬) কুরআন, হাদীস, ফিকহ, উসূল ইত্যাদি সকল ইসলামী জ্ঞান অধ্যয়নের পরেও অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন। এজন্য কি আমরা কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য দীনী ইলম শিক্ষা অর্জনে মানুষদেরকে নিরুৎসাহিত করব? না ইলম অর্জনে উৎসাহ প্রদান-সহ বিভ্রান্তি বা দুর্নীতি থেকে সতর্ক করব?

(৭) সমাজে অনেক মানুষ দু-চারজন আলিম বা তালিবুল ইলমের অন্যায়, দুর্নীতি বা ভুলভ্রান্তিকে বড় করে দেখিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলেন। অথচ অনুরূপ দুর্নীতি বা অন্যায়ের পরিমান যে অ-মাদ্রাসা শিক্ষিতদের মধ্যে অনেক অনেক বেশি তা বুঝতে চান না। অনেক আলিম বা দীনদার মানুষ কুরআনের ক্ষেত্রে একইরূপ আচরণ করেন। কুরআন বুঝে পড়ে দু-একজন বিভ্রান্ত হয়েছে বলে কুরআন বুঝে তিলাওয়াত করতে নিরুৎসাহিত করেন। অথচ কুরআন না বুঝে যে লক্ষলক্ষ মুসলিম শিরক, কুফর ও ভয়ঙ্কর সব হারামে লিপ্ত হচ্ছেন তা বুঝতে চান না। দু-চারজন আলিমের অন্যায়ের অজুহাতে কি আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার অবমূল্যায়ন করব? না মাদ্রাসা শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি তালিবুল ইলমদেরকে সতর্কতার পরামর্শ দান করব?

(৮) কুরআনের অর্থ বুঝে কেউ বিভ্রান্ত হন না। কুরআন অবশ্যই সঠিক পথের হেদায়াত। অর্থ বুঝে কুরআন তিলাওয়াতকারী বা কুরআনের তরজমা-অনুবাদ পাঠকারী কুরআনের সে হেদায়াত পেয়েছেন। তবে তার হৃদয়ের অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে হেদায়াত ধরে রাখতে পারেন নি।

খাদ্যের মূল প্রভাব সুস্থতা ও পুষ্টি আনয়ন করা। এরপরও অনেক সময় খাদ্যের সাথে "অখাদ্য" বা "বিষ" মিশ্রিত হয়ে স্বাস্থ্য বা সুস্থতার ক্ষতি করতে পারে। কখনো কখনো খাদ্য অসুস্থতা সৃষ্টি করে- এ কারণে কি আমরা মানুষদেরকে খাদ্য গ্রহণে নিরুৎসাহিত করব? না খাদ্য গ্রহণ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সাবধানতা ও সমস্যা হলে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে বলব?

মানব আত্মার প্রধান খাদ্য আল্লাহর যিকর, আর আল্লাহর যিকরের প্রধান বিষয় কুরআন তিলাওয়াত। কুরআনের শব্দ, অর্থ ও মর্ম মানব-হৃদয়ের সুস্থতা ও পুষ্টি আনয়ন করে। তবে কখনো কখনো কোনো ব্যক্তির হৃদয়ের অহঙ্কার, বিভ্রান্তি, ওয়াসওয়াসা ইত্যাদি উক্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এজন্য আমারা মুমিনকে সাবধান করতে পারি, আলিমদের কাছে প্রশ্ন করতে উৎসাহ দিতে পারি; কিন্তু কখনোই তাকে হেদায়াতের মূল উৎস কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারি না।

(৯) অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে কুরআন তিলাওয়াত করার কারণে এক প্রকারের বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছিল খারিজীদের মধ্যে। কুরআনের অর্থ চিন্তা ও ব্যাপক অধ্যয়ন তাদের মধ্যে হেদায়াত ও তাকওয়ার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু তাদের হৃদয়ের অহঙ্কার, নেক আমলের আত্মতৃপ্তি ও প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে তারা সে তাকওয়ার প্রকৃত ফল ধরে রাখতে পারে নি। বরং ভয়ঙ্কর উগ্রতায় লিপ্ত হয়েছিল। সাহাবীগণ তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনোই কুরআনের অর্থ চিন্তা ও অধ্যয়নকে নিরুৎসাহিত করেন নি।

(১০) কুরআনের অর্থ অনুধাবন কখনোই বিভ্রান্তির জন্ম দেয় না; তবে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে। এরূপ প্রশ্নের ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব আলিমদেরকে প্রশ্ন করা এবং আলিমদের দায়িত্ব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। আমাদের সমাজে আলিমগণ অত্যন্ত বঞ্চনা ও কষ্টের মধ্যে থাকেন। ব্যাপক অধ্যয়ন তো দূরের কথা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ক্রয়ের সামর্থ্যও অনেক আলিমের নেই। ফলে কুরআন কেন্দ্রিক অনেক প্রশ্নের তাঁরা উত্তর দিতে পারেন না। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তারা কুরআনের অনুবাদ পাঠকারী প্রশ্নকর্তাকে রাগ করেন এবং অনুবাদ পড়তে নিষেধ করেন। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। সকল সমস্যার মধ্যেই আলিমদেরকে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে। আর কুরআনের অনুবাদ-পাঠকারীকে রাগ না করে তাকে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি সতর্ক করতে হবে এবং প্রয়োজনে কোনো প্রাজ্ঞ আলিম থেকে জেনে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

(১১) সর্বোপরি আমাদের বুঝতে হবে যে, উম্মাতের কোটি কোটি সদস্যের প্রত্যেকের বাড়িতে যেয়ে তাকে "সঠিক", "হক্কানী" বা "বিশুদ্ধ" দীনের দাওয়াত প্রদানের ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে ইচ্ছা করলে প্রত্যেকেই কুরআনের একটি নির্ভরযোগ্য অনুবাদ কিনে তা পড়ে দীনের মৌলিক বিষয়কগুলো জানতে পারেন। অন্যান্য সকল বিষয়ে মতভেদ থাকলেও কুরআনের বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। আমরা অন্তত সকলকে উৎসাহ প্রদান করি কুরআন পাঠ করতে ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা করতে। পাশাপাশি "রিয়াদুস্‌সালিহীন" বা অনুরূপ কোনো প্রসিদ্ধ ছোট হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ পাঠ করতে। এভাবে মুমিন তাঁর মহান রব্ব সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর মহান রাসূলের (ﷺ) সান্নিধ্য লাভ করবেন। এতে তাঁর মধ্যে যে ঈমান, তাকওয়া ও চেতনা সৃষ্টি হবে তার ভিত্তিতে তিনি নির্ভরযোগ্য আলিমদের থেকে দীনের বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।

চতুর্থ বিষয়: কুরআন মাজীদের অর্থ কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করার পরেই নিজেকে "ফকীহ", ইসলামী জ্ঞানের বিশেষজ্ঞ ও দিক-নির্দেশক বলে মনে করা এ বিষয়ক সর্বশেষ বিপর্যয়। বিষয়টি কুরআনের নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক। আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক মুমিনকেই অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে "হক্ক তিলাওয়াত" করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"মু'মিনদের সকলের একসাথে বের হওয়া সংগত নয়, ওদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা দীনের "ফিকহ" বা গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।"[১]

এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুমিনদের সকলেই ফকীহ হবেন না; কিছু মানুষ দীনের গভীর জ্ঞান বা ফিকহ অর্জনের জন্য ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণায় রত থাকবেন এবং অন্যদেরকে এ গভীর জ্ঞান বা ফিকহের মাধ্যমে সতর্ক করবেন। উভয় আয়াতের সমন্বিত নির্দেশনা যে, প্রত্যেক মুমিনই অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে কুরআন "হক্ক তিলাওয়াত" করবেন; তবে প্রত্যেকেই ফকীহ হবেন না; কিছু মুমিন কুরআন, হাদীস ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় গভীর অধ্যয়ন করে "ফকীহ" হবেন। "হক্ক তিলাওয়াত"-কারী মুমিনগণ তাদের থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করবেন ও সতর্ক হবেন।

বস্তুত সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞানের এ পার্থক্য সর্বজনীন। চিকিৎসা, আইন, বিজ্ঞান, প্রকৌশন ও অন্যান্য সকল বিষয়ে যে কোনো শিক্ষিত মানুষ সাধারণ অধ্যয়নের মাধ্যমে 'সাধারণ' জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। তবে কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি আজীবন গভীর অধ্যয়নে কাটাতে হয়। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন না করে কেউ যদি সাধারণ পড়াশোনার মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে "তাত্ত্বিক গুরু" হতে চেষ্টা করেন তাহলে তা ক্ষতিকর ফল প্রদান করে। দীনী ইলমের বিষয়টিও একইরূপ।

এক্ষেত্রে নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(১) অনেক মুমিন ব্যাপকভাবে কুরআন অধ্যয়ন করেন কিন্তু কুরআন বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন না। অবস্থাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। সাময়িক ওজর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু এরূপ অবস্থা অব্যাহত রাখা, অর্থাৎ বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় অবহেলা করে অশুদ্ধ তিলাওয়াত ও অর্থ অধ্যয়নকেই "হক্ক তিলাওয়াত" বলে মনে করা নিঃসন্দেহে খেলাফে সুন্নাত ও বিদআত।

(২) অর্থ-সহ কুরআন "হক্ক তিলাওয়াত" করার মাধ্যমে মুমিন নিজের ঈমান, তাকওয়া, আখিরাতমুখিতা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শানিত করবেন। তবে আলিমগণের ভুল ধরা, ইসলামী ব্যবস্থার সংশোধন, সংস্কার বা সমালোচনা করা, কোন্ বিষয়টি ইসলাম সমর্থিত ও কোন্‌টি ইসলাম সমর্থিত নয় ইত্যাদি বিষয়ে মত দেওয়ার জন্য কুরআন অধ্যয়নের পাশাপাশি আরো অনেক ব্যাপক ও প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন জরুরী।

(৩) কুরআনের অনুবাদ পাঠ করে অর্থ শিক্ষা ও আরবী ভাষায় পারদর্ষিতার মাধ্যমে কুরআন অনুধাবন করা এক নয়। কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ। এর প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের বিভিন্ন প্রকারের অর্থ, মর্ম, ব্যঞ্জনা ও ব্যাপকতা আছে। অনুবাদক তার অনুবাদে এ সকল অর্থ ও মর্মের একটিমাত্র দিক প্রকাশ করতে পারেন। এজন্য অনুবাদ পড়ার অর্থ কুরআন মাজীদের একটি অর্থের অনুবাদ পাঠ। এতে মুমিন মূল বিষয়টি জানতে পারেন। কিন্তু তাত্ত্বিক কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডন করতে এতটুকুই যথেষ্ট নয়।

(৪) সমকালীন আরবী ভাষায় পারদর্শিতা ও কুরআনের আরবী ভাষায় পারদর্শিতা এক বিষয় নয়। অগণিত আরবী শব্দের অর্থের মধ্যে কমবেশি পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়া শাব্দিক অর্থ ও কুরআনের পরিভাষা ও ব্যবহারের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। এগুলো অনুধাবন ব্যতিরেকে ফিকহী বা তাত্ত্বিক কোনো মতবাদ প্রদান বা খণ্ডন করা বাতুলতা মাত্র।

(৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনে বারংবার বলেছেন যে, তিনি তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কে দু প্রকারের ওহী প্রদান করেছেন: (১) কিতাব এবং (২) হিকমাহ। কিতাব গ্রন্থাকারে কুরআন হিসেবে সংকলিত। আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে প্রদত্ত হিকমাহ বা প্রজ্ঞাকে কথা বা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করে কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করেছেন যা "হাদীস" হিসেবে সংকলিত। হাদীস ও হাদীস বিষয়ক সকল জ্ঞানের ব্যাপক অধ্যয়ন ছাড়া কুরআন বিষয়ে "বিশেষজ্ঞ" হওয়ার কল্পনা করা যায় না।

(৬) কুরআন-সুন্নাহ অনুধাবনে সাহাবীগণ ও প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের মত ও ব্যাখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ কুরআনে সাহাবীগণ, বিশেষত প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের পরিপূর্ণ অনুসরণ পরবর্তী মুমিনদের নাজাত ও সফলতার মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস শরীফে পরবর্তী প্রজন্মগুলোর গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই সাহাবীগণ ও পরবর্তী প্রজন্মগুলোর আলিমদের মত, কর্ম ও পন্থা সর্ম্পকে ব্যাপক অধ্যয়ন ছাড়া কেউ কুরআনের বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না।

উপরের বিষয়গুলোর আলোকে "হক্ক তিলাওয়াত" ও "ফকীহগণের মাধ্যমে সতর্ক হওয়ার" মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব কুরআন কারীমের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত-এর পাশাপাশি কোনো প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য আলিম বা প্রতিষ্ঠানের অনুবাদের উপর নির্ভর করে অর্থ অনুধাবন-সহ কুরআনের "হক্ক তিলাওয়াত" আদায়ে সচেষ্ট থাকা। সম্ভব হলে কুরআন বুঝার মত আরবী শিখে কুরআনের অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা। কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা প্রশ্ন দেখা দিলে নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ "ফকীহ" আলিমদের মুখ বা গ্রন্থ থেকে উত্তর জেনে নেয়া। প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ আলিম ছাড়া অন্য কারো মতকে চূড়ান্ত বা নির্ভরযোগ্য

বলে মনে না করা। জ্ঞানের অহঙ্কারের বিষাক্ত ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

১. ১৭. ১১. কুরআন তিলাওয়াতের আদব ও নিয়ম

কুরআন তিলাওয়াত, গবেষণা, আলোচনা ইত্যাদির অনেক মাসনূন আদব হাদীস ও সাহাবীগণের বক্তব্যের আলোকে আলিমগণ বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় লিখছি:

১. যথাসম্ভব ওযূ-সহ আদবের সাথে তিলাওয়াত করা।
২. সম্ভব হলে মিসওয়াক করে সুন্দর পোশাকে বসে তিলাওয়াত করা। তবে বসে শুয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁটতে চলতে সর্বাবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যায়।
৩. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত করা।
৪. তিলাওয়াতের সময় অর্থের দিকে খেয়াল রাখা এবং যথা সম্ভব অর্থকে হৃদয়ে জাগরুক করে হৃদয়কে নাড়া দেওয়া।
৫. তিলাওয়াতের সময় সাজদার আয়াতে সাজদা করা, তাসবীহের আয়াতে তাসবীহ পড়া, পুরস্কারের আয়াতে পুরস্কার চাওয়া ও আযাবের আয়াতে আযাব থেকে আশ্রয় চাওয়া।
৬. তিলাওয়াতের সময় মনকে যথাসম্ভব বিনীত ও আল্লাহর রহমতের জন্য ব্যাকুল রাখা।
৭. তিলাওয়াতের সাথে সাথে সাধ্যমত বিনীত হৃদয়ে ক্রন্দন করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াতের সময় চোখের পানি বইয়ে ক্রন্দন করতেন। মুখচাপা ক্রন্দনে তার বুকের মধ্যে শব্দ উঠত। আবু বকর (রা), উমার (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও সালাতে ও সালাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন ঠেকাতে পারতেন না।
৮. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তিলাওয়াতের সময় কারো সাথে কথা বলার জন্য তিলাওয়াত কেটে না দেওয়া। যথাসম্ভব মনোযোগের সাথে তিলাওয়াত শেষ করে কথা বলা।
৯. তিন দিনের কমে কুরআন খতম না করা। যথসম্ভব প্রতি মাসে বা ২/৩ মাসে একবার খতম করা।
১০. ঘরের কুরআনকে ফেলে না রাখা। প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় তা দেখে পাঠ করা।
১১. রমযান মাসে বেশি বেশি তিলাওয়াত করা।
১২. মুখস্থ থাকলেও যথাসম্ভব দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত করা ; কারণ কুরআন শরীফের (মুসহাফের) পৃষ্ঠায় নজর বুলানোই একটি ইবাদত।
১৩. প্রতি বছর অন্তত একবার উত্তম তিলাওয়াত করতে পারেন এমন কাউকে তিলাওয়াত করে শুনান।[১]

১. ১৮. যিকর বিষয়ক কয়েকটি বিধান

১. ১৮. ১. যিকর গণনা ও তাসবীহ-মালা প্রসঙ্গ

আমরা ৯ প্রকার যিক্‌রের আলোচনা শেষ করেছি। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রবেশের পূর্বে আমরা তাসবীহ বা হাতে যিক্‌র গণনার বিষয়টি আলোচনা করতে চাই। আমরা বিভিন্ন হাদীসে দেখলাম যে, যিক্‌র দু'ভাবে আদায় করা যায় : বেশি বেশি পাঠ করে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠ করে। নির্দিষ্ট সংখ্যক যিক্‌রের জন্য গণনার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখি যে, কোনো কোনো সাহাবী ও পরবর্তী ইমাম যিক্‌র গণনা করতে নিষেধ করেছেন। তারা বলতেন, আল্লাহই তো গণনা করছেন, তুমি কেন গণনা করবে। তুমি কি আল্লাহর কাছে যেয়ে গুণে হিসেব বুঝে নেবে?

ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও হানাফী ইমামগণ যিক্‌র ও তাসবীহ-তাহলীল গণনা মাকরূহ বলে জেনেছেন। ইমাম তাহাবী ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসূফের সনদে ইমাম আবু হানীফা থেকে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২]

ইবনু মাস'উদ (রা) যিক্‌র গণনা করতে দেখলে বলতেন, তোমাদের গোনাহগুলো গণনা করে হিসেব করে রাখ, সাওয়াব গণনার প্রয়োজন নেই।[৩]

উকবা ইবনু সুবহান নামাক একজন তাবেয়ী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে প্রশ্ন করলাম, যদি কেউ যিক্‌রের সময় তার তাসবীহ-তাহলীল হিসাব করে রাখে তাহলে কী হবে? তিনি বললেন :

سُبْحَانَ اللهِ! أَتُحَاسِبُوْنَ اللهَ

"সুব'হানাল্লাহ! তোমরা কি আল্লাহর হিসাব নেবে ?"[৪]

এ সকল হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) তাসবীহ তাহলীল গণনা মাকরূহ মনে করেছেন। ইমাম তাহাবী (রহ) বলেন, যে সকল যিক্‌র হাদীস শরীফে নির্দিষ্ট সংখ্যায় আদায়ের নির্দেশনা রয়েছে, সে সকল যিক্‌রের ক্ষেত্রে মুমিনের উচিত তা গণনা করে পাঠ করা। কারণ গণনা ছাড়া নির্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ হয়েছে কিনা এবং আল্লাহর ওয়াদাকৃত সাওয়াবের পরিমাণ যিক্‌র পালিত হয়েছে কিনা তা জানার উপায় নেই। এজন্য এ সকল যিক্‌র গণনা করে পালন করতে হবে। আর যেসকল যিক্‌র সাধারণভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ সংখ্যার জন্য বিশেষ সাওয়াব বর্ণনা করা হয়নি, সেসকল যিক্‌র গণনা করা বাতুলতা। সেক্ষেত্রেই আল্লাহর হিসাব গ্রহণের প্রশ্ন আসে। নির্ধারিত সংখ্যক যিক্‌রের অতিরিক্ত সকল সাধারণ যিক্‌রের ক্ষেত্রে মুমিনের দায়িত্ব কোনো রকম গণনা বা

হিসাব ছাড়া যথাসম্ভব বেশি বেশি এবং যথাসম্ভব মনোযোগ সহকারে এসকল যিক্‌রের বাক্য উচ্চারণ করবেন। হিসাবপত্রের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীনের উপর ছেড়ে দেবেন।[১]

সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কর্ম থেকে জানা যায় যে, সালাত, সালাম, তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল, তাহমীদ ইত্যাদি যিক্‌র, যা সাধারণভাবে বেশি বেশি আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা অনেকে নিজের সুবিধামতো নির্দিষ্ট সংখ্যায় ওযীফা হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। যেমন, কেউ কেউ সারাদিনে ১০০০ বার সালাত বা তাসবীহ বা তাহলীল করবেন বলে নিজের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এগুলো তাঁরা গুণে আদায় করতেন। এর অতিরিক্ত অগণিত যিক্‌র তাঁরা আদায় করতেন।[২]

এখন প্রশ্ন: সংখ্যা নির্ধারিত যিক্‌র কিভাবে গণনা করব? 'তাসবীহ' ব্যবহার করে? না হাতের কর গণনা করে? তাসবীহ ব্যবহার বিদ'আত কি না? এ প্রশ্নের উত্তর, যিক্‌র গণনার জন্য দানা বা তাসবীহ ব্যবহার না-জায়েয বা বিদ'আত নয়। তবে হাতের আঙ্গুল দ্বারা গণনা করা উত্তম; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যিক্‌র হাতে গণনা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيَدِهِ [بِيَمِيْنِهِ]

"আমি নবীজী (ﷺ)-কে দেখলাম তিনি নিজের হাতে [ডান হাতে] তাসবীহের গিঠ দিচ্ছেন (গণনা করছেন)।" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৩]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে গণনা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। মহিলা সাহাবী ইউসাইরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে বলেছেন:

عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَاعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُوْلاَتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ

"তোমরা মহিলাগণ অবশ্যই তাসবীহ (সুব'হানাল্লাহ), তাহলীল (লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকদীস (সুব্বুহুন কুদ্দূসুন) করবে এবং আঙ্গুলের গিটে গণনা করবে ; কারণ এদেরকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে এবং কথা বলানো হবে। (এরা যিক্‌রের সাক্ষ্য প্রদান করবে।)" হাদীসটির সনদ সহীহ।[৪]

পাশাপাশি দানা বা তাসবীহ-মালা দ্বারা যিক্‌র গণনা জায়েয ও সাহাবী-তাবেয়ীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত। বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো সাহাবীকে দানা বা বীচির দ্বারা তাসবীহ-তাহলীল বা যিক্‌র গণনা করতে দেখেছেন। তিনি তাঁদেরকে এভাবে গণনা করতে নিষেধ করেননি, তবে সংক্ষিপ্ত ও উত্তম যিক্‌রের উপদেশ প্রদান করেছেন। এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কাঁকর, দানা, বীচি ইত্যাদির মাধ্যমে যিক্‌র গণনা সুন্নাহ-সম্মত জায়েয।

পরবর্তী যুগে কোনো কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে জমা করা কাঁকর, দানা, গিরা দেওয়া সুতা বা 'তাসবীহ' ব্যবহারের কথা জানা যায়। আবু সাফিয়্যা (রা) নামক একজন সাহাবী পাত্র ভর্তি কাঁকর রাখতেন। ফজরের সালাতের পরে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি এগুলো দিয়ে যিক্‌র করতেন। আবার বিকালেও অনুরূপ করতেন। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস কাঁকর দিয়ে তাসবীহ তাহলীল ও যিক্‌র করতেন। ইমাম হুসাইনের কন্যা ফাতিমা গিঠ দেওয়া সুতা (তাসবীহের মতো) দ্বারা গণনা করে তাসবীহ তাহলীল করতেন। আবু হুরাইরা (রা)-এর ১০০০ টি গিরা দেওয়া একটি সুতা ছিল। তিনি এ সংখ্যক তাসবিহ-তাহলীল পাঠ না করে ঘুমাতেন না। এছাড়া তিনি কাঁকর জমা করে তা দিয়ে যিক্‌র করতেন বলে বর্ণিত আছে। আবু দারদা (রা) খেজুরের বীচি একটি থলের মধ্যে রাখতেন। ফজরের সালাতের পরে সেগুলো বাহির করে যিক্‌রের মাধ্যমে গণনা করে শেষ করতেন।

আল্লামা শাওকানী, সয়ূতী, আব্দুর রাউফ মুনাবী প্রমুখের আলোচনায় মনে হয় ইমাম আবু হানীফা (রা) ও তার সঙ্গীগণ বা মাযহাবের ইমামগণ ছাড়া পূর্বযুগের অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম যিক্‌র গণনা বা তাসবীহ ব্যবহার করতে নিষেধ করেননি। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি) এ বিষয়ে একটি ছোট্ট বই লিখেছেন।[৫] সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সুন্নাত ও নির্দেশনা সংখ্যা নির্ধারিত যিক্‌র হাতের আঙ্গুলে গণনা করা। প্রয়োজনে, বিশেষত যারা ওযীফা হিসেবে দৈনিক বেশি সংখ্যক যিক্‌র নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছেন তারা তাসবীহ, কাঁকর, বীচি, ছোলা, ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

১. ১৮. ২. সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে

সম্মানিত পাঠক, আমরা যিক্‌রের প্রকারভেদ ও ফযীলত আলোচনা শেষ করেছি। এখানে যে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ যিক্‌র। যিক্‌রের এমন কোনো সময় নেই বা অবস্থা নেই যে, সে সময়ে বা অবস্থায় যিক্‌র করতে হবে, অন্য সময় করতে হবে না। মুমিন সদা সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকে। আয়েশা (রা) বলেছেন :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ

"নবীজী (ﷺ) সকল অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করতেন।"[১]

এখানে যিক্‌র বলতে মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে যিক্‌র বুঝানো হয়েছে। মনের স্মরণ তো সর্বদায়ই থাকে। সকল অবস্থায় কোনো না কোনো কর্ম মুমিন করে। কিন্তু সকল অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করা যাবে কিনা? নাপাক অবস্থায়? শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে, চলতে? এ প্রশ্নের উত্তরেই আয়েশা (রা) এ কথা বলেছেন। আর এ থেকে মুসলিম উম্মার ইমাম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এ কথাই বুঝেছেন। এজন তাঁরা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত করেছেন যে, নাপাক অবস্থায়, শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, রাস্তাঘাটে, মাঠে এবং সর্বাবস্থায় মুমিন বান্দা মুখে মাসনূন বাক্যাদি উচ্চারণ করে আল্লাহর যিক্‌র করতে পারবেন। সালাত, সালাম, তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ ও সকল প্রকার যিক্‌রের বিষয়েই একথা প্রযোজ্য।[২] শুধুমাত্র ইস্তিঞ্জা রত অবস্থায় ও স্বামী-স্ত্রী একান্ত অবস্থায় ছাড়া সর্বদা সকল অবস্থায় মুমিনের জিহ্বা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ এটি এবং এটিই তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনের আদর্শ ও কর্ম।[৩]

১. ১৮. ৩. কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ওযূ ও গোসল

উপরের হাদীস থেকে আমরা জানলাম যে, সর্বাবস্থায় যিকর করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াতও কি এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত? পাক-নাপাক সকল অবস্থায় কি কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে? কুরআন হাতে নিয়ে কি পাঠ করা যাবে? এ বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ থেকে মতভেদ বিদ্যমান। এখানে কয়েকটি বিষয় রয়েছেঃ (১) অযুবিহীন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত, (২) গোসলবিহীন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত, (৩) ওযূ বা গোসলবিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ। আমরা নিচে বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ে তেমন কোনো মতভেদ নেই। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে উম্মাতের সকল আলিম একমত যে, ওযূ বিহীন অবস্থায় কুরআন কারীম স্পর্শ না করে মুখস্থ বা দেখে দেখে তিলাওয়াত করা জায়েয। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সহীহ হাদীসের আলোকে উম্মাতের প্রায় সকল ইমাম ও ফকীহ একমত যে, ওযূ বা গোসল বিহীন অবস্থায় কুরআন কারীম সরাসারি স্পর্শ করা বৈধ নয়। তবে বর্তমান সময়ে কতিপয় ফকীহ ওযূ-বিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ বৈধ বলছেন। এজন্য সংক্ষেপে বিষয়টি আলোচনা করছি।

নাপাক অবস্থায় বা ওযূ-বিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞায় সহীহ হাদীস বর্ণিত। ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

অন্য হাদীসে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবন আবূ বাকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম আনসারী (৬৫-১৩৫ হি) বলেন, আমার দাদা সাহাবী আমর ইবন হাযমকে (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন:

أَنْ لا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না।" এ হাদীসটি অনেককগুলো সনদে বর্ণিত। প্রত্যেক সনদেই কিছু দুর্বলতা বিদ্যমান। তবে সবগুলি সনদের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল, ইমাম ইসহাক ইবন রাহওয়াইহি, ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী, শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী ও অন্যান্য প্রাচীন ও সমকালীন মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলে নিশ্চিত করেছেন।[৫]

উপরের হাদীসগুলোর ভিত্তিতে "অপবিত্র"- অর্থাৎ গোসল ফরয থাকা অবস্থায় অথবা অযু-বিহীন- অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণ-সহ মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকল ফকীহ এ বিষয়ে একমত।[৬] প্রসিদ্ধ হাম্বালী ফকীহ ইবন কুদামা (৬২০ হি) বলেন:

وَلا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا طَاهِرٌ يَعْنِي طَاهِرًا مِنْ الْحَدَثَيْنِ جَمِيعًا، ... وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَلَا نَعْلَمُ مُخَالِفًا لَهُمْ إِلَّا دَاوُد فَإِنَّهُ أَبَاحَ مَسَّهُ.

"উভয় প্রকারের নাপাকি থেকে পবিত্র না হয়ে কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। ... আর এটি অন্য তিন ইমাম- মালিক, শাফিয়ী ও হানাফীগণেরও মত। একমাত্র (তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ফকীহ) দাউদ যাহিরী (২০১-২৭০ হি) ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। একমাত্র তিনিই অপবিত্র (ওযু বা গোসল ছাড়া) কুরআন স্পর্শ বৈধ বলেছেন।"[৭]

সাহাবীগণের মধ্যে আলী, ইবন মাসউদ, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবন যাইদ, সালমান ফারিসী, আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ)

ও অন্যান্য ফকীহ সাহাবী ওযূ বা গোসল বিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ করেছেন।[১] ইবন তাইমিয়া (রাহ) বলেন, এদের বিপরীতে কোনো সাহাবী ওযূ বিহীন অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বৈধ বলেছেন বলে জানা যায় না।[২]

উল্লেখ্য যে, ফকীহগণ শিশু-কিশোর ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ বৈধ বলেছেন। কারণ শিক্ষার জন্য বারবার কুরআন স্পর্শ করা তাদের জন্য প্রয়োজন এবং তারা নাবালেগ হওয়ার কারণে তাদের জন্য শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়। এছাড়া কুরআনের তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ, ও কুরআন সম্বলিত অন্যান্য সকল গ্রন্থ ওযূ ও গোসলবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা বৈধ বলে তাঁরা একমত।[৩]

গোসল ফরয থাকা অবস্থায় ও মহিলাদের স্বাভাবিক রক্তস্রাব অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করে শুধু তিলাওয়াতের বৈধতার বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ থেকে ফকীহগণ কিছু মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মতে এ সকল অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। ইমাম মালিক-এর মতে 'গোসল ফরয' অবস্থায় তিলাওয়াত নিষিদ্ধ; তবে মহিলাদের রক্তস্রাবের সময়ে তিলাওয়াত বৈধ। হাম্বালী মাযহাবের এটি দ্বিতীয় মত। কয়েকটি হাদীসের ভিত্তিতে তাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন।[৪]

(১) আলী (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ 'জানাবাত' বা গোসলের নাপাক অবস্থা ছাড়া সকল অবস্থায় আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন।"

হাদীসটির মূল বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবন সালিমা-এর বিষয়ে ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস আপত্তি করেছেন। এজন্য হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।[৫] ইমাম হাকিম, হাইসামী, শাইখ শুআইব আরনাউত, প্রমুখ মুহাদ্দিসও হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বা হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।[৬] পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ী, ইমাম নববী, আলবানী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।[৭]

(২) ইবন উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

"নাপাক ব্যক্তি এবং ঋতুবতী মহিলা কুরআনের কিছুই পাঠ করবে না।" হাদীসটি দুর্বল।[৮]

(৩) তাবিয়ী আবীদাহ সালমানী বলেন:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ.

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নাপাক অবস্থায় কুরআন পাঠ মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলে গণ্য করতেন।" হাদীসটি সহীহ।[৯]

(৪) তাবিয়ী আবুল আরীফ বলেন, আলী (রা) বলেন:

الْجُنُبِ لاَ يَقْرَأُ ، وَلاَ حَرْفًا

"নাপাক ব্যক্তি কুরআনের কিছুই পাঠ করবে না।" হাদীসটি সহীহ।[১০]

এর বিপরীতে কোনো কোনো সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী ফকীহ গোসল ফরযের নাপাক অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত বৈধ বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), তাবিয়ী সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব, সায়ীদ ইবনু জুবাইর, ইমাম বুখারী, ইমাম তাবারী ও অন্যান্য ফকীহ।[১১]

সামগ্রিক বিচারে এরূপ নাপাক অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ হওয়ার মতটিই সঠিক। নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ- থেকে বর্ণিত দুটি হাদীসের মধ্যে একটি হাদীসকে অনেক মুহাদ্দিসই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। এছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের দু'জন থেকে সহীহ সনদে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত। এর বিপরীতে সাহাবীগণের মধ্যে শুধু ইবন আব্বাস (রা) থেকে বৈধতার মত বর্ণিত। আর এজন্যই চার ইমাম-সহ অধিকাংশ ফকীহ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন।

নিম্নের দু'টি সহীহ হাদীস এ মত সমর্থন করে:

(১) আবুল জুহাইম ইবনুল হারিস আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বি'র জামাল-এর দিক থেকে আগমন করছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি তাঁকে দেখে সালাম দেয়। তিনি তার সালামের উত্তর না দিয়ে একটি দেওয়ালের নিকট যেয়ে তায়াম্মুম করেন এবং তারপর সালামের উত্তর দেন।[১২]

(২) মুহাজির ইবন কুনফুয (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গমন করেন। তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। তিনি সালামের উত্তর না দিয়ে ওযূ করেন এবং এরপর বলেন:

إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ (طَهَارَةٍ)

"আমি পবিত্র অবস্থায় ছাড়া আল্লাহর যিকরকে মাকরূহ-অপছন্দনীয় বলে মনে করলাম (এজন্য তোমার সালামের উত্তর দিলাম না)। হাদীসটি সহীহ।[১]

এ প্রসঙ্গে শাইখ আলবানী বলেন, এ হাদীসটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নাপাক ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত মাকরূহ। কারণ ওযূ বিহীন অবস্থায় সালাম যদি মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হয়; তবে নাপাক অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত আরো বেশি মাকরূহ বা অছন্দনীয় হওয়া উচিত...।[২]

১. ১৮. ৪. সাজদায় কুরআনের দুআ পাঠ

বিভিন্ন হাদীসে রুকু-সাজদার মধ্যে কুরআন পাঠ নিষেধ করা হয়েছে। একটি হাদীসে আলী (রা) বলেন:

نَهَانِي حِبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

"আমার প্রিয়তম (ﷺ) আমাকে রুকু-রত অবস্থায় অথবা সাজদা-রত অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।"[৩]

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে যে, সাজদায় কুরআনের কোনো বক্তব্য দুআ হিসেবে পাঠ করা যাবে কি না? বস্তুত, দুআ তিলাওয়াত নয়; বরং মহান আল্লাহর সাথে প্রার্থনাকারীর কথা। তিনি শুধু কুরআনের বাক্যগুলো ব্যবহার করে মহান মালিকের সাথে কথা বলছেন। এজন্যই নাপাক অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ হলেও এ সময়ে কুরআনের দুআগুলো পাঠের বৈধতার বিষয়ে ফকীহগণ একমত।

আবূ যার (রা) বলেন:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ لَيْلَةً فَقَرَأَ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يَرْكَعُ بِهَا وَيَسْجُدُ بِهَا: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).... سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لأُمَّتِي

রাসূলুল্লাহ একরাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করেন। তিনি একটি আয়াতই পাঠ করছিলেন এবং রুকুতে ও সাজদায়ও আয়াতটি (সূরা মায়িদা: ১১৮) পাঠ করছিলেন: "আপনি যদি তারেদকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আপনি তো মহাপরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।"... তিনি বলেন, আমি আমার রব্বের কাছে আমার উম্মাতের জন্য শাফাআত প্রার্থনা করছিলাম...। হাদীসটি হাসান।[৪]

এ হাদীসটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, সাজদায় কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ হলেও, কুরআনের বাক্য ব্যবহার করে মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথন করা বা দুআ করা নিষিদ্ধ নয়; বরং সুন্নাহ নির্দেশিত।[৫]

১. ১৮. ৫. মাতৃভাষায় যিকর ও দুআ পাঠ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো যিকর ও দুআগুলি অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে মূল আরবীতে পাঠ করলেই মহান আল্লাহর যিকর ও দুআর প্রকৃত স্বাদ, তৃপ্তি, আনন্দ ও আধ্যাতিকতা লাভ করা যায়। কারণ তাঁর ভাষার যে অপূর্ব কাঠামো ও পূর্ণতা তা কোনোভাবে অন্যভাষায় ভাষান্তর করা যায় না। মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বালী মাযহাবের ফকীহগণ সাধারণভাবে আরবীতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য অনারব ভাষায় সালাতের মধ্যে যিকর ও দুআ পাঠ বৈধ বলেছেন। হানাফী মাযহাবের ইমামাগণ আরবীতে অপারগের জন্য সালাতের মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার বৈধ বললেও পরবর্তী ফকীহগণ তা মাকরূহ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী বলেন:

وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ... وَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ إِلاَّ أَنْ لاَ يُحْسِنَ الْعَرَبِيَّةَ ... وَكَذَلِكَ الْخِلاَفُ فِيمَا إِذَا تَشَهَّدَ بِالْفَارِسِيَّةِ

"যদি সালাতের তাকবীর ফারসী ভাষায় বলে তবে আবূ হানীফা (রাহ)-এর মতে তা জায়েয হবে।...আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে তা জায়েয হবে না, তবে আরবীতে পারঙ্গম না হলে জায়েয হবে। সালাতের মধ্যে তাশাহহুদ ফারসীতে পাঠ করা ... ক্ষেত্রেও একই মতভেদ"[৬]

সালাতের মধ্যে অনারব ভাষায় যিকর-দুআ প্রসঙ্গে আল্লামা শামী বলেন:

الْمَنْقُولَ عِنْدَنَا الْكَرَاهَةُ ... وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ أَنَّ الدُّعَاءَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ تَنْزِيهِيَّةٌ... وَلَا

يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مَكْرُوهًا تَحْرِيمًا فِي الصَّلَاةِ وَتَنْزِيهًا خَارِجَهَا

"হানাফী মাযহাবের বর্ণিত মত যে তা মাকরূহ। ... বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, তা অনুত্তম বা অনুচিত পর্যায়ের এবং মাকরূহ তানযীহী। ... অনারব ভাষায় দুআ করা সালাতের মধ্যে মাকরূহ তাহরীমী এবং সালাতের বাইরে মাকরূহ তানযীহী হওয়াও অসম্ভব নয়।"[১]

সামগ্রিক বিচারে প্রত্যেক আগ্রহী মুমিনের উচিত মাসনূন দুআ ও যিকরগুরি অর্থ-সহ আরবীতে মুখস্থ করা এবং সালাতের মধ্যে তা পাঠ করা। একান্ত অক্ষম হলে যতদিন আরবী দুআ মুখস্থ না হয় ততদিন নফল বা তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে ও সাজদায় মাসনূন দুআগুলির অর্থ মাতৃভাষায় পাঠ করা অনুচিত হলেও নিষিদ্ধ হবে না বলেই আমরা আশা করি। মাসনূন দুআগুলো মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত সালাতের বাইরে বই হাতে দেখে দেখে আরবী দুআ পাঠ করা যায়। প্রয়োজনে শুধু বাংলা অর্থ পাঠ করেও দুআ করা যায়। তবে চেষ্টা করতে হবে মাসনূন আরবী দুআ মুখস্থ করার। আল্লাহই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেলায়াতের পথে যিকরের সাথে

আমরা দেখলাম, আল্লাহর বেলায়াত অর্জন মুমিনের অন্যতম কাম্য ও জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্য অর্জনে যিক্র অন্যতম অবলম্বন। তবে নফল পর্যায়ের যিক্রের মাধ্যমে বেলায়াত অর্জনের পূর্বে মুমিনকে আরো অনেক কর্ম করতে হয়। যেগুলোর অবর্তমানে সকল যিক্র অর্থহীন ও ভণ্ডামিতে পরিণত হতে পারে। এ অধ্যায়ে আমরা এ সকল বিষয় আলোচনা করব। এছাড়া যিক্রের ন্যূনতম বা পরিপূর্ণ ফযীলত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় আলোচনা করতে চাই। আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি।

২. ১. বিশুদ্ধ ঈমান

আল্লাহ তাঁর বেলায়াতের জন্য দুটি বিষয় উল্লেখ করেছেন: ঈমান ও তাকওয়া। ঈমানের পরিচয় **'কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকীদা'** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এ বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করবে। আবার এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক সচেতনতা ছাড়া সকল ইবাদতই অর্থহীন। এজন্য এখানে সংক্ষেপে তথ্যসূত্র ব্যতিরেকে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করছি। ঈমান, শিরক, কুফর ইত্যাদি বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা, তথ্যা ও তথ্যসূত্রের জন্য পাঠককে উপরের বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

২. ১. ১. তাওহীদের ঈমান

ঈমানের প্রথম অংশ **(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)** সাক্ষ্য প্রদান করা। 'ইলাহ' শব্দের অর্থ উপাস্য, পূজ্য, ইবাদত-কৃত বা মাবূদ। আরবী ভাষায় সকল পূজিত ব্যক্তি, বস্তু বা দ্রব্যকেই 'ইলাহ' বলা হয়। এজন্য সূর্যের আরেক নাম 'ইলাহাহ' (الإلاهة) বা 'দেবী'; কারণ কোনো কোনো সম্প্রদায় সূর্যের উপাসনা করত।

আরবীতে 'ইলাহাহ' ও 'ইবাদাহ' শব্দদুটি সমার্থক। 'ইবাদত' অর্থ (غاية التذلل) চূড়ান্ত বিনম্রতা-ভক্তি। শব্দটি 'আবদ' বা 'দাস' থেকে গৃহীত। দাসত্ব বলতে 'উবূদিয়্যাত' ও 'ইবাদত' দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। উবূদিয়্যাত (slavery) অর্থ লৌকিক বা জাগতিক দাসত্ব। আর 'ইবাদত' (worship, veneration) অর্থ অলৌকিক, অজাগতিক বা অপার্থিব দাসত্ব। সকল যুগে সকল দেশের মানুষই জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি অতিপরিচিত শব্দের মত 'ইবাদত', উপাসনা, worship, veneration ইত্যাদি শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে। মানুষ অন্য মানুষের দাসত্ব করতে পারে, তবে সে অন্য যে কোনো মানুষ বা সত্তার 'ইবাদত' বা উপাসনা করে না। শুধু যার মধ্যে অলৌকিক বা অপার্থিব ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলেই মঙ্গল করার বা অমঙ্গল করার বা তা রোধ করার অলৌকিক শক্তি বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তারই 'ইবাদত' করে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বাক্যটির অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ বা উপাস্য নেই। অর্থাৎ ইবাদত, উপাসনা, আরাধনা, চূড়ান্ত ভক্তি পাওয়ার যোগ্য উপাস্য বা মাবূদ একমাত্র তিনিই। এজন্য এ বিশ্বাসের নাম তাওহীদ বা একত্বের বিশ্বাস।

এখানে উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীসের আলোকে তাওহীদের ন্যূনতম দুটি পর্যায় রয়েছে: (১) জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ ও (২) কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ।

প্রথম প্রকারের তাওহীদকে **'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ'** বা প্রতিপালনের একত্ব বলা হয়। এ পর্যায়ে মহান আল্লাহর কর্ম ও গুণাবলিতে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহই এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, সংহারক, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, বিধানদাতা... ইত্যাদি। এ সকল কর্মে তাঁর কোনো শরীক বা সমকক্ষ নেই।

দ্বিতীয় প্রকারের তাওহীদকে **'তাওহীদুল ইবাদাত'** বা ইবাদাতের তাওহীদ বলা হয়। এ পর্যায়ে বান্দার কর্মে আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ বান্দার সকল প্রকার ইবাদাত: সাজদা, প্রার্থনা, জবাই, উৎসর্গ, মানত, তাওয়াক্কুল, ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য বলে বিশ্বাস করা।

তাওহীদের এ দু'টি পর্যায় একে অপরের সম্পূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির উপর ঈমান এনে মুসলিম হওয়া যায় না। তবে ইসলামী বিশ্বাসে বা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-তে মূলত দ্বিতীয় পর্যায় বা "তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্"-র সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। কারণ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনানুসারে মক্কার কাফিরগণ এবং সকল যুগের কাফির-মুশরিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ' বা প্রথম পর্যায়ের তাওহীদ বিশ্বাস করত। তারা একবাক্যে স্বীকার করত যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, তিনিই সর্বশক্তিমান এবং সকল কিছুর একমাত্র মালিক তিনিই।[১] এ বিশ্বাস নিয়ে তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করত। তাঁকে সাজদা করত, তাঁর নামে মানত করত, তাঁর কাছে প্রার্থনা করত, সাহায্য চাইত, তাঁকে খুশি করতে হজ্জ, উমরা কুরবানী ইত্যাদি আমল করত। তবে তারা এর পাশাপাশি অন্যান্য দেবদেবী, নবী, ফিরিশতা, ওলী, পাথর, গাছগাছালি ইত্যাদির পূজা উপাসনা করত।

আল্লাহ ছাড়া কোনো রাব্বুল আলামীন নেই, সর্বশক্তিমান নেই ইত্যাদি বিশ্বাস করলেও আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত বা 'চূড়ান্ত ভক্তি' করা যাবে না- এ কথাটি তারা মানতো না। তাদের দাবি ছিল, কিছু মানুষ, জিন ও ফিরিশতা আছেন যারা মহান আল্লাহর খুবই প্রিয়। তাঁদের ডাকলে বা তাঁদের ভক্তি করলে আল্লাহ খুশি হন ও তাঁর নৈকট্য, প্রেম ও সন্তুষ্টি অর্জন

করা যায়। এছাড়া তারা বিশ্বাস করত যে, এ সকল প্রিয় সৃষ্টির সুপারিশ আল্লাহ শুনেন। কাজেই এদের কাছে প্রার্থনা করলে এরা আল্লাহর নিকট থেকে সুপারিশ করে ভক্তের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করে দেন। এজন্য তারা এ সকল ফিরিশতা, জিন, মানুষ, নবী, ওলী বা কল্পিত ব্যক্তিত্বের মূর্তি, সমাধি, স্মৃতিবিজড়িত বা নামজড়িত স্থান বা দ্রব্যকে সম্মান করত এবং সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে সাজদা, মানত, কুরবানী ইত্যাদি করত।[১]

একারণে ইসলামে 'ইবাদতের তাওহীদের' উপর মূল গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মূলত এর মাধ্যমেই ঈমান ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

তাওহীদের বিশ্বাসের ৬টি দিক রয়েছে, যেগুলোকে আরকানুল ঈমান বলা হয়। (১) আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, (২) আল্লাহর ফিরিশতাগণে বিশ্বাস, (৩) আল্লাহর গ্রন্থসমূহে বিশ্বাস, (৪) আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণে বিশ্বাস, (৫) আখেরাতের বিশ্বাস, (৬) আল্লাহর জ্ঞান ও নির্ধারণ বা তাকদীরে বিশ্বাস। **'ইসলামী আকীদা'** বইটি থেকে এগুলি জানতে পাঠককে অনুরোধ করছি।

২. ১. ২. রিসালাতের ঈমান

ঈমানের দ্বিতীয় অংশ **(মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)** অথবা **(মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু)** অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করা। সংক্ষেপে একে "রিসালাত"-এর ঈমান বলা হয়।

(আবদ) অর্থ বান্দা, 'দাস বা 'ক্রীতদাস'। আরবীতে প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহর আব্দ বা বান্দা বলা হয়। এভাব আব্দ অর্থই মানুষ এবং মাখলূক বা সৃষ্ট। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাতদের ঈমান বিনষ্ট হয়ে শিরকে নিপতিত হওয়ার মূল কারণ ছিল নবীগণ বা ওলীগণের বিষয়ে অতিভক্তি করা, তাদেরকে আল্লাহ সত্তা বা যাতের অংশ, প্রকাশ, আল্লাহর সাথে একীভূত বা ফানা ও বাকা প্রাপ্ত, ইলাহীয় বা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী ইত্যাদি মনে করা। সর্বশেষ উম্মাতকে এ সকল শিরক থেকে রক্ষা করার জন্য মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের বিশ্বাসের সাথে তাঁর 'আবদিয়্যাত'-এর বিশ্বাসকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহর রাসূল, তবে তিনি তাঁর বান্দা (দাস), মাখলূক (সৃষ্ট) ও মানুষ। তিনি কোনোভাবেই আল্লাহর যাত (সত্তা) বা সিফাত (বিশেষণ)-এর অংশ বা প্রকাশ নন। মহান আল্লাহ সৃষ্টকর্তা, মালিক ও উপাস্য। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর মাখলূক (সৃষ্ট), বান্দা (দাস) ও উপাসক রাসূল।

(রাসূল) অর্থ বার্তাবাহক (Messenger)। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান, বিবেক, স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচার শক্তি দান করেছেন; যেন মানুষ ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করে ন্যায় ও ভালর পথে চলে এবং মন্দ ও অন্যায়ের পথ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। উপরন্তু মানুষকে ন্যায়ের পথের সন্ধান ও তাকওয়ার বাস্তব মডেল দেওয়ার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে প্রত্যেক জাতি, সমাজ বা জনগোষ্ঠির মধ্য থেকে কিছু মানুষকে মনোনীত করে তাদের কাছে ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তার বাণী ও নির্দেশ প্রেরণ করেছেন। যেন তারা মানুষদেরকে তা শিক্ষা দান করেন এবং নিজেদের জীবনে তার বাস্তব ও পরিপূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের সামনে বাস্তব আদর্শ তুলে ধরেন। এদেরকে ইসলামের পরিভাষায় নবী ও রাসূল বলা হয়।

কুরআন ও হাদীসের বিস্তারিত দিকনির্দেশনার আলোকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার অর্থ অতি-সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর মনোনীত নবী ও রাসূল। মানবজাতির মুক্তির পথের নির্দেশনা দানের জন্য তাদের ইহলৌকিক সকল কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন। মানবজাতির মুক্তির পথ, কল্যাণ ও অকল্যাণের সকল বিষয় আল্লাহ তাকে জানিয়েছেন এবং তা মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তাঁকে দান করেছেন।

২. তিনি আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তার পরে আর কোনো ওহী নাযিল হবে না, কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না।

৩. মুহাম্মাদ (ﷺ) বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তার আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়েছে। তার রিসালাতে বিশ্বাস ছাড়া কোনো মানুষই মুক্তির দিশা পাবে না।

৪. মুহাম্মদ ﷺ পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নবুয়তের ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর সকল বাণী, শিক্ষা ও নির্দেশ তিনি পরিপূর্ণভাবে তাঁর উম্মতকে শিখিয়ে গিয়েছেন, কোন কিছুই তিনি গোপন করেননি।

৫. মুহাম্মাদ (ﷺ) যা কিছু উম্মতকে জানিয়েছেন সবকিছুই তিনি সত্য বলেছেন। তার সকল শিক্ষা, সকল কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

৬. আল্লাহকে ডাকতে, উপাসনা করতে, তাঁর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি অর্জন করতে অবশ্যই মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে। তার শিক্ষার বাইরে ইবাদত করলে তা কখনো আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে তাঁর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া। সকল মানুষের কথা ও সকল মতের উর্দ্ধে তাঁর শিক্ষা ও কথাকে স্থান দেওয়া।

৮. তাঁর শিক্ষা অনুসারে সকল মতবিরোধের নিষ্পত্তি করা। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটলে ফয়সালার জন্য তাঁর শিক্ষার, অর্থাৎ কুরআন- হাদীসের শিক্ষার আশ্রয় নিতে হবে। কুরআনের বা হাদীসে নির্দেশনভ সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে হবে। তাঁর মতকে সকল মতের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।

Contents

৯. জীবনের সকল পর্যায়ে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা এবং তাঁর সুন্নাত (জীবনপদ্ধতি) অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করা। তাঁর সুন্নাত বা জীবনাদর্শই মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বলে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

১০. মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সর্বোচ্চ সম্মান করা। একথা বিশ্বাস করা যে, তিনি সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির নেতা, নবী-রাসূলদের প্রধান। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, তাঁর হাবীব, তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা, সর্বযুগের সকল মানুষের নেতা। তিনি নিষ্পাপ। নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ও নুবুওয়াতের পরে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে সকল পাপ, অন্যায় ও অপরাধ থেকে রক্ষা করেছেন। প্রথম মানব আদম (আ)-এর সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ তার জন্য নবুয়ত নির্ধারণ করে রাখেন এবং তাকে সর্বশেষ নবী হিসাবে মনোনীত করেন।

১১. মুহাম্মাদ ﷺ-এর মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস সম্মান ঈমানের মৌলিক বিষয় এবং ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলি প্রত্যেক মানুষের জন্য দ্ব্যর্থহীন ও সহজবোধ্যভাবে বর্ণনা করাই ওহীর মূল কাজ। এখানে ঘোরপ্যাচ, ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদের অবকাশ রাখার অর্থ ঈমান ও নাজাতকে কঠিন করা।

এজন্য কুরআন-হাদীসে তাঁর সম্মান, মর্যাদা, দায়িত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। মুসলিমের দায়িত্ব তাঁর বিষয়ে কুরআন কারীম বা সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে বাহ্যিক ও সহজ অর্থে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা। নিজের থেকে কোন কিছু বাড়িয়ে বলা যাবে না, কারণ তা আমাদেরকে মিথ্যা ও বাড়াবাড়ির পথে ঠেলে দেবে, যা কুরআন ও হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এ জাতীয় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

ক. কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে একজন মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সকল মর্যাদা ও সম্মান সহ তিনি আল্লাহর একজন বান্দা (দাস) ও একজন মানুষ। সৃষ্টির উপাদানে, মানবীয় প্রকৃতি ও স্বভাবে তিনি একজন মানুষ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর মহান কর্মে, তার মহোত্তম চরিত্রে। উপাদানে, সৃষ্টিতে ও প্রকৃতিতে অন্য সবার মত হয়েও তিনি সকল মানবীয় দুর্বলতা জয় করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা, আস্থা, ইবাদত, বিধান পালন, ন্যায়বিচার, সেবা ইত্যাদি সকল দিকে মানবতার পূর্ণতম নিদর্শন ও আদর্শ ছিলেন তিনি। এটিই ছিল তাঁর অন্যতম মু'জিজা। তিনি মানবতার পূর্ণতার শিখরে উঠেছিলেন, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

এগুলির পাশাপাশি মহান আল্লাহ তাকে অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, যেগুলি কোন মানুষকে দেন নি। যেমন সাধারণ মানুষের মত তার ঘামে কোন দুর্গন্ধ ছিলনা, বরং তার শরীরের ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধ। তার ঘুম সাধারণ মানুষের মত ছিল না; তিনি ঘুমালেও আর তার অন্তর সজাগ ও সচেতন থাকত। তিনি সালাতের মধ্যে তাঁর পিছন দিকেও দেখতে পেতেন। অনুরূপ যত বৈশিষ্ট সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সবই মুমিন কোনরূপ অপব্যাখ্যা, বাড়াবাড়ি, তুলনা বা সন্দেহ ছাড়া বিশ্বাস করেন।

খ. আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের অতীত-ভবিষ্যৎ অনেক কিছু জানিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে অনেক গোপনীয় ও ভবিষ্যতের জ্ঞান তাকে আল্লাহ দান করেন। সাথেসাথে কুরআন ও হাদীসে বারবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, সার্বিক গাইব ও ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। আল্লাহর জানানো বিষয় ছাড়া কোন ভবিষ্যৎ কথা, মনের গোপন কথা, বর্তমানের লুক্কায়িত কথা, গোপনকৃত তথ্য ইত্যাদি তিনি জানতেন না বলে তিনি আমাদেরকে কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে বারবার জানিয়েছেন। আমরা তাঁর সকল কথা সরলভাবে বিশ্বাস করি। এক আয়াত দ্বারা আরেক আয়াতকে বা এক হাদীস দ্বারা অন্য হাদীসকে বাতিল বা অপব্যাখ্যা করি না, কোন একটির জন্য বাড়াবাড়ি করি না বা অতিভক্তি করি না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সকল কথা সরলভাবে হুবহু মেনে নেওয়াই সর্বোচ্চ ভক্তি।

গ. আল্লাহর আবদ (দাস) ও রাসূল হিসাবে তাঁকে আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করা ও সুসংবাদ প্রদান করার দায়িত্ব দান করেন। বিশ্ব জগতের পরিচালনা, কারো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার দায়িত্ব বা ক্ষমতা আল্লাহ তাঁকে দেন নি। তাঁকে আল্লাহ অনেক মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শন দান করেছেন। তার দু'আয় আল্লাহ অগণিত অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করেছেন। এসকল আয়াত (অলৌকিক নিদর্শন) বা মুজিযা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় সংঘটিত হয়েছে। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, আর দুআ কবুল করা বা না করা পুরোপুরিই আল্লাহর এখতিয়ার। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা। তার অনেক দুআ আল্লাহ কবুল করেছেন। আবার কখনো কখনো কবুল করেননি। তিনি বদদুআ করলে আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেছেন। তাঁর দুআয় আল্লাহ অসংখ্য মানুষের গোনাহ মাফ করেছেন। আল্লাহর অনুমতিতে তিনি শাফায়াত করবেন এবং তাঁর শাফায়াতে অসংখ্য পাপী মুসলিমকে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। তবে তাঁর দুআ ও শাফায়াত কবুল করা আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহর রহমত ও তাঁর রাসূলের দুআর কল্যাণ পাওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহ জাল্লা জালালুহু-ই ভাল জানেন।

ঘ. তিনি অন্যান্য সকল মানুষের মত মরণশীল। তিনি যথা সময়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুর পরে বিশেষ বারযাখী হায়াত বা জীবন দিবেন যাতে তিনি নামায পড়বেন, উম্মতের দরুদ সালাম ফিরিশতাগণ তাঁর কাছে পৌছাবেন, তিনি জবাব দিবেন ও দুআ করবেন। হাদীসে বর্ণিত এসকল বিষয় আমরা সরলভাবে বিশ্বাস করি। এগুলির উপর নির্ভর করে বাড়িয়ে অন্য কিছু বলি না। আমরা বলি না যে, যেহেতু তাঁর বিশেষ জীবন আছে, সেহেতু তিনি খাওয়া দাওয়া করেন, অথবা ঘুরে বেড়ান, ইত্যাদি। তিনি আমাদের যতটুকু জানার প্রয়োজন তা জানিয়ে দিয়েছেন, তার বেশি বলার অর্থ তাঁর নামে আন্দাযে মিথ্যা কথা বলা, যা কঠিনতম পাপ ও জাহান্নামের কারণ।

ঙ. তিনি নিজে তাঁর বিষয়ে বাড়াবাড়ি অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন: ''তোমরা আমার প্রশংসায়-ভক্তিতে বাড়াবাড়ি করবে না, যেমনভাবে খৃষ্টানরা ঈসা (আ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিলে। আমি তো একজন বান্দা (দাস) মাত্র, কাজেই তোমরা বলবে: আল্লাহর

দাস (বান্দা) ও রাসূল।"[১] একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন: "আল্লাহর মর্জিতে এবং আপনার মর্জিতে ..।" তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন: "তুমি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে দিচ্ছ? বরং একমাত্র আল্লাহর মর্জিতেই।"[২] এক ব্যক্তি বলে: 'ইয়া মুহাম্মাদ, ইয়া সাইয়েদানা, ইবনা সাইয়েদানা, খাইরানা, ইবনা খাইরানা: হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা, আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ মানুষের সন্তান।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "হে মানুষেরা, তোমরা তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) অবলম্বন কর। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিপথগামী না করে। আমি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ: আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, আল্লাহর বান্দা (দাস-চাকর) ও রাসূল। আল্লাহর কসম! আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাকে যে স্থানে রেখেছেন, যে মর্যাদা প্রদান করেছেন তোমরা আমাকে তার উপরে উঠাবে তা আমি পছন্দ করি না।"[৩]

১২. "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে সকল মানুষের ঊর্ধ্বে, নিজের সম্পদ, সন্তান, পিতামাতা ও নিজের জীবনের চেয়ে অধিক ভালবাসা। তাঁর মহান সাহাবীগণ ও তাঁর আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা তাঁর ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসা মুখের দাবীর ব্যাপার নয়। তাঁর নির্দেশিত পথে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা, তাঁর শরীয়তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকাই তাঁর মহব্বতের প্রকাশ। তাঁর আনুগত্য, অনুসরণ ও শরীয়ত পালন ব্যতিরেকে যদি কেউ তাঁর ভালবাসার দাবি করেন তবে তিনি মিথ্যাবাদি অথবা তিনি আবূ তালিব-এর মত তাঁকে ভালবাসেন। এরূপ ভালবাসা মুক্তির পথ নয়।

প্রেম বা ভালবাসার স্বাভাবিক প্রকাশ কোনোভাবে 'প্রেমকৃতকে' কষ্ট না দেওয়া; প্রাণপনে তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। এজন্য প্রকৃত ভালবাসা পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণে ধাবিত করে। আর আনুগত্য ও অনুকরণ ভালবাসাকে গভীর থেকে গভীরতর করে। যে যত বেশী তাঁর শরীয়তকে মেনে চলবেন এবং তাঁর সুন্নাত মত জীবন যাপন করবেন, তাঁর ভালবাসা তত বেশী অর্জন করবেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও বুজুর্গগণ কর্ম ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাঁকে ভালবেসেছেন। এভাবেই মুসলিমের অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা গভীর হতে থাকে, তখন জীবনের সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সকল মানুষের ঊর্ধ্বে, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও তাকে ভালবাসতে সক্ষম হয় একজন মুসলিম। আমার আল্লাহর দরবারে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসরণের ও প্রকৃত ভালবাসার তাওফীক দান করেন। আমীন।

২. ২. ফরয ও নফল ইবাদত পালন

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথে চলার ক্ষেত্রে কর্ম দুই প্রকার : (১) ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম, ও (২) ফরযের অতিরিক্ত নফল বা সুন্নাত ইবাদত। ফরয ইবাদত পালনই আল্লাহর বেলায়েত, নৈকট্য, সাওয়াব ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম কর্ম। ফরযের পরে অনবরত নফল ইবাদত পালন বান্দাকে আল্লাহর বন্ধুত্ব বা বেলায়েতের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় যিক্‌রেরও দু'টি পর্যায় আছে : (১) ফরয যিক্‌র, যেমন, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র ও (২) নফল যিক্‌র, যা মূলত আমাদের আলোচনার বিষয়। যদি কোনো মুমিন অন্যান্য ফরয ইবাদত আদায় করার পরে নফল যিক্‌র আদায় করেন তাহলে তার যিক্‌র হবে অত্যন্ত ফলদায়ক। কিন্তু তিনি যদি ফরয যিক্‌র ও অন্যান্য ফরয ইবাদতে অবহেলা করেন, অথচ নফল যিক্‌র বেশি বেশি করেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে বাতুলতা।

অনেকে ফরয ইবাদত পালন করেন না। ফরয ইল্‌ম, আকীদা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত (যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য) পালন না করে নফল ইবাদত পালন করা, নফল যিক্‌র ইত্যাদি পালন বিশেষ কোনো উপকারে লাগবে না। অবস্থা বিশেষে হয়ত নফল ইবাদত কোনো কোনো ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। কিন্তু কোনো অস্থাতেই তা আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়েতের মাধ্যম নয়। ফরয পরিত্যাগ করলে হারামের গোনাহ হয়। হারামের গোনাহে রত অবস্থায় নফল ইবাদতের অর্থ হলো সর্বাঙ্গে মলমূত্র লাগানো অবস্থায় নাকে আতর মাখা।

এছাড়া, ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সকল নফল ইবাদত থাকে তাও ফরযের বাইরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। সালাতের মধ্যে অসংখ্য ফরয, সুন্নাত ও নফল যিক্‌র আযকার রয়েছে। এগুলি বিশুদ্ধভাবে পালন করা সালাতের বাইরে সারাদিন বিশুদ্ধ মাসনূন যিক্‌রের চেয়ে অনেক উত্তম। নফল যিক্‌র আযকারে রত হওয়ার আগে সালাত ইত্যাদি ফরয যিক্‌র ও তৎসংশ্লিষ্ট নফল যিক্‌র বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে।

ফরয-নফল যে কোনো ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে ইবাদত কবুলের পূর্বশর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কুরআন কারীম ও সুন্নাতের আলোকে যিক্‌রসহ সকল ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল বা গৃহীত হওয়ার পূর্বশত:

(১) বিশুদ্ধ ঈমান: শির্‌ক, কুফ্‌র ও নিফাক-মুক্ত তাওহীদ ও রিসালাতের বিশুদ্ধ ঈমান সকল ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত।

(২) ইবাদতের ইখলাস: ইখলাস অর্থ বিশুদ্ধকরণ। ইবাদতটি একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো

সন্তুষ্টি বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যর সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।

(৩) অনুসরণের ইখলাস: কর্মটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুসরণে পালিত হতে হবে। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম ইবাদত বলে গণ্য নয়।

(৪) হালাল ভক্ষণ: ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল-জীবিকা-নির্ভর হতে হবে। হারাম ভক্ষণকারীর কোনো ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

ফরয ও নফলের দু'টি দিক রয়েছে, – পালন ও বর্জন। কোনো কাজ করা যেরূপ ফরয, তেমনি কিছু কাজ বর্জন করা ফরয। এসকল কাজ করাকে হারাম বলা হয়। অনুরূপভাবে কিছু কর্ম করা নফল-মুসতাহাব বা সুন্নাত। আবার কিছু কাজ বর্জন করাও নফল-মুসতাহাব বা সুন্নাত। এ ধরনের কাজ করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। মাকরুহ কখনো হারামের নিকটবর্তী হয়, যাকে মাকরুহ তাহরীমি বলা হয়। কখনো তা মাকরুহ তানযিহী বা অনুচিত পর্যায়ের হয়, যা বর্জন করা উত্তম তবে করলে গোনাহ হবে না।

আল্লাহর নৈকট্যের পথে কর্মের চেয়ে বর্জনের গুরুত্ব বেশি। যা করা ফরয তা করতেই হবে। আর যা বর্জন করা ফরয তা বর্জন করতেই হবে। যে ব্যক্তি তার উপরে ফরয এরূপ কোনো কর্ম পালন করছেন না, বা তার জন্য হারাম এরূপ কোনো কার্যে রত রয়েছেন, অথচ বিভিন্ন নফল মুসতাহাব কর্ম পালন করছেন তার কাজকে আমরা ইসলামের শিক্ষা বিরুদ্ধ বলতে বাধ্য। তিনি জেনে অথবা না জেনে ভণ্ডামীতে রত রয়েছেন।

নফল পর্যায়ে বর্জনীয় নফলের গুরুত্ব করণীয় নফলের থেকে অনেক বেশি। সাজানোর পূর্বে পরিচ্ছন্নতা। নিজেকে নোংরা, অপরিচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত করে এরপর যতটুকু সম্ভব সাজগোজ করতে হবে। এজন্য সকল প্রকার মাকরুহ বর্জন করা নফল ইবাদতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করলে তা বর্জন করবে; আর কোনো কিছু করতে নির্দেশ দিলে সাধ্যমত তা করবে।"[১]

আমরা এ গ্রন্থে মূলত নফল যিক্‌র সম্পর্কে আলোচনা করছি। এ সকল নফল যিক্‌র পালনের চেয়ে মাকরুহ বর্জন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যাকিরকে এ সকল যিক্‌র পালনের পাশাপশি সকল প্রকার মাকরুহ বর্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে। কখনো কোনো মাকরুহ করে ফেললে বেশি বেশি তাওবা করতে হবে। ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মাকরুহের মধ্যে নিয়োজিত রেখে পাশাপাশি এ সকল যিক্‌র আযকারে রত থাকা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর শিক্ষা, সুন্নাত ও রীতির ঘোর বিরোধী ও বিপরীত।

২. ৩. কবীরা গোনাহ বর্জন

এভাবে মুমিন সর্বদা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কর্ম পরিহার করতে চেষ্টা করবেন। আর হারাম ও কবীরা গোনাহ-সমূহ থেকে শত যোজন দূরে থাকতে সদা সচেষ্ট থাকবেন। আমরা জানি যে, সকল চেষ্টা সত্বেও কিছু অপরাধ হবেই। তবে ছোটখাট পাপ ও ভুলভ্রান্তি আল্লাহ নেক কর্মের কারণে ক্ষমা করে দেন। এজন্য কঠিন পাপগুলো থেকে দূরে থাকার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা, সংখ্যা ও পরিচয় সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম অনেক কথা লিখেছেন। যে সকল পাপের বিষয়ে কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফে কঠিন গজব, শাস্তি বা অভিশাপের উল্লেখ করা হয়েছে বা যে সকল কর্মকে কুরআন বা হাদীসে কঠিন পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও অনেক পাপকে কবীরা বলা হয়েছে। এছাড়া যে কোনো সাধারণ পাপও সর্বদা করলে তা বড় পাপে পরিণত হয়।

ইমাম যাহাবী "আল-কাবাইর" গ্রন্থে কবীরা গুনাহ বিষয়ক আয়াত ও হাদীস সমূহ সংকলিত করেছেন। যে সকল পাপকে কুরআন বা হাদীসে বড় পাপ বা কঠিন শাস্তি, গজব বা অভিশাপের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সেগুলির তালিকা প্রদান করেছেন। আমি এখানে সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। পরে এগুলোর মধ্য থেকে বিশেষ কতগুলো পাপ যা আমাদের নেক কাজগুলোকে বিনষ্ট করে দেয় সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

এ সকল পাপ বা অপরাধকে আমরা দুইভাগে ভাগ করতে পারি: ব্যক্তিগত বা হক্কুল্লাহ বিষয়ক ও সামাজিক বা হক্কুল ইবাদ বিষয়ক। যদিও উভয় প্রকার পাপই আল্লাহর অবাধ্যতা ও পরস্পর সম্পৃক্ত, তবুও সংক্ষেপে বুঝার জন্য দু'ভাগ করে আলোচনা করছি:

২. ৩. ১. হক্কুল্লাহ বিষয়ক কবীরা গুনাহসমূহ

১. **ঈমান বিষয়ক:** শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা-বোধ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, তকদীরে অবিশ্বাস করা, গনক বা জ্যোতিষীর কথা সত্য মনে করা, অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রায় বিশ্বাস করা, মক্কার হারামে যে কোনো প্রকার অন্যায় করার ইচ্ছা, যাদু শিক্ষা বা ব্যবহার, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জবাই করা, নিজের জীবন, সম্পদ, ও সকল মানুষের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেশি ভালবাসায় ত্রুটি থাকা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস বলা, নিজের পছন্দ-অপছন্দ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও শরীয়তের অনুগত না হওয়া, বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া, আত্মহত্যা করা।

২. **ফরয ইবাদত পরিত্যাগ বিষয়ক:** সালাত পরিত্যাগ, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা, ওজর ছাড়া রমযানের সিয়াম পালনে অবহেলা, জুম'আর সালাত পরিত্যাগ করা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব আদায় না করা, ধর্ম পালনে অতিশয়তা বা সুন্নাতের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইবাদত করা, সালাতরত ব্যক্তি সামনে দিয়ে গমন করা।
৩. **হারাম খাদ্য ও পানীয়:** মদপান, মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করা।
৪. **পবিত্রতা ও অন্যান্য অভ্যাস বিষয়ক:** পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া, মিথ্যা বলার অভ্যাস, প্রাণীর ছবি তোলা বা আঁকা, কৃত্রিম চুল লাগান, শরীরে খোদাই করে উল্কি লাগান। পুরুষের জন্য মেয়েলী পোশাক বা চাল চলন, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরা, সোনা ও রেশমের ব্যবহার, গোফ বেশি বড় করা, দাড়ি না রাখা। মেয়েদের জন্য পুরুষালী পোশাক বা আচরণ, সৌন্দর্য প্রকাশক পোশাক পরিধান করে, মাথা, মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া।
৫. **অন্তরের বা মনের পাপ:** অহংকার, গর্ব করা, নিজেকে বড় ভাবা, নিজের মতামত বা কর্মের প্রতি পরিতৃপ্ত থাকা, রিয়া, হিংসা, কোনো মুসলিমকে হেয় বা ছোট ভাবা, ক্রোধ, প্রশংসা ও সম্মানের লোভ, সম্পদের লোভ, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা, দ্বীনী ইল্‌ম পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা, ইল্‌ম গোপন করা।

এগুলোর মধ্যে কিছু পাপের সাথে মানুষের অধিকার জড়িত। মিথ্যা হাদীস বলা এমনিতেই ভয়ঙ্করতম পাপ। সাথে সাথে এ মিথ্যা দ্বারা যারা বিপথগামী হয় তাদের সকলের পাপের ভাগ পেতে হয় মিথ্যাবাদীকে। যাকাত প্রদানে অবহেলা করলে একদিকে আল্লাহর অবাধ্যতা ও ইসলামের রুকন নষ্ট করা হয়। সাথে সাথে সমাজের দরিদ্রদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ইল্‌ম গোপন করলে সাধারণত সমাজের মানুষেরা অজ্ঞতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং এ আলিম তাদের অপরাধের জন্য দায়ী থাকেন।

যাদু ও মিথ্যা বলার অভ্যাস যদি কারো কোনো ক্ষতি না করে তাহলেও কবীরা গোনাহ। পক্ষান্তরে কারো কোনো প্রকার ক্ষতি করলে তা দ্বিতীয় একটি কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে অহংকার, হিংসা, কাউকে হেয় ভাবা ইত্যাদি ব্যক্তিগত কবীরা গোনাহ হলেও সাধারণত এগুলোর অভিব্যক্তি ব্যক্তির বাইরে প্রকাশিত হয়ে অন্যদের কষ্ট দেয়। তখন তা আরো অনেক হক্কুল ইবাদ সংশ্লিষ্ট কবীরা গোনাহের মধ্যে ব্যক্তিকে নিপতিত করে। কৃপণতা যদিও মানসিক পাপ ও ব্যাধি, কিন্তু সাধারণত এ ব্যধি মানুষকে বান্দার হক নষ্ট বা ক্ষতি করার অনেক পাপের দিকে প্ররোচিত করে।

২. ৩. ২. সৃষ্টির অধিকার সংক্রান্ত কবীরা গোনাহসমূহ

কুরআন-হাদীসের আলোকে মানুষের মূল দায়িত্ব দুটি ও পাপের সূত্রও দুটি। প্রথম দায়িত্ব, মানুষ তার মহান প্রভুর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস, অগাধ ভালবাসা ও আস্থা পোষণ করবে এবং এ আস্থা, বিশ্বাস ও ভালবাসা বৃদ্ধিপায় এমন সকল কর্ম আল্লাহর মনোনীত রাসূলের শিক্ষা অনুসারে পালন করবে। আর এ দায়িত্বে অবহেলা সৃষ্টি করে এমন সকল কর্ম বা চিন্তা-চেতনাই প্রথম পর্যায়ের পাপ।

মানুষের দ্বিতীয় দায়িত্ব, এ পৃথিবীকে সুন্দর বসবাসযোগ্য করতে তার আশেপাশের সকল মানুষ ও জীবকে তারই মতো ভালভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। আর এ দায়িত্বের অবহেলাজনিত কর্মই দ্বিতীয় পর্যায়ের পাপ। আল্লাহর সৃষ্টির কষ্ট প্রদান, ক্ষতি করা, শান্তি বিনষ্ট করা বা অধিকার নষ্ট করাই মূলত সবচেয়ে কঠিন অপরাধ। এ জাতীয় পাপগুলো কুরআন-হাদীসে বেশি আলোচনা করা হয়েছে। একই জাতীয় পাপের শাখা প্রশাখাকে বিশেষভাবে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এর তালিকাও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

১. ইসলাম নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধীর (চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা।
২. আইনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করা। এমনকি ডাকাতী, খুন, ধর্মদ্রোহিতা ইত্যাদি ইসলামী বিধানে যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে নির্ধারিত সে অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তিকেও কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে শাস্তি দিলে তা হত্যা। একমাত্র উপযুক্ত আদালতের বিচারের মাধ্যমেই অপরাধীর অপরাধ, তার মাত্রা ও শাস্তি নির্ধারিত হবে। যথাযথ বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে অপরাধী মনে করা বা শাস্তি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টির অধিকার নষ্টকারী কঠিন অপরাধ।
৩. রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা বিচারক কর্তৃক জনগণের দায়িত্ব, সম্পদ বা আমানত আদায়ে অবহেলা করা বা ফাঁকি দেওয়া।
৪. নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, প্রশাসক বা প্রধানকে ধোঁকা দেওয়া বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করা।
৫. রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ।
৬. অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করা।
৭. 'বাইয়াত' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের শপথের' বাইরে থেকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বা 'অবাধ্য' অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।
৮. রাষ্ট্র প্রশাসনের অন্যায় বা জুলুম সমর্থন বা সহযোগিতা করা।
৯. সমাজের মানুষদেরকে কবীরা গোনাহের কারণে কাফির বলা বা মনে করা।
১০. বিচারকের জন্য ন্যায় বিচারে একনিষ্ঠ না হওয়া বা বিচার্য বিষয়ের বাইরে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচার করা।
১১. আইন প্রয়োগকারীর জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা ও আপনজনদের জন্য হালকাভাবে শাস্তি প্রয়োগ করা।
১২. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান না করা।
১৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ বা ভোগ করা, তা যত সামান্যই হোক।
১৪. মুনাফিককে নেতা বলা।
১৫. জিহাদের মাঠ থেকে পালিয়ে আসা।
১৬. মুসলিমগণকে কষ্ট প্রদান ও গালি দেওয়া।

১৭. যবরদস্তি, মিথ্যা মামলা বা অবৈধভাবে কোনো মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করা।
১৮. হাটবাজার, রাস্তাঘাটে টোল আদায় করা বা চাঁদাবাজী করা।
১৯. মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট প্রদান বা তার অধিকার নষ্ট। যে কোনো মানুষকে কষ্ট দেওয়াই কঠিন পাপ। তবে হাদীস শরীফে বিশেষ করে অমুসলিম ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণ নির্দেশনা তো আছেই।
২০. কোনো মহিলা বা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। যে কোনো মানুষের সামান্য সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ অন্যতম কবীর গোনাহ। তবে মহিলা ও এতিম যেহেতু দুর্বল এজন্য হাদীসে তাদের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে তাদের সম্পদ অবৈধ ভোগকারীর কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
২১. আল্লাহর প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট প্রদান বা তাদের সাথে শত্রুতা করা।
২২. প্রতিবেশীর কষ্ট প্রদান।
২৩. কোনো মাজলিসে এসে খালি জায়গা দেখে না বসে ঠেলাঠেলি করে অন্যদের কষ্ট দিয়ে মাজলিসের মাঝে এসে বসে পড়া বা এমনভাবে মাঝে বসা যাতে অন্য মানুষদের অসুবিধা হয়।

২৪. কারো স্ত্রী বা চাকর বাকর ফুসলিয়ে সরিয়ে দেওয়া।
২৫. কর্কশ ব্যবহার ও অশ্লীল- অশ্রাব্য কথা বলা।
২৬. অভিশাপ বা গালি দানে অভ্যস্ত হওয়া।
২৭. কোনো মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু অর্থলাভ করা।
২৮. তিন দিনের অধিক কোনো মুসলিমের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা।
২৯. মুসলিমগণের একে অপরকে ভাল না বাসা বা ভালবাসার অভাব থাকা।
৩০. মুসলিমদের গোপন দোষ খোঁজা, জানা ও বলে দেওয়া।
৩১. নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা।
৩২. কোনো ব্যক্তিকে তার বংশের বিষয়ে অপবাদ দেওয়া।
৩৩. পিতামাতার অবাধ্য হওয়া বা তাঁদের কষ্ট প্রদান করা।
৩৪. সুদ গ্রহণ করা, প্রদান করা, সুদ লেখা বা সুদের সাক্ষী হওয়া।
৩৫. ঘুষ গ্রহণ করা, প্রদান করা ও ঘুষ আদান প্রদানের মধ্যস্থতা করা।
৩৬. মিথ্যা শপথ করা।
৩৭. হীলা বিবাহ করা বা করানো।
৩৮. আমানতের খেয়ানত করা।
৩৯. কোনো মানুষের উপকার করে পরে খোটা দেওয়া।
৪০. মানুষের গোপন কথা শোনা বা জানার চেষ্টা করা।
৪১. স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্য হওয়া।
৪২. স্বামীর জন্য স্ত্রীর টাকা বা সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে ভোগ বা দখল করা।
৪৩. চোগলখুরী করা বা একজন মানুষের কাছে অন্য মানুষের নিন্দামন্দ ও শত্রুতামূলক কথা বলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট করা।
৪৪. গীবত বা পরচর্চা করা। অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান বাস্তব ও সত্য দোষগুলো উল্লেখ করা।
৪৫. অসত্য দোষারোপ করা। অর্থাৎ কারো মধ্যে যে দোষ বিরাজমান নেই অনুমানে বা লোকমুখে শুনে তার সম্পর্কে সে দোষের কথা উল্লেখ করা।

৪৬. জমির সীমানা পরিবর্তন করা।
৪৭. মহান সাহাবীগণকে গালি দেওয়া।
৪৮. আনসারগণকে গালি দেওয়া।
৪৯. পাপ বা বিভ্রান্তির দিকে বা খারাপ রীতির দিকে আহ্বান করা।
৫০. কারো প্রতি অস্ত্র জাতীয় কিছু উঠান বা হুমকি প্রদান।
৫১. নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা।
৫২. জেদাজেদি ঝগড়া, বিতর্ক কলহ বা কোন্দল।
৫৩. ওজন, মাপ বা দ্রব্যে কম দেওয়া বা ভেজাল দেওয়া।
৫৪. কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
৫৫. নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে প্রদান থেকে বিরত থাকা।
৫৬. কোনো প্রাণীর মুখে আগুনে পুড়িয়ে বা কেঁটে দাগ বা মার্কা দেওয়া।
৫৭. জুয়া খেলা।
৫৮. অবৈধ ঝগড়া বা গোলযোগে সহযোগিতা করা।

৫৯. কথাবার্তায় সংযত না হওয়া।
৬০. ওয়াদা ভঙ্গ করা।
৬১. উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
৬২. স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক তাদের একান্ত গোপনীয় কথা অন্য কাউকে বলা।
৬৩. কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি করা।
৬৪. কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে সাহায্য বা ক্ষমা চাইলে আর তার প্রতি বিরক্ত থাকা অথবা তাকে ক্ষমা বা সাহায্য না করা।
৬৫. যা কিছু শোনা হয় বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা।
৬৬. বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য প্রদানে ও সাহায্য দানে উৎসাহ না দেওয়া।
৬৭. ব্যভিচার, সমকামিতা বা যৌন অনাচার ও অশ্লীলতা।
৬৮. নিরপরাধ মানুষকে, বিশেষত মহিলাকে ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য ছাড়া ব্যভিচার বা অনৈতিকতার অপবাদ দেওয়া।
৬৯. সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করতে পারে এমন কোনো গল্পগুজব বা কথাবার্তা বলা বা প্রচার করা। এর মধ্যে সকল পর্নোগ্রাফি, ছবি, অশ্লীল উপন্যাস ও গল্প অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর প্রচার, বিক্রয়, আদান প্রদান সবই কবীরা গোনাহ।

উপরের সকল পাপই অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআন ও হাদীসে এগুলোর ভয়ঙ্কর শাস্তি ও খারাপ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো পাপ নেক আমলের ফলে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। আবার কোনো কোনো পাপ সকল নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। এ সকল ইবাদত বিনষ্টকারী পাপের অন্যতম শিরক, কুফর, অহঙ্কার, হিংসা, অপরের অধিকার নষ্ট করা, গীবত করা ইত্যাদি।

২. ৪. আল্লাহর পথের পথিকদের পাপ

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর পথে চলতে সচেষ্ট ও ধর্ম-সচেতন অনেক মানুষ অনেক সময় এসব ইবাদত বিধ্বংসী পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যান। অনেক সচেতন মুসলিম ব্যভিচার, মিথ্যা, মদপান, সালাত বা সিয়াম পরিত্যাগ ইত্যাদি পাপে কখনোই লিপ্ত হন না। কখনো এরূপ কিছু করলে সকাতরে তাওবা-ইসতিগফার করতে থাকেন। কিন্তু জেনে অথবা না জেনে তাঁরা শির্‌ক, কুফ্‌র, বিদ'আত, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, আত্মতুষ্টি, গীবত ইত্যাদি পাপের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছেন।

এর কারণ, কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই শয়তান কখনো নিরাশ হয় না। প্রত্যেক মানুষকেই কোনো না কোনোভাবে বিভ্রান্ত করতে সে সদা সচেষ্ট। সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য তার নিজস্ব পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী রয়েছে। সবাইকেই সে পরিপূর্ণ ধর্মহীন অবিশ্বাসী করতে চায়। যাদের ক্ষেত্রে সে তা করতে সক্ষম না হয় তাদেরকে সে 'ধর্মের আবরণে' পাপের মধ্যে লিপ্ত করে। অথবা বিভিন্ন প্রকার 'অন্তরের পাপে' লিপ্ত করে, যেগুলো নেককার মানুষের নেক-আমল নষ্ট করে দেয়, অথচ সেগুলোকে অনুধাবন করা অনেক সময় ধার্মিক মানুষের জন্যও কষ্টকর হয়ে যায়। আমরা এখানে এ জাতীয় কিছু পাপের কথা আলোচনা করতে চাই।

২. ৪. ১. শিরক, কুফর ও নিফাক

শিরক অর্থ অংশ। আল্লাহর কোনো কর্ম, গুণ, নাম বা ইবাদতে কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার বানানো, তাঁর সমকক্ষ মনে করা, কোনো ফিরিশতা, জিন, নবী, ওলী, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা অন্য কিছুর মধ্যে 'ঈশ্বরত্ব' বা অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে মনে করা শিরক। কুফর অর্থ অবিশ্বাস। তাওহীদ ও রিসালাত বিষয়ক ঈমানের কোনো বিষয় অবিশ্বাস করা কুফর। শিরক ও কুফর পরস্পর জড়িত ও অবিচ্ছেদ্য। মনের মধ্যে শিরক-কুফর গোপন রেখে জাগতিক প্রয়োজনে মুখে ঈমানের দাবী করা নিফাক বা মুনাফিকী।

শিরক ধার্মিকদের পাপ। **ধার্মিক মানুষদের ধ্বংস করতে শয়তানের মূল অস্ত্র ৫টিঃ শিরক, কুফর, বিদআত, হিংসা-বিদ্বেষ ও বান্দার হক্ক নষ্ট করা।** এর মধ্যে প্রথম চারটিকে শয়তান একেবারে ধর্মের লেবাস পরিয়ে পেশ করে। বিশ্বাসী মানুষ ধর্ম পালনের নামেই এ সকল পাপ করেন। কোনো নাস্তিক কখনো শিরকে লিপ্ত হয় না। বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহর করুণা লাভের আবেগে আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে অতিভক্তি করে শিরকে লিপ্ত হন। কুরআনে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ শুধু আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের জন্যই শিরক করত (সূরা ৩৯-যুমারঃ আয়াত ৩)।

নাস্তিকতা পর্যায়ের কুফর ধার্মিকদের মধ্যে থাকে না। তবে অনেক ধার্মিক মানুষ তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান বিষয়ক অনেক কিছু অস্বীকার বা অবিশ্বাস করে কুফরীতে লিপ্ত হন। এজন্য বেলায়াত অর্জনের পথে শিরক-কুফর সম্পর্কে সচেতনতা অতীব জরুরী। এখানে শিরক-কুফর বিষয়ক কিছু তথ্য সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, বিস্তারিত আলোচনা, তথ্য ও তথ্যসূত্রের জন্য **'কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা'** বইটি পড়তে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

২. ৪. ১. ১. শিরক-কুফরের বৈশিষ্ট্যাবলি

কুরআন-হাদীসের অগণিত বর্ণনায় আমরা দেখি যে, শিরক-কুফর জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। অন্যান্য পাপ থেকে এর বিশেষত্বঃ

(ক) এর শাস্তি ভয়ঙ্কতম ও কঠিনতম।

(খ) সকল পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাওবা ছাড়া নিজ করুণায়, নেক আমলের বরকতে বা কারো শাফাআতে ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরক-কুফরের পাপ পরিপূর্ণ তাওবা ও শিরক-কুফর বর্জন ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

(গ) শিরক-কুফরের ফলে মানুষের অন্যান্য সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিক্‌র, দোয়া, সুন্নাত পালন, মানব সেবা ইত্যাদি অগণিত নেক আমল করেন, এরপর তিনি একটি শিরকমূলক কর্ম করেন, তাহলে তার সকল নেক কর্মের সাওয়াব বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে তার কিছুই থাকবে না। অন্য কোন পাপের ফলে এভাবে নেককর্ম নষ্ট হয় না।

(ঘ) শিরক-কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। তাকে অনন্তকাল জাহান্নামেই থাকতে হবে।

২. ৪. ১. ২. সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক-কুফর

মুসলিম সমাজে অগণিত মানুষ বিভিন্ন প্রকার শিরক ও কুফরীর মধ্যে নিপতিত। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রচলিত কুসংস্কার, মাজারের খাদেম ও প্রচারকদের কথায় বিশ্বাস, ওলী ও বুজুর্গগণ সম্পর্কে অতিভক্তি, তাদের কারামতকে তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে মনে করা ইত্যাদি কারণে তাঁরা বহুবিধ শিরক-কুফরে লিপ্ত। এখানে সুস্পষ্ট কিছু শিরক ও কুফরের উল্লেখ করছিঃ

১. তাওহীদ বা রিসালাতের কোনো বিষয় অবিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস না করা। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তাঁর বান্দা, দাস ও মানুষ রূপে বিশ্বাস না করা। অথবা তাঁকে আল্লাহর অবতার, আল্লাহ তাঁর সাথে মিশে গিয়েছেন, 'যে আল্লাহ সে-ই রাসূল' ইত্যাদি মনে করা। অথবা তাঁকে আল্লাহর নবী ও রাসূল রূপে না মানা। তাকে কোনো বিশেষ যুগ, জাতি বা দেশের নবী মনে করা। তাঁর কোনো কথা বা শিক্ষাকে ভুল বা অচল মনে করা। আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর শিক্ষার অতিরিক্ত কোনো শিক্ষা, মত বা পথ আছে, থাকতে পারে বা প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করা।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এ বিশ্বের প্রতিপালন বা পরিচালনায় শরীক আছেন বলে বিশ্বাস করা। অন্য কোনো সৃষ্টি, প্রাণী, ফিরিশতা, জীবিত বা মৃত মানুষ, নবী, ওলী সৃষ্টি, পরিচালনা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্য সাহায্য, রিযিক দান, জীবন দান, সুস্থতা বা রোগব্যাধি দান, বৃষ্টি দান, বরকত দান, অনাবৃষ্টি প্রদান, অমঙ্গল প্রদান ইত্যাদি কোনো প্রকার কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ কাউকে অনুরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বলে বিশ্বাস করা।

৩. আল্লাহ ছাড়া কোনো নবী, ওলী, জিন বা ফিরিশতা সকল প্রকার অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, গায়েব বা দূরের ডাক শুনতে পারেন, সাড়া দিতে পারেন, সদাসর্বদা সর্বত্র বিরাজমান বা হাজির নাযির বলে বিশ্বাস করা।

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ, ঈসা (আ) বা অন্য কাউকে আল্লাহর যাত (সত্তা) বা সিফাত (বিশেষণ)-এর অংশ, আল্লাহর সত্তা, বিশেষণ বা নূর থেকে (Same Substance/ Light from Light) সৃষ্ট বা জন্মদেওয়া বলে বিশ্বাস করা।

৫. অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা। কোনো বস্তু, প্রাণী, কর্ম, বার, তিথি, মাস ইত্যাদিকে অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রা বলে মনে করা স্পষ্ট শিরক। আমাদের দেশে অনেক মুসলিমও 'কী করলে কী হয়' জাতীয় অনেক বিষয় লিখেন বা বিশ্বাস করেন। এগুলি সবই শিরক। জন্মদিনে নখ-চুল কাটা, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখা, রাতে নখ কাটা, পিছন থেকে ডাকা, কাক ডাকা ইত্যাদি অগণিত বিষয়কে অমঙ্গল বা অশুভ মনে করা হয়, যা নিতান্তই কুসংস্কার, মিথ্যা ও শিরকী বিশ্বাস। পাপে অমঙ্গল ও পুণ্যে কল্যাণ। সৃষ্টির সেবায় সকল মঙ্গল নিহিত ও সৃষ্টির ক্ষতি করা বা অধিকার নষ্ট করার মধ্যে নিহিত সকল অমঙ্গল। এছাড়া অমঙ্গল বা অশুভ বলে কিছুই নেই।

৬. আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা। আল্লাহ ছাড়া কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য, জীবিত বা মৃত প্রাণী বা বস্তুকে; যেমন মানুষ, জিন, ফিরিশতা, মাযার, কবর, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে সাজদা করা, অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ, দীর্ঘায়ু, রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, সন্তান ইত্যাদি প্রার্থনা করা। তাদের নামে মানত, কুরবানি বা উৎসর্গ (sacrifice) করা শিরক। আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য- জীবিত বা মৃত, বিমূর্ত, মূর্ত, প্রস্তরায়িত বা সমাধিত, নবী, ওলী, ফিরিশতা বা যে কোনো নামে বা প্রকারে কারো জন্য- এগুলি করা হলে তা শিরক। মূর্তিতে ভক্তিভরে ফুলদান, মূর্তির সামনে নীরবে বা ভক্তিভরে দাঁড়ানো ইত্যাদি এজাতীয় শিরকী বা শিরকতুল্য কর্ম।

৭. আল্লাহর জন্য কোনো ইবাদত করে সে ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সাথে অন্য কারো সম্মান প্রদর্শন বা সন্তুষ্টি কামনাও শিরক। যেমন আল্লাহর জন্য সাজদা করা তবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে সামনে রেখে সাজদা করা, যেন আল্লাহর সাজদার সাথে সাথে তাকেও সম্মান করা হয়ে যায়। অথবা আল্লাহর জন্য মানত করে কোনো জীবিত বা মৃত ওলী, ফিরিশতা, জিন, কবর, মাযার, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে মানতের সাথে সংযুক্ত করা।

৮. আল্লাহ, তাঁর রাসূল বা তাঁর দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা কুফর। এ জাতীয় প্রচলিত কুফরীর মধ্যে অন্যতম আল্লাহর বিভিন্ন বিধান, যেমন - নামায, পর্দা, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, ইসলামী আইন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা এগুলিকে বর্তমানে অচল বা মধ্যযুগীয় মনে করা।

৯. ইসলামকে শুধু ব্যক্তি জীবনে পালন করতে হবে এবং সমাজ, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে না বলে মনে করা, ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা, ওয়াজ মাহফিল, যিক্‌র, তিলাওয়াত, নামায, মাদ্রাসা, মসজিদ, বোরকা, পর্দা ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা অনুভব করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবী-রাসূলের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

১০. মুহাম্মাদ ﷺ-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করা, তাঁর পরে কারো কাছে কোনো প্রকার নুবুওয়াত বা ওহী এসেছে বা আসা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা।

১১. সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারকি, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি, নীতি, আদর্শ, আইন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো নিয়ম, নীতি, মতবাদ বা আদর্শ বেশী কার্যকর, উপকারী বা উপযোগী বলে মনে করা। যুগের প্রয়োজনে তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করা।

১২. যে কোনো প্রকার কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। উপরে বর্ণিত কোন কুফুর বা শিরকে লিপ্ত মানুষকে মুসলিম মনে করা বা তাঁদের আকীদার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। যেমন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সর্বশেষ নবী বলে মানেন না বা তাঁর পরে কোনো নবী থাকতে পারে বা ওহী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করেন তাদেরকে কাফির মনে না করা কুফরী। অনুরূপভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সঠিক বা

পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম বলে মনে করা, সব ধর্মই ঠিক মনে করা কুফর। অন্যান্য ধর্মের শিরক বা কুফরমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, সেগুলির প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণাবোধ না থাকা, অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা, ক্রিসমাস (বড়দিন), পূজা ইত্যাদিতে আনন্দ- উদ্‌যাপন করা ইত্যাদি বর্তমান যুগে অতি প্রচলিত কুফরী কর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামই সর্বপ্রথম সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রত্যেকেই তাদের ধর্ম পালন করবেন। তাদের ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা নিষিদ্ধ। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুক্তি একমাত্র ইসলামের মধ্যে বলে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল ধর্মই সঠিক বলার অর্থ সকল ধর্মকে মিথ্যা বলা এবং সকল ধর্মকে অবিশ্বাস করা; কারণ প্রত্যেক ধর্মেই অন্য ধর্মকে বেঠিক বলা হয়েছে।

১৩. আরেকটি প্রচলিত কুফরী গণক, জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ, রাশিবিদ, জটা ফকির বা অন্য কানো ভাগ্যগণনা, ভবিষ্যৎ গণনা বা গোপন জ্ঞান দাবি করা অথবা এসকল মানুষের কথায় বিশ্বাস করা। এ ধরনের কোনো কোনো কর্ম ইসলামের নামেও করা হয়। যেমন, 'এলেম দ্বারা চোর ধরা'। যে নামে বা যে পদ্ধতিতেই করা হোক গোপন তথ্য, গায়েব, অদৃশ্য, ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য গণনা বা বলা জাতীয় সকল কর্মই (কাহানা)-র অন্তর্ভুক্ত ও কুফরী কর্ম। অনুরূপভাবে কোনো দ্রব্য, পাথর, ধাতু, অষ্টধাতু, গ্রহ বা এ জাতীয় কোনো কিছু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে অথবা দৈহিক বা মানসিক ভালমন্দ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা শিরক।

১৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো কোনো কর্ম, পোষাক, আইন, বিধান, রীতি, সুন্নাত, কর্মপদ্ধতি বা ইবাদত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা।

১৫. কোন মানুষকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা বা কোনো কোনো মানুষের জন্য শরীয়তের বিধান পালন করা জরুরী নয় বলে বিশ্বাস করা কুফরী। যেমন, মারিফাত বা মহব্বত অর্জন হলে, বিশেষ মাকামে পৌঁছালে আর শরীয়ত পালন করা লাগবে না বলে মনে করা। অনুরূপভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল উপার্জন, পর্দা ইত্যাদি শরীয়তের যে সকল বিধান প্রকাশ্যে পালন করা ফরয তা কারো জন্য গোপনে পালন করা চলে বলে বিশ্বাস করাও কুফরী। এ ধরণের মত পোষণ কারী মূলত নিজেকে বা নিজের ধারণার উক্ত বুজুর্গকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মহান সাহাবীগণের চেয়েও বড় বুজুর্গ মনে করে। এ ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবেন, যদিও তিনি ইসলামের বিধান পালন করেন।

১৬. যাদু, টোনা, বান ইত্যাদি ব্যবহার করা বা শিক্ষা করা।

১৭. ইসলাম ধর্ম জানতে-বুঝতে আগ্রহ না থাকা। ইসলামকে জানা ও শিক্ষা করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না করা বা এ বিষয়ে মনোযোগ না দেয়া।

১৮. আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ আছে বা মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর নিকট ক্ষমালাভ, করুণালাভ বা মুক্তিলাভ সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করা শিরক।

২. ৪. ২. বিদ'আত

আমরা দেখেছি, যে কর্ম বা বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ দীন বা ইবাদত হিসেবে পালন করেননি তাকে দীন, ইবাদত বা সাওয়াবের কর্ম বলে মনে করা বিদ'আত। এখানে সংক্ষেপে বিদআতের কিছু বৈশিষ্ট্য তথ্যসূত্র বাদে উল্লেখ করছি। বিস্তারিত আলোচনা, তথ্য, তথ্যসূত্রের জন্য পাঠককে আমার লেখা **'এহইয়াউস সুনান'** গ্রন্থ পাঠ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।

(ক) বিদআত একান্তই ধার্মিকদের পাপ। ধার্মিক ছাড়া কেউ বিদআতে লিপ্ত হয় না। বিদআতই একমাত্র পাপ যা মানুষ পুণ্য মনে করে পালন করে।

(খ) কোনো কর্ম বিদআত বলে গণ্য হওয়ার শর্ত তাকে ইবাদত মনে করা। যেমন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে বা নর্তনকুর্দন করে যিকর বা দরুদ-সালাম পড়ছেন। এরূপ দাঁড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন শরীয়তে মূলত নিষিদ্ধ নয়। কেউ যদি জাগতিক কারণে এরূপ করেন তা পাপ নয়। দাঁড়ানো বা নর্তন কুর্দনের সময় যিকর বা দরুদ-সালাম পাঠ পাপ নয়। দরুদ-সালাম বা যিকরের সময় কোনো কারণে বা অনিয়ন্ত্রিত আবেগে দাঁড়ানো বা লাফানো পাপ নয়। কিন্তু যখন কেউ 'দাঁড়ানো', 'লাফানো' বা 'নর্তন-কুর্দন'-কে দীন, ইবাদত বা ইবাদতের অংশ হিসেবে বিশ্বাস করেন তখন তা বিদআতে পরিণত হয়।

ইবাদত মনে করার অর্থ: **(১)** যিকর বা দরুদ-সালাম দাঁড়ানো বা লাফানো ব্যতিরেকে পালন করার চেয়ে দাঁড়ানো বা লাফানো-সহ পালন করা উত্তম, অধিক আদব, অধিক সাওয়াব বা অধিক বরকত বলে মনে করা বা (২) দাঁড়ানো বা লাফানো ছাড়া যিকর বা দরুদ-সালাম পালন করতে অস্বস্তি অনুভব করার কারণে এপদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনকে রীতিতে পরিণত কর।

(গ) আমরা দেখছি যে, সাধারণভাবে বিদআতকে পাপ বলে বুঝা যায় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মটি ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তাকে ইবাদত বানানো বা ইবাদত বলে বিশ্বাস করাই পাপ। অনেক সময় শরীয়ত নিষিদ্ধ কর্মও বিদআতে পরিণত হয়। যেমন মদপান, ব্যভিচার, গানবাদ্য, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা, কবর পাকা করা, কবরে বাতি দেওয়া ইত্যাদি। কেউ যদি সাধারণভাবে মদপান, ব্যভিচার, গানবাদ্য ইত্যাদি করে তবে তা হারাম। আর যদি কেউ এ সকল কর্মকে ইবাদত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কর্ম হিসেবে পালন করে তা হারাম ও বিদআত। বাস্তবেও অনেক ফকীর, মারফতী বা সূফী নামধারী ব্যক্তি ধর্ম বা ইবাদতের নামে এ সকল মহাপাপে লিপ্ত হন।

(ঘ) বিদআতের পাপ কয়েকটি পর্যায়ের: **(১)** তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ এ কর্ম আল্লাহ কবুল করছেন না এবং এজন্য কোনো সাওয়াব হচ্ছে না। **(২)** তা বিভ্রান্তি। কারণ তিনি জেনে বা না-জেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের ইবাদতকে অপূর্ণ বলে মনে করছেন। **(৩)** বিদআত অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। (৪) গানবাদ্য, মদপান, কবর সাজদা ইত্যাদি মহাপাপকে ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করলে তাতে এ সকল মহাপাপের শাস্তি এবং বিদআতের শাস্তির পাশাপাশি ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

(ঙ) বিদআতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক তা সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করে। বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে সুন্নী বা আহলুস সুন্নাত মনে করেন। যে সুন্নাতগুলো তার বিদআতের প্রতিপক্ষ নয় সেগুলি তিনি পালন বা মহব্বত করেন। তবে তাঁর পালিত বিদআত সংশ্লিষ্ট সুন্নাতকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না।

উপরের উদাহরণটি বিবেচনা করুন। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পালন করছেন তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর, দরুদ বা সালাম পালন করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে তিনি কোথাও দেখেন নি। তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বসেবসে যিকর, দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন বলে তিনি অনেক হাদীস থেকে জেনেছেন। তারপরও তিনি বসে যিকর বা দরুদ-সালাম পালনে অস্বস্তিবোধ করবেন। বিভিন্ন 'দলীল' দিয়ে এ সকল ইবাদত বসে পালনের চেয়ে দাঁড়িয়ে বা নেচে পালন করা উত্তম বলে প্রমাণের চেষ্টা করবেন।

তাঁর বিদআতকে প্রমাণ করতে তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক দলীল পেশ করবেন এবং সুন্নাত-প্রমাণিত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করতে তিনি বলবেন: 'সবকিছু কি সুন্নাত মত হয়? ফ্যান, মাইক... কত কিছুই তো নতুন। ইবাদতটি একটু নতুন পদ্ধতিকে করলে সমস্যা কী? উপরন্তু সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করে বসেবসে দরুদ, সালাম ও যিকর পালনকারীর প্রতি কম বা বেশি অবজ্ঞা অনুভব করবেন।

(চ) তাওহীদের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে শিরকের উৎপত্তি এবং রিসালাতের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে বিদআতের উৎপত্তি। বিদআত মূলত মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বা রিসালাতের পূর্ণতায় অনাস্থা। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যেমন শিরক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'গাইরুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া অন্য)-এর প্রতি হৃদয়ের আস্থা অধিক অনুভব করেন তেমনি বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদআতের ক্ষেত্রে 'গাইরুন্নবী' (নবী ছাড়া অন্য)-এর অনুসরণ-অনুকরণে অধিক স্বস্তি বোধ করেন। তিনি সর্বদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'সব কিছু কি নবীর তরীকায় হয়?' বলে এবং নানাবিধ 'দলীল' দিয়ে ইত্তিবায়ে রাসূল ﷺ গুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। পাশাপাশি তার 'বিদআত' আমল বা পদ্ধতিকে উত্তম প্রমাণ করতে 'গাইরুন্নবী' অর্থাৎ বিভিন্ন বুজুর্গের কর্মের প্রমাণ প্রদান করেন।

(ছ) মুশরিকগণ আল্লাহর প্রতিপালনের একত্বে বিশ্বাস করত এবং তাঁর ইবাদত করত, তবে তাঁর একার বন্দনায় তৃপ্তি পেত না। তাঁর যিকর বা বন্দনার পাশাপাশি 'গাইরুল্লাহ'-এর যিকর-বন্দনা হলে তাদের হৃদয় তৃপ্ত হতো। আল্লাহ বলেন: 'যখন শুধু আল্লাহর একার যিকর হয় তখন আখিরাতে অবিশ্বাসীদের হৃদয় বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। আর তিনি ছাড়া অন্যদের যিকর হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" (সূরা ৩৯-যুমার: আয়াত ৪৫) আমরা দেখি যে, বিদআতে লিপ্ত মানুষদের হৃদয়ের অবস্থা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে ঠিক একইরূপ হয়ে যায়। তাঁরা তাঁকে মানেন। কিন্তু যখন শুধু তাঁরই অনুসরণ অনুকরণের কথা বলা হয় তখন তারা বিরক্তি অনুভব করেন। কিন্তু তাঁর পাশাপাশি অন্যান্য বুজুর্গের কথা বলা হলে তারা তৃপ্তি বোধ করেন।

অনেকেই বলেন: 'আমি শুধু অমুক বুজুর্গকে অনুসরণ করব। অন্য কারো বিষয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে আমি অনুসরণ করব শুধু তাঁকেই। তিনি যা করেছেন তা করব এবং যা করেন নি তা করব না। তিনি জান্নাতে গেলে আমিও যাব। ... ।' বর্তমান যুগ থেকে অতীতের যে কোনো 'গাইরুন্নবী' আলিম, ইমাম বা বুজুর্গের নামে এ কথাটি বলা হলে তাতে সাধারণত আপত্তি করা হয় না। কিন্তু যদি এ কথাটিই মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে বলা হয় তবে বিদআতে আক্রান্ত মুমিনগণ তা পছন্দ করবেন না।

সকল বিদআতের ক্ষেত্রেই এটি সুস্পষ্ট। মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় অধঃপতন তো আর কিছুই হতে পারে না যে, তাঁর হৃদয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত গ্রহণ করতে অস্বস্তি বা অবজ্ঞা বোধ করে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার বলেছেন: "তাঁর সুন্নাত যে অপছন্দ বা অবজ্ঞা করবে সে তাঁর উম্মাত নয়।"

(জ) অন্যান্য পাপ যতই ভয়ঙ্কর হোক, মুমিন সাধারণত এগুলো থেকে তাওবা করতে পারেন, কিন্তু বিদআত থেকে তাওবা করা খুবই কঠিন। কারণ সকল পাপের ক্ষেত্রে মুমিন জানেন যে তিনি পাপ করছেন; ফলে তাওবার একটি সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বিদআত পালনকারী তার বিদআতকে নেক আমল মনে করেই পালন করেন। কাজেই এর জন্য তাওবার কথা তিনি কল্পনাও করেন না।

এজন্য তাবিয়ীগণ বলতেন: কাউকে সাধারণ পাপে লিপ্ত করার চেয়ে বিদআতে লিপ্ত করতে পারলে ইবলীস অনেক বেশি খুশি হয়। সম্ভবত একারণেই বিদআত যত সাধারণই হোক তার প্রতি আকর্ষণ সর্বদা খুবই বেশি হয়। যেমন দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে বা নেচে যিকর, দরুদ বা সালাম পালনকারী দাবি করবেন যে, দাঁড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন মুসতাহাব বা মুসতাহসান; জরুরী নয়। কিন্তু অন্য অনেক ফরয-ওয়াজিব থেকে এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি থাকে। এ থেকে তাওবা তো দূরের কথা এর জন্য তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত থাকেন।

(ঝ) বিদআতের অন্য অপরাধ তা সুন্নাত হত্যা করে। সুন্নাত বহির্ভুত কোনো কর্ম বা পদ্ধতি ইবাদতে পরিণত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট মাসনূন ইবাদত বা পদ্ধতির মৃত্যু। যিনি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পাঠ উত্তম বলে গণ্য করছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে বসে যিকর বা সালম তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। এভাবে সমাজের অন্যান্য মানুষেরা যখন এভাবে ইবাদতটি পালন করতে থাকবেন তখন সমাজ থেকেও সুন্নাতটি অপসারিত হবে।

সম্মানিত পাঠক, বিদআত শিরকের পথ উন্মুক্ত করে এবং শিরক আল্লাহর বেলায়াতের পথ চিররুদ্ধ করে। মক্কার কাফিরগণ ইবরাহীম (আ)-এর উম্মাত ছিল। তারা প্রথমে ইত্তিবায়ে রাসূল অবহেলা করে। দীনের বিভিন্ন বিষয়ে ইবরাহীম (আ)-এর হুবহু অনুসরণ না করে যুক্তি দিয়ে নতুন কর্ম করতে শুরু করে। যেমন হজ্জের সময় আরাফাতে না যেয়ে মুযদালিফায় অবস্থান, তাওয়াফের সময় উলঙ্গ হওয়া, তালি বাজিয়ে যিকর করা ইত্যাদি। এর ধারাবাহিকতায় যুক্তি ও দলীলের পথ ধরে তাদের মধ্যে শিরক প্রবেশ করে। উম্মাতে মুহাম্মাদীর শিরকে লিপ্ত মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আপনি একই অবস্থা দেখবেন।

পাঠক, আল্লাহর বেলায়াত বা নৈকট্য অর্জনের অর্থ তো সর্বদা তাঁরই নৈকট্য অনুভব করা। সর্বদা হৃদয়ে তাঁরই রহমতের স্পর্শ, সকল আনন্দ-বেদনায় শুধু তাঁরই কথা মনে পড়া, তাঁরই সাথে কথা বলা, তিনি সাথে আছেন এবং তাঁর রহমতময় দৃষ্টি আমাকে ঘিরে রয়েছে বলে

সর্বদা অনুভব কর। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আল্লাহর ইবাদত করেন। তবে আনন্দ-বেদনায় তার মনে পড়ে 'গাইরুল্লাহ' কথা। অর্থাৎ যে বুজুর্গকে তিনি 'ভক্তি' করেন তাঁরই কথা তার মনে পড়ে, তাঁকেই স্মরণ করেন, তাঁরই দরদভরা দৃষ্টি অনুভব করেন, আনন্দে তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং বিপদে তাঁরই প্রতি আকুতি তার হৃদয় আলোড়িত করে। শিরকের এ বৃত্ত আল্লাহর বেলায়াতের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে।

২. ৪. ৩. অহঙ্কার বা তাকাব্বুর

নিজেকে অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে উন্নত, উত্তম বা বড় মনে করা, অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে হেয় মনে করাই অহঙ্কার। এটি মূলত একটি মানসিক অনুভূতি, তবে কর্মের মধ্যে কিছু প্রকাশ থাকে। অহঙ্কার একমাত্র আল্লাহর অধিকার। কোনো মানুষের অহঙ্কার করা মূলত আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ। কারণ, আল্লাহর নিয়ামত নিয়েই মানুষ অহঙ্কারে লিপ্ত হয়।

পৃথিবীর সকল নিয়ামত আল্লাহ সবাইকে সমানভাবে প্রদান করেন না। কাউকে দেন, কাউকে দেন না অথবা কমবেশি প্রদান করেন। যিনি নিয়ামত পেয়েছেন তার দায়িত্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু যদি তিনি এ নিয়ামতকে আল্লাহর দয়ার দান বা ভিক্ষা হিসেবে গ্রহণ না করে নিজের উপার্জন ও সম্পদ মনে করেন তখনই অহঙ্কারের শুরু হয়। এতে প্রথমেই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন–বাস্তবে আমরা দুনিয়াতে বড় ছোট রয়েছি। কাজেই তা অস্বীকার করব কিভাবে ? কেউ বেশি জ্ঞানী , ডিগ্রিধারী, সম্পদশালী, শক্তিশালী, ... কেউ কম। কাজেই যার বেশি আছে তিনি কিভাবে যার কম আছে তাকে সমান ভাববেন ?

বিষয়টি এখানে নয়। আপনার জ্ঞান, সম্পদ, সৌন্দর্য, প্রভাব, শক্তি, বাকপটুতা, ডিগ্রি, পদমর্যাদা, ইত্যাদি হয়ত আপনার আরেক ভাই থেকে বেশি। এখন প্রশ্ন , আপনার নিকট যে সম্পদটি বেশি আছে তা আপনার নিজস্ব উপার্জন না আল্লাহর দয়ার দান? যদি আল্লাহর দয়ার দান বলে আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি কখনই নিজেকে তার চেয়ে বড় বলে বা তাকে আপনার চেয়ে হেয় বলে ভাবতে পারবেন না। আপনি ভাববেন – আল্লাহর কত দয়া! আমাকে দয়া করে এ নিয়ামতটি দিয়েছেন অথচ তাকে দেননি। ইচ্ছা করলে তিনি এর বিপরীত করতে পারতেন। একান্ত দয়া করেই তিনি আমাকে নিয়ামত দিয়েছেন। আমার কাজ , বেশি বেশি শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুতি জানানো। এ অনুভূতি মুমিনের। এ অনুভূতি থাকলে কোনো মানুষ নিজেকে কারো চেয়ে বড় ভাবতে পারে না। বড়জোর নিজেকে 'বেশি দয়াপ্রাপ্ত' বলে মনে করতে পারে। এই মানুষটি কখনোই অন্য কাউকে তার চেয়ে হেয় বলে অবজ্ঞা করার কথা চিন্তা করে না। সে কখনো আল্লাহর দয়ার দানকে নিয়ে মনের মধ্যে গোপনে বা মুখে প্রকাশ্যে বড়াই করতে পারে না।

অহঙ্কার ও মুমিনের কৃতজ্ঞতার অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য দেখুন। আপনি একজন মানুষকে দেখলেন সে কথাবার্তায়, ভদ্রতায়, ডিগ্রিতে, অর্থে, শিক্ষায়, সৌন্দর্যে বা অন্য কোনো দিক থেকে আপনার চেয়ে অনেক খারাপ অবস্থানে রয়েছেন। তাকে দেখে আপনার মনে বা অনেকের মনে হাসি, অবজ্ঞা বা উপহাস উৎপন্ন হচ্ছে। অথচ আপনাকে দেখে আপনার মনে বা অন্যদের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধা বোধ জাগছে। আপনি কি করবেন ? অবজ্ঞা ও অবহেলা ভরে তার দিকে তাকাবেন? – এটিই তো অহঙ্কার। আপনি আল্লাহর দেওয়া সকল নিয়ামতকে অস্বীকার করে আল্লাহর সাথে অবিশ্বাসীর মতো ব্যবহার করলেন।

মুমিনের মনে এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যাবে। অপরদিকে সে ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ একটুও কমবে না। তিনিও আমার মতোই আল্লাহর বান্দা। তাকে আল্লাহ যতটুকু দিয়েছেন তা নিয়েই তিনি রয়েছেন। তাকে সম্মান করতে হবে। তার জন্য দু'আ করতে হবে। কোনো অবস্থায় তার প্রতি অবজ্ঞার প্রশ্নই আসে না।

সবচেয়ে বড় কথা, আমি তো জানি না, এ কমজ্ঞানী, অভদ্র, দুর্বল বা অবজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষটি আল্লাহর কাছে কতটুকু প্রিয়। আমি জানি না, কিয়ামতের দিন আমার অবস্থা কী হবে আর তার অবস্থা কী হবে। হয়ত এ অবহেলিত দুর্বল মানুষটি কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত বেশি লাভ করবে। হয়ত আমার চেয়ে অনেক সম্মানপ্রাপ্ত হবে। হয়ত আমাকে আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতার অপরাধে ধরা পড়তে হবে। তাহলে আমার জন্য অহঙ্কারের সুযোগটা কোথায় ?

অহঙ্কার সকল ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক অনুভূতি। তবে তা যদি আল্লাহর ইবাদত কেন্দ্রিক হয় তাহলে তা আরো বেশি ক্ষতিকারক। নিজেকে ভাল দ্বীনদার মনে করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। সাথে সাথে যদি নিজেকে অন্য কোনো মুসলমানের চেয়ে বেশি দ্বীনদার মনে করা হয় তাহলে ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

পাঠক হয়ত আবারো প্রশ্ন করবেন, ধর্ম পালনে তো কম-বেশি আছেই। আমি দাড়ি রেখেছি, আরেকজন রাখেনি। আমি যিক্‌র করি অথচ সে করে না। আমি বিদ'আতমুক্ত, অথচ অমুক বিদ'আতে জড়িত। আমি সুন্নাত পালন করি কিন্তু অমুক করে না। আমি ইসলামের দাওয়াত, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছি অথচ আমার আরেক ভাই শুধুমাত্র সালাত-সিয়াম পালন করেই আরামে সংসার করছেন। এখন কি আমি ভাবব যে, আমি ও সে সমান বা আমি তার চেয়ে খারাপ? তাহলে আমার এত কষ্টের প্রয়োজন কি ?

প্রিয় পাঠক, বিষয়টি আবারো ভুল খাতে চলে গেছে। প্রথমত, আমি যা কিছু করেছি সবই আল্লাহর দয়া, রহমত ও তাওফীক হিসেবে তাঁর দরবারে শুকরিয়া জানাতে হবে এবং এ নিয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য সকাতরে দু'আ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যে ভাই এ সকল নিয়ামত পাননি তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দু'আ করতে হবে, যেন আল্লাহ তাকেও এ সকল নিয়ামত প্রদান করেন এবং আমরা একত্রে আল্লাহর জান্নাতে ও রহমতের মধ্যে থাকতে পারি। তৃতীয়ত, আমাকে খুব বেশি করে বুঝতে হবে যে, আমি যা কিছু করছি তা আমার প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের তুলনায় খুবই কম। আমি কখনোই আল্লহর দেওয়া দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারিনি। কাজেই, আমার তৃপ্ত হওয়ার মতো কিছুই নেই। চতুর্থত, আমাকে বারবার সজাগ হতে হবে যে, আমি জানি না আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে গ্রহণ

হচ্ছে কি না ? হয়ত আমার এ সকল ইবাদত বিভিন্ন ভুল ও অন্যায়ের কারণে কবুল হচ্ছে না, অথচ যাকে আমি আমার চেয়ে ছোট ভাবছি তার অল্প আমলই আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন, কাজেই কিভাবে আমি নিজেকে বড় ভাবব? পঞ্চম, আমি জানি না, আমার কী পরিণতি ও তার কী পরিণতি ? হয়ত মৃত্যুর আগে সে আমার চেয়ে ভাল কাজ করে আমার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা নিয়ে আল্লাহ দরবারে হাজিরা দেবে।

মুহতারাম পাঠক, কিয়ামতের হিসাব নিকাশ শেষে জান্নাতে প্রবেশের আগে কখনো কোনো মুমিন নিশ্চিত হতে পারে না, নিজেকে অন্য কারো চেয়ে উত্তম বা বেশি ধার্মিক ভাবা তো দূরের কথা! সাহাবী, তাবেয়ীগণ ও পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠতম বুজুর্গ ও নেককার মানুষেরা নিজেদেরেকে জীবজানোয়ারের চেয়ে উত্তম ভাবতে পারতেন না। তাঁরা বলতেন, কিয়ামতের বিচার পার হওয়ার পরেই বুঝতে পারব, আমি পশুদের চেয়ে নিকৃষ্ট না তাদের চেয়ে উত্তম। অহঙ্কার আমাদের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়। যার অন্তরে অহঙ্কার থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে। ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১]

সুপ্রিয় পাঠক, অহঙ্কার অন্তরের কর্ম হওয়ার কারণে আমরা সহজে তা ধরতে পারি না। আমরা মনে করি যে, আমার মধ্যে অহঙ্কার নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান। বিভিন্নভাবে তা যাচাই করা যায়। অতি সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় মানুষের মধ্যে বেরোতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়? এরূপ পোশাক পরিহিত অবস্থায় যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আপনাকে দেখে ফেলেন তবে কি খুব সংকোচ বোধ হয়? যদি হয় তবে বুঝতে হবে যে, মনের মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান।

কোনো মাজলিসে পিছনে বা নিচে বসতে হলে কি আপনার খারাপ লাগে? মনের মধ্যে কি আশা হয় যে, কেউ আপনাকে ডেকে সম্মান করুক, আগে সালাম দিক? যদি হয় তবে বুঝবেন যে, অহঙ্কার অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে।

অন্তরের মধ্যে অহঙ্কারের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য মুমিনকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা বলেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) মাথায় এক বোঝা খড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে বলা হলো, আপনি কেন এ কাজ করছেন? আল্লাহ তো আপনাকে সচ্ছলতা দিয়েছেন, যাতে এমন না করলেও আপনার চলে? তিনি বলেন, আমি অন্তরের অহঙ্কার ও অহংবোধকে আহত করতে চাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" হাদীসটি হাসান।[২]

২. ৪. ৪. হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা

মানব হৃদয়ের আরেকটি নোংরা ও ক্ষতিকারক কর্ম বিদ্বেষ, ঘৃণা, অমঙ্গল কামনা, পারস্পারিক শত্রুতা, ইত্যাদি। হৃদয়ে এগুলোর উপস্থিতি হৃদয়কে কলুষিত করে, ভারাক্রান্ত করে, আল্লাহর যিক্‌র থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং সর্বোপরি অন্যান্য নেক আমল নষ্ট করে দেয়। হাদীসের আলোকে মুসলমান মুসলমানে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার দুটি ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জানতে পারি।

প্রথমত, আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوْ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا

"প্রতি সপ্তাহে দু'বার–সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দাদের কর্ম (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তখন সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, শুধুমাত্র সে ব্যক্তি বাদে যার ও তার অন্য ভাইয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা (hatred) আছে। এদের বিষয়ে বলা হয় : এদের বিষয় স্থগিত রাখ, যতক্ষণ না এরা ফিরে আসে।"[৩]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَطَّلِعُ اللهُ (إِلَى جَمِيْعِ خَلْقِهِ) فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ (لأَخِيْهِ)

"শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রে (১৪ই শা'বানের দিবাগত রাতে) আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তির সাথে অন্য ভাইয়ের বিদ্বেষ (hatred) রয়েছে তাদেরকে বাদে।"

হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য। সার্বিকভাবে হাদীসটি সহীহ।[৪]

দ্বিতীয়ত, সকল নেক কর্ম ও ধর্ম ধ্বংস করে দেয়। যুবাইর ইবনুল আউআম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

"পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে: হিংসা ও বিদ্বেষ। এ বিদ্বেষ মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে তা চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দ্বীন বা ধর্মকে মুণ্ডন ও ধ্বংস করে দেয়। আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, ঈমানদার না হলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরে একে অপরকে ভাল না বাসলে তোমরা বিশ্বাসী বা মুমিন হতে পারবে না। এ ভালবাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, সর্বত্র ও সবর্দা পরস্পরে সালাম প্রদানের রেওয়াজ প্রচলিত রাখবে।" হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।[১]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে যয়ীফ সনদে বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ أَوْ قَالَ الْعُشْبَ

"খবরদার! হিংসা থেকে আত্মরক্ষা করবে; কারণ হিংসা এমনভাবে নেককর্ম ধ্বংস করে, যেমনভাবে আগুন খড়ি বা খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে।" হাদীসটির সনদ দুর্বল, তবে উপরের হাদীসের অর্থ তা সমর্থন করে।[২]

২. ৪. ৫. অন্যায়ের ঘৃণা বনাম হিংসা ও অহংকার

আরেকটি বিষয় আমাদেরকে সমস্যায় ফেলে দেয়। আমরা জানি যে, শিরক, কুফর, বিদ'আত, হারাম, পাপ ইত্যাদিকে ঘৃণা করা ও যারা এগুলোতে লিপ্ত বা এগুলোর প্রচার প্রসারে লিপ্ত তাদেরকে ঘৃণা করা আমাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ঈমানী দায়িত্ব। আমরা এ দায়িত্ব ও হৃদয়কে মুক্ত রাখার মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করব?

এ বিষয়টিকে শয়তান অন্যতম ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করে, যা দিয়ে সে অগণিত ধার্মিক মুসলিমকে হিংসা, হানাহানি, আত্মতৃপ্তি ও অহংকারের মত জঘন্যতম কবীরা গোনাহের মধ্যে নিপতিত করছে। এ ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো স্মরণ রাখতে হবে।

প্রথম বিষয়: পাপ অন্যায়, জুলুম অত্যাচার, শিরক, কুফর, বিদ'আত বা নিফাককে অপছন্দ বা ঘৃণা করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে ও তাঁর প্রদত্ত গুরুত্ব অনুসারে। তিনি যে পাপকে যতটুকু ঘৃণা করেছেন, নিন্দা করেছেন বা যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন ততটুকু গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর পদ্ধতি বা সুন্নাতের বাইরে মনগড়াভাবে ঘৃণা করলে তা হবে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের নামে নিজের ব্যক্তি আক্রোশ বা অহংকারকে প্রতিষ্ঠা করা ও শয়তানের আনুগত্য করা।

এক্ষেত্রে অধিকাংশ ধার্মিক মানুষ কঠিন ভুলে নিপতিত হন। কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত কঠিন পাপগুলোকে আমরা ঘৃণা করি না বা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি না, কিন্তু যেগুলো কোনো পাপ নয়, কম ভয়ঙ্কর পাপ বা যেগুলোর বিষয়ে কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় আলিমগণ মতভেদ করেছেন সেগুলো নিয়ে হিংসা-বিদ্বেষে নিপতিত হই। ইতোপূর্বে আমি ইসলামের কর্মগুলোর পর্যায় আলোচনা করেছি। আমাদের সমাজের ধার্মিক মুসলিমদের দলাদলি, গীবতনিন্দা ও অহঙ্কারের ভিত্তি শেষ দুই-তিন পর্যায়ের সুন্নাত-নফল ইবাদত। আমরা কুফর, শিরক, হারাম উপার্জন, মানুষের ক্ষতি, সৃষ্টির অধিকার নষ্ট, ফরয ইবাদত ত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে তেমন কোনো আপত্তি, বিরোধিতা বা ঘৃণা করি না। অথচ নফল নিয়ে কি ভয়ঙ্কর হিংসা ঘৃণার সয়লাব। অনেক সময় এসকল নফল, ইখতিলাফী বিষয়, অথবা মনগড়া কিছু 'আকীদা'কে ঈমানের মানদণ্ড বানিয়ে ফেলি।

যে ব্যক্তি ফরয সালাত মোটেই পড়ে না, তার বিষয়ে আমরা বেশি চিন্তা করি না, কিন্তু যে সুন্নাত সালাত আদায় করল না, বা সালাতের মধ্যে টুপি বা পাগড়ী পরল না, অথবা সালাতের শেষে মুনাজাত করল বা করল না, অথবা সালাতের মধ্যে হাত উঠালো বা উঠালো না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা হানাহানি ও অহঙ্কারে লিপ্ত রয়েছি।

দ্বিতীয় বিষয়: এ ঘৃণা একান্তই আদর্শিক ও ঈমানী। ব্যক্তিগত জেদাজেদি, আক্রোশ বা শত্রুতার পর্যায়ে যাবে না। আমি পাপটিকে ঘৃণা করি। পাপে লিপ্ত মানুষটিকে আমি খারাপে লিপ্ত বলে জানি। আমি তার জন্য দু'আ করি যে, আল্লাহ তাকে পাপ পরিত্যাগের তাওফীক দিন।

তৃতীয় বিষয়: ঘৃণা অর্থ হিংসা নয়। ভালবাসার সাথে এ ঘৃণা একত্রিত থাকে। মা তার মলমূত্র জড়ানো শিশুকে দেখে নাক সিটকায় ও তাকে ঘৃণা করে। আপন ভাই তার অপরাধে লিপ্ত ভাইকে ঘৃণা করে। কিন্তু এ ঘৃণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা। মূলত ব্যক্তি শিশু বা ব্যক্তি ভাইকে ঘিরে থাকে তার সীমাহীন ভালবাসা, আর তার গায়ে জড়ানো ময়লা বা অপরাধকে ঘিরে থাকে ঘৃণা। সাথে থাকে তাকে ঘৃণিত বিষয় থেকে মুক্ত করার আকুতি। মুমিনের পাপের প্রতি ঘৃণাও অনুরূপ। পাপের প্রতি ঘৃণা যেমন দায়িত্ব, ঈমানের প্রতি ভালবাসাও অনুরূপ দায়িত্ব। মুমিনের পাপের দিকে নয়, বরং তার ঈমানের দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হবে। ঈমান ও অন্যান্য নেক আমলের জন্য মুমিনকে ভালবাসা ফরয। পাশাপাশি পাপের প্রতি আমাদের ঘৃণা থাকবে, এই ঘৃণা কখনোই মুমিনকে হিংসা করতে শেখায় না, বরং মুমিন ভাইয়ের জন্য দরদভরা দু'আ করতে প্রেরণা দেয়, যেন তিনি পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন।

চতুর্থ বিষয়: ঘৃণা ও অহংকার এক নয়। আমি পাপকে ঘৃণা করি। পাপীকে অন্যায়কারী মনে করি। পাপের প্রসারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। কিন্তু এগুলোর অর্থ এটাই নয় যে, আমি আমার নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে অমুক পাপীর চেয়ে উন্নত, মুত্তাকী বা ভাল মনে করি। নিজেকে কারো চেয়ে ভাল মনে করা তো দূরের কথা নিজের কাজে তৃপ্ত হওয়াও কঠিন কবীরা গোনাহ ও ধ্বংসের কারণ। আমি জানি না, আমার ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কিনা, আমি জানি না আমার পরিণতি কী আর উক্ত পাপীর পরিণতি কী, কিভাবে আমি নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করব?

পঞ্চম বিষয়: সবচেয়ে বড় কথা, মুমিনকে নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকতে হবে। অন্যের কথা চিন্তা করা থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতে হবে। আমরা অধিকাংশ সময় অন্যের শিরক, কুফর, বিদ'আত, পাপ, অন্যায় ইত্যাদির চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। মনে হয় আমাদের বেলায়াত, কামালাত, জান্নাত, নাজাত সবকিছু নিশ্চিত। এখন শুধু দুনিয়ার মানুষের সমালোচনা করাই আমার একমাত্র কাজ।

এ থেকে বাঁচতে হলে এগুলো পরিহার করতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া পাপ বা পাপীর চিন্তায় নিজের হৃদয়কে ব্যস্ত রাখা খুবই অন্যায়। এসব চিন্তা আমাদের কঠিন ও আখেরাত বিধ্বংসী পাপের মধ্যে ফেলে দেয়। এ আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার। যখনই আমি পাপীর চিন্তা করি তখনই আমার মনে তৃপ্তি চলে আসে, আমি তো তার চেয়ে ভাল আছি। তখন নিজের পাপ ছোট মনে হয় ও নিজের কর্মে তৃপ্তি লাগে। আর এ ধ্বংসের অন্যতম পথ।

এজন্য সাধ্যমত সর্বদা নিজের দ্বীনী বা দুনিয়াবী প্রয়োজন বা আল্লাহর যিক্‌র ও নিজের পাপের চিন্তায় নিজেকে রত রাখুন। হৃদয় পবিত্র থাকবে এবং আপনি লাভবান হবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক প্রদান করুন।

২. ৪. ৬. সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা

আমরা ইতোপূর্বে কবীরা গোনাহের তালিকায় এ জাতীয় কিছু গোনাহের কথা লিখেছি। মহান আল্লাহ মানুষকে ভালবাসেন ও মানুষকে করুণা করতে চান। সাথে সাথে তিনি ন্যায়বিচারক মহাবিচারের প্রভু। তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি। কোনো মানুষ যদি অন্য কোনো মানুষ, সৃষ্টি বা জীব জানোয়ারের অধিকার বা প্রাপ্য নষ্ট করে বা কম দেয় এবং জীবদ্দশায় তার অধিকার বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে না পারে মহাবিচারের দিনে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত সৃষ্টির অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দেবেন। সেদিন কোনো টাকাপয়সা বা সম্পদ দিয়ে ক্ষতিপূরণ দানের সুযোগ থাকবে না। তখন যালিম, ক্ষতিকারী বা অধিকার হরণকারী ব্যক্তির নেককর্ম বা সাওয়াব নিয়ে মাযলূমকে প্রদান করা হবে। যদি যাকির এ বিষয়ে সতর্ক না থাকেন তাহলে তার কষ্টার্জিত সাওয়াব ও নেক কর্ম অন্য মানুষ ভোগ করবেন, আর তিনি বঞ্চিত হয়ে শাস্তি ভোগ করবেন।

কুরআন-হাদীসে পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এগুলো শিক্ষা ও পালন করা যাকিরের জন্য বিশেষ জরুরি। আমাদের সমাজে অনেক ধার্মিক ব্যক্তি স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, সহকর্মী, কর্মদাতা, কর্মী বা কর্মচারী, আত্মীয়স্বজন, বিধবা, এতিম, দরিদ্র ও সমাজের অন্যান্য মানুষের অধিকার, সমাজের অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার, পশুপাখির অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে খুবই অসচেতন। আমরা বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, ধার্মিক মানুষদের মধ্যে অনেকেই অন্যের অধিকার নষ্ট করার কঠিন পাপে লিপ্ত থাকেন। হয়ত তাহাজ্জুদ, যিক্‌র, নফল সিয়াম, দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে রত রয়েছেন ; কিন্তু স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, কর্মস্থল, সেবা গ্রহণে আগত ব্যক্তি, কর্মদাতা ও অন্য অনেকের অধিকার লঙ্ঘন ও নষ্ট করেন। এগুলোকে অনেকে খুবই হালকা ভাবেন বা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদের কঠিন অন্যায়কে যুক্তিসঙ্গত করতে চেষ্টা করেন। যাকিরকে এসকল বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

২. ৪. ৭. গীবত বা পরনিন্দা করা বা শোনা

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অনেক দোষত্রুটি বিদ্যমান, কিন্তু অন্য মানুষেরা সেগুলো আলোচনা করলে তার খারাপ লাগে। এরূপ কোনো সত্যিকার দোষত্রুটি কারো অনুপস্থিতিতে আলোচনা করাই "গীবত"। যেমন,- একজন মানুষ বেটে, রগচটা, অহঙ্কারী, তোতলা, বিলাসী, অল্প শিক্ষিত, জামাত কাযা করে, ধুমপান করে, স্ত্রী পর্দা করে না, দ্বীনের অমুক কাজে অবহেলা করে ... , ইত্যাদি কোনো দোষ বা দৃষ্টিকটু বিষয় সত্যিই তার মধ্যে রয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে তার এ দোষ উল্লেখ করা গীবত ও কঠিন পাপ।

মুমিনের পুণ্য বিনষ্ট করার অন্যতম কারণ গীবত। কুরআনে গীবতকে 'মৃতভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"হে মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ অনুমান-ধারণা পরিত্যাগ কর; কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করতে চাইবে? তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَنَافَسُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

"খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান-ধারণা থেকে আত্মরক্ষা করবে; কারণ অনুমান ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না, গোপন দোষ সন্ধান করবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং পরস্পরে শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। তোমরা পরস্পরে ভাইভাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।"[১]

এভাবে আমরা জানছি যে, অনুমানে কথা বলা এবং অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ছাড়াও যদি অন্যের কোনো দোষত্রুটি জানতে পারলে তা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা গীবত ও হারাম।

গীবত ১০০% সত্য কথা। কোনো ব্যক্তির ১০০% সত্য দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করার নামই গীবত। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা কি জান গীবত বা অনুপস্থিতের নিন্দা কী? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (ﷺ) ভাল জানেন। তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তখন প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো, আমি যা বলছি তা যদি সত্যই আমার ভাইয়ের মধ্যে বিরাজমান হয় তাহলে কি হবে? তিনি বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যই তার মধ্যে বিরাজমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার মিথ্যা অপবাদ করলে।"[২]

আমরা ভাবি, সত্য কথা বলব তাতে অসুবিধা কি? আমরা হয়ত বুঝি না বা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রনায় বুঝতে চাই না যে, সব সত্য কথা জায়েয নয়। অনেক সত্য কথা মিথ্যার চেয়েও বেশি হারাম। আবার কখনো বলি, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে পারি। সামানে যা বলতে পারেন তা পিছনে বলাই তো গীবত।

গীবতের সবচেয়ে কঠিন বিষয় গীবত করা বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট পাপ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা না করলে এ অপরাধের কারণে আমাদের পুণ্য তাকে প্রদান করতে হবে। গীবতের নিন্দায় এবং এর কঠোরতম শাস্তির বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই:

ধার্মিক মানুষদের পতনের অন্যতম কারণ গীবত। সমাজের অধিকাংশ ধার্মিক, আলিম, যাকির, আবিদ, ইসলামের দাওয়াত, তাবলীগ, আন্দোলন ইত্যাদিতে নিয়োজিত ধর্মপ্রাণ মুসলিম সকলেই এ সব কঠিন বিধ্বংসী পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ি। সাধারণত আমরা নিজেদের সহকর্মী, সঙ্গী অথবা অন্য কোনো দলের বা মতের কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির গীবত করে মজা পাই। এছাড়া সমাজের ব্যবসায়ী, নেতৃস্থানীয় মানুষ সকলেরই ব্যক্তিগত সমালোচনা ও গীবত করে আমরা তৃপ্তি পাই। অনেক সময় আমরা গীবতকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণিত করতে গিয়ে বলি– 'আমি এ সকল কথা তার সামনেও বলতে পারি'। সামনে যে কথা বলা যায় সে কথা অগোচরে বললে গীবত হবে? অনেক সময় আমরা গীবতকে ইসলামী বা ধর্মীয় রূপদান করি। লোকটি অন্যায় করে, পাপ করে তা বলব না ? এখানে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে:

প্রথম বিষয়: কোনো ব্যক্তির অন্যায় জানলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা মুমিনের দায়িত্ব। কিন্তু তার অন্যায়ের কথা তার অনুপস্থিতিতে অন্য মানুষের সামনে আলোচনা বা গীবতের মাধ্যমে কোনোদিনই কাউকে সংশোধন করা যায় না। শুধু পাপ অর্জন ও নিজের শয়তানী প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো হয়।

দ্বিতীয় বিষয়: কারো দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে বলার একটিই শরীয়ত সম্মত কারণ আছে, তাকে বা অন্য কাউকে অধিকতর ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। যেমন তাকে সংশোধন করতে তার অভিভাবক বা এরূপ কাউকে বলা যাকে বললে তার সংশোধনের আশা করা যায়। অথবা তার দোষটি না জানলে কারো জান-মালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তাকেও তা বলা যায়। এক্ষেত্রেও মুমিনকে বুঝতে হবে যে, এটি একটি ঘৃণিত কাজ। একান্তই নিজের দীনী দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়ে তিনি তা করছেন। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না বলা।

তৃতীয় বিষয়: গীবত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে গীবতকে কোনো অবস্থায় হালাল বলা হয় নি। শুধু কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনে তা বৈধ হতে পারে বলে আলিমগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এখন মুমিনের কাজ কুরআন ও হাদীস যা নিষেধ করেছে তা ঘৃণাভরে পরিহার করবেন। এমনকি সে কর্মটি কখনো জায়েয হলেও তিনি তা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করবেন। শূকরের মাংস, মদ, রক্ত ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং প্রয়োজনে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। এখন মুমিনের দয়িত্ব কী? বিভিন্ন অজুহাতে প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে এগুলো ভক্ষণ করা? না যত কষ্ট বা প্রয়োজনই হোক তা পরিহার করার চেষ্টা করা?

গীবতও অনুরূপ একটি হারাম কর্ম যা একান্ত প্রয়োজনে বৈধ হতে পারে। গীবত ও শূকরের মাংসের মধ্যে দু'টি পার্থক্য: (ক) প্রয়োজনে শূকরের মাংস খাওয়ার অনুমতি কুরআনে বিদ্যমান, পক্ষান্তরে গীবতের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো সুস্পষ্ট অনুমোদন কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। (খ) শূকরের মাংস ভক্ষণ করা শুধুমাত্র আল্লাহর হক্ক জনিত পাপ। সহজেই তাওবার মাধ্যমে তা ক্ষমা হতে পারে। পক্ষান্তরে গীবত বান্দার হক্ক জনিত পাপ। এর ক্ষমার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা প্রয়োজন। এজন্য মুমিনের দায়িত্ব বিভিন্ন অজুহাতে বা যয়ীফ-মাউযূ হাদীসের বরাত দিয়ে এ পাপে লিপ্ত না হয়ে যথাসাধ্য একে বর্জন করা।

চতুর্থ বিষয়: ইসলামে অন্যের দোষ পিছনে বলতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তেমনি তা গোপন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। একজন আরেকজনকে জুলুম করে না এবং বিপদে পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট-বিপদ দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।"[১]

মিশরের গভর্নর সাহাবী উকবা ইবনু আমির (রা)-এর সেক্রেটারী 'আবুল হাইসাম দুখাইন' বলেন, আমি উকবা (রা) কে বললাম, আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে। আমি এখনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। উকবা বলেন, তুমি তা করবে না। বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও।.... আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে বলতে শুনেছি,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন করল, সে যেন জীবন্ত প্রোথিত এক কন্যাকে কবর থেকে উঠিয়ে জীবন দান করল।" হাদীসটি সহীহ।[২]

পঞ্চম বিষয়: মুমিনের দায়িত্ব যথাসম্ভব নিজের অন্তরকে নিজের ভুলত্রুটি ও পাপের স্মরণে, তাওবায় ও দু'আয় ব্যস্ত রাখা। অন্যের ভুল, অন্যায়, পাপ ইত্যাদির চিন্তা মুমিনের অন্তরকে নোংরা করে এবং অগণিত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে। গীবতের ফলে মুমিনের মনে অহংকার জন্ম নেয়, যা আখেরাতের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

প্রিয় পাঠক, নাজাতের উপায় কারো অনুপস্থিতে তার কথা আলোচনা বা চিন্তা করা পরিহার করা। সর্বদা নিজের দোষত্রুটির কথা চিন্তা করা। নিজের নাজাতের পথ খুঁজতে থাকা। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন; আমীন।

২. ৪. ৮. নামীমাহ বা চোগলখুরী

গীবতের আরেকটি পর্যায় 'নামীমাহ', 'চোগলখুরী' অর্থাৎ কানভাঙ্গানো বা কথা লাগান। একজনের কাছে অনুপস্থিত কারো দোষত্রুটি আলোচনা গীবত। আর যদি এমন দোষত্রুটি আলোচনা করা হয় যাতে দু ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয় তাহলে একে আরবীতে 'নামীমাহ' বলা হয়। এটি গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ ও জঘন্যতম কবীরা গোনাহের একটি। সত্য কথা লাগানোও নামীমাহ, যেমন সত্য দোষ বলা গীবত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"চোগলখোর (কানভাঙ্গানিতে লিপ্ত) ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৩]

মনে করুন 'ক' 'খ'-এর কাছে 'গ' সম্পর্কে কিছু গীবত বা খারাপ মন্তব্য করেছে। 'খ' 'ক'-এর মুখ থেকে সেগুলো শুনে কোনো প্রতিবাদ না করে গীবত শোনার পাপে পাপী হয়েছে। এখন এ পাপকে বহুগুণে বৃদ্ধি করার জন্য সে 'গ'-এর নিকট এসে 'ক'-এর কথাগুলো সব বলে দিল। এভাবে 'খ' গীবত শোনা, গীবত করা ও নামীমাহ করার পাপে লিপ্ত হলো। এ দুর্বল ঈমান ব্যক্তি 'গ'-এর প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি, গজব ও শাস্তি চেয়ে নিল।

মুহতারাম পাঠক, মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিথ্য কথা বলা জায়েয, কিন্তু সম্পর্ক নষ্টকারী সত্য কথা জায়েয নয়। এছাড়া এসকল গীবত ও নামীমায় লিপ্ত মানুষদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। যদি কেউ আপনার কাছে এসে আপনার কোনো ভাই সম্পর্কে এধরনের কথা বলে তাহলে তাকে থামিয়ে দিন। এই লোকটি চোগলখোর। সে সত্যবাদী হলেও আপনার শত্রু। আপনার হৃদয়ের প্রশান্তি, প্রবিত্রতা ও আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়। আল্লাহ আমাদেরকে চোগলখোরী ও চোগলখোর থেকে হেফাযত করুন ; আমীন।

সম্মানিত পাঠক, অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, গীবত, নামীমা ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক হৃদয়জাত অনুভূতি থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম

উপায় যথাসম্ভব সর্বদা নিজের জাগতিক ও পারলৌকিক উন্নতি, নিজের দোষত্রুটি সংশোধন ও তাওবার চিন্তায় মনকে মগ্ন রাখা। আত্মপ্রশংসার প্রবণতা রোধ করে আত্মসমালোচনার প্রবণতা বৃদ্ধি করা। 'আমার ভালগুণ তো আছেই। সেগুলোর প্রশংসা করে বা শুনে কি লাভ। আমার ভুলত্রুটি কি আছে তা জেনে এবং সংশোধিত করে আরো ভাল হতে হবে' এ চিন্তাকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করতে হবে।

অন্য কোনো মানুষের কথা মনে হলে, আলোচনা হলে বা কেউ তাঁর প্রশংসা করলে মনের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, হিংসা বা অহংকার আসতে পারে। এজন্য এ সকল ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে নিজের মনে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ভাল ধারণা বদ্ধমূল করা, তার প্রশংসা যৌক্তিক ও উচিত বলে নিজের মনকে বিশ্বাস করানো, তার ভাল গুণাবলীর কথা মনে করে তাকে শ্রদ্ধা করতে নিজের মনকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। ক্রমান্বয়ে এভাবে আমরা এ সকল কঠিন ও ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারব।

২. ৪. ৯. প্রদর্শনেচ্ছা ও সম্মানের আগ্রহ

মুমিন তার সকল কর্ম কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর জন্য বা কারো কাছ থেকে প্রশংসা, সম্মান বা পুরস্কার লাভের জন্য কর্ম করাকে 'রিয়া' বলা হয়। বাংলায় আমরা একে 'প্রদর্শনেচ্ছা' বলতে পারি। মুমিনের সকল ইবাদত ধ্বংস করার ও তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এ 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়।[১]

বিভিন্ন হাদীসে রিয়াকে 'শিরক আসগার' বা ছোট শিরক বলা হয়েছে। কারণ বান্দা আল্লাহর জন্য ইবাদত করলেও অন্য সৃষ্টি থেকেও সেজন্য কিছু 'পুরস্কার' বা প্রশংসা আশা করে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। এ শিরকের কারণে মুসলিম কাফির বলে গণ্য না হলেও তার ইবাদত কবুল হবে না। এক হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

"দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক। গোপন শির্ক এটা যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।" হাদীসটি হাসান।[২]

রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিনের চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সকল নফল ইবাদত গোপনে করা। তবে যে ইবাদত প্রকাশ্যে করাই সুন্নাত-সম্মত তা প্রকাশ্যেই করতে হবে। রিয়ার ভয়ে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা প্রকাশ্যে করণীয় ইবাদত বাদ দেওয়া যাবে না। রিয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। কখনো এসে গেলে বারংবার তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করতে হবে।

রিয়ার অন্যতম কারণ সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান, মর্যাদা বা প্রশংসার আশা। আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় কোনো মানুষই কিছু দিতে পারে না। সকলেই আমার মতই অক্ষম। যে মানুষকে দেখানোর জন্য, শোনানোর জন্য, যার প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের জন্য আমি লালায়িত হচ্ছি সে আমার মতই অসহায় মানুষ। আমার কর্ম দেখে সে প্রশংসা নাও করতে পারে। হয়ত তার প্রশংসা শোনার আগেই আমার মৃত্যু হবে। অথবা প্রশংসা করার আগেই তার মৃত্যু হবে। আর সে প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই লাভ হবে না। আমার মালিক ও পালনকারীর পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার দেন। তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না।

কা'ব ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

"দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে নেকড়েদুটি মেষপালের যে ক্ষতি করবে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দীনের তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

সম্মানিত পাঠক, দুনিয়ার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি একটি কঠিন বোঝা ও ফিতনা। সম্মান ও প্রতিপত্তিহীন মানুষের অন্তর বিনয় ও সরলতায় ভরা থাকে। ফলে আল্লাহর বেলায়াত অর্জন তাদের জন্য খুবই সহজ হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অধিকাংশই এরূপ সাধারণ মানুষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ

"অনেক মানুষ এমন আছেন যার মাথার চুল এলোমেলো, পদযুগল ধুলিধুসরিত, পরণের কাপড় অতি-সাধারণ এবং সমাজে

তাদেরকে কোনো গুরত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা এত বেশি যে, যদি তিনি শপথ করে আল্লাহর কাছে কিছু দাবি করেন তবে আল্লাহ্ তা পূরণ করেন।"[১]

২. ৪. ১০. ঝগড়া-তর্ক

ধার্মিক মানুষদের জন্য শয়তানের একটি ফাঁদ ঝগড়া ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। ধার্মিক মানুষেরা অনেক সময়েই ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া-তর্কে জড়িয়ে পড়েন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ

"কোনো সম্প্রদায়ের সুপথপ্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ যে, তারা ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে।" হাদীসটি হাসান সহীহ।[২]

সর্বদা চেষ্টা করতে হবে বিতর্ক এড়িয়ে চলার। ধর্মীয় আলোচনার দায়িত্ব আলিমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। একান্তই বাধ্য হলে আমরা আলোচনায় লিপ্ত হব, কিন্তু ঝগড়ায় লিপ্ত হব না। তথ্যভিত্তিক আলোচনা বা মত-বিনিময় জ্ঞান বৃদ্ধি করে। আর ঝগড়া-তর্ক জ্ঞান গ্রহণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজের জানা তথ্যাদি উপস্থাপন করেন এবং অন্যের কাছে নতুন কিছু পেলে বা নিজের ভুল ধরতে পারলে তা আনন্দিতচিত্তে গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে ঝগড়-তর্কে উভয়পক্ষই নিজের জ্ঞানকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন এবং যে কোনো ভাবে নিজের মতের সঠিকতা ও অন্য মতের ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। নিজের জ্ঞানের ভুল স্বীকার করাকে ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করেন। এ কারণে ইসলামে ঝগড়া-তর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ تَرَكَ الْمِراءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌّ، بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلاَهَا

"নিজের মত বাতিল হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যার আচরণ সুন্দর তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

২. ৫. যিক্‌রের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ

আল্লাহর যিক্‌র মানব হৃদয়ের খাদ্য ও আত্মার পাথেয়। আল্লাহর রহমত, নিয়ামত, বরকত, বিধান, পুরস্কার, শাস্তি, তাঁর প্রশংসা, মর্যাদা, একত্ব ইত্যাদির স্মরণ মানুষের হৃদয়কে পবিত্র, প্রশান্ত ও শক্তিশালী করে। যিক্‌র মূলত রূহের জন্য অক্সিজেন ও পানির মতো। যে মুহূর্তগুলো বান্দা আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত থাকে সেই মুহূর্তগুলি তার আত্মা অক্সিজেন ও পানির অভাবে কষ্ট পেতে থাকে। মহান প্রভুর সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। দুর্বল হয়ে পড়ে তার হৃদয়। চিরশত্রু শয়তান সুযোগ পায় এই দুর্বল হৃদয়কে আক্রমণ করার। আত্মিক সুস্থতা ও ভারসাম্যপূর্ণ হৃদয়ের জন্য মুমিনকে সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে হৃদয়কে রত রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন ব্যস্ততা, কর্ম, চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদির কারণে কিছু সময় যিক্‌র বিহীনভাবে অতিবাহিত হলে, আবার যিক্‌রের দিকে ফিরে আসতে হবে। মুখ ও মনকে সাধ্যমতো ব্যস্ত রাখতে হবে মহান প্রভুর স্মরণে।

জাগতিক ব্যস্ততার ফলে যিক্‌র থেকে সাময়িক বিরতি আত্মার কিছু ক্ষতি করলেও তা স্বাভাবিক এবং সে ক্ষতির পূরণ সম্ভব। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ঙ্কর ক্ষতি এমন বিষয়ে হৃদয়কে রত রাখা যা আল্লাহর যিক্‌র থেকে তাকে দূরে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি হৃদয়ে অনীহা সৃষ্টি করে। আমরা জানি যে, মানুষ অসুস্থ হলে তার রুচি নষ্ট হয়। তখন দেহের জন্য উপকারী খাদ্যে তার অনীহা সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতিকারক খাদ্য গ্রহণে তার লোভ বেড়ে যায়। হৃদয়ের অবস্থাও অনুরূপ। স্বাভাবিকভাবে মানবহৃদয় আল্লাহর যিক্‌রে তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু অসুস্থ হৃদয় তার প্রভুর যিক্‌রে অনীহা অনুভব করে।

বর্তমান প্রায় সকল প্রচার মাধ্যম, বিনোদন, পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস হৃদয়কে অসুস্থ করার ও আল্লাহর যিক্‌র থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার কর্মে নিয়োজিত। আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করি যে, এ সকল প্রচার ও বিনোদন মাধ্যমগুলো শুধু আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরতই রাখে না। উপরন্তু ধর্ম, নৈতিকতা, ধার্মিক মানুষ ও ধর্মজীবনের প্রতি কটাক্ষ, বিষোদগার ও ঘৃণা ছড়াতে ব্যস্ত। এসকল প্রচার ও বিনোদন মাধ্যম মুনিনের জন্য বিষের মতোই ক্ষতিকর। যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এগুলি থেকে দূরে থাকার। বিনোদনের জন্য ইসলাম-সম্মত অথবা ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী নয় এরূপ মাধ্যম ব্যবহার করুন। সাহিত্য উপন্যাস, গল্প, পত্রিকা ইত্যাদি পরিহার করে ইসলামী বই, সৎ মানুষদের জীবনী ইত্যাদি পাঠে নিজেকে রত রাখা দরকার। প্রয়োজনে এমন সাহিত্য পাঠ করুন যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। অমুসলিম লেখকগণের উপন্যাস-গল্প শিরক, কুফর, মূর্তিপূজা ও অনৈসলামিক রীতিনীতির কথায় ভরা। এর চেয়েও ক্ষতিকর মুসলিম নামধারী অনেক লেখকের উপন্যাস ও সাহিত্য। তারা ইসলামী মূল্যবোধকে আহত করার মানসেই সাহিত্য রচনা করেন।

কোনো কোনো পত্র-প্রত্রিকার মূলনীতি ইসলাম, মুসলিম, আলিম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কুৎসা রটনার

মাধ্যমে পাঠকের মনকে ক্রমান্বয়ে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি বিরক্ত বা অশ্রদ্ধাশীল করে তোলা। যখনই কোনো পত্র-পত্রিকা বা সাহিত্যকর্মে এরূপ লেখালেখি দেখতে পাবেন, তখনই তা পড়া বন্ধ করুন। এগুলো বিষ। স্বল্পমাত্রার বিষের মতো ক্রমান্বয়ে তা আপনার হৃদয়কে আল্লাহর যিক্‌র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। সংবাদ জানার জন্য, বা সাহিত্যের জন্য অন্য পত্রিকা বা বই পড়ুন। সবচেয়ে ভাল হয় এসকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা। আল্লাহ আমাদের শয়তান ও তার অনুচরদের খপ্পর থেকে রক্ষা করুন।

২. ৬. আত্মশুদ্ধিমূলক মানসিক ও দৈহিক কর্ম

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা দেখি যে, কিছু মানসিক বা দৈহিক কর্ম আছে যা অতি সহজে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য ও সাওয়াব লাভে সাহায্য করে। এ সকল কর্ম পালন করলে যাকির অতি অল্প আমলে অধিক সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। আমাদের উচিত এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা।

২. ৬. ১. জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব স্মরণ

মানব জীবনে জাগতিক, সাংসারিক কর্মকাণ্ড, ব্যস্ততা ও চিন্তাভাবনা থাকবেই। আল্লাহ মানুষকে এসকল কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তবে এ ব্যস্ততা ও কর্ম নিজের, পরিবারের ও সমাজের সকলের পৃথিবীতে সুন্দররূপে বাঁচার ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি ও আল্লাহর সান্নিধ্যে অফুরন্ত নিয়ামত লাভের জন্য। কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত ও বরকত অর্জন করে নিজে বাঁচতে হবে এবং অন্যকে বাঁচতে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু শয়তানী প্ররোচনা ও মানবীয় দুর্বলতার কারণে আমরা সৃষ্টি ও কর্মের উদ্দেশ্যের একেবারে বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করি। আমরা স্বার্থপর হয়ে যাই এবং নিজের অপ্রয়োজনীয় ও অবৈধ স্বার্থরক্ষার জন্য অন্যান্যদের অকল্যাণ, ক্ষতি বা ধ্বংস কামনা করি বা সে জন্য চেষ্টা করি। এভাবে আমরা মূলত নিজেদেরকেও ধ্বংস করি। লোভ, লালসা, হিংসা, হানাহানি আমাদের হৃদয় ও জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে, আমাদেরকে স্রষ্টার প্রেম, করুণা ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে, তাঁর শাস্তি র মধ্যে নিপতিত করে এবং সর্বোপরি আমাদের পারলৌকিক জীবনের কঠিন ধ্বংস ও ক্ষতি নিশ্চিত করে।

এ সব ক্ষতিকর পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য যুগে যুগে অনেক মানুষ সন্যাস, বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন বেছে নিয়েছেন। এভাবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছেন। ইসলামে বৈরাগ্য বা সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ। সমাজের মধ্যে বসবাস করে, সকল কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করার সাথে সাথে নিজের হৃদয়কে মোহমুক্ত রাখা-ই ইসলামী বৈরাগ্য। আর এ অবস্থা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম প্রতিনিয়ত এ জাগতিক জীবনের অস্থায়িত্ব, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা নিজেকে স্মরণ করানো। কুরআন ও হাদীসে এজন্য বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ পৃথিবীতে নিজেকে প্রবাসী বা পথিক হিসাবে গণ্য করতে বলা হয়েছে। এ স্মরণ আমাদের জন্য অগণিত সাওয়াব অর্জনের পাশাপাশি আমাদের হৃদয়গুলোকে লোভ, হিংসা, প্রতিহিংসা ইত্যাদির কঠিন ভার থেকে মুক্ত করবে। আমাদের জীবনকে হানাহানি ও হিংস্রতা থেকে মুক্ত করবে।

দিনের বিভিন্ন অবসরে ও বিশেষ করে সকালে, সন্ধ্যা বা রাতে নির্ধারিত সময়ে নিজেকে স্মরণ করান : যে মানুষের পরবর্তী নিশ্বাসের নিশ্চয়তা নেই সে কী জন্য হানাহানিতে লিপ্ত হবে? কিজন্য সে লোভ করবে। সেতো পথিক। চলার পথের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করা ও পাথেয় সংগ্রহই তো তার কাজ। চলার পথে যদি কেউ কষ্ট দেয় তাকে সম্ভব হলে ক্ষমা করে দিই না কেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তো তাকে আর দেখব না। রাস্তায়, ফেরীতে, রেলস্টেশনে বা এয়ারপোর্টে বসার চেয়ার, ট্রলি, খাবারের প্লেট, সামান্য ধাক্কাধাক্কির জন্য কি আমরা সময় নষ্ট করে মারামারিতে লিপ্ত হই? এ জীবন তো এ সকল অস্থায়ী স্থানেরই একটু বিস্তৃত রূপ। চেষ্টা করি না কেন এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্ষমা, ভালবাসা ও সেবায় ভরে দিতে। তাতে জীবন হবে আল্লাহর রহমতে ধন্য আর আমি অর্জন করব আখেরাতের অমূল্য পাথেয়।

পার্থিব স্বার্থপরতা বা লোভের জন্য প্রভুর নির্দেশনার বাইরে কাজ করছি? কি লাভ হবে তাতে? সে লাভ কি ভোগ করতে পারব? পারলে কতদিন। তারপর তো আমাকে প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অমুকের খুশির জন্য, তমুকের কাছে বড় হওয়ার জন্য, আরেকজনের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য আমি এ কাজটি করতে চাচ্ছি। কি লাভ তাতে? সে আমাকে কী দেবে? যা দেবে তা থেকে কি আমি লাভবান হতে পারব? আমাকে তো আমার প্রভুর কাছে একাকীই চলে যেতে হবে। আমার তো বাস্তববাদী হওয়া উচিত। নিজের জাগতিক ও পরকালীন জীবনের জন্য যে কাজে আমার রব খুশি সে কাজই তো আমার করা উচিত।

সুপ্রিয় পাঠক, আমাদের উচিত প্রতিদিন নিজেদের বিচার করা। ক্ষণস্থায়ী প্রবাসের ও চিরস্থায়ী আবাসের জন্য যা প্রয়োজনীয় সেগুলোই করা। এ চিন্তা আমাদেরকে উপরে বর্ণিত ক্ষমাময় ও হিংসাহীন হৃদয় অর্জনেও সাহায্য করবে। এ চিন্তাগুলো বেলায়াত ও ইহসানের পথে আমাদের মহামূল্য পাথেয়।

২. ৬. ২. সৃষ্টির কল্যাণে রত থাকা

আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সহজতম পথ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সকল জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলূম হলে সাহায্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবামূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে

রত থাকবেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার নিকট মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে কিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। ... এইরূপ অগণিত হাদীস আমরা হাদীসের গ্রন্থে দেখতে পাই।[১]

২. ৬. ৩. হিংসামুক্ত কল্যাণ কামনা

হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে মুক্ত রাখা এমন একটি কর্ম যা মানুষকে অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও যিক্‌র আযকার ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী করে তোলে। আনাস (রা) বলেন, "একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসেছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেন : এখন তোমাদের এখানে একজন জান্নাতী মানুষ প্রবেশ করবেন। তখন একজন আনসারী মানুষ প্রবেশ করলেন, যাঁর দাড়ি থেকে ওযূর পানি পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে তাঁর জুতাজোড়া ছিল। পরের দিনও রাসূলুল্লাহ ﷺ একই কথা বললেন এবং একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তৃতীয় দিনেও রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম দিনের মতোই আবারো বললেন এবং আবারো একই ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তৃতীয় দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলিস ভেঙ্গে চলে গেলে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) উক্ত আনসারী ব্যক্তির পিছে পিছে যেয়ে বলেন, আমি আমার পিতার সাথে মন কষাকষি করেছি এবং তিন রাত বাড়িতে যাব না বলে কসম করেছি। এ কয় রাত আপনার কাছে থাকতে দিবেন কি? তিনি রাজি হন। (আব্দুল্লাহর ইচ্ছা তিন রাত তাঁর কাছে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত ইবাদত জেনে তদ্রূপ আমল করা, যেন তিনিও জান্নাতী হতে পারেন)।

তিনি তিন রাত তাঁর সাথে থাকেন, কিন্তু তাঁকে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করতে বা বিশেষ কোনো নফল ইবাদত পালন করতে দেখেন না। তবে তিন দিনের মধ্যে তাঁকে শুধুমাত্র ভাল কথা ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো খারাপ কথা বলতে শোনেননি। আব্দুল্লাহ বলেন, আমার কাছে তাঁর আমল খুবই নগণ্য মনে হতে লাগল। আমি বললাম : দেখুন, আমার সাথে আমার পিতার কোনো মনমালিন্য হয়নি। তবে আমি পরপর তিনি দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনলাম এখন একজন জান্নাতী মানুষ আসবেন এবং তিনবারই আপনি আসলেন। এজন্য আমি আপনার আমল দেখে সেইমতো আমল করার উদ্দেশ্যে আপনার কাছে তিন রাত্র কাটিয়েছি, কিন্তু আমি আপনাকে বিশেষ কোনো আমল করতে দেখলাম না! তাহলে কী কর্মের ফলে আপনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতী বললেন? তিনি বললেন: তুমি যা দেখেছ এর বেশি কোনো আমল আমার নেই, তবে আমি আমার অন্তরের মধ্যে কোনো মুসলমানের জন্য কোনো অমঙ্গল ইচ্ছা রাখি না এবং আমি কোনো কিছুর জন্য কাউকে হিংসা করি না। তখন আব্দুল্লাহ বলেন: এই কর্মের জন্যই আপনি এই মর্যাদায় পৌঁছাতে পেরেছেন।" হাদীসটি সহীহ।[২]

অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "বেটা, যদি পার তবে এমনভাবে সকাল ও সন্ধ্যা করবে (জীবন কাটাবে) যে, তোমার হৃদয়ে কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা নেই। সম্ভব হলে এইরূপ চলবে, কারণ এইরূপ চলা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করল, সে আমাকে ভালবাসল। আর যে আমাকে ভালবাসবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে, তবে ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৩]

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, সংঘাতপূর্ণ জীবনে অনেক মানুষ আমাদেরকে কষ্ট দেন, হক্ক নষ্ট করেন, ক্ষতি করেন বা শত্রুতা করেন। অনেকে অকারণেও এগুলো করেন। এদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে হৃদয়কে কিভাবে বিরত রাখব ? আসলে বিষয়টি কঠিন বলেই তো সাওয়াব বেশি। তবে চেষ্টা করলে তা কঠিন থাকে না। মানবীয় স্বভাবের কারণে আমাদের মনে বিশেষ মুহূর্তে ক্রোধ, কষ্ট বা বিরক্তি আসবেই। তবে মনটা একটু শান্ত হলেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের মধ্য থেকে এ অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ও যার কর্মে বা ব্যবহারে আমরা কষ্ট পেয়েছি তার জন্য ইস্তিগফার করতে হবে ও দু'আ করতে হবে।

প্রয়োজনে নিজের হক্ক রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে অধিকার আদায়ের চেষ্টা বা কর্ম আর মনের হিংসা ও শত্রুতা এক নয়। এক ব্যক্তি আমার অধিকার নষ্ট করেছেন, আমি তার নিকট থেকে আমার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি। কিন্তু তার সাথে আমার অন্য কোনো শত্রুতা নেই। আমি আমার অধিকার ফেরৎ পাওয়া ছাড়া তার কোনো প্রকার অমঙ্গল কামনা করি না। বরং আমি সর্বদা তার জন্য দু'আ করি। এভাবে হৃদয়কে অভ্যস্ত করলে ইন্‌শা আল্লাহ আমরা উপরিউক্ত সাহাবীর মতো হতে পারব এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত জীবিত করার সাওয়াব অর্জন করতে পারব।

২. ৬. ৪. আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যধারণ

মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সহজেই অত্যন্ত বেশি সাওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সবর বা ধৈর্যধারণের গুণ অর্জন করা। ধৈর্য মুমিনের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধৈর্য বলতে নিষ্ক্রিয় নির্জীবতা বুঝানো হয় না, বরং সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বুঝানো হয়। পারিপার্শিক অবস্থা বা অন্যের আচরণ দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত না করে নিজের স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে

নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা। এক কথায় Re-active না হয়ে Pro-active হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَفْضَلُ الإِيمانِ الصَّبْرُ والسَّماحَةُ

"ধৈর্য ও উদারতাই সর্বোত্তম ঈমান।" হাদীসটি সহীহ।[১]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধৈর্য তিন প্রকারের: (১) বিপদ-আপদ ও কষ্টে ধৈর্য, (২) পাপ ও লোভ থেকে ধৈর্য এবং (৩) ক্রোধের মধ্যে ধৈর্য।

বিপদে হতাশ বা অধৈর্য হয়ে পড়া একদিকে যেমন ঈমানের পরিপন্থী, অপরদিকে তা মানবীয় ব্যক্তিত্বের চরম পরাজয়। হতাশা, অস্থিরতা বা উৎকণ্ঠা বিপদ দূর করেনা, বিপদের কষ্ট কমায় না বা বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ দেখায় না। সর্বোপরি হতাশা বা ধৈর্যহীনতা স্বয়ং একটি কঠিন বিপদ যা মানুষকে আরো অনেক কঠিন বিপদের মধ্যে নিপতিত করে। পক্ষান্তরে ধৈর্য বিপদ দূর না করলেও তা বিপদ নিয়ন্ত্রণ করে, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য শান্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয় এবং অস্থিরতা জনিত অন্যান্য বিপদের পথরোধ করে। সর্বোপরি বিপদে কষ্টে ধৈর্যের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর নিকট মহান মর্যাদা, সাওয়াব, জাগতিক বরকত ও পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে: "আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করব। আর আপনি শুভ সংবাদ প্রদান করুন ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তণকারী।"[২]

ধৈর্য হলো কর্মময় স্থিরচিত্ততা ও হতাশামুক্ত সুদৃঢ় মনোবল। মুমিন দৃঢ় মনোবল নিয়ে নিজের কল্যাণ ও স্বার্থ অর্জনের জন্য চেষ্টা করবেন। বিপদে আপদে কখনোই অতীতের ভুলভ্রান্তি নিয়ে হতাশা বা আফসোস করে সময় নষ্ট করবেন না বা মনের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও হতাশার অনুপ্রবেশের দরজা খুলে দিবেন না। বরং যা ঘটার আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটেছে এ বিশ্বাস নিয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে কর্মের পথে এগোতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে অধিক প্রিয় ও অধিক কল্যাণময়, যদিও প্রত্যেকের ভিতরেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার জন্য যা কল্যাণকর তা অর্জনের জন্য তুমি সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে সচেষ্ট হও এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। কখনোই হতাশা বা অবসাদগ্রস্ত হবে না। যদি তুমি কোনো বিপদে-অসুবিধায় নিপতিত হও তবে তুমি বলবে না যে, যদি আমি এইরূপ করতাম!! বরং তুমি বলবে: আল্লাহর নির্ধারণ এবং তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন। কারণ 'যদি করতাম!!' বলে অতীতের কর্ম নিয়ে আফসোস শয়তানের কর্মের পথ উন্মুক্ত করে।"[৩]

ক্রোধের সময় ধৈর্যধারণ ঈমানের অন্যতম দিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.

"যে অপরকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পারে সে প্রকৃত বীর নয়, প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে।"[৪]

আবূ দারদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমাকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন:

لاَ تَغْضَبْ وَلَكَ الجَنَّةُ

"তুমি রাগবে না; তাহলেই জান্নাত তোমার জন্য।"[৫] হাদীসটি সহীহ।

ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যার প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে বা যে কষ্ট দিয়েছে তাকে ক্ষমা করতে ও তার সাথে উত্তম আচরণ করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। বিশেষত যাকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব সেরূপ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা অতীব প্রয়োজন। আল্লাহ বলেন:

وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

"ভাল এবং মন্দ (আচরণ) সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।"[১]

প্রকৃত মুমিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

"তারা কবীরা গোনাহসমূহ ও অশ্লীল কর্ম বর্জন করে এবং যখন তারা ক্রোধান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে।"[২]

অন্যত্র জান্নাতী মুমিনদের পরিচয়ে আল্লাহ বলেছেন:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"তারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষদেরকে ক্ষমা করে।"[৩]

ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قَلْبَهُ رِضًى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বিরক্তি ও ক্রোধে উত্তেজিত অবস্থায় যদি কেউ রাগ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সম্বরণ করে তবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার হৃদয়কে পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবেন।" হাদীসটি হাসান।[৪]

ক্রোধ সম্বরণ করা ও ক্রোধের সময় আত্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে রয়েছে, ক্রোধান্বিত হলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা, আল্লাহর ক্রোধের কথা স্মরণ করা, উত্তেজিত অবস্থায় কথা না বলে চুপ করে থাকা, মুখে-মাথায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা, ওজু করা, দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে শয়ন করা ইত্যাদি।

২. ৬. ৫. হতাশা বর্জন ও আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা

আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্যই হতাশা ও উৎকণ্ঠার মূল কারণ। এজন্য তা মূলত কষ্টময় পাপ এবং কখনো শুধুই কষ্ট। এজন্য হাদীসে বারংবার এগুলো থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হাদীসে এ বিষয়ে দুটি শব্দ ব্যবহৃত। প্রথম শব্দটি 'হাম্ম' (**الهـم**) এবং দ্বিতীয় শব্দ হুযন বা হাযান (**الحـزن**)। দুটি শব্দেরই অর্থ: মনোবেদনা, উৎকণ্ঠা, মনোকষ্ট, বিষন্নতা, মানসিক অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা, অশান্তি, উদ্বিগ্নতা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তাবোধ, দুঃখ, শোক, মর্মপীড়া, হতাশা, মনোবলহীনতা, বিমর্ষতা, বিষাদগ্রস্ততা, আনন্দহীনতা ইত্যাদি (worry, anxiety, solicitude, grief, distress, sadness, sorrow, unhappiness, depression, dejection, melancholy)। দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য উৎকণ্ঠা বা হতাশার উৎস নিয়ে। যদি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ের কারণে এরূপ হতাশা বা উৎকণ্ঠা হয় তাহলে তাকে আরবীতে 'হাম্ম' বলা হয়। আর যদি অতীত নিয়ে তা হয় তাহলে তাকে 'হুযন' বলা হয়। সালাতের পরের দুআ ও ঋণমুক্তির দুআ প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি দুআ উল্লেখ করেছি যেগুলোতে হাম্ম ও হুযন থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থন করা হয়েছে।

মানসিক অস্থিরতা ও অশান্তি মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশেষত বর্তমান যান্ত্রিক ও স্বার্থপর 'সভ্যতা' ও সমাজব্যবস্থা মানুষকে অনেক বিষয়ে 'আরাম-আয়েশের' ব্যবস্থা করলেও মানসিক অশান্তি ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিয়েছে। সচ্ছল, সক্ষম ও ক্ষমতাবান মানুষেরাও নানাবিধ মানসিক অশান্তি, উৎকণ্ঠা, হতাশা, বিষাদগ্রস্ততা ইত্যাদিতে আক্রান্ত। এ সকল মানসিক অসুস্থতার কারণে বাড়ছে অহঙ্কার, আগ্রাসী বা উদ্ধত মনোভাব, হীনমন্যতাবোধ, সন্দেহপ্রবণতা, অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, হিংস্রতা, মাদকতা ইত্যাদি। আর এগুলো ব্যক্তির মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি ও অবক্ষয় বৃদ্ধি করছে। নষ্ট হচ্ছে পরিবার ও সমাজ।

এ সকল অসুস্থতা, অশান্তি, হতাশা বা উৎকণ্ঠার মূল কারণ আল্লাহর যিকর থেকে অন্তরকে বিমুখ রাখা। কখনো কখনো দৈহিক বা দেহযন্ত্রের সমস্যার কারণেও হতাশা (depression) রোগের আক্রমন ঘটে। এগুলো খুব কম ক্ষেত্রে হয়। অধিকাংশ মানসিক অস্থিরতাই দেহযন্ত্রের বৈকল্য তৈরি করে। পবিত্র ও ঈমানী যিন্দেগি যাপনের মাধ্যমে আমরা এ কঠিন কষ্ট থেকে রক্ষা পেতে পারি।

মানুষের মনে আল্লাহর উপর আস্থা যত গভীর হয় মানসিক শক্তি ও স্থিরতা ততই বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত আল্লাহর ইবাদত, দুআ ও যিকর, কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন, মাজালিসুয যিকর ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর উপর গভীর আস্থা, বিশ্বাস, তাওয়াক্কুল, তাঁর ইলম, ইচ্ছা, রহমত, তাকদীর ইত্যাদির গভীর বিশ্বাস, আখিরাতমুখিতা অর্জনের মাধ্যমে মুমিন সকল প্রকার হতাশা ও উৎকণ্ঠামুক্ত পবিত্র জীবন লাভ করেন। হতাশা ও উৎকণ্ঠার বিরুদ্ধে মুমিনের মনে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয়। যেকোনো দুঃখ, বেদনা, কষ্ট বা সমস্যায় মনের মধ্যে হতাশা বা উৎকণ্ঠা আকৃতি নিতে শুরু করলেই ঈমানী চেতনাগুলো আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা, নির্ভরতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, নির্লোভতা, সাওয়াব-আকাঙ্খা ইত্যাদি অনুভূতি দিয়ে দ্রুত তাকে ঘিরে ধরে, অবদমিত করে এবং নেতিবাচক অনুভূতিগুলোকেই ইতিবাচকে পরিণত করে হৃদয়কে প্রশান্তিতে ভরে দেয়।

মূলত এটিই রাহে বেলায়াত বইটির মূল বিষয়। এ বইটিতে কুরআন ও সুন্নাহর যে দিক নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর

আংশিক হৃদয়ঙ্গম ও পালন যে কোনো মুমিনকে এরূপ প্রশান্তির ছোঁয়া দিবে বলে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ও বাস্তব অভিজ্ঞতা।

আর এ পাপ ও কষ্ট থেকে উদ্ধার পাওয়ার মূল উপায় মহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা। অন্তরের একটি সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করা ও আল্লাহর রহমতের আশায় হৃদয়কে ভরপুর রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

(إن) حُسْنَ الظَّنِّ (بالله) مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ

"আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদত।"[১]

যত কঠিন বিপদ বা সমস্যাই আসুক না কেন, মুমিনের হৃদয়ে অবিচল আস্থা থাকে যে, তার করুণাময়-দয়াময় প্রতিপালক তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তার জন্য যা কল্যাণকর তারই ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহর রহমতের প্রতি অবিচল আস্থার সামান্যতম ঘাটতি ঈমানেরই ঘাটতি। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, হতাশা বা অবসাদে আক্রান্ত হওয়া অবিশ্বাসেরই নামান্তর। আল্লাহ বলেন: "একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।"[২]

হতাশা ও দুশ্চিন্তা শয়তানের বিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ। আল্লাহ বলেন:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বরকত-রহমতের অঙ্গীকার করেন।"[৩]

আমরা একটু আগে দেখেছি, মুমিনকে শক্তিশালী হতে হবে এবং যে কোনো সমস্যা বা বিপদে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, নিজের কল্যাণ, স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তবে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা ও পরিকল্পনা এক বিষয় আর দুশ্চিনা ও হতাশা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়।

মুমিনের মস্তিস্ক পরিকল্পনা করবে, দেহ তা বাস্তবায়নে পরিশ্রম করবে, কিন্তু হৃদয়-মন প্রশান্ত ও উৎকণ্ঠা-মুক্ত থাকবে। আমাদের অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই অমূলক। রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হলে অধিকাংশ সময়েই আমরা খারাপ পরিণতির কথা চিন্তা করে হতাশা ও দুশ্চিন্ত াগ্রস্ত হই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা সমাজিক যে কোনো প্রকৃত বা সম্ভাব্য সমস্যাকে নিয়ে আমাদের চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ দিকটা নিয়েই আবর্তিত হয়। অথচ সমস্যা থেকে উত্তরণের বাস্তব চেষ্টার পাশাপাশি সকল অবস্থায় ভাল চিন্তা করা এবং আল্লাহর রহমতে সকল বিপদ কেটে যাবেই এরূপ সুদৃঢ় আশা পোষণ করা মুমিনের ঈমানের দাবী এবং সাওয়াবের কাজ। যে বান্দা রহমতের আশা করতে পারেন না তিনি তো আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করতে পারলেন না। আর আল্লাহ তো বান্দার ধারণা ও আস্থা অনুসারেই তার প্রতি ব্যবহার করবেন।

সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, প্রকৃত বিপদের ক্ষেত্রেও মুমিন কখনোই হতাশ হন না। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি।"[৪]

এভাবে আল্লাহ একটি কষ্টের জন্য দুটি স্বস্তির ওয়াদা করেছেন। এজন্য মুমিন কষ্ট বা বিপদের মধ্যে নিপতিত হলে এ ভেবে খুশি হন যে, এ কষ্ট মূলত আগত স্বস্তিরই পূর্বাভাস মাত্র। মহান আল্লাহ আমাদের হৃদয়গুলো তাঁর রহমতের আশায় ভরে দিন এবং সকল হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত রাখুন।

২. ৬. ৬. কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি

শুক্‌র অর্থ কৃতজ্ঞতা, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি এবং কানা'আত অর্থ স্বল্পে তুষ্টি। এ তিনটি কর্মে মুমিনের মনকে অনুশীলন করতে হবে। এগুলি দুনিয়া ও আখিরাতের অনন্ত নিয়ামতের উৎস। আল্লাহ বলেন:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।"[৫]

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অগণিত নেয়ামত রয়েছে। আবার অনেক কষ্টও রয়েছে। মানুষের একটি বড় দুর্বলতা আনন্দের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া ও কষ্ট বেদনার কথা বারংবার স্মরণ করা। এ দুর্বলতা কাটাতে হবে। জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ইতিবাচক হতে হবে। আমরা কখনোই কষ্ট ও অসুবিধাগুলোকে বড় করে দেখব না। কষ্টের কথা বারংবার মনে করে জাবর কাটব না। বরং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত, শান্তি, সুখ বারংবার স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। এ ইতিবাচক ও

কৃতজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। এ দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনো মানুষের জীবনকে শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে ভরে দেয়।

কষ্টের অনুভুতিকে ক্রমান্বয়ে কৃতজ্ঞতার অনুভুতিতে রূপান্তরিত করতে হবে। আল্লাহর অগনিত নিয়ামতের মধ্যে কিছু কষ্টের কারণে যদি গোনাহ ক্ষমা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তাহলে অসুবিধা কী? প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিপদাপদ আছে। কাজেই আমার জীবনে তো কিছু অসুবিধা থাকবেই। বিপদ ও সমস্যা তো আরো কঠিন হতে পারত। অনেকের জীবনেই তো আমার চেয়েও অধিক কষ্ট আছে। কাজেই আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ (وَالرِّزْقِ)، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

"সম্পদে, শক্তিতে বা রিয্‌কে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি পড়বে, তখন যেন সে তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে।"[১]

অতি সামান্য নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। সামান্যতম আনন্দ, তৃপ্তি, ভাললাগা, চারপাশের কারো সামান্যতম সুন্দর আচরণ সব কিছুর জন্য হৃদয়ভরে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহর সকল নিয়ামতই বড়। ছোট্ট নেয়ামতকে বড় করে অনুভব করলে আল্লাহ আরো বড় নেয়ামত প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ، لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ

যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।[২]

জীবনের সকল আনন্দ, সুখ, লাভ, পুরস্কার ইত্যাদি সকল নিয়ামতের কথা প্রসঙ্গ ও সুযোগ পেলে অন্যদেরকে বলতে হবে। আমরা সাধারণত সুখের বা আনন্দের কথার চেয়ে দুঃখের কথা বলতে বেশি আগ্রহী। আমাদেরকে এর বিপরীত বলার অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ

"আল্লাহর নিয়ামতের কথা বলা কৃতজ্ঞতা এবং তা না বলা অকৃতজ্ঞতা।"[৩]

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি, বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি কেউ আমাদের সামান্যতম সহযোগিতা করেন তবে আমাদের দায়িত্ব, তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সম্ভব হলে তাকে প্রতিদান দেওয়া। না হলে তার জন্য দু'আ করা এবং তার উপকারের কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করা ও বলা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

"যদি তোমাদের কাউকে কেউ কোনোভাবে উপকার করে তবে তোমরা তার প্রতিদান দিবে। যদি তোমরা প্রতিদান দিতে না পার তবে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে যাতে অনুভব করতে পার যে, তোমরা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পেরেছ।"[৫]

২. ৬. ৭. নির্লোভতা

যুহদ অর্থ নির্লোভতা, নির্লিপ্ততা, বৈরাগ্য ইত্যাদি। ইসলামে সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগের বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে অবস্থান করে জাগতিক সম্পদ ও সম্মানের লোভ থেকে হৃদয়কে বিমুক্ত রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সম্মান ও অসম্মান সকল অবস্থায় হৃদয়ের অবস্থা এক থাকাই ইসলামী বৈরাগ্য। আল্লাহ যখন যেভাবে রাখবেন তখন সে অবস্থায় বান্দা তার দায়িত্বগুলো পালন করতে সচেষ্ট থাকবেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি থাকলে তা দিয়ে বান্দা যথাসাধ্য আখিরাতের পাথেয় অর্জনের চেষ্টা করেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি না থাকলে বান্দা ভারমুক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নিরিবিলি আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। যে কোনো সময়ে তার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ আবাসে গমনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন।

এ জগতে মুমিন একজন পথচারী বা প্রবাসী মাত্র। বাস, রেল বা বিমানে ভাল সিট পেতে চান যাত্রী, কিন্তু ভাল সিট না পেলে দুশ্চিন্তা বা হতাশায় আক্রান্ত হন না। যে সিট পেয়েছেন তাতে বসেই নিজের গন্তব্যস্থলে গমন করেন। পথের সৌন্দর্য ও শান্তি তাকে

আনন্দিত করে। কিন্তু পথের কষ্ট তাকে হতাশ করে না।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠলে আমরা দেখলাম যে, তার দেহে চাটাইয়ের দাগ হয়ে গিয়েছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি বিছানা বানিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন:

مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

"আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক! দুনিয়াতে আমার অবস্থা অবিকল সে আরোহীর মত, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে এবং এরপর গাছটি ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছে।"[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

"তুমি দুনিয়াতে এমন হও, যেন তুমি প্রবাসী অথবা পথচারী।" ইবনু উমার বলতেন, "যখন সন্ধ্যা হবে, তখন তুমি পরবর্তী সকালের অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে তখন তুমি পরবর্তী সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকবে না। তোমার সুস্থতা থেকে তুমি তোমার অসুস্থতার পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তোমার জীবন থেকে তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ কর।"[২]

সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

"দুনিয়ার বিষয়ে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন, আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

সম্মানিত পাঠক, নির্লোভতা ও প্রশান্তিপূর্ণ পবিত্র হৃদয় ও জীবন অর্জনের অন্যতম পথ আখিরাতমুখিতা। আনাস (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ

"যে ব্যক্তির চিন্তা-উৎকণ্ঠা আখিরাত নিয়ে আবর্তিত আল্লাহ তাঁর হৃদয়ের মধ্যে সচ্ছলতা প্রদান করেন, তার কর্মকাণ্ড সুগোছালো বানিয়ে দেন এবং দুনিয়া অনুগত ও বাধ্য হয়ে তার নিকট আগমন করে। আর যে ব্যক্তির চিন্তা-উৎকণ্ঠা দুনিয়া নিয়ে আবর্তিত আল্লাহ তার দুচোখের মাঝে দারিদ্র্য রেখে দেন, তার কর্মকাণ্ড বিক্ষিপ্ত বানিয়ে দেন এবং দুনিয়া থেকে সে ততটুকুই অর্জন করতে পারে যা তার জন্য নির্ধারিত।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

২. ৬. ৮. সুন্দর আচরণ

সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয়তম ইবাদতসমূহের অন্যতম। আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ.

"কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর আচরণ এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী মানুষ শুধু তার সুন্দর ব্যবহারের বিনিময়েই নফল সালাত ও নফল সিয়াম পালন করার সাওয়াব অর্জন করবে।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

মুমিনের আচরণ এমনই যে সহজেই তিনি মানুষকে আপন করে নেন এবং অন্যেরাও তাকে আপন করে ভালবেসে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ.

"মুমিন ঐ ব্যক্তি যে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসে এবং অন্যেরাও তাকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি নিজে অন্যদের ভালবাসে না এবং

অন্যরাও তাকে ভালবাসে না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।" হাদীসটি হাসান।[১]

হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণের তিনটি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ কথা ও আচরণের ক্ষেত্রে বিনম্রতা, প্রফুল্ল চিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সত্য পরায়ণতা, কম কথা বলা ও বেশি শ্রবণ করা। দ্বিতীয়তঃ কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলে গালি গালাজ, অভিশাপ ও সীমালঙ্ঘণ বর্জন করা। তৃতীয়তঃ ক্ষমা করা, বিশেষত প্রতিশোধ নেয়া বা প্রতিউত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে ক্ষমা করে দেওয়া। এরূপ আচরণের অধিকারী কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর সবচেয়ে নৈকট্যের মর্যাদায় সমাসীন হবেন। আর এর বিপরীত আচরণের অধিকারী সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে থাকবেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ

"তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থান লাভ করবে যাদের আচরণ সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে তারা যারা বেশি কথা বলে, যাদের কথায় বা আচরণে অহংকার প্রকাশিত হয় এবং যারা কথাবার্তায় অন্যের প্রতি অবজ্ঞা বা অভদ্রতা প্রকাশ করে।" হাদীসটি হাসান।[২]

২. ৬. ৯. নফল সিয়াম ও নফল দান

আমরা দেখেছি যে, সকল ইবাদতই মূলত যিক্‌র। আল্লাহর পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য ফরয ইবাদত পালনের পরে বেশি বেশি নফল ইবাদত মুমিনের পাথেয়। বিশেষত নফল সিয়াম, নফল দান, নফল ইল্‌ম অর্জন ইত্যাদি ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করতে হবে। নফল সিয়াম বা সিয়াম মুমিনের জীবনে অন্যতম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ নফল সিয়াম পালনের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা নিয়মিত ও অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন। প্রতি দুদিন পর একদিন, বা একদিন পর একদিন, বা প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি মাসের প্রথমে ও শেষে নিয়মিত নফল সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এছাড়া সুযোগমতো যত বেশি সম্ভব অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি।

নফল দান, সাদকা, সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রত্যেক মুমিনের নিয়মিত ও অনিয়মিত দানের অভ্যাস রাখা প্রয়োজন। মানুষের অভাব চিরন্তন। মনের অভাব থেকে কেউই মুক্ত নয়। মুমিন সর্বদা চেষ্টা করবেন প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে নিয়মিত কিছু নির্ধারিত এতিম, বিধবা, অসহায় বা অভাবী মানুষকে সাহায্য করার। এছাড়া সর্বদা সাধ্যমতো দান করার চেষ্টা করতে হবে। দানের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও সাওয়াব বিষয়ে হাদীস আলোচনা করার জন্য পৃথক বই প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার অধিপতি ছিলেন। আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে তিনি যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে এক পঞ্চমাংশ পেতেন। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা অভাবী মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার আগেই তাঁর সব সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেত। মাসের পর মাস তাঁর স্ত্রীগণের ঘরে রান্না করার মতো কিছুই থাকত না। শুধুমাত্র ২/১ টি শুকনো খেজুর ও পানি খেয়েই তাঁদের মাসের পর মাস চলে যেত। সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা এ ধরনের ব্যয়ের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ সকল ঘটনা বিস্তারিত বলতে গেলে বিশাল আকারের বই লিখতে হবে।

২. ৭. আল্লাহর প্রেম ও আল্লাহর জন্য প্রেম

মহান আল্লাহর নৈকট্য ও বেলায়াত অর্জনের জন্য সবচেয়ে সহজ ও সর্বাধিক সহায়ক বিষয় তিনটিঃ (১) মহব্বত বা প্রেম ও (২) সুহবাত বা সাহচর্য ও (৩) যিকর। মহব্বত বা প্রেম বলতে আল্লাহর প্রেম, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রেম এবং আল্লাহর জন্য প্রেম বুঝানো হয়। সুহবাত বা সাহচর্য অর্থ নেককার মানুষদের সহচর হওয়া বা তাদের সাথে কিছু সময় কাটানো। শেষের দুটি ইবাদত মূলত নফল পর্যায়ের; কিন্তু তা ফরয ও নফল পর্যায়ের ঈমান ও তাকওয়া অর্জনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। যিকর বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে আমরা প্রেম ও সাহচর্য বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি। মহান আল্লাহর কাছে তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি।

২. ৭. ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) প্রেম

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে অন্য সকল কিছু এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসা আল্লাহর প্রিয়তম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلاَّ للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

"তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে, (১) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অন্য সকলের চেয়ে তার নিকট বেশি

প্রিয় হবেন, (২) কাউকে ভালবাসলে শুধু আল্লাহর জন্য ভালবাসবে, অন্য কোনা কারণে কাউকে ভালবাসবে না এবং (৩) আল্লাহর দয়ায় কুফর থেকে রক্ষা পাওয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতই অপছন্দ করবে।"[১]

অন্য হাদীসে তিনি আরো বলেছেন:

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশী ভালবাসবে।"[২]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন:

إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قَالَ لاَ شَيْءَ (مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ) إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ. فَقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলে: কিয়ামত কখন? তিনি বলেন: তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুত করেছ? লোকটি বলেন: কিছুই নয়, আমি কিয়ামতের জন্য অনেক বেশি (নফল) সালাত, সিয়াম বা দান-সাদকা প্রস্তুত করতে পারিনি; কিন্তু আমি আল্লাহকে এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালবাসি। তিনি বলেন: "তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে।" আনাস (রা) বলেন: 'তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে' রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ কথায় আমরা যত খুশি হলাম এমন খুশি আর কিছুতে হই নি। আনাস বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-কে ভালবাসি এবং আমি আশা করি যে, আমি তাদের মত আমল করতে না পারলেও তাদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাদের সাথেই থাকব।"[৩]

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালবাসা তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভালবাসা অর্জনের অন্যতম উপায় সাহচর্য, আনুগত্য ও অনুকরণ। সাহচর্য, আনুগত্য, অনুসরণ এবং ভালবাসা একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জাড়িত। ভালবাসা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে এবং অনুসরণ আরো ভালবাসা সৃষ্টি করে। প্রকৃত ভালবাসা ছাড়া প্রকৃত ইত্তিবায়ে সুন্নাত সম্ভব নয়। আবার যে ভালবাসা অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে না তা মেকি।

পাঠক, আপনি যদি নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আশিক' বা প্রেমিক মনে করেন, কিন্তু তাঁর হাদীস, সুন্নাত ও সীরাত পাঠের মাধ্যমে তাঁর সাহচর্য লাভের চেয়ে অন্য কারো সাহচর্য বা অন্য কিছুর আলোচনা অধিক ভাল লাগে অথবা তাঁর সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম করতে আপনার প্রচণ্ড কষ্ট হয় না কিন্তু অন্য কারো কথার ব্যতিক্রম করতে কষ্ট লাগে তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, আপনার প্রেমের দাবি মিথ্যা। শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং জীবনকে সুন্নাতে নববীর অনুকরণে পরিচালিত করে সত্যিকার প্রেমের স্বাদ লাভ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রকৃত প্রেম অর্জনের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সর্বদা বেশিবেশি দরুদ-সালাম পাঠ করা। মুমিনের উচিত এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা।

২. ৭. ২. আল্লাহর জন্য প্রেম

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ভালবাসার অবিচ্ছেদ্য প্রকাশ যারা আল্লাহকে মাবূদ এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল হিসেবে বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের সকলকে ভালবাসা। যার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্য ও সুন্নাতের অনুসরণ যত বেশি তার প্রতি মুমিনের প্রেমও তত বেশি। দল, মত, পাওনা, দেনা, ভাল ব্যবহার বা খারাপ ব্যবহারের কারণে তা বাড়ে না বা কমে না। বরং দীনের হ্রাসবৃদ্ধির কারণে তা বাড়ে-কমে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভিন্ন কিছুই নয়।"[৪]

এখানে মহান আল্লাহ 'মুসলিম' না বলে 'মুমিন' বলেছেন। উভয় শব্দ সমার্থক হলেও সাধারণত ইসলাম বলতে বাহ্যিক কর্ম ও ঈমান বলতে অন্তরের বিশ্বাস ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য বুঝানো হয়। এথেকে জানা যায় যে, যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি ঈমানের সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং সন্দেহাতীত কুফরী-শিরকে লিপ্ত হচ্ছেন না ততক্ষণ তিনি অন্য মুমিনের "দীনী ভাই" বলে গণ্য। কুরআনে রক্ত সম্পর্কের ভ্রাতৃত্বের চেয়ে "ঈমানী ভ্রাতৃত্ব"-কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

কুরআনে "ভাই" শব্দটির ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। হত্যাকারীকে নিহতের পরিজনের "ভাই" বলা হয়েছে।[৫] দুটি মুমিন গোষ্ঠীর

মধ্যে যুদ্ধ চলা অবস্থাতেও তাদেরকে "ভাই" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২] অর্থাৎ মানবীয় দুর্বলতার শিকার হয়ে একজন মুমিন অন্য মুমিনকে খুন করে ফেলার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। দুজন মুমিনের পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ কারণে তাদের কেউ কাফির হন না বা চিরশত্রুতে পরিণত হন না। তাদের যুদ্ধ আপন দু ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধের মত। যুদ্ধের পাশবিকতার মধ্যেও যেমন দু সহোদরের ভ্রাতৃত্ব মিলন ও মমতার হাতছানি দেয়, তেমনি দুজন মুমিনের যুদ্ধ। ভুল বুঝাবুঝি, হানাহানি, অশান্তি বা যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলা এরূপ অপরাধে লিপ্ত পক্ষদ্বয় এবং মুমিন সমাজের দীনী দায়িত্ব।

উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক মুমিনকে ভাই হিসেবে ভালবাসা এবং ঈমানের দাবিদার কোনো ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা পোষণ না করা ঈমানের ন্যূনতম দাবি। এটি ঈমানী ভালবাসার ন্যূনতম পর্যায়।

২. ৭. ৩. ভালবাসার মাপকাঠি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুকরণ-অনুসরণই আল্লাহর জন্য ভালবাসার মাপকাঠি। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেন:

بَاب عَلَامَةِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ لِقَوْلِهِ (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)

"আল্লাহর জন্য ভালবাসার আলামত: আল্লাহ বলেন: তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আল-ইমরান: ৩১)"[৩]

অর্থাৎ যার মধ্যে আল্লাহর ভালবাসা যত বেশি বিদ্যমান তাকে তত বেশি ভালবাসা ঈমানের মূল দাবি। আর কার মধ্যে আল্লাহর ভালবাসা কত বেশি তার সুনিশ্চিত মাপকাঠি সুন্নাতে নববীর অনুসরণ-অনুকরণ। যিনি যত বেশি সুন্নাতের অনুসারী হবেন তাকে তত বেশি ভালবাসা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানের ন্যূনতম দাবি। আর যদি কোনো মুমিন সুন্নাতে নববীর আলোকে আল্লাহর ইবাদত করেন, কিন্তু আমার রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক দল, নেতা বা পীরের অনুসরণ বা মহব্বত না করার কারণে তাঁর ইত্তিবায়ে সুন্নাতের অপব্যাখ্যা বা অবমূল্যায়ন করি তবে তা আমার ঈমানের অবক্ষয় প্রমাণ করে।

২. ৭. ৪. আল্লাহর জন্য ভালবাসা-ই ঈমান

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ الْمُوَالاَةُ فِي اللهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ والبُغْضُ فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ

"ঈমানের সুদৃঢ়তম রশি মহান আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব-নৈকট্য, আল্লাহর জন্য শত্রুতা, আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্য অপছন্দ-বিদ্বেষ।"[৪]

অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসল, আল্লাহর জন্য অপছন্দ করল, আল্লাহর জন্য প্রদান করল এবং আল্লাহর জন্য দেওয়া থেকে বিরত থাকল সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে, ঈমানের পূর্বশত মুমিনদের পারস্পরিক ভালবাসা এবং এরূপ ভালবাসার গভীরতাই ঈমানের পূর্ণতা প্রমাণ করে। আমরা আরো দেখছি যে, পছন্দের সাথে অপছন্দ ও ভালবাসার সাথে শত্রুতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ঈমান ও নেক আমলকে ভালবাসতে হবে এবং কুফর ও পাপাচারকে ঘৃণা করতে হবে। কাফিরকে অবিমিশ্র (absolute) অপছন্দ করতে হবে এবং যার মধ্যে বাহ্যিক ঈমান ও তাকওয়ার পূর্ণতা দেখা যায় তাকে অবিমিশ্র (absolute) ভালবাসতে হবে। যার মধ্যে ঈমান ও পাপচার মিশ্রিত তার ক্ষেত্রে পছন্দ ও অপছন্দ মিশ্রিত হবে। তাকে ঈমানের কারণে অবশ্যই ভালবাসতে হবে; কারণ ন্যূনতম আল্লাহর প্রেম থাকার কারণেই সে ঈমানদার হতে পেরেছে। পাশাপাশি পাপাচরের পরিমাণ অনুসারে তাকে অপছন্দ করতে হবে।

দল-মত সবকিছুর উর্ধ্বে মুমিনকে তাঁর ঈমানের কারণে ভালবাসতে না পারলে আমাদের ঈমানের দাবিই মিথ্যা হয়ে যায়। এটি খুবই স্বাভাবিক বিষয়। হৃদয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সর্বদা ভালবাসার মাপকাঠি হয়। আমার দল, নেতা বা পীরের অনুসরণের দাবিদারকে ভালবাসতে পারি, কিন্তু আমার দল, নেতা বা পীরের বিরোধী ঈমানের দাবীদারকে যদি ভালবাসতে না পারি, তাহলে প্রমাণ হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে অন্য কিছু আমার হৃদয়ে অধিক মূল্যবান।

২. ৭. ৫. ভালবাসাতে ঈমানের মজা

আমরা উপরের হাদীসে দেখেছি যে, ঈমানের স্বাদগ্রহণের জন্য মানুষকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসতে হবে।। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ

"যদি কেউ ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে চায় তবে সে যেন কাউকে ভালবাসলে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসে।" হাদীসটি হাসান।[১]

২. ৭. ৬. অল্প আমলে অধিক মর্যাদা

ঈমানী ভালবাসার দ্বারা মুমিন অল্প আমল করেও অনেক বেশি আমলকারী নেককার বান্দাদের সমান মর্যাদা লাভ করেন। ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি কিছু মানুষকে ভালবাসে, তবে আমলে তাদের সমান হতে পারে নি, তার অবস্থা কেমন হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: মানুষ যাকে ভালবেসেছে তার সাথেই তার অবস্থান।"[২]

আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে বলেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ قَالَ أَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ فَأَعَادَهَا أَبُو ذَرٍّ فَأَعَادَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি কিছু মানুষকে ভালবাসে, তবে সে তাদের মত আমল করতে পারে না? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আবূ যার, তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তোমার অবস্থান। আবূ যার (রা) বলেন: আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালবাসি। তিনি বলেন: "যাকে ভালবাস তুমি তারই সাথে।" আবূ যার (রা) তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-ও পুনরায় একই উত্তর দেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

২. ৭. ৭. আল্লাহর প্রেম ও ছায়া লাভ

ঈমানী প্রেমের অন্যতম পুরস্কার আল্লাহর প্রেম লাভ এবং কিয়ামতে তাঁর দেওয়া ছায়া লাভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ বলবেন:

أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي

"যারা আমার মর্যাদায় একে অপরকে ভালবাসত তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে ছায়া প্রদান করব, যে দিবসে আমার দেওয়া ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই।"[৪]

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا تَحَابَّ رَجُلاَنِ فِيْ اللهِ إِلاَّ كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ

"দু ব্যক্তি যখন একে অপরকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালবাসে তখন তাদের মধ্যে যে অপরকে বেশি ভালবাসে সেই আল্লাহর অধিক প্রিয়।"[৫]

আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ

"যে কোনো দু ব্যক্তি যখন একজন অপরজনকে তার অনুপস্থিতিতে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসে তখন তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বেশি ভালবাসবে উভয়ের মধ্যে সে-ই আল্লাহর অধিক প্রিয়।"[৬]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করেন। তখন মহান আল্লাহ তার রাস্তার মাথায় এক ফিরিশতাকে নিয়োজিত রাখেন। যখন উক্ত ব্যক্তি উক্ত ফিরিশতার নিকটবর্তী হন তখন ফিরিশতা বলেন: আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উক্ত ব্যক্তি বলেন: এ গ্রামে আমার এক ভাই আছেন তার নিকট যাচ্ছি। ফিরিশতা বলেন: তার কাছে কি আপনার কোনো নেয়ামত বা সুবিধা রয়েছে যা আপনি সংরক্ষণ করতে চান? তিনি বলেন: না। তবে আমি তাকে মহান আল্লাহর জন্য ভালবাসি। তখন ফিরিশতা বলেন:

فَإِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ.

আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছি এ কথা জানাতে যে, আপনি যেভাবে তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসেন আল্লাহও আপনাকে সেভাবে ভালবাসেন।[১]

২. ৭. ৮. ঈমানী প্রেমের অন্তরায়

এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর জন্য ভালবাসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। তবে এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ভুলে লিপ্ত হই: **(১)** আল্লাহর জন্য ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ছাড়া অন্য কাউকে মানদণ্ড ধরা, **(২)** নিজের বা অন্য কারো ইজতিহাদী মতকে কুরআন-সুন্নাহর সুনিশ্চিত নির্দেশনার উপরে স্থান দেওয়া, **(৩)** নিজের প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করতে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা দিয়ে ছোট পাপকে বড়, বড় পাপকে ছোট, ছোট নেক আমলকে বড় বা বড় আমলকে ছোট বানানো এবং **(৪)** কাফির বিষয়ক আয়াত ও হাদীসকে মুমিনগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ অগণিত ধর্মীয় দল-উপদলে বিভক্ত। আমরা প্রত্যেকে নিজের দল, মত, মুরব্বী, বুজুর্গ, আকাবির, ইমাম, আমীর বা শাইখকে "আল্লাহর জন্য ভালবাসার" মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছি। মূলত আমরা এখন আর "আল্লাহর জন্য" ভালবাসি না; বরং প্রত্যেকে নিজ মত বা বুজুর্গের জন্য ভালবাসেন। প্রত্যেকে নিজের দলের মুমিনকে "আল্লাহর জন্য" ভালবাসেন বা দীনী ভাই বলে গণ্য করেন। অর্থাৎ তিনি নিজের দলকেই "দীন" বলে বিশ্বাস করছেন। প্রত্যেকে ভিন্নমতের 'অধিক মুত্তাকীর' চেয়ে নিজ মতের 'কম মুত্তাকীকে' অধিক ভালবাসছেন। শুধু তাই নয়, নিজ মতের প্রকাশ্য ফাসিককে ভালবাসছেন কিন্তু অন্য মতের মুত্তাকী ও সুন্নাত অনুসারীকে দলীয় বা ইজতিহাদী মতভেদের কারণে শত্রু বলে গণ্য করছেন। কুরআন ও হাদীসে কাফিরদেকে শত্রু ভাবার, ঘৃণা করার বা তাদের সাথে বন্ধুত্ব না করার যে সকল আয়াত ও হাদীস রয়েছে সেগুলোকে আমরা অন্য দলের বা মতের মুমিনদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছি। মুমিনের ঈমান, তাকওয়া, সুন্নাতের অনুসরণ ইত্যাদি সকল নেক আমলকে কিছু মতভেদের কারণে বাতিল করে তাকে কাফির বলছি বা কাফিরের কাতারে ফেলে দিচ্ছি।

এভাবে আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করার নামে দীনকে দলে দলে বিভক্ত করার, মুমিনের সাথে শত্রুতার এবং মুমিনের ঈমান ও নেক আমলকে ঘৃণা করার কঠিন পাপে লিপ্ত হচ্ছি। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ

"যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়।"[২]

এ ভয়ঙ্কর পাপ থেকে রক্ষা পেতে মুমিনের দায়িত্ব দলমত নির্বিশেষে সকল মুমিনকে ভালবাসা। ইজতিহাদী মতভেদের ক্ষেত্রে নিজের মতকে সঠিক মনে করার অধিকার সকলেরই আছে। তবে ইজতিহাদী বিষয়ে নিজের পছন্দনীয় মতকে কুরআন-হাদীসের মতভেদহীন নির্দেশনাগুলোর উপরে স্থান দেওয়া যাবে না। যারা মতভেদহীন নির্দেশনাগুলো পালন করছেন তাদেরকে ইজতিহাদী মতভেদের কারণে ঘৃণা করা যাবে না কখনোই ইজতিহাদী মতভেদকে ঘৃণা বা ভালবাসার ভিত্তি বানানো যাবে না। বরং নিজ মত ও ভিন্ন মত উভয় ক্ষেত্রে ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে ভালবাসতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) আল্লাহর জন্য ভালবাসা একান্তই মুমিনের নিজের আমল। এদ্বারা মুমিন নিজে লাভবান হন, সাওয়াব পান এবং মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত ও বেলায়াত বৃদ্ধি পায়। যাকে ভালবাসা হলো তিনি প্রকৃতই ভালবাসার উপযুক্ত কিনা, তিনি প্রকৃতই আল্লাহর নিকট "মাকবূল" কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

(২) আল্লাহর জন্য ভালবাসার ন্যূনতম পর্যায় প্রকাশ্য শিরক- কুফরে লিপ্ত নয় এরূপ সকল মুমিনকে ঈমানের কারণে ভালবাসা। তাদের পাপের প্রতি ঘৃণা-সহ তাদের ঈমানের মূল্যায়ন করতে হবে। যারা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত সুস্পষ্ট কবীরা গোনাহে লিপ্ত পাপের কারণে তাদের সাহচর্য, তাদের সাথে সামাজিক ও আন্তরিক সুসম্পর্ক পরিত্যাগ করতে হবে। তবে তাদেরকে অমুসলিমদের মত শত্রু মনে করার প্রবণতা পরিত্যাগ করতে হবে। তাদের জন্য দুআ করতে হবে এবং তাদের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

(৩) আল্লাহর জন্য ভালবাসার সাধারণ পর্যায় দলমত নির্বিশেষ নেক আমল ও সুন্নাত অনুসরণে সচেষ্ট সকল মুমিন ও আলিমকে বিশেষভাবে ভালবাসতে হবে। তাদের কোনো মত বা কর্ম ভুল বা পাপ বলে মনে হলে তাদের হেদায়াত ও তাওফীকের জন্য দুআ করতে হবে। এ সকল ভুলের কারণে তাদের ঈমান ও নেক আমলকে অস্বীকার করার অর্থ নিজের ইজতিহাদী মতকে কুরআন ও হাদীসের সুনিশ্চিত বক্তব্যের চেয়ে অধিক শক্তিশালী বলে মনে করা। এতে ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরূপ মানসিকতা পরিহার করতে হবে।

(৪) ইতোপূর্বে আমরা তিনটি বিষয় জেনেছি: **(ক)** "আল্লাহর ওলীগণ"-এর জন্য দুটি শর্ত: ঈমান ও তাকওয়া। দুটিই মূলত অন্তরের বিষয়, বাইরে থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় না; তবে কর্ম ও আচরণের মধ্যে ঈমান ও তাকওয়ার আলামত দেখা যায়। **(খ)** আল্লাহর কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করা ভয়ঙ্কর পাপ ও আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা। **(গ)** ফরয পালনের পাশাপাশি নফল পালনের মাধ্যমে আল্লাহর বেলায়াত অর্জন হয়।

এ বিষয়গুলোকেই "আল্লাহর জন্য ভালবাসার" মানদণ্ড রাখতে হবে। যে ব্যক্তির আমলে ও আচরণে ঈমান ও তাকওয়ার আলামত পাওয়া যায় এবং যিনি ফরযগুলো পালন করেন এবং নফল পালনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যের চেষ্টা করেন তাকেই আল্লাহর

জন্য ভালবাসতে হবে। এরূপ কোনো ব্যক্তির প্রতি সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোনো মতবিরোধের কারণে হৃদয়ে শত্রুতা-বিদ্বেষ পোষণ করা, তার অমঙ্গল কামনা করা, তার সাথে অশোভন আচরণ করা বা তার কুৎসা রটনা করার অর্থ আল্লাহর কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করা। জাগতিক প্রয়োজনে নিজের হক্ক আদায়ের জন্য এরূপ ব্যক্তির সাথে বিরোধিতা করা খুবই স্বাভাবিক। মতবিরোধের ক্ষেত্রে তার মতের সমালোচনা করাও খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এরূপ বিরোধিতার কারণে তার প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষ পোষণ, কুৎসা রটনা বা অশোভন আচরণ করা বৈধ নয়। এতে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার মত ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে।

(৫) আল্লাহর জন্য ভালবাসার সর্বোচ্চ পর্যায়, যে সকল আবিদ ও আলিমকে ঈমান, তাকওয়া ও সুন্নাত অনুসরণে বিশেষ অগ্রগণ্য বলে মনে হয় সকল দলীয়, মাযহাবী ও ইজতিহাদী মতপার্থক্যের উর্ধ্বে তাদেরকে বিশেষভাবে ভালবাসতে হবে। মাঝে মাঝে একান্তই আল্লাহর জন্য তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতে হবে। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে এরূপ নেককার মানুষদের সাথে কিছু সময় মাজলিসে আখিরাতের আলোচনায় কাটাতে হবে। গীবত, নামীমা, অহঙ্কার, হিংসা ও সকল পাপমূলক আলোচনা থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) মহব্বত, তাকওয়া, তাওবা ও আখিরাতমুখিতা বৃদ্ধিমূলক আলোচনায় সময় কাটাতে হবে।

(৬) কাছে বা দূরে, দেশে বা বিশ্বের কোথাও কোনো আলিম বা দায়ীর পরিচয় জানলে ইজতিহাদী মত ও অন্যান্য বিষয়ের অনুভূতি হৃদয় থেকে দূর করে তাঁর দীনদারী ও আল্লাহর দীনের প্রতি তার ভালবাসা ও কর্মকাণ্ডকে বড় করে দেখে তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসুন। ভালবাসার অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত করুন এবং তার জন্য দুআ করুন। সম্ভব হলে তাকে ভালবাসার কথা জানান। কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসার কথা বললে তার জন্য দুআ করুন।

(৭) বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সাধারণভাবে আবেগনির্ভর। আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও শত্রুতার ক্ষেত্রেও তা ক্রমান্বয়ে আবেগে পরিণত হয়। তবে মুমিনের উচিত আবেগকে সাধ্যমত নিয়ন্ত্রণ করে ঈমানী দিকটিকে মনের মধ্যে জাগরুক করা। যাকে ভালবাসব তার ঈমান ও তাকওয়ার কমতি বা বৃদ্ধি হলে যেমন আমি সচেতনভাবে ভালবাসা কমিয়ে বা বাড়িয়ে ঈমানী ভালবাসার সাওয়াব পেতে পারি। অনুরূপভাবে যাকে আংশিক বা পূর্ণ অপছন্দ করব তার মধ্যে ঈমান ও তাকওয়ার আলামত পেলে তাকে ভালবাসতে হবে। এভাবে ভালবাসা ও ঘৃণার মধ্যে সচেতন ঈমানী অবস্থা বিদ্যমান থাকবে। সামগ্রিকভাবে সকল ক্ষেত্রে আবেগের আতিশয্য বর্জনের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

"তোমার বন্ধুকে বা পছন্দনীয় ব্যক্তিকে তুমি সহজভাবে ভালবাস; হতে পারে একদিন সে অপছন্দনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হবে। আর তোমার অপছন্দের ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষে তুমি সহজ হও; হতে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু ও পছন্দনীয় হয়ে যবে।" হাদীসটি সহীহ।[১]

(৮) কাউকে আল্লাহর জন্য ভালবাসতে পারলে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তা জানানো এবং কেউ এরূপ ঈমানী ভালবাসার কথা জানালে 'আহাব্বাকাল্লাহু... আল্লাহ আপনাকে ভালবাসুন..' বলে তার জন্য দুআ করা সুন্নাত। মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ إِيَّاهُ (أَنَّهُ يُحِبُّهُ)

"যদি তোমাদের কেউ তার ভাইকে ভালবাসে তবে সে যেন তাকে তা জানায়, যে সে তাকে ভালবাসে।" হাদীসটি সহীহ।[২]

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেনঃ একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ছিলেন। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে গমন করেন। তখন তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি এ (গমনরত) লোকটিকে ভালবাসি।' তিনি বলেনঃ 'তুমি কি তাকে তা জানিয়েছ?' লোকটি বলেঃ 'না।' তিনি বলেনঃ 'তুমি তাকে তা জানাও।' তখন লোকটি গমনরত লোকটির কাছে যায় এবং বলেঃ 'আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি।' তখন তিনি বলেনঃ

أَحَبَّكَ (اللهُ) الَّذِى أَحْبَبْتَنِى لَهُ (فِيهِ)

"আল্লাহ আপনাকে ভালবাসুন, যার জন্য আপনি আমাকে ভালবেসেছেন।" হাদীসটি হাসান।[৩]

সুপ্রিয় পাঠক, প্রথমে যে কথাটি বলেছি সে কথাই আবার শেষে বলছি। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, "আল্লাহর জন্য ভালবাসা" একান্তই আপনার ইবাদত। এ ইবাদতের উদ্দেশ্য নিজের আমিত্ব, বড়ত্ব, নিজের মত, ইজতিহাদ সবকিছুকে ছোট করে আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদাকে হৃদয়ের মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর করা। এ ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে খুশি করা। যাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসছেন তাকে প্রকৃতই "মাকবূল" হতে হবে এমন নয়। মূল কর্ম "আল্লাহর জন্য ভালবাসা"। উক্ত ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য, তাকওয়া ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের প্রকাশ দেখে আপনি তাকে ভালবেসেছেন। এতেই আপনি কাঙ্খিত ফলাফল লাভ করেছেন। উক্ত 'ভালবাসিত' ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকট কিরূপ তা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাহ্যিক আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে

ভালবাসার হ্রাসবৃদ্ধি হবে।

বিশর হাফী নামে প্রসিদ্ধ বিশর ইবনুল হারিস ইবনু আব্দুর রাহমান বাগদাদী (১৫২-২২৭) তৃতীয় হিজরী শতকের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তিনি তাঁর ইবাদত ও আখিরাতমুখিতার জন্য খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক মানুষই তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন:

رجل أحب رجلا على خير توهمه، لعل المحب قد نجا، والمحبوب لا يدرى ما حاله

"একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মধ্যে নেকি ও কল্যাণ আছে কল্পনা করে তাকে ভালবাসে। যে ভালবাসে সে হয়ত নাজাত পেয়ে যাবে। কিন্তু যাকে ভালবাসা হলো তার কী পরিণতি হবে তা সে নিজেই জানে না।"[১]

২. ৮. সাহচর্য ও বন্ধুত্ব

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল। চারিপাশের মানুষগুলোই মূলত তার মানসিকতা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। এজন্য সহচর ও বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা মূলত ঈমান সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির সতর্কতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ

"তুমি মুমিন ছাড়া আর কারো সাথে মিশবে না এবং তোমার খাদ্য মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন না খায়।" হাদীসটি হাসান।[২]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

"বন্ধুর ধর্মই মানুষের ধর্ম; কাজেই তোমাদের কেউ কারো সাথে বন্ধুত্ব করলে সে যেন দেখেশুনে বিবেচনা করে তা করে।" হাদীসটি হাসান।[৩]

আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ (بَدَنَكَ أَو) ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً »

সৎ সহচর ও অসৎ সহচর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপর। আতর বিক্রেতা তোমাকে আতর দিবে, অথবা তুমি আতর ক্রয় করবে, অথবা তার কাছে তুমি সুন্দর গন্ধ পাবে। আর হাপরের ফুঁকদাতা তোমার শরীর অথবা পোশাকে আগুন লাগাবে অথবা তুমি দুর্গন্ধ পাবে।"[৪]

পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যাচাই করতে পারি না। ভাল ও মন্দ সকলের সাথেই আমাদের সম্পর্ক রাখতে হয়। তবে বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। শিরক, বিদআত, কুফর ও পাপাচারে লিপ্ত কোনো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব সতর্কতার সাথে বর্জন করতে হবে। এরূপ মানুষদের সাথে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া একত্রে অবস্থান ও আড্ডা বর্জন করতে হবে। কারণ এতে নিজের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পাপের বিষবাষ্প মুমিনের হৃদয়ে প্রবেশ করে। যে মুমিন নিজে পাপে লিপ্ত তারও দায়িত্ব অন্য পাপীদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক না রাখা। এতে তিনি অন্যান্য পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পাবেন এবং নিজের পাপ থেকে তাওবা করা তার জন্য সহজ হবে।

পাপীদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব বর্জন করার পাশাপাশি নেককার মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব এবং সাহচর্যের সম্পর্ক গড়ে তোলা খুবই জরুরী। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিৎ:

(ক) সাহচর্য চার পর্যায়ের: (১) আল্লাহর সাহচর্য, (২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহচর্য, (৩) সাহাবীগণের সাহচর্য ও (৪) নেককার মানুষদের সাহচর্য।

(খ) মহান আল্লাহ বলেছেন: 'তিনি তোমাদের সাথে তোমরা যেখানেই থাক না কেন (হাদীদ: ৪), 'আল্লাহ মুমিনদের সাথে' (আনফাল: ১৯), 'আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে (বাকারা: ১৯৪, তাওবা ৩৬, ১২৩), 'যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা নেককর্মশীল আল্লাহ তাদের সাথে' (নাহল: ২৮), 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে' (বাকারা: ১৫৩, আনফাল: ৪৬)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: 'ইহসান (সৌন্দর্য, পূর্ণতা বা ইখলাস) এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; কারণ তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।'[৫] মহান আল্লাহর এ সাহচর্য সর্বদা অনুভবের গভীরতা-ই আল্লাহর নৈকট্য বা বেলায়াতের গভীরতা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন ও সার্বক্ষণিক যিকর-এর মাধ্যমে এ ঈমান গভীর হয়। এভাবেই মুমিন ইহসান বা সৌন্দর্য, পূর্ণতা ও ইখলাসের চূড়ায় পৌছান।

(গ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভের জন্য আমাদের একমাত্র উপায় তাঁর হাদীস, সীরাত ও শামাইল অধ্যয়ন, আলোচনা, তাঁর প্রতি দরূদ-সালাম পাঠে যথাসম্ভব বেশি সময় কাটানো এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাত জানা ও মানার জন্য সচেষ্ট থাকা। সাহাবীগণের সাহচর্য লাভের জন্য আমাদের সহীহ সনদনির্ভর সাহাবীগণের জীবনী অধ্যয়ন ও আলোচনা করা দরকার।

(ঘ) উপরের তিন প্রকার সাহচর্য একদিকে সহজ; কারণ অন্য কোনো মানুষের সহযোগিতা ছাড়াই মুমিন ইবাদত-বন্দেগি, যিকর, দুআ, কুরআন, তাফসীর, হাদীস, সীরাত, সাহাবীচরিত ইত্যাদি বইপত্র কিনে ও পড়ে এ সাহচর্য লাভ করতে পারেন। পাশাপাশি এরূপ সাহচর্য লাভ করা কঠিন; কারণ মানবীয় দুর্বলতার কারণে একাকী এ সকল ইবাদত করা কঠিন ও ক্লান্তিকর মনে হয়। সাধারণত মুমিন অল্পতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। নেককার মানুষদের আল্লাহ জন্য ভালবাসা এবং তাদের সাহচর্যে কিছু সময় কাটানো উপরের সকল প্রকারের সাহচর্য সহজ ও গভীর করে।

(ঙ) প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব নিজের চারিপাশে একটি ঈমানী পরিমণ্ডল তৈরি করা। আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও বন্ধুত্ব নিয়ে পরস্পরে সাক্ষাৎ করা, কিছু সময় একত্রে কাটানো, দীনী আলোচনা বা আল্লাহর যিকরে কিছু সময় রত থাকা মুমিনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এতে ঈমান উজ্জীবিত হয়, মন আখিরাতমুখি হয়, পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আবেগ তৈরি হয় এবং ইলম বৃদ্ধি পায়। এজন্য হাদীস শরীফে এরূপ সাক্ষাৎ, সাহচর্য ও মাজলিসের বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

মুআয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ বলেন:

وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ.

"যারা আমার জন্যই একে অপরকে ভালবাসে, আমার জন্যই একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে, আমার জন্যই একে অপরের জন্য খরচ করে এবং আমার জন্যই একে অপরের সাথে বৈঠক বা মাজলিস করে তাদের জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব হয়ে যায়।" হাদীসটি সহীহ।[১]

আবূ দারদা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقْوَاماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ (النُّوْرِ) يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ (يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ) (عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ) لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ (وَلاَ صِدِّيْقِيْنَ) فَجَثَى أَعْرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ جَلِّهِمْ (انْعَتْهُم) لَنَا نَعْرِفْهُمْ قَالَ هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ اللهِ (بِجَلاَلِ اللهِ) مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَبِلاَدٍ شَتَّى (مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلاَ أَنْسَابٍ) يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُوْنَهُ (فَيَنْتَقُوْنَ أَطَايِبَ الْكَلاَمِ كَمَا يَنْتَقِيْ آكِلُ التَّمْرِ أَطَايِبَهُ)

"মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন এমন কিছু মানুষকে উত্থিত করবেন যাদের মুখমণ্ডলগুলো হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা মনিমুক্তার (নূরের) মিম্বরের উপর অবস্থান করবেন। মহান আল্লাহর সাথে তাদের নৈকট্য ও তাদের মর্যাদার কারণে মানুষেরা তাদের ঈর্ষা করবেন (নবীগণ ও শহীদগণও তাদের ঈর্ষা করবেন), তবে তারা নবী নন, শহীদও নন (সিদ্দীকও নন)। তখন একজন বেদুঈন হাটু গেড়ে বসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কাছে তাদের বিবরণ প্রকাশ করুন যেন আমরা তাদেরকে চিনতে পারি। তিনি বলেন: তারা বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠী ও বিভিন্ন দেশের মানুষ, তারা একে অপরকে শুধু মহান আল্লাহর জন্য (মহান আল্লাহর মর্যাদায়) ভালবাসেন (রক্ত, বংশ বা জাগতিক সম্পর্ক তাদের একত্রিত করে না), তারা আল্লাহর যিকরের জন্য একত্রিত হন, আল্লাহর যিকর করেন। এজন্য তারা পবিত্র-সুন্দর কথাগুলো বাছাই করেন, যেমন খেজুর ভক্ষণকারী ভালভাল খেজুর বেছে নেন।"[২]

এ হাদীসটির সমার্থক অনেকগুলো হাদীস বিভিন্ন সহীহ ও হাসান সনদে আমর ইবনু আম্বাসা (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা), আবূ হুরাইরা (রা), উমার ইবনুল খাত্তাব (রা), আবূ মালিক আশআরী (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত এবং সুনান তিরমিযী, সুনান আবী দাউদ, সুনান ইবন মাজাহ, সুনান নাসায়ী, মুসনাদ আহমদ, মুস্তাদরাক হাকিম ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সংকলিত। এভাবে এ হাদীসটি অর্থগতভাবে প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের।[৩]

সম্মানিত পাঠক, আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ঈমান ও তাকওয়ার সংরক্ষণ এবং আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের জন্য নিজেদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এরূপ একটি ঈমানী পরিমণ্ডল তৈরি করা। সর্বাগ্রে নিজের পরিবারের মধ্যে এরূপ পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী, পিতামাত ও সন্তানগণ একত্রে কিছু সময় কুরআন-হাদীস পাঠ ও অর্থালোচনা, ইসলামী বই পড়া, অনুষ্ঠান দেখা অথবা বাড়িতে কোনো নেককার আলিমকে এনে পরিবারের কিছু সময় দীনী আলোচনায় কাটানোর দরকার। এতে ঈমান, তাকওয়া ও বেলায়াত বৃদ্ধি ছাড়াও পারিবারিক ভালবাসা, সৌহার্দ্য ও আনন্দ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নিজ এলাকার নেককার কিছু মানুষের সাথে দৈনিক অথবা অন্তত সাপ্তাহিক কিছু সময় এরূপ মাজলিস করার চেষ্টা

করুন। দল, মত বা সামাজিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে শুধু তাকওয়ার অবস্থার দিকে লক্ষ্য দিয়ে মাজলিসের সাথী নির্বাচন করুন। তৃতীয় পর্যায়ে কাছের বা দূরের কিছু নেককার আলিমদের সাহচর্যে সপ্তাহে, মাসে বা অনিয়মিতভাবে কিছু সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। সকল পর্যায়ের সাহচর্য ও মাজলিসে পরিবারের সদ্যস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকুন। **যিকরের মাজলিস বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আমরা এ বইয়ের শেষ অধ্যায়ে দেখব, ইনশা আল্লাহ।**

২. ৯. ভালবাসা, সাহচর্য ও পীর-মুরিদী

সম্মানিত পাঠক, আল্লাহর জন্য ভালবাসা, সাহচর্য ও মাজলিসের ইবাদত পালনের জন্যই পীরমুরিদী ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। পীর-মুরিদী বিষয়ক সুন্নাত, খেলাফে সুন্নাত, বিদআত ও শিরক-কুফর বিষয়াদি আমি অন্যান্য গ্রন্থে আলোচনা করেছি। 'এহইয়াউস সুনান' গ্রন্থে[১], 'ফুরফুরার পীর আবূ জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযূআত' গ্রন্থের পর্যালোচনায়[২], 'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা গ্রন্থে[৩] এবং 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে 'আউলিয়া কিরাম ও বেলায়াত বিষয়ক' জাল হাদীস প্রসঙ্গে এ সকল বিষয় আলোচনা করেছি। মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক-এর 'তাসাউফ (পীর-মুরীদি) তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' গ্রন্থটিতে এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠককে গ্রন্থগুলো পড়তে সবিনয়ে অনুরোধ করছি। এখানে অতি-সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

প্রথম বিষয়: সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীগণের যুগে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে 'পীর' বা 'শাইখ' হিসেবে গ্রহণ করার কোনো প্রচলন ছিল না। তাঁরা সকল নেককার মানুষকে আল্লাহর জন্য ভালবাসতেন, কিছু মানুষকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন এবং তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। কিন্তু কখনোই একজনকে নির্দিষ্ট করতেন না। সাহচর্য গ্রহণের নামে 'বাইয়াত' গ্রহণ করার কোনোরূপ প্রচলন তাদের মধ্যে ছিল না। তারা উন্মুক্ত সাহচর্য গ্রহণ করতেন। আবূ নুআইম ইসপাহানীর হিলইয়াতুল আওলিয়া ও ৪র্থ শতকের তাসাউফ বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থে উমার ইবন আব্দুল আযীয, হাসান বসরী, ইবন সিরীন, সুফইয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইবরাহীম ইবনুল আদহাম, বিশর আল-হাফী, যুন্নুন মিসরী, হারিস মুহাসিবী, জুনাইদ বাগদাদী ও 'সূফী' হিসেবে প্রসিদ্ধ অন্যান্যদের জীবনী অধ্যয়ন করলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন। ৪র্থ-৫ম হিজরী শতক থেকে একজন নির্দিষ্ট নেককার মানুষের সাহচার্য গ্রহণের প্রবণতা বাড়তে থাকে। তবে তখনও 'বাইয়াত' পদ্ধতি ছিল না। আরো কয়েক শত বৎসর পরে বাইয়াতের মাধ্যমে পীর-মুরীদি পদ্ধতির প্রচলন হয়।

দ্বিতীয় বিষয়: উপরের বইগুলো থেকে পাঠক জানতে পারবেন যে, মুজাদ্দিদ আলফ সানী, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী-সহ ভারতের ও বিশ্বের প্রসিদ্ধ সূফী আলিমগণ একমত যে, 'পীরের মুরিদ হওয়া' ইবাদত নয়; উপকরণ মাত্র। ঈমান ও তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে বেলায়াত লাভের জন্য এটি সহায়ক উপকরণ। মুমিনের বেলায়াত নির্ভর করবে তার ঈমান ও তাকওয়ার গভীরতার উপরে, মুরীদ হওয়ার উপরে নয়। মুরীদ হয়ে বা না হয়ে, নির্দিষ্ট একজনের সাহচার্য নিয়ে বা বিভিন্ন মানুষের সাহচার্য নিয়ে মুমিন বেলায়াত অর্জন করতে পারেন।

বিষয়টি অনেকটা মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার মতই। মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়া কোনো ইবাদত নয়; ইলম শিক্ষা করা ইবাদত। মাদ্রাসায় ভর্তি না হয়ে বিভিন্ন আলিমের মজলিসে যেয়ে, বাড়িতে বইপত্র পড়ে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে ইলম শিক্ষা করলেও মুমিন একইরূপ সাওয়াব লাভ করবেন। তবে মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়াকে 'ইবাদত' বা ইবাদতের অংশ মনে করলে তা বিদআতে পরিণত হবে। অর্থাৎ কেউ যদি মনে করেন যে, ইলম শিক্ষা করি বা না করি মাদ্রাসায় ভর্তি হলেই ইবাদত পালন হয়ে গেল, অথবা মাদ্রাসায় ভর্তি না হয়ে বিভিন্ন আলিমের বাড়িতে বা দরসে যেয়ে বা অন্যভাবে যতই ইলম অর্জন করুক ইলম শিক্ষার ইবাদত এতে পালিত হবে না তবে তিনি বিদআতে লিপ্ত।

তৃতীয় বিষয়: 'রাহে বেলায়াত' রচনা করা হয়েছে মহান আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের সুন্নাত পদ্ধতি আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কর্ম বা পদ্ধতির সমর্থন বা খণ্ডন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ঈমানী সাহচর্যের জন্য এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের আলোকে নিষিদ্ধ বা আপত্তিকর নয়। নেককার মানুষের অভাব, আস্থার সংকট ইত্যাদি কারণে মুমিন এরূপ নির্ধারণে বাধ্য হতে পারেন। তবে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ীগণের হুবহু অনুকরণে সাধ্যমত একাধিক নেককার মানুষকে আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ বেলায়াতের পথে অধিক সহায়ক। এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করলে সাহচর্যের সকল বরকত লাভের পাশাপাশি ভালবাসা অতিভক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া যে কোনো নেককার মানুষের মধ্যেই কিছু ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতা থাকে। নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির সাহচর্য গ্রহণ করলে এ সকল ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতা অনুসারীর মধ্যেও প্রবেশ করে।

পক্ষান্তরে একাধিক নেককার মানুষের সাহচর্য গ্রহণ করার মধ্যে অতিরিক্ত কয়েকটি কল্যাণ বিদ্যমান। যেমন: সাহাবী-তাবিয়ীগণের সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ, অতিভক্তির প্রবণতা রোধ এবং একাধিক নেককারের সাহচার্যের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতাগুলো থেকে মুক্ত হওয়া। পাশাপাশি এক্ষেত্রে মুমিনের হৃদয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর মহব্বত অধিক থাকে। কারণ এক্ষেত্রে মুমিন অনুভব করেন যে, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য বিভিন্ন মানুষের সাহচর্য গ্রহণ করছেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 'মুরীদ' এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তার উদ্দেশ্য বা 'মুরাদ'। নেককার মানুষগণ তার সাথী, সহচর ও উস্তাদ; তাঁরা কেউ তাঁর 'মুরাদ' বা উদ্দেশ্য নন।

২. ১০. ভালবাসা, শিক্ষা ও দুআর জন্য সাক্ষাৎ

আমরা অনেক সময় নিজেদের সমস্যা বা অসুবিধার জন্য কোনো পীর, বুজুর্গ বা আলিমের কাছে গমন করি। এরূপ গমন, সাক্ষাৎ ও দুআ চাওয়া নিষিদ্ধ নয়। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দুআ চাইতেন। তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দুআ চাইলে তাঁরা দুআ করতেন। এক ব্যক্তি আনাস (রা) -এর কাছে এসে দুআ চায়। তিনি বলেন: "আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।" (হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।) ঐ ব্যক্তি বার বার দুআ চাইলে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন।[১]

অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সময় অনেক সাহাবীর কাছে দুআ চাইলে দুআ করতেন না, কারণ এতে মানুষ দুআ চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে। এক ব্যক্তি খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে চিঠি লিখে দোয়া চায়। তিনি উত্তরে লিখেন :

إِنِّيْ لَسْتُ بِنَبِيٍّ، وَلَكِنْ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ لِذَنْبِكَ

"আমি নবী নই (যে তোমাদের জন্য দুআ করব বা আমার দুআ কবুল হবেই), বরং যখন নামায কায়েম করা হবে (বা নামাযের ইকামত দেওয়া হবে), তখন তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।"[২]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) সিরিয়ায় গেলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে দুআ প্রার্থনা করে বলেন: আপনি দুআ করেন, যেন আল্লাহ আমার গোনাহ ক্ষমা করেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এরপর অন্য একজন এসে একইভাবে দুআ চান। তখন তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন, আগের ঐ ব্যক্তিকেও ক্ষমা না করুন! আমি কি নবী? (যে সবার জন্য দুআ করব বা আল্লাহ আমার দুআ কবুল করবেনই)।[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত সকল অবস্থায় সদা সর্বদা নিজের জন্য নিজে মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করা। পাশাপাশি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে একে অপরের মাসনূন দুআদি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কারো কাছে দুআ চাওয়া, সাহাবী বা তাবেয়ীগণের মধ্যে পরস্পরের দুআ চাওয়া, বা তাবেয়ীগণ কর্তৃক সাহাবীগণের নিকট দুআ চাওয়ার ঘটনা খুবই কম।[৪]

অন্যের কাছে দুআ চাওয়া পরিত্যাগ করলে কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু যদি কেউ চিন্তা করে যে, অমুক ব্যক্তি দুআ করলেই আল্লাহ কবুল করবেন বা অমুক ব্যক্তির দুআই বিপদ উদ্ধারের কারণ তাহলে সে অতিভক্তি বা শিরকের মধ্যে নিপতিত হয়ে যাবে। অথবা বুজর্গগণের নিকট দুআ চাওয়ার জন্য যদি কেউ নিজের জন্য নিজে দুআ করার মাসনূন রীতি পরিত্যাগ করে, কোনো বিপদ, পাপ বা সমস্যায় পতিত হলেই দৌড়ে নেককার মানুষদের কাছে চলে যায় তবে সে শুধু বিদ'আতেই লিপ্ত হবে না, উপরন্তু অফুরন্ত সাওয়াব ও মহান প্রভুকে আবেগভরে ডাকার বা প্রার্থনা করার অশেষ সাওয়াব, বরকত ও আত্মিক প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কোনো একটি হাদীসে সামান্যতম উল্লেখ নেই যে, কারো কাছে দুআ চাওয়ার জন্য গমন করলে সামান্যতম কোনো সাওয়াব বা বরকত লাভ হয়। পক্ষান্তরে যদি কেউ আল্লাহর জন্য ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেখা করা বা সালাম দেওয়ার জন্য কোনো কারো কাছে গমন করেন তবে তিনি উপরের হাদীসগুলোতে বর্ণিত অফুরন্ত সাওয়াব, বরকত, আল্লাহর ভালবাসা ও আখিরাতে ছায়া লাভের যোগ্যতা অর্জন করবেন। অনুরূপভাবে যদি কেউ দীনের বা কুরআন-সুন্নাহর কোনো মাসআলা বা ইলম শিক্ষার জন্য গমন করেন তাহলেও তিনি অফুরন্ত সাওয়াব ও বরকত অর্জন করবেন। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইলম শিখতে বা জানতে যে ব্যক্তি পথ চলে সে প্রতি পদক্ষেপে অগণিত সাওয়াব লাভ করে, বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সে জিহাদের সাওয়াব লাভ করে, তার জন্য ফিরিশতাগণ তাঁদের পাখাগুলো বিছিয়ে দেন এবং সকল সৃষ্টি দুআ করতে থাকে। এ বিষয়ক কয়েকটি হাদীস আমরা কুরআন শিক্ষার ফযীলত প্রসঙ্গে দেখেছি।

এজন্য পাঠকের কাছে আমার অনুরোধ, আপনি যাকে 'নেককার' বা 'আল্লাহর প্রিয়' বলে মনে করেন দুআ চাওয়ার উদ্দেশ্যে তার কাছে যাবেন না। দীনের কোনো আমল, মাসআলা বা তাকওয়া বিষয়ক পরামর্শ বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাবেন। অথবা একান্তই আল্লাহর জন্য ভালবাসা নিয়ে দেখা করা ও সালাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাবেন। সাক্ষাতের সময় মাসনূন সালাম, মুসাফাহা ও কথাবার্তার মধ্যে মাসনূন দুআগুলো বললেই সকল দুআ হয়ে যায়। তারপরও ইচ্ছা করলে প্রসঙ্গত দুআ চাইবেন। তবে শুধু দুআ চাওয়ার জন্য কখনোই কারো কাছে যাবেন না। চেষ্টা করবেন দুআ চাওয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করে শুধু ভালবাসা ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেখা করতে যাওয়ার। মহান আল্লাহ মনের অবস্থা দেখেন। তিনি আপনাকে তদনুসারে সাওয়াব প্রদান করবেন।

২. ১১. যিক্‌রের আদব

যিকরের কিছু আদব রয়েছে। আদব পালন করতে না পারার অর্থ এ নয় যে, যিক্‌র বন্ধ করতে হবে বা এ অবস্থায় যিক্‌র করলে পাপ হবে। বরং মুমিন সর্বাবস্থায় যিক্‌রে রত থাকবেন এবং সাধ্যমত আদবগুলো পালনের চেষ্টা করবেন।

২. ১১ ১. যিকিরের ওযীফা তৈরি করা

"ওযীফা" অর্থ নিয়মিত বা নির্ধারিত কর্ম, নির্ধারিত কর্ম তালিকা, দৈনন্দিন কর্ম ইত্যাদি। মুমিন নিজের জন্য প্রতিদিনের যে সকল কর্ম পালনের নির্ধারিত তালিকা বা কর্মসূচী তৈরি করেন তাকেই 'ওযীফা' বলা হয়।

বিভিন্ন হাদীসে আমরা বিভিন্ন প্রকার যিকির ও ইবাদতের ফযীলতের কথা জানতে পারি। স্বভাবত অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে সকল প্রকার নেক আমল সবসময় করা সম্ভব হয় না। তবে যিকির বা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো ফযীলতের বিষয়ে সহীহভাবে জানতে পারলে অন্তত একবার হলেও পালন করা মুমিনের কর্তব্য। এরপর যথাসম্ভব তা পালনের চেষ্টা করতে হবে।

এ ধরনের সাময়িক কর্ম মুমিনের জীবনের মূল নিয়ম হবে না। মূল নিয়ম হবে নিয়মিত কর্ম। মুমিনের দায়িত্ব হলো মাসনূন যিকির আযকারের মধ্য থেকে নিজের সময়, সুযোগ ও ক্বলবের হালতের দিকে লক্ষ্য রেখে একেবারে কম না হয় আবার সাধ্যের বাইরে চলে না যায় এমনভাবে নিজের জন্য সুনির্দিষ্ট ওযীফা বা নির্ধারিত যিকিরের তালিকা ও কর্মসূচি তৈরি করে নিতে হবে। মাঝে মাঝে অনেক যিকির বা ইবাদত করে আবার মাঝে মাঝে একেবারে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে অল্প হলেও নির্ধারিত ওযীফা নিয়মিত পালন করা উত্তম। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلاً أَثْبَتُوهُ

"হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো নফল আমল গ্রহণ কর; কারণ তোমরা ক্লান্ত না হলে আল্লাহ ক্লান্ত হবেন না। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম হলো যে কর্ম নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম হয়। আর মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিজনের (তিনি ও তাঁর আপনজনদের) নিয়ম ছিল কোনো আমল শুরু করলে তা স্থায়ী রাখা।"[১]

অসংখ্য সাহাবী-তাবেয়ীর জীবন থেকে আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাই। তাঁরা তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত, দোয়া, সালাত পাঠ, চাশ্‌ত, তাসবীহ তাহলীল ও অন্যান্য যিকিরের একটি নির্দিষ্ট ওযীফা নিজেদের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। এর বাইরে তাঁরা সর্বদা অনির্ধারিতভাবে আল্লাহর যিকিরে তাঁদের জিহ্বা আর্দ্র রাখতেন।[২] ইতঃপূর্বে আমি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি। আমাদেরও এভাবে কিছু যিকির নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত। অতিরিক্ত যিকির হবে অনির্ধারিত ও অগণিত।

২. ১১. ২. ওযীফা নষ্ট না করা

নির্ধারিত যিক্‌র যথাসময়ে পালন করার চেষ্টা করতে হবে। কোনো অসুবিধার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পালন সম্ভব না হলে পরবর্তী সময়ে তা আদায় (কাযা) করার চেষ্টা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সাহাবীগণ এধরনের নির্ধারিত যিক্‌র, দু'আ ও তিলাওয়াত পালন করতেন রাত্রে একাকী। তাহাজ্জুদের সালাত ও এসকল যিক্‌র, তিলাওয়াত ও দু'আয় তাঁরা রাত্রের অধিকাংশ সময়, বিশেষত শেষ রাত ব্যয় করতেন। উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

"যে ব্যক্তি তার নির্ধারিত ওযীফা পালন না করে ঘুমিয়ে পড়বে, সে যদি তা ফজর ও যোহর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয় তাহলে সে যথাসময়ে রাতের বেলায় আদায় করার সাওয়াব পাবে।"[৩]

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) নিয়মও তাই ছিল। আয়েশা (রা) বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো আমল করলে তা স্থায়ী (নিয়মিত) করতেন। তিনি কখনো ঘুম বা অসুস্থতার কারণে রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারলে দিনের বেলায় ১২ রাক'আত সালাত আদায় করতেন।"[৪]

২. ১১. ৩. যিক্‌রে মনোযোগ

যিক্‌রের সময় হৃদয় ও জিহ্বাকে একত্রিত করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হবে। মুখে যা উচ্চারণ করতে হবে মনকে তার অর্থের দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে। যিক্‌রের শব্দের সাথে হৃদয়কে আলোড়িত করতে হবে। সর্বোত্তম যিক্‌র হলে – যা মুখে ও মনে একত্রে উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের যিক্‌র – শুধু মনের যিক্‌র। তৃতীয় পর্যায়ের যিক্‌র– শুধু মুখের যিক্‌র। অনেক সময় যাকিরের মনে ওয়াসওয়াসা আসে যে, চলতে ফিরতে, গাড়িতে, মাজলিসে বা জনসমক্ষে মুখের যিক্‌র করলে রিয়া হবে বা মানুষ রিয়াকারী বলবে, কাজেই শুধু মনে যিক্‌র করি। এ চিন্তা অর্থহীন ও যিক্‌র থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানী ওয়াসওয়াসা। যাকিরের দায়িত্ব, নিজের মনকে আল্লাহ-মুখী করা ও রিয়া থেকে পবিত্র করা। সাথে সাথে বেপরোয়াভাবে সর্বদা নিজের জিহ্বাকে যিক্‌রে ব্যস্ত ও আর্দ্র রাখা।

২. ১১. ৪. মনোযোগের উপকরণ: সুন্নাত বনাম বিদ'আত

যিক্র এবং অন্য সকল ইবাদতের প্রাণ মনোযোগ। মনোযোগ একটি মাসনূন ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ মনোযোগ সহকারে যিক্রের সাথে হৃদয়কে আলোড়িত করে ক্রন্দন ও আবেগসহ যিক্র করতেন। এ মনোযোগ ও আবেগ সৃষ্টির জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতি তাঁদের কর্ম থেকে আমরা দেখতে পাই না। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ সহকারে যিক্র করতেন। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলিম, আবিদ বা যাকির মনোযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ সকল পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে যিক্রের অংশে পরিণত হয়ে বিদ'আতে পর্যবসিত হয়।

যেমন, ইমাম নববী বলেন: "যাকিরের জন্য লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ একটু টেনে টেনে এর অর্থ মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে চিন্তা করে যিক্র করা উত্তম।"[১]

এরূপ 'মদ্দ' অর্থাৎ উচ্চারণের দীর্ঘায়ন বা প্রলম্বন কোনো ইবাদত নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ থেকে যিকর ইবাদত পালনের পদ্ধতি হিসেবে এটি বর্ণিত হয়নি। সুন্নাতের আলোকে এরূপ টানার মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই। যিক্রটি মুখে উচ্চারণ করা ও মনে এর অর্থ অনুধাবন ও চিন্তা করা-ই ইবাদত। উচ্চারণ বা অর্থ-চিন্তার প্রয়োজনে যাকির যদি ব্যক্তিগতভাবে একটু থেমে বা প্রলম্বিত করে যিক্র করেন তাহলে এ থামা বা প্রলম্বনের মধ্যে কোনো পাপ বা সাওয়াব নেই, শুধু তবে অনুধাবন ও হৃদয় নাড়ানো ইবাদতের সাওয়াব পাবেন।

তাহলে উচ্চারণ প্রলম্বিত করার কারণে তিনি কোনো পাপ বা সাওয়াব পান নি; তবে এ কর্মটি তার অর্থ অনুধাবনের ইবাদতকে সহায়তা করলে তিনি অর্থ অনুধাবনের গভীরতা অনুসারে সাওয়াব পাবেন। যদি কেউ এভাবে না টেনে স্বাভাবিক বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে সাথে অনুরূপ অনুধাবন ও চিন্তা করতে পারেন তাহলে তিনিও একই সাওয়াব অর্জন করবেন। তবে আমরা দেখেছি যে, যদি টান, প্রলম্বন, দীর্ঘায়ন বা সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বা নিয়মকে কেউ রীতি হিসাবে গ্রহণ করেন অথবা এরূপ কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত কোনো সাওয়াব বা ইবাদত হচ্ছে বলে মনে করেন তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

তাহলে আমরা দেখছি যে, যদি কেউ মনোযোগ অর্জনের জন্য একটু ধীরে লয়ে টেনে টেনে উচ্চারণ প্রলম্বিত করে অথবা চোখ বন্ধ করে, বিশেষভাবে বসে বা উচ্চারণ করে যিক্র করেন তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। এগুলো জায়েয কর্ম। তিনি একটি জায়েয উপকরণ একটি মাসনূন ইবাদত অর্জনের জন্য ব্যবহার করছেন। কিন্তু সমস্যা ত্রিবিধ :

প্রথম সমস্যা: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ এভাবে ধীর ধীরে বা টেনে টেনে উচ্চারণের রীতি অনুসরণ করতেন বলে কোথাও জানা যায় না। তাঁরা ঠোঁট নেড়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারণ করতেন বলে অগণিত হাদীসে আমরা দেখি। কখনো কোনো রকম ব্যতিক্রম উচ্চারণ করলে তা সাহাবীগণ বর্ণনা করতেন। এখন আমরা কোন্ যুক্তিতে তাদের রীতির বাইরে যাব?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ চোখ মেলে দৃষ্টিকে সাজদার স্থানে নিবদ্ধ করে সালাত আদায় করতেন। তাঁরা কখনো চোখ বুজে সালাত আদায় করেছেন বলে আমরা কোথাও বর্ণনা পাচ্ছি না। আমরা জানি যে, চক্ষু বন্ধ করে যিক্র, সালাত, মুরাকাবা ইত্যাদিতে মনোযোগ বেশি আসে। কিন্তু মনোযোগ সৃষ্টির যুক্তিতে কি আমরা চোখ বুজে সালাত আদায় করতে পারব? রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ মনোযোগ অর্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা মনোযোগ সৃষ্টির জন্য এ সকল রীতি অনুসরণ করেননি। আমরা কিভাবে তাকে ভাল বলব?

দ্বিতীয় সমস্যা: প্রয়োজনে ইবাদত পালনের জন্য কোনো জায়েয উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, দাঁড়িয়ে সালাত পড়া ইবাদত। কারো জন্য দাঁড়াতে অসুবিধা হলে তিনি লাঠি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আমরা সবার জন্য লাঠি ব্যবহারের রীতি প্রচলন করতে পারি না। মনোযোগের জন্য দু একবার চোখ বন্ধ করে সালাত আদায়ের অনুমতি কেউ কেউ দিয়েছেন। কিন্তু সর্বদা চোখ বন্ধ করে সালাতের রীতি চালু করা কখনোই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে কোনো যাকির মনোযোগের প্রয়োজনের এ সকল জায়েয উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কিছুকেই রীতিতে পরিণত করা যায় না। কারণ তাতে সুন্নাত পদ্ধতি মৃত্যুবরণ করে এবং তৃতীয় সমস্যাটির উদ্ভব হয়।

তৃতীয় সমস্যা: এরূপ উপকরণের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক আবিদ এক পর্যায়ে উপকরণকে ইবাদতের অংশ মনে করেন। তখন তা বিদ'আতে পরিণত হয়। যেমন, যে ব্যক্তি টেনে টেনে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করছেন তিনি ভাবছেন – যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে তা উচ্চারণ করছে তার ইবাদতটি পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। অথবা একটু টেনে উচ্চারণ করলে ইবাদতটি আরো ভাল হতো।

এখানে তিনটি কর্ম আছে : যিক্রটির উচ্চারণ, মনোযোগ ও ধীর লয়। তিনি তিনটি কাজকেই পৃথক ইবাদত মনে করছেন। প্রথম দুটি অর্জিত হলেও তৃতীয়টির অভাব থাকলে ইবাদতকে অসম্পূর্ণ ভাবছেন। যে কাজটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবাদত বলেননি বা করেননি তাকে তিনি ইবাদত মনে করছেন। অথবা তিনি ভাবছেন যে, এভাবে টেনে না পড়লে মনোযোগ আসতেই পারে না। অর্থাৎ, মনোযোগ অর্জনের একমাত্র উপকরণ এভাবে টেনে উচ্চারণ করা। এভাবে তিনি মনে করছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মতো স্বাভাবিক উচ্চারণের মনোযোগ আসতে পারে না। এ কথার অর্থ ,– 'পরিপূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে ইবাদত করলে ইবাদত পূর্ণ হবে না বা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের ইবাদত পূর্ণ ছিল না!' এভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে বিদ'আতের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করবেন।

আমরা জানি যে, মনোযোগ ও বিনয় সহকারে সালাত আদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হাদীস শরীফে প্রত্যেক সালাতকে জীবনের শেষ সালাত মনে করে ভয়ভীতি ও বিনয় সহকারে আদায় করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এখন একব্যক্তি সালাতের মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য কাফনের কাপড় পরিধান করে বা গলায় বেড়ি পরে সালাত আদায় করতে শুরু করলেন। এক্ষেত্রে তিনি এমন একটি উপকরণ ব্যবহার করছেন যা খেলাফে সুন্নাত বা সুন্নাত-সম্মত নয়। এ উপকরণ কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ ব্যবহার করেননি, যদিও

সালাতের মনোযোগ সৃষ্টির আগ্রহ তাঁদের ছিল সবচেয়ে বেশি। এরপরেও যদি তিনি মাঝেমধ্যে এ উপকরণ ব্যবহার করেন তাহলে হয়ত কেউ কেউ তা মেনে নেবেন বা প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তিনি যদি একে সালাতের অবিচ্ছেদ্য রীতি বানিয়ে নেন তাহলে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আতে পরিণত হবে। তৃতীয় পর্যায়ে যদি তিনি সালাতের জন্য কাফনের কাপড় বা বেড়ি পরিধানকে অতিরিক্ত একটি ইবাদত বলে মনে করেন অথবা এ পোশাক ছাড়া সালাতের মনোযোগ সম্ভব নয় বলে মনে করেন তাহলে তার বিদ'আত আরো পরিপক্কতা লাভ করবে।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য যিক্‌র কেন্দ্রিক কিছু বিভ্রান্তি সমাধানের চেষ্টা করা। যিক্‌রের মনোযোগ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আবিদ বা যাকির বুজুর্গ বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, ঘাড় বা শরীর নাড়ানো, শরীরের বিভিন্ন স্থানের দিকে লক্ষ্য করে যিক্‌র করা, যিক্‌রের শব্দ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের কল্পনা করা, ইত্যাদি। এগুলি সবই খেলাফে সুন্নাত উপকরণ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাঝেমধ্যে এ সকল উপকরণের ব্যবহার অনেকটা চোখ বুজে সালাত আদায়ের মতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এগুলিকে রীতি বানিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এরপর সেগুলোকে ইবাদত বলে মনে করা হয়েছে। এভাবে বিদ'আতের সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে আমাদের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন

(ক) সকল ইবাদত, সাওয়াব ও কামালাতের ক্ষেত্রে একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আমাদেরকে সকল ইবাদতের ও কামালাতের পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত সুন্নাত বা রীতি ও পদ্ধতি শিখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সাহাবীগণ তাঁর সুন্নাত অনুসরণের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। সুন্নাতের মধ্যেই নিরাপত্তা, মুক্তি ও কামালাত। আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে ইবাদতে, উপকরণে, পদ্ধতিতে, প্রকরণে সবকিছুতে সুন্নাতের মধ্যে থাকা।

(খ) রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেননি বা শেখাননি তা-ই খেলাফে সুন্নাত। এক্ষেত্রে বলতে পারব না যে, তিনি তো নিষেধ করেননি। এ কথা বললে আর কোনো সুন্নাতই পালন করা যাবে না। সালাতুল ঈদের আযান দিতে, রামাদান ছাড়া অন্য সময়ে সালাতুল বিত্‌র জামাতে আদায় করতে বা খালি মাথায় সালাত আদায় করতে তিনি নিষেধ করেন নি। এরূপ অগণিত উদাহরণ রয়েছে। ইবাদতের পূর্ণতা অর্জনের আগ্রহ তাঁরই সবচেয়ে বেশি ছিল। ইবাদতের পূর্ণতার পথ শেখানোর দায়িত্বও তাঁরই ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি যা করেননি বা শেখাননি তা বর্জনীয়। 'সুযোগ ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি করেননি' অর্থ – তিনি তা বর্জন করেছেন। এ বিষয়ে আমি "এহ্‌ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

অতএব, কোনো ইবাদত পালনের জন্য সুন্নাতে শেখানো হয়নি এমন কোনো উপকরণ ব্যবহার করা উচিত নয়, বিশেষত যে উপকরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু করেননি তা ব্যবহার করা কখনোই উচিত নয়। একান্ত বাধ্য হলে, সুন্নাত পদ্ধতিতে ও সুন্নাত পর্যায়ের ইবাদত পালনের জন্য কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যায়, তবে তাকে রীতিতে পরিণত করা উচিত নয়। সর্বাবস্থায় সুন্নাতের বাইরে না যাওয়াই আমাদের জন্য মঙ্গল।

(গ) যদি কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাঝে মধ্যে আবেগ, মনের প্রেরণা বা তৃপ্তির কারণে এ ধরনের কোনো উপকরণ 'মনোযোগ' অর্জনের জন্য ব্যবহার করেন তাহলে তা হয়ত আপত্তিজনক হবে না। তবে এগুলোকে রীতিতে পরিণত করা যাবে না।

(ঘ) আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের উদ্দেশ্য এ নয় যে, ইবাদত করে আল্লাহকে কৃতার্থ করে দেব বা তাকে জান্নাত প্রদানে বাধ্য করব বা নির্দিষ্ট কোনো ফলাফল লাভ করব। আমাদের উদ্দেশ্য, আমরা তাঁর করুণা, রহমত ও ক্ষমা চাই এ আবেগটা প্রকাশ করব। সুন্নাতের অনুসরণই মূলত ইবাদত। সুন্নাতের মধ্যে থেকে আমরা যতটুকু ইবাদত করব ততটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুন্নাতের মধ্যে থেকে যতটুকু করতে পারি তাতেই আমাদের চলবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে সালাত, যিক্‌র ইত্যাদি ইবাদত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। মনোযোগ অর্জনের জন্য বিভিন্ন উপায় মানব সমাজে প্রচলিত। যেমন, বনে জঙ্গলে চলে যাওয়া, নির্জন প্রান্তরে যাওয়া, চক্ষু বন্ধ করা, আত্মসম্মোহন করা ইত্যাদি। এ ধরনের কোনো পদ্ধতি তিনি আমাদেরকে শিখিয়ে জাননি। চোখ মেলে, মসজিদে জামাতের সাথে স্বাভাবিক পোশাকে সালাত আদায়ের রীতি শিখিয়ে গিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব সুন্নাতের মধ্যে থেকে যতটুকু সম্ভব মনোযোগ অর্জন করা। এতে যতটুকু হবে তাতেই আমাদের চলবে। এর বেশি এগোতে যাওয়ার অর্থ তার সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা করা। তিনি করেননি বা শেখাননি এমন কোনো উপায় বা উপকরণ দিয়ে ইবাদতকে উচ্চমার্গে নিয়ে যাওয়ার অর্থ তাঁর শিক্ষাকে অপূর্ণ মনে করা। আমরা হয়ত দেখতে পাব যে, অনেক আবিদ বা যাকির চোখবুজে, কাফনের কাপড় পরিধান করে, সালাতের আগে আত্মসম্মোহন করে নিয়ে, মস্তিষ্ককে অটো সাজেশনের মাধ্যমে আলফা বা ডেলটা লেভেলে নিয়ে যেয়ে, গোরস্থানের কাছে যেয়ে, নির্জন প্রান্তরে যেয়ে, মাটির উপরে বা নিচে কবর তৈরি করে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বা এ ধরনের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে সালাত আদায় করে খুবই আনন্দ, তৃপ্তি, মনোযোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করছেন। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি ? মনোযোগ অর্জনের জন্য এ সকল উপকরণ ব্যবহার করা বা এসকল উপকরণকে সালাত আদায়ের সাথে রীতিতে পরিণত করা ? নাকি সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ?

সম্মানিত পাঠক, এ সকল মজা, তৃপ্তি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইত্যাদি কোনোটিই ইবাদত নয়। এগুলো একান্তই জাগতিক, পার্থিব ও মনোদৈহিক বিষয়। এগুলোর জন্য কোনোপ্রকার সাওয়াব বা আল্লাহর নৈকট্য আপনি পাবেন না। সিয়াম রাখলে আমরা দৈহিক ও জাগতিকভাবে অনেক লাভবান হই। এ লাভগুলো ইবাদত নয়। এগুলো ইবাদতের অতিরিক্ত লাভ। এ সকল জাগতিক বিষয়ের জন্য ইবাদত করলে তা আর ইবাদত থাকে না। ইবাদত অর্থ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে ইবাদত করা। কাজেই, এ সকল উন্নতী ও বুজুর্গীর কথা যেন আপনাকে মোহিত না করে। হৃদয়কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিয়ে মোহিত করে রাখুন, তাঁকে অনুসরণ

Contents

করুণ। সেখানে আর কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না। আমরা চোখ মেলে, জামাতে, সুন্নাতের শিক্ষার মধ্যে থেকেই সালাত আদায় করব। এভাবেই যতটুকু সম্ভব মনোযোগ অর্জনের চেষ্টা করব। এভাবেই যতটুকু তৃপ্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অনুভব করতে পারি তাতেই আমাদের চলবে। এটুকু নিয়েই আমরা মহাবিচারের দিনে মহাপ্রভুর দরবারে হাজিরা দিতে চাই। এ সামান্য পুঁজি নিয়েই আমরা সেদিনে রাহমাতুল্লিল আলামীন নবীয়ে মুসতাফা ﷺ-এর হাউযে হাযিরা দিতে চাই।

সম্মানিত পাঠক, উপরের বিষয়গুলো সামনে রেখে, যথাসম্ভব মনোযোগ অর্জন করে যিক্‌র করার চেষ্টা করুন। সুন্নাতে স্পষ্টভাবে শেখানো হয়নি এমন কোনো বিষয়কে যিক্‌রের সাথে জড়িয়ে ফেলবেন না বা রীতিতে পরিণত করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতে তৃপ্ত থাকার তাওফীক দিন এবং আমাদেরকে সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে থেকেই তাঁর সন্তুষ্টি, পরিপূর্ণ বেলায়েত ও কামালাত অর্জনের তাওফীক দান করুন।

২. ১১. ৫. বসা, শয়ন, একাকিত্ব ও পবিত্রতা

মুমিন যখন বিশেষভাবে যিক্‌রের জন্য বসবেন তখন যথাসম্ভব যাঁর যিক্‌র করা হচ্ছে তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আদব, বিনয়, আগ্রহ, আবেগ ও ভালবাসা নিয়ে শান্ত মনে বসতে হবে। সম্ভব হলে কিবলামুখী হয়ে বসা উত্তম। তবে প্রয়োজনে শুয়েও যিক্‌র ও ওযীফা আদায় করা যায়। আয়েশা (রা) বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ

"আমার নিয়মিত অপবিত্রতার সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।"[১]

আয়েশা (রা) নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

إِنِّي لأَقْرَأُ حِزْبِي أَوْ عَامَّةَ حِزْبِي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى فِرَاشِي

"আমার নিয়মিত তিলাওয়াত-ওযীফা বা তার অধিকাংশই আমি নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাঠ করি।"[২]

যথাসম্ভব পবিত্র ও নির্জন স্থানে যিক্‌র করা উত্তম। পবিত্র নামের যিক্‌রের জন্য মেসওয়াক করা ও মুখকে দুর্গন্ধমুক্ত করা উচিত।[৩]

২. ১১. ৬. যিক্‌র রত অবস্থায় বিভিন্ন কর্ম

ইমাম নববী, ইমাম ইবনুল জাযারী প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, যিক্‌র রত অবস্থায় যদি যাকিরকে কেউ সালাম প্রদান করে, তাহলে তিনি সালামের উত্তর প্রদান করে আবার যিক্‌রে রত হবেন। যদি তাঁর নিকট কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল-'হামদু লিল্লাহ' বলেন, তাহলে তিনি তার জওয়াবে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলে পুনরায় যিক্‌রে মনোনিবেশ করবেন। যাকির যিক্‌র রত অবস্থায় আযান শুরু হলে, তিনি আযানের কথাগুলো বলে মুয়াযযিনের জওয়াব প্রদানের পরে যিক্‌রে রত হবেন। যিক্‌র রত অবস্থায় কোনো অন্যায়, ইসলাম বিরোধী বা অনৈতিক কাজ দেখলে তিনি তার প্রতিবাদ করবেন, কোনো ভাল কর্মে নির্দেশনার সুযোগ আসলে তা পালন করবেন, কেউ উপদেশ বা পরামর্শ চাইলে তা প্রদান করবেন, এরপর আবার যিক্‌রে রত হবেন। অনুরূপভাবে ঘুম আসলে বা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার যিক্‌র শুরু করবেন।[৪]

২. ১১. ৭. উচ্চারণ ও শ্রবণ

শরীয়ত সম্মত বা মাসনূন যিক্‌র, সালাতের মধ্যে বা সালাতের বাইরে সকল প্রকার যিক্‌রের ক্ষেত্রেই মূলনীতি যে, তা স্পষ্ট জিহ্বা দ্বারা এভাবে উচ্চারণ করতে হবে যে, উচ্চারণকারী কোনো সমস্যা বা অসুবিধা না থাকলে তার নিজের উচ্চারণ শুনতে পাবেন। এভাবে নিজে শুনার মতো করে জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করা না হলে তা যিক্‌র বলে গণ্য হবে না। তবে মনের স্মরণ, তাফাক্কুর বা ফিকিরের কথা ভিন্ন।[৫]

২. ১১. ৮. নিঃশব্দে বা মৃদু শব্দে যিক্‌র করা

ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, যিক্‌র অর্থ স্মরণ করা বা করানো। স্মরণ করানো বা ওয়ায-নসীহত জাতীয় যিক্‌রে প্রয়োজন মতো জোরে আলোচনা করতে হবে, যাতে শ্রোতাগণ শুনতে পান। আর স্মরণ করা বা সাধারণ যিক্‌রের ক্ষেত্রে যাকিরের কর্ম নিজে শোনা ও তাঁর প্রভুকে শোনানো। এক্ষেত্রে সুন্নাত চুপে চুপে ও অনুচ্চস্বরে যিক্‌র করা।

যিক্‌র একটি নফল ইবাদত। সকল নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেই সুন্নাতের সাধারণ মূলনীতি যথাসম্ভব একাকী ও যথাসম্ভব চুপে

চুপে তা আদায় করা। যিক্র সম্পর্কিত সকল হাদীস, সাহাবী-তাবেয়ীগণের কর্ম ও চার ইমামসহ তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ফকীহ ও ইমামগণের মতামত পর্যালোচনা করলে সন্দেহাতীতভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, যিক্রের মূল সুন্নাত নীরবে, মনে মনে বা মৃদু শব্দে যিক্র করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সাধারণত সকল যিক্র চুপে চুপে ঠোঁট নেড়ে বা মৃদু শব্দে পালন করতেন। কোনো কোনো যিক্র, যেমন ঈদুল আযহার তাকবীর, হজ্বের তালবিয়া, বিতিরের পরে তাসবীহ ইত্যাদি সশব্দে বলেছেন। প্রথম যুগের সকল ফকীহ ও ইমাম একমত হয়েছেন যে, যে সকল স্থানে বা সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ জোরে বা শব্দ করে যিক্র করেছেন বলে স্পষ্টভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সে সকল স্থান বা সময় ছাড়া অন্য সকল স্থানে ও সময়ে যিক্র আস্তে বা মৃদু স্বরে আদায় করা সুন্নাত এবং জোরে বা উচ্চৈঃস্বরে যিক্র সুন্নাতের খেলাফ।

২. ১১. ৯. হানাফী মাযহাবে জোরে যিক্র বিদ'আত

হানাফী মাযহাবে এ বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের মূলনীতি যিক্রের ক্ষেত্রে মূল সুন্নাত চুপে চুপে নিস্বরে যিক্র করা المخافتة والإخفاء আর জোরে বা উচ্চশব্দে যিক্র করা মূলত বিদ'আত।[১] শুধু যে সকল যিক্র ও দু'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরে সাহাবীগণ শব্দ করে পাঠ করতেন বলে নিশ্চিতরূপে এজমা বা সহীহ হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত, যেমন – ঈদুল আযহার সময়ের তাকবীর, হজ্বের তালবিয়াহ ইত্যাদি ছাড়া কোনো প্রকার যিক্র ও দু'আ সশব্দে উচ্চারণ করা হানাফী মাযহাবে বিদ'আত ও মাকরুহ তাহরীমী। যেখানে সুন্নাত অথবা বিদ'আত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ আছে সেখানে তাকে বিদ'আত হিসাবে গণ্য করে তা বর্জন করতে হবে। উপরন্তু যে সুন্নাত পালন করতে বিদ'আতের সাথে সম্পৃক্ত হতে হয় সে সুন্নাতও বর্জন করতে হবে। কারণ বিদ'আত বর্জন করা ফরয, আর সুন্নাত বা সাওয়াব অর্জন করা ফরয নয়। ফরয নষ্ট করে কোনো সুন্নাত পালন করা যায় না। হানাফী মযহাবের সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্যান্য মাযহাবের গ্রন্থে এ বিষয়ে বারাবার বলা হয়েছে।[২]

২. ১১. ১০. পরবর্তী যুগে জোরে যিক্র-এর প্রচলন ও সমর্থন

সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগ শেষ হওয়ার পরে ক্রমান্বয়ে সমাজে বিভিন্ন সুন্নাত বিরোধী কর্ম প্রবেশ করতে থাকে। বিশেষত বাগদাদের খিলাফতের পতনের পরে সারা মুসলিম বিশ্বে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ফিতনা ফাসাদ ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামী জ্ঞান, বিশেষত কুরআন, হাদীস ও ফিকহের চর্চা কমে যায়। বিশাল মুসলিম বিশ্বের তুলনায় অতি নগণ্য সংখ্যক আলিম উলামা ইলমের ঝাণ্ডা বয়ে চলেন।

এ যুগে সুন্নাতের জ্ঞানের অভাব, আবেগ, আগ্রহ, সাময়িক ফাইদা, ফলাফল, বিভিন্ন স্থানে প্রচলন ইত্যাদির কারণে অনেকে সশব্দে যিক্র করতে শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তা রীতিতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে তা ব্যক্তিগত থেকে সম্মিলিত যিক্রের রীতিতে পরিণত হয়। সে যুগে কোনো কোনো আলিম যখন এভাবে জোরে যিক্রের প্রচলন দেখতে পান, তখন সেগুলোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তারা এভাবে যিক্রকারীদের মধ্যে অনেক নেককার মানুষকে দেখতে পান এবং এভাবে যিক্রের মধ্যে 'ফল' দেখতে পান। এজন্য তাঁরা একাকী বা একাধিক ব্যক্তি একত্রে জোরে জোরে যিক্রকে জায়েয বলে বিভিন্ন প্রমাণাদি পেশ করেন। তাঁরা জোরে যিক্রের বিরুদ্ধে কুরআন, হাদীস ও ইমামগণের মতামতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন।[৩]

আপনারা যে কোনো গবেষক একটু চেষ্টা করলেই বিষয়টি জানতে পারবেন। ৫০০ হিজরী পর্যন্ত লেখা সকল ফিকহের গ্রন্থ আপনারা পাঠ করে দেখুন, সেখানে জোরে যিক্রকে বিদ'আত লেখা হয়েছে। অথচ পরবর্তী যুগে দুই একজন লেখক ঢালাওভাবে জেরে বা সশব্দে যিক্র জায়েয করেছেন এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইমামদের সকল কথা বাতিল করে দিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ আলিম স্পষ্ট লিখেছেন যে, জোরে যিক্র জায়েয হলেও মসজিদের মধ্যে ইল্ম ও ফিকহ শিক্ষামূলক যিক্র বা ওয়ায-আলোচনা ছাড়া কোনো যিক্র জোরে বা উচ্চৈঃস্বরে করা মাকরুহ, অর্থাৎ মাকরুহ তাহরীমি।[৪] এটি হলো মসজিদের মধ্যে একাকী জোরে যিক্র করার বিধান। এখন সবাই মিলে সমবেতভাবে, সমস্বরে ও ঐক্যতানে যিক্রের কী বিধান হবে তা পাঠক নিজেই চিন্তা করুন।

আমাদের সমাজে উচ্চৈঃস্বরে যিক্রের খুবই প্রচলন। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন :

(১) জায়েয বা না-জায়েয আমাদের বিবেচ্য নয়। আমাদের বিবেচ্য সুন্নাত কি? অনেক কর্মই জায়েয, কিন্তু সুন্নাত নয়। আমরা এখানে যিক্রের ইবাদতকে সুন্নাত পদ্ধতিতে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মতো পালন করতে চাই।

(২) কোনো কর্ম জায়েয হওয়ার অর্থ তাকে রীতিতে পরিণত করা নয়। সালাতের আগে গলা খাঁকরি দেওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয, কিন্তু একে সালাতের রীতিতে পরিণত করলে বিদ'আত হবে। এ ধরনের অনেক উদাহারণ আমার "এহ্ইয়াউস সুনান" গ্রন্থে আলোচনা

করেছি। কেউ যদি একাকী অন্য কারো অসুবিধা না করে মাঝে মাঝে ভাল লাগলে একটু জোরে জোরে যিক্‌র করেন তাহলে তা জায়েয হবে। কিন্তু তার অর্থ কি এ যে সর্বদা একাকী বা সমবেতভাবে জোরে বা চিৎকার করে যিক্‌র করাই উত্তম?

(৩) সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কেন জোরে জোরে যিক্‌র করব? কাকে শুনাব? যে যিক্‌র যাকির আল্লাহকে শুনাবেন সে যিক্‌র তিনি ও তার প্রভু শুনলেই হলো। অন্য কাউকে শুনানোর উদ্দেশ্য কি ?

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তাঁর যিক্‌র করতে হবে। তাঁর মহান রাসূল ﷺ উম্মতকে শিখিয়েছেন কিভাবে যিক্‌র করতে হবে। আমাদের কী প্রয়োজন সুবিধামতো বানোয়াট পদ্ধতিতে যিক্‌র করার ? কুরআন কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে :

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

"এবং যিক্‌র করুন আপনার রবের আপনার মনের মধ্যে (মনে মনে) বিনীতভাবে এবং ভীতচিত্তে এবং অনুচ্চস্বরে সকালে এবং বিকালে, আর অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"[১]

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যাকিরের মধ্যে চারটি অবস্থা একত্রিত হলে তিনি কুরআন নির্দেশিত পদ্ধতিতে যিক্‌রকারী বলে গণ্য হবেন:

(১) যিক্‌র মনের মধ্যে হবে। অর্থাৎ, যিক্‌র বা স্মরণ মূলত মনের কাজ। যিক্‌রের সময় যে কথা মুখে উচ্চারিত হবে তা অবশ্যই মনের মধ্যে আলোড়িত ও আন্দোলিত হবে।
(২) বিনীতভাবে যিক্‌র করতে হবে।
(৩) ভীত ও সন্ত্রস্ত চিত্তে যাঁর যিক্‌র করছি তাঁর মর্যাদার পরিপূর্ণ অনুভূতি হৃদয়ে নিয়ে যিক্‌র করতে হবে।
(৪) যিক্‌রের শব্দ মুখেও উচ্চারিত হতে হবে। আর সে উচ্চারণ হবে অনুচ্চস্বরে।

অর্থাৎ, যিক্‌রে শুধু মনই নয়, মনের সাথে আন্দোলিত হবে জিহ্বা। ভক্তি, ভয় ও বিনয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে মৃদু শব্দে যিক্‌র করতে হবে।

সম্মানিত পাঠক, এরপরেও কি যিক্‌রের জন্য অন্য কোনো চিন্তার প্রয়োজন আছে? আমরা অতি সহজে বুঝতে পারি যে, এ চারটি অবস্থা একে অপরের সম্পূরক ও পরিপূরক। যেখানে বিনয় আছে সেখানে ভক্তি ও ভয় থাকবে। আর যেখানে ভক্তি ও বিনয় আছে সেখানে অন্তর আলোড়িত হবেই। আর যেখানে অন্তরের অনুভূতি, ভক্তি ও বিনয় আছে সেখানে শব্দ কখনই জোরে হবে না, হতে পারেই না। অন্তরের সকল আলোড়ন, বিনয় ও ভীতি প্রকাশ করবে একান্ত বিগলিত মৃদু শব্দের বাক্য।

যিক্‌রের প্রাণ মনের আবেগ, বিনয় ও ভীতবিহ্বল অবস্থা। আর এ অবস্থায় কোনো মানুষ ইচ্ছা করলেও মুখের আওয়াজ উচ্চ করতে পারে না। আবেগ, বিনয় ও ভীতি যত বেশি হবে শব্দের জোর ততই কমতে থাকবে। মুহতারাম পাঠক, আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে, কোনো মানুষ দুনিয়ার কোনো বড় নেতা বা কর্মকর্তার সামনে বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে চিৎকার করে তাকে ডাকছে ? এ কি সম্ভব ?

যিক্‌র-দু'আর বিষয়ে অন্য আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে :

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"ডাক তোমাদের প্রভুকে বিনীত-বিহ্বল চিত্তে এবং চুপে চুপে। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীগণকে পছন্দ করেন না।"[২]

প্রিয় পাঠক, মহান প্রভু শিখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে তাঁকে ডাকতে হবে, কিভাবে তাঁর যিক্‌র করতে হবে এবং কিভাবে তাঁর কাছে দু'আ করতে হবে। তিনি আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর শেখানো সীমার বাইরে বেরিয়ে তাঁকে যারা ডাকে তাদের তিনি পছন্দ করেন না। সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী মুফাসসিরগণ লিখেছেন যে, দু'আ ও যিক্‌রের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ শব্দ উচ্চ করা বা জোরে করা।[৩]

আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (فِيْ سَفَرٍ) فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا (فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে [এক সফরে] ছিলাম। আমরা যখন কোনো প্রান্তরে পৌঁছাচ্ছিলাম তখন আমরা তাকবীর ও তাহলীল [আল্লাহু আকবার এবং লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ] বলছিলাম। আমাদের শব্দ উচ্চ হয়ে গেল; সাহাবীগণ উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলেন। তখন

নবীজী ﷺ বললেন: হে মানুষেরা, নিজেদেরকে ধীর ও প্রশান্ত কর। তোমরা যাঁকে ডাকছ তিনি বধির বা দূরবর্তী নন। তোমরা যাঁকে ডাকছ তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রবণশীল এবং নিকটবর্তী। মহামহিমান্বিত তাঁর নাম, মহা-উচ্চ তাঁর মর্যাদা।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আজীবন এভাবেই আল্লাহর যিক্‌র করেছেন। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাসান বসরী (১১০ হি) বলেন,

لقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السرّ فيكون علانية أبدًا! ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يُسمع لهم صوت، إن كان إلا همسًا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله يقول:"ادعوا ربكم تضرعًا وخفية" ، وذلك أن الله ذكر عبدًا صالحًا فرضِي فعله فقال:(إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا)

"আমরা এমন মানুষদের পেয়েছি যাঁরা (সাহাবী ও প্রথম যুগের তাবেয়ীগণ) পৃথিবীর বুকে কোনো ইবাদত চুপে বা গোপনে করতে পারলে তা কখনো তারা জোরে বা প্রকাশ্যে করতেন না। তাঁরা বেশি বেশি দু'আ-যিকরে লিপ্ত থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাদের কোনো শব্দই শোনা যেত না। তাদের দুআ ছিল তাদের ও তাদের রব্বের মধ্যে শুধুই ফিসফিসানি। কারণ আল্লাহ বলেছেন: 'তোমরা তোমাদের রব্বকে ডাক ভীতবিহ্বল হয়ে এবং গোপনে।' আল্লাহ অন্যত্র তাঁর একজন নেককার বান্দা- যাকারিয়া (আ)-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "সে তার রব্বকে চুপে চুপে ডাকে"[২]। আর তিনি যাকারিয়া (আ)–এর এরূপ চুপে চুপে ডাকে সন্তুষ্ট হয়েছেন (দুআ কবুল করেছেন)।"[৩]

এ-ই রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের দুআ ও যিকরের পদ্ধতি। একটি হাদীস থেকেও জানা যায় না যে, তাঁরা কখনো উচ্চস্বরে বা দলবদ্ধভাবে যিকর করেছেন। এখন পাঠক আপনিই সিদ্ধান্ত নিবেন আপনার জন্য কোন্‌টি উত্তম। আপনার সামানে দু'টি বিকল্প: (১). বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে নিজের মনকে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে উৎসাহ দিবেন, সুন্নাতকেই সাওয়াব ও কামালাতের জন্য যথেষ্ট বলে বিশ্বাস করবেন; অথবা (২). বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রম বিভিন্ন পদ্ধতি, শব্দ, উচ্চশব্দ, চিৎকার বা অন্য কোনো নিয়ম পদ্ধতি জায়েয করবেন এবং সে জায়েযের জন্য সুন্নাতকে সর্বদা পরিত্যাগ করবেন।

সম্মানিত পাঠক, আপনার কাছে কোনটি ভাল মনে হয়? আমি আমার জন্য সুন্নাতকেই যথেষ্ট ও সুন্নাতকেই নিরাপদ বলে দৃঢ়তমভাবে বিশ্বাস করি। আল্লাহর কাছে সকাতরে আর্জি করি, তিনি দয়া করে আমাদের হৃদয়, প্রবৃত্তি ভাললাগা ও মন্দলাগাকে তাঁর হাবীবের (ﷺ) সুন্নাতের অনুগত ও অনুসারী বানিয়ে দেন।

তৃতীয় অধ্যায়
সালাত ও বেলায়াত

আমরা দেখেছি যে, সালাতই সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর এবং সালাতই মুমিনের বেলায়াতের অন্যতম পথ। বর্তমান যুগে বেলায়াত-সন্ধানী মুমিনগণ সাধারণত নফল যিকর-আযকারকেই বেলায়াতের মূল ভিত্তি মনে করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের জীবনে আমরা দেখি যে, তাদের বেলায়াত, মা'রিফাত, ক্রন্দন, কাশফ ইত্যাদি সব কিছুর মূল ছিল সালাত। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সালাত মহান আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সরাসরি ও সর্বোচ্চ সংযোগ। সালাতের সাজদায় বান্দা তার মা'বুদের সর্বোচ্চ নৈকট্য ও বেলায়াত লাভ করে।

কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবী-তাবিয়ীগণের আদর্শ ও জীবনের বাস্তবতা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, কোনো মুমিন যদি যতটুকু এবং যতক্ষণ সম্ভব মনোযোগ দিয়ে মহান আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভূতি নিয়ে সালাতের যিকর ও দুআগুলো অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পড়তে পারেন, সালাতের মধ্যে, সাজদায়, সালামের আগে আল্লাহর কাছে হৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করতে পারেন তবে তার হৃদয় প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হবে, হৃদয়ের অস্থিরতা, কষ্ট, রাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি দূরীভূত হবে, তার সকল দুআ কবুল হবে এবং তিনি হৃদয়ে আল্লাহর রহমত অনুভব করবেন। পাঁচ মিনিটের সালাতের মধ্যে আধা মিনিটও যদি এভাবে মনোযোগ দিয়ে অর্থানুভব করে সালাত আদায় করতে পারি তাও অনেক বড় নিয়ামত।

সুপ্রিয় পাঠক, আসুন আমার সালাতকে মহান রব্বের বেলায়াতের মূল মাধ্যম বানিয়ে ফেলি। এ অধ্যায়ে আমরা সালাতে ফিকহী বিষয়গুলো অতি সংক্ষেপে এবং সালাতের খুশু বা বিনম্রতা-একাগ্রতা, যিকর ও দুআর বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। মহান আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

৩. ১. সালাতের সংক্ষিপ্ত বিধান ও নিয়ম

৩. ১. ১. সালাতের গুরুত্ব

প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর উপর দৈনিক পাঁচ বার নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট কয়েক রাক'আত (মোট ১৭ রাক'আত) সালাত আদায় করা ফরয। ঈমানের পরে মুসলিমের সবচেয়ে বড় করণীয় নিয়মিত সালাত আদায় করা। কুরআনে প্রায় শত স্থানে এবং অসংখ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব বোঝান হয়েছে।

কুরআনের আলোকে সালাতই সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন: "মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন।"[১] অন্যত্র তিনি বলেন: "সে ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।"[২]

কুরআন বলেছে, সালাত পরিত্যাগের পরিণতি জাহান্নামের মহাশাস্তি। আল্লাহ বলেন: "তাদের পরে আসল অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। কাজেই তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি পাবে।"[৩] জান্নামীদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "(তাদের প্রশ্ন করা হবে) তোমাদেরকে জাহান্নামে ঢুকালো কিসে? তারা বলবে: আমরা সালাত আদায় করতাম না... ।"[৪] যে মুমিন সালাত আদায় করেন; কিন্তু সালাত আদায়ে অনিয়মিত-অমনোযোগী তার পরিণতি বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "মহাশাস্তি-মহাদুর্ভোগ সে সকল সালাত আদায়কারীর যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।"[৫]

সালাত বা নামায মুমিন ও কাফিরের মধ্যে মাপকাঠি। নামায ত্যাগ করলে মানুষ কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একজন মানুষ ও কুফরী-শিরকের মধ্যে রয়েছে নামায ত্যাগ করা।"[৬] তিনি আরো বলেন: "যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কুফরী করল।"[৭]

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, নামায মুসলিমের মূল পরিচয়। নামায ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। নামায পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারেন না। যে ব্যক্তি মনে করে যে, নামায না পড়লেও চলে বা কোনো নামাযীর চেয়ে কোনো বেনামাযী ভাল হতে পারে- সে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে কাফির। প্রসিদ্ধ চার ইমাম-সহ মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম ও ফকীহ এ বিষয়ে একমত। পক্ষান্তরে যে মুসলিম সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, নামায কাযা করা কঠিনতম পাপ, দিনরাত শুকরের গোশত ভক্ষণ করা, মদপান করা, রক্তপান করা ইত্যাদি সকল ভয়ঙ্কর গোনাহের চেয়েও ভয়ঙ্করতর পাপ ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত সালাত কাযা করা, সে ব্যক্তি

যদি ইচ্ছা করে কোনো নামায ত্যাগ করেন তাহলে তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা হবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ আছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এ প্রকারের মানুষকেও কাফির গণ্য করা হত। তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ

"মুহাম্মাদ (ﷺ)-সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করাকে কুফ্‌রী মনে করতেন না।" হাদীসটি সহীহ।[১]

বিশেষত সাহাবীগের মধ্যে উমার (রা), আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা), তাবিয়ীগণের মধ্যে ইবরাহীম নাখয়ী, ফকীহগণের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল, ইমাম ইসহাক ইবন রাহাওয়াইহি ও অন্যান্য অনেকে এ মত পোষণ করতেন। তাঁদের মতে মুসলিম কোনো পাপকে পাপ জেনে পাপে লিপ্ত হলে কাফির বলে গণ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম নামায। যদি কেউ নামায ত্যাগ করা পাপ জেনেও এক ওয়াক্ত নামায ইচ্ছা পূর্বক ত্যাগ করেন তাহলে তিনি কাফির বলে গণ্য হবেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালিক ও অধিকাংশ ফকীহ বলেন, এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা হবে না। তবে তাকে সালাতের আদেশ দিতে হবে এবং সালাত পরিত্যাগের শাস্তি হিসেবে জেল, বেত্রাঘাত ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করতে হবে। ইমাম শাফিয়ী বলেনঃ সালাত আদায়ের আদেশ দিলেও যদি সে তা পালন না করে তবে তাকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।[২]

৩. ১. ২. আল্লাহর যিকিরের জন্য সালাত

আমরা এ পুস্তিকার ক্ষুদ্র পরিসরে সালাত বা নামাযের মূল নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। তবে প্রথমে কয়েকটি মূল বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবেঃ

প্রথম বিষয়ঃ মহান প্রতিপালক মালিক আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে হৃদয়কে পবিত্র, পরিশুদ্ধ, আবিলতামুক্ত ও ভারমুক্ত করার জন্য সালাত বা নামায। সালাতের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি অনেক বিধান রয়েছে। সবই সাধ্য অনুসারে। এজন্য সাধ্যের বাইরে হলে এগুলো রহিত ও মাফ হয়ে যায়, কিন্তু নামায মাফ হয় না।

আল্লাহ বলেনঃ "যদি তোমরা বিপদাশংকা কর তবে হাঁটতে হাঁটতে অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে।"[৩]

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ

"তোমার কাছে যদি কুরআনের কিছু থাকে তবে তা পাঠ কর; আর তা না হলে তুমি আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা ইলাহা ইল্লাহ বল।"[৪]

কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে সকল মাযহাব ও মতের ফকীহগণ মূলত একমত যে, ওযরে বা বাধ্য হলে মুমিন ওযূ ছাড়া, বসে, শুয়ে, অপবিত্র পোশাকে, উলঙ্গ অবস্থায়, যে কোন দিকে মুখ করে, হাঁটতে হাঁটতে, দৌড়াতে দৌড়াতে, সূরা-কিরাত ছাড়া, শুধু সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি যিকিরের মাধ্যমে সালাত আদায় করবেন। কিন্তু কোন কারণেই তিনি সেচ্ছায় এক ওয়াক্ত সালাত কাযা করতে পারবেন না। যতক্ষণ হুশ আছে বা হৃদয়ে আল্লাহর স্মরণ করার ক্ষমতা আছে ততক্ষণ তার নামায রহিত বা মাফ হয় না। তাকে সময় হলে সাধ্যানুসারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো পদ্ধতিতে তাঁর প্রভুর দরবারে হাজিরা দিয়ে তাঁকে স্মরণ করে হৃদয়কে প্রশান্ত করতেই হবে। নইলে তার হৃদয় ও আত্মা মৃত্যুবরণ করবে। ফিকহের গ্রন্থগুলির বিভিন্ন স্থানে বিষয়গুলো আলোচিত এবং এ বিষয়ে মৌলিক কোনো মতভেদ নেই।

মানুষকে স্বভাবত সমাজের মধ্যে বাস করতে হয়। সারাদিনের কর্মময় জীবনে বিভিন্নমুখি আবেগ, ভালবাসা, ঘৃণা, হিংসা, রাগ, বিরাগ, ভয়, লোভ ইত্যাদির মধ্যে পড়তে হয়। এগুলো তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত, অসুস্থ ও কলুষিত করে তোলে। শুধুমাত্র মাঝে মাঝে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের আবেগ, বেদনা ও আকুতি পেশ করার মাধ্যমেই মানুষ এ ভয়ানক ভার থেকে নিজের হৃদয়কে মুক্ত করতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহর যিক্র বা স্মরণই হলো সালাতের মূল বিষয়। যিক্র বা স্মরণ হৃদয় দিয়ে করতে হয় এবং মুখ তাকে পূর্ণতা দেয়। এজন্য নামাযের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর স্মরণ করা ও নামাযের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হয় তার অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখা ও অর্থের সাথে হৃদয়কে আলোড়িত করা অতীব প্রয়োজন। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ "এবং আমার যিক্র বা স্মরণের জন্য সালাত কায়েম কর।"[৫] হৃদয়হীন স্মরণহীন নামায মুনাফিকের নামায। মহান আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেনঃ "আর যখন তারা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন অলসতাভরে দাঁড়ায়, মানুষকে দেখায় এবং খুব কমই আল্লাহর যিক্র (স্মরণ) করে।"[৬]

তৃতীয় বিষয়: নামাযের অন্যান্য নিয়মাবলী পালনের ক্ষেত্রে ওযর বা অসুবিধা থাকলেও যিক্‌র বা স্মরণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা কখনোই থাকে না। আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, যেভাবেই নামায আদায় করি না কেন, যে যিক্‌র বা কিরাআতই পাঠ করি না কেন, নামাযের মধ্যে পঠিত দোয়া, যিক্‌র বা কিরাআতের অর্থের দিকে মন দিয়ে মনকে আল্লাহর দিকে রুজু করে অন্তরের আবেগ দিয়ে নামায আদায়ের চেষ্টা করতে পারি। মনোযোগ নষ্ট হলে আবারো মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা নামাযের অন্যান্য প্রয়োজনীয়, অল্পপ্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে অতি সচেতন হলেও মনোযোগ, আবেগ ও ভক্তির বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখাই না।

চতুর্থ বিষয়: আরো দুঃখজনক বিষয়, অনেক ধার্মিক মুসলিম দ্রুত নামায আদায়ের জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। ধীর ও শান্তভাবে পরিপূর্ণ আবেগ ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করাই কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা। মাত্র কয়েক রাক'আত নামায এভাবে মাসনূন পদ্ধতিতে আদায় করলে হয়ত ১০ মিনিট সময় লাগবে। আর তাড়াহুড়ো করে আদায় করলে হয়ত ৩/৪ মিনিট কম লাগবে। আমরা সারাদিন গল্প করতে পারি। মসজিদ থেকে বেরিয়ে গল্প করে সময় নষ্ট করতে পারি, কিন্তু নামাযের মধ্যে তাড়াহুড়ো করি ও অস্থির হয়ে পড়ি। এ তাড়াহুড়ো নামাযকে প্রাণহীন করে দেয়।

৩. ১. ৩. সালাতের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি

কুরআন-হাদীসের আলোকে আমরা জানি যে, আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোন ইবাদত করা হলে তা কবুল হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সেগুলোর অন্যতম হলো যে, উক্ত ইবাদত রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত বা শিক্ষা ও পদ্ধতি অনুসারে পালন করতে হবে। তাঁর শিক্ষার বাইরে ইবাদত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শেখান পদ্ধতিতে সালাত আদায় করতে হবে। তিনি বলেছেন: "আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ, সেভাবে তোমরা সালাত আদায় করবে।"[১] হাদীসের হাদীসের আলোকে মুসলিম উম্মাহর প্রাজ্ঞ ইমাম ও ফকীহগণ সালাত আদায়ের নিয়মাবলী বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। সামান্য কয়েকটি বিষয়ে হাদীসের বর্ণনা বিভিন্ন প্রকারের হওয়ার কারণে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আলোচনা করছি।

১. ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম করে পবিত্র হয়ে, পবিত্র কাপড় পরে সতর আবৃত করে, বিনম্র ও শান্ত মনে কিবলামুখী হয়ে নামাযে দাঁড়ান।

পুরুষদের জন্য সদাসর্বদা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয। সালাতের মধ্যে এ অংশটুকু আবৃত করে রাখা ফরয। কেউ দেখুক বা না দেখুক শরীরের এ অংশের মধ্যে কোন স্থান অনাবৃত হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে কাপড় একদম না থাকলে উলঙ্গ অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে হবে। এছাড়া কাঁধ ও শরীরের উপরিভাগ আবৃত করা সুন্নাত। মুমিনের উচিত মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) পছন্দনীয়, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি পোশাক পরিধান করা।

মহিলাদের জন্য সালাতের মধ্যে শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত বাদে মাথার চুলসহ মাথা ও পুরো শরীর আবৃত করা ফরয। সালাতের মধ্যে যদি কোন মহিলার কান, চুল, মাথা, গলা, কাঁধ, পেট, পায়ের নলা ইত্যাদি পূর্ণ বা আংশিক অনাবৃত হয়ে যায় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণভাবে শাড়ী মুসলিম মহিলার জন্য অসুবিধাজনক পোশাক। ঢিলেঢালা পুরো হাতা সেলোয়ার-কামিজ বা ম্যাক্সি মুসলিম মহিলার জন্য উত্তম ও আদর্শ পোশাক। সর্বাবস্থায় সাধারণ পোশাকের উপর অতিরিক্ত বড় চাদর দিয়ে ভালভাবে নিজেকে আবৃত করে সালাত আদায় করতে হবে। মাথার চুল, কান, গলা ইত্যাদি ভালভাবে আবৃত রাখার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. সামনে সুতরা বা আড়াল রাখুন। দেয়াল, খুঁটি, পিলার বা যে কোন কিছুকে সামনে আড়াল হিসেবে রাখুন। না হলে অন্তত একহাত বা আধাহাত লম্বা সরু কোন লাঠি, কাঠ ইত্যাদি সামনে রাখলেও সুতরার সুন্নাত আদায় হবে। যথাসম্ভব সুতরার কাছে দাঁড়াতে হবে, যেন সাজদা করলে সুতরার নিকটে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সুতরার তিনহাতের মধ্যে দাঁড়াতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তখন সামনে আড়াল রাখবে এবং আড়ালের কাছাকাছি দাঁড়াবে", "আড়াল বা সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করবে না, আর কাউকে তোমার সামনে দিয়ে (সুতরার ভিতর দিয়ে) যেতে দিবে না। যদি সে জোর করে তাহলে তার সাথে মারামারি করবে (শক্তভাবে বাধা দিবে), কারণ তার সাথে শয়তান রয়েছে,... "[২]

ইসলামের প্রথম যুগে সুতরার এত গুরুত্ব প্রদান করা হতো যে, প্রয়োজনে মাথার টুপি খুলে সুতরা বানিয়ে নামায আদায় করা হতো। ইবনু আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক সময় নামায আদায়ের জন্য মাথা থেকে টুপি খুলে টুপিটাকে নিজের সামনে সুতরা বা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করতেন।"[৩] প্রখ্যাত তাবে- তাবেয়ী সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (১৯৮হি:) বলেন, "আমি শারীক ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবী নামিরকে (১৪০হি:) দেখলাম, তিনি একটি জানাযায় উপস্থিত হয়ে আসরের সময় হলে আমাদেরকে

নিয়ে জামাতে আসরের নামায আদায় করেন। তখন তিনি তাঁর টুপিটি তার সামনে রেখে (টুপিটিকে সুতরা বানিয়ে) নামায আদায় করলেন।"[১]

৩. মনে মনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের জন্য সালাত আদায়ের নিয়ত করুন। মুখে নাওয়াইতুআন.. ইত্যাদি বলা সুন্নাতের খেলাফ।

৪. তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত অথবা কান পর্যন্ত উঠান। এসময়ে হাতের আঙুলগুলো স্বাভাবিকভাবে সোজা থাকবে। একেবারে মিলিত থাকবে না, আবার বিচ্ছিন্নও থাকবে না। হাতের তালু কিবলার দিকে থাকবে।

৫. বাঁ হাতের পিঠ, কব্জি ও বাজুর উপর ডান হাত রাখুন, অথবা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরুন। এভাবে হাতদুইটি নাভী বা পেটের উপরে রাখুন।

৬. নামাজের মধ্যে সবিনয়ে সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখুন। এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত করবেন না, উপরের দিকে তাকাবেন না। হাদীসে বলা হয়েছে, "যারা নামায রত অবস্থায় উপর দিকে তাকায়, তাদের অবশ্যই তা থেকে বিরত হতে হবে, অন্যথায় তাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে।[২]

৭. তাকবীরে তাহরীমার পরে সানা বা শুরুর দুআ পাঠ করুন।

৮. এরপর অনুচ্চস্বরে (মনে মনে) বলুন :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ/ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

(আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম) আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অথবা বলুন: "আ'উযু বিল্লা-হিস সামী'য়িল 'আলীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম, মিন হাম্‌যিহী, ওয়া নাফ্‌খিহী ওয়া নাফ্‌সিহী: 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে, তার প্রবঞ্চনা, জ্ঞান নষ্টকারী ও অহংকার সৃষ্টিকারী প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের 'সানা' পাঠের পর বলতেন: "আ'উযু ...মিন হাম্‌যিহী, ওয়া নাফ্‌খিহী ওয়া নাফ্‌সিহী।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

৯. এরপর অনুচ্চস্বরে (মনে মনে) বলুন: "বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম।" অর্থাৎ (পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।)

১০. এরপর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রার্থনার আবেগে প্রতিটি আয়াতে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা পাঠ করুন।

সূরা ফাতিহা পাঠ করা সালাতের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। তবে যদি কেহ সূরা ফাতিহা না জানেন, তাহলে তা শিখতে থাকবেন। যতদিন শেখা না হবে ততদিন সূরা পাঠের পরিবর্তে তাসবীহ তাহলীল করবেন। বলবেন : (সুব'হা-নাল্লা-হ), (আল'হামদু লিল্লাহ), (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ), আল্লা-হু আকবার), (লা- 'হাওলা ওয়ালা- ক্কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ)।[৪]

১১. সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলে "আমীন" বলবেন। "আমীন" শব্দের অর্থ "হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন।" এরপর কুরআনের অন্য কোন সুরা বা কিছু আয়াত পাঠ করুন। তিলাওয়াত শেষে সামান্য একটু থামুন। এরপর "আল্লাহ আকবার" বলে রুকু করুন। রুকু অবস্থায় দুই হাত দুই হাঁটুর উপর দৃঢ়ভাবে রাখুন, হাতের আঙুল ফাঁক করে হাঁটু আঁকড়ে ধরুন। দুই বাহুকে ও দু'হাতের কুনুইকে ও দেহ থেকে সরিয়ে রাখুন। এ অবস্থায় পিঠ লম্বা করে দিতে হবে, পিঠ কোমর ও মাথা এমন ভাবে সোজা ও সমান্ত রাল থাকবে পিঠের উপর পানি ঢেলে দিলে তা গড়িয়ে পড়বে না। এ ভাবে রুকুতে পুরোপুরি শান্ত ও স্থির হয়ে যেতে হবে। রুকুর তাসবীহ পাঠ করুন।

১২. রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ান ও কয়েক মহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকুন। রুকু ও সাজদা থেকে উঠে কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা থাকা সালাতের অন্যতম ওয়াজিব। রুকু থেকে উঠে পুরোপুরি সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদায় চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। এ অবস্থায় মাসনূন যিকরগুলো পালন করুন।

১৩. এরপর আল্লাহু আকবার বলতে বলতে শান্তভাবে সাজদা করবেন। সাজদা করার সময় প্রথম দু হাঁটু এরপর দু হাত অথবা প্রথম দু হাত এরপর দু হাঁটু মাটিতে রাখা- উভয় প্রকার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাজদা অবস্থায় দু পা, দু হাঁটু, দু হাত, কপাল ও নাক মাটিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকবে। দু হাতের আঙুল মিলিত অবস্থায় সোজা কিবলামুখি থাকবে। দু হাতের পাতা দু কানের নীচে অথবা দু কাঁধের নীচে থাকবে। দু হাতের বাজু ও কনুই মাটি থেকে উপরে থাকবে এবং কোমর থেকে দূরে সরে থাকবে। সাজদার সময়ে নাক মাটি থেকে উঠবে না। হাদীসে বলা হয়েছে: "যতক্ষণ কপাল মাটিতে থাকবে, ততক্ষণ নাকও মাটিতে থাকবে, অনথ্যায় সালাত শুদ্ধ হবে না।"[৫]

সাজদার সময় পায়ের আঙুল কিবলামুখি থাকবে। অনেক ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, দাঁড়ানো অবস্থায় যেমম দু পায়ের মাঝে ৪ আঙুল বা এক বিঘত ফাঁক থাকে সাজদার সময়েও একইভাবে পদদ্বয় পৃথক থাকবে। অন্যন্য ফকীহ বলেছেন, সাজদার সময় দুপায়ের গোড়ালি একত্রিত থাকবে। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবন আবিদীন শামী রুকুর নিয়ম প্রসঙ্গে বলেন:

(ويسن أن يلصق كعبيه) قال السيد أبو السعود وكذا في السجود أيضا ....

"সুন্নাত হলো মুসাল্লী তার পায়ের গোড়ালিদুটি একত্রিত করে রাখবে। সাইয়েদ আবুস সাউদ বলেন: সাজদার মধ্যেও এভাবে পায়ের গোড়ালিদ্বয় একত্রিত রাখা সুন্নাত। ...."[১]

এ মতটি সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত। এক হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ আদায় করছিলেন। আমি অন্ধকারে হাত বাড়ালাম,

فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلاً بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

"আমি স্পর্শ করে দেখলাম তিনি সাজদায় রত, তাঁর পায়ের গোড়ালিদ্বয় একত্রিত করে পায়ের আঙুলগুলির প্রান্ত কিবলামুখি করে রেখেছেন।[২]

১৪. সাজদায় স্থির ও শান্ত হতে হবে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "... সাজদা করবে এবং সাজদায় এমন ভাবে শান্ত হবে যেন তোমার সকল অস্থি ও জোড় শান্ত ও শিথিল হয়ে যায়।"[৩] তিনি বলেন, "দৃঢ়ভাবে কপাল, নাক ও দুই হাত মাটিতে রেখে সাজদায় স্থির থাকবে, যেন তোমার দেহের সকল অস্থি নিজনিজ স্থানে থাকে।"[৪] এ অবস্থায় সাজদার তাসবীহ পাঠ এবং দোয়া করুন।

১৫."আল্লাহ আকবার" বলতে বলতে সাজদা থেকে উঠে বসতে হবে এবং সম্পুর্ণ স্থির হতে হবে যেন শরীরের সকল অস্থি নিজনিজ স্থানে স্থির হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সালাত শুদ্ধ হতে হলে দু সাজদার মাঝে অবশ্যই স্থির হয়ে বসতে হবে।[৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ যতক্ষণ রুকু এবং সাজদায় থাকতেন রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ও দু সাজদার মাঝে বসে প্রায় তত সময় কাটাতেন।[৬]

১৬.এ সময়ে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর শান্ত হয়ে বসতে হবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখি করে পা সোজা রাখতে হবে। দু হাত দু উরু ও হাঁটুর উপরে থাকবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক সামান্য ফাঁক অবস্থায় কিবলামুখি থাকবে। এ সময়ে মাসনূন যিকর পাঠ করুন।

১৭. এরপর "আল্লাহু আকবার" বলে দ্বিতীয়বার সাজদা করতে হবে। দ্বিতীয় সাজদাতে প্রথম সাজদার মত শান্ত ও স্থিরভাবে অবস্থান করতে হবে এবং উপরে বর্ণিত যিক্‌র ও দুআ পাঠ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে রুকু, সাজদা, রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ও দুই সাজদার মাঝে বসে শান্ত হওয়া এবং তাড়াহুড়া না করা নামাযের জন্য অতীব গুরুত্বপুর্ণ এবং এতে অবহেলা করলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কষ্ট করে নামায পড়েও তা যদি নবীজির (ﷺ) শিক্ষার বিরোধিতার কারণে আল্লাহ কবুল না করেন তাহলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে মুসাল্লী পুরোপুরি শান্তভাবে রুকু সাজদা আদায় করে না, তার সালাতের দিকে আল্লাহ তাকান না।[৭] তিনি একব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি অপূর্ণভাবে রুকু সাজদা করতে দেখে বলেন : "যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে মুহম্মদের (ﷺ) ধর্মের উপর তার মৃত্যু হবে না। কাক যেমন রক্তে ঠোকর দেয় তেমনি এরা সালাতে ঠোকর দেয়। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে রুকু করে না এবং ঠুকরে ঠুকরে সাজদা করে তার অবস্থা হলো সে ব্যক্তির মত যে অত্যাধিক ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি বা দু'টি খেজুর খেল, যাতে তার কোন রকম ক্ষুধা মিটিল না।[৮]

তিনি বলেন, "সবচেয়ে খারাপ চোর যে নিজের সালাত চুরি করে।" সাহাবীরা প্রশ্ন করেন, "হে আল্লাহর রাসূল, নিজের সালাত কিভাবে চুরি করে?" তিনি বলেন, "সালাতের রুকু ও সাজদা পুরোপুরি আদায় করে না।"[৯]

তিনি একদিন সালাত আদায় করতে করতে লক্ষ্য করেন যে একব্যক্তি রুকু ও সাজদা করার সময় স্থির হচ্ছে না। তিনি সালাত শেষে বলেন, "হে মুসলিমগণ, যে ব্যক্তি রুকুতে এবং সাজদায় পুরোপুরি স্থির ও শান্ত না হবে, তার সালাত আদায় হবে না।"[১০]

১৮. এরপর "আল্লাহ আকবার" বলতে বলতে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতে হবে। সাজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় পরিপূর্ণ আদব ও ভক্তির সাথে শান্তভাবে প্রথমে দুই হাত, তারপর দুই হাঁটু মাটি থেকে উপরে উঠাতে হবে। উপরের নিয়মে দ্বিতীয় রাকআত আদায় করতে হবে।

১৯. দ্বিতীয় রাক'আত পূর্ণ হলে তাশাহহুদের জন্য বসতে হবে। দুই সাজদার মাঝে মাঝে যেভাবে বসতে হয়, সেভাবে বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে আঙুলগুলো কিবলামুখি করে বসতে হবে। বাম হাত স্বাভাবিকভাবে বাম উরু বা হাঁটুর উপর বিছানো থাকবে। ডান

Contents

হাত ডান উরুর উপর থাকবে, ডান হাতের আঙ্গুলগুলো মুঠি করে শাহাদাত আঙ্গুলী বা তর্জনী দিয়ে তাশাহহুদ ও দোয়ার সময় কিবলার দিকে ইঙ্গিত করা সুন্নাত। চোখের দৃষ্টি ইঙ্গিত রত তর্জনীর দিকে থাকবে। দু রাকআত সালাত হলে তাশাহ্হুদের পর দরুদ ও দুআ পাঠ করতে হবে। তিন বা চার রাকআত সালাত হলে তাশাহ্হুদ পড়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দরুদ ও দুআ পাঠ করতে হবে।

২০. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করতে হবে। ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' এরপর বাম দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলতে হবে "আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"।

২১. সালামের সাথে সাথে সালাত শেষ হয়ে যায়। সালামের পরে নামাযের আর কোন কর্ম- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিছুই বাকী থাকে না। সালামের পরে মাসনূন যিকর ও দুআ পৃথক ইবাদত, যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৩. ১. ৪. কয়েকটি ফিকহী মতভেদ ও বিদআত ঝগড়া

উপরের এবং পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখব যে, সালাতের জন্য ও সালাতের মধ্যে মুমিন সহস্রাধিক মাসনূন ইবাদত পালন করেন। এগুলির অধিকাংশের ক্ষেত্রে কোনো মতভেদ নেই। সামন্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: (১) সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হস্তদ্বয় রাখার স্থান, (২) সূরা ফাতিহার পর "আমীন" বলার ক্ষেত্রে আস্তে বা জোরে বলা, (৩) রুকুতে যাওয়ার, রুকু থেকে উঠার এবং তৃতীয় রাকআতে উঠার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করা, (৪) সাজদা করার সময় এবং উঠে দাঁড়ানোর সময় হাঁটু অথবা হাত আগে নামানো বা উঠানো, (৫) দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতে দাঁড়ানোর আসে সামান্য বসা, (৬) শেষ বৈঠকে বসার সময় ডান পায়ের বা নিতম্বের উপর বসা এবং (৭) নারী ও পুরুষের সালাত-পদ্ধতির পার্থক্য। জামাতে সালাতের ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কুরআন পাঠ, সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর, সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ ও সালাতুল বিতর পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান।

এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে লক্ষণীয়: (১) প্রতিটি বিষয়ে উভয় মতের পক্ষে হাদীস বিদ্যমান, (২) সাহাবী-তাবিয়ীগণ ও ইমামগণ এগুলোর ক্ষেত্রে একটি কর্মকে উত্তম বলেছেন, কিন্তু বিপরীত কর্মকে কখনোই নিষিদ্ধ বলেন নি, (৩) তাঁরা এগুলো নিয়ে মতভেদ করেছেন, নিজের পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন, কিন্তু কখনোই ভিন্ন মতের অনুসারীকে অবজ্ঞা করেন নি (৪) মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ের মতভেদ নফল-মুসতাহাব বা উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের।

বর্তমানে ধার্মিক মুসলিমগণ একে অপরকে এ বিষয়গুলো নিয়ে অবজ্ঞা, উপহাস, অবমূল্যায়ন ও ভয়ঙ্কর শত্রুতায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। এমনকি প্রকাশ্য পাপে লিপ্ত মুসলিমদের চেয়ে বিরোধী মতের ধার্মিক মুসলিমদের অধিক অবজ্ঞা বা ঘৃণা করেন। মহান আল্লাহ আমাদের শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা করুন।

এ বইয়ে আমরা ফিকহী দলিলগুলো আলোচনা করতে পারছি না। তবে আমরা দেখেছি, আল্লাহর বেলায়াত লাভের অন্যতম বিষয় আল্লাহরর জন্য মুমিনদেরকে ভালবাসা এবং অবজ্ঞা, হিংসা-বিদ্বেষ, উপহাস ইত্যাদি পরিহার করা। এজন্য সম্মানিত পাঠকের নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(১) সহস্রাধিক কর্মের মধ্যে মাত্র ৮/১০টি বিষয়ে মতভেদ একেবারেই গুরুত্বহীন। যাদি ৯৯০টি বিষয়ের মিল না দেখে শুধু ৮/১০ বিষয়ের অমিল আপনার দৃষ্টি কাড়তে থাকে তবে আপনাকে দৃষ্টিভঙ্গির চিকিৎসা করতে হবে।

(২) মতভেদীয় প্রতিটি বিষয়ে উভয় মতের পক্ষে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য দলীল বিদ্যমান। যারা অপর মতের দলীলকে মানসূখ, রহিত বা দুর্বল বলে হৈচৈ করেন তারা অজ্ঞ অথবা অন্ধ-অনুসারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে সাহাবী-তাবিয়ীগণ থেকে এ সকল কর্ম প্রমাণিত। কাজেই এ সকল মতভেদীয় বিষয়ে ভিন্ন মতকে বাতিল বললে অগণিত সাহাবী-তাবিয়ীকে বাতিল বলা হয়।

(৩) আমরা অনেক সময় মনে করি যে, কোনো হানাফী মাযহাব অনুসারী যদি আমীন জোরে বলে বা রাফউল ইয়াদাইন করে তবে তার মাযহাব নষ্ট হবে বা গোনাহ হবে। হানাফী মাযহাবের প্রথম ৫০০ বছরের কোনো ইমাম বা ফকীহ এরূপ বলেন নি। হানাফী মাযহাবের প্রথম যুগগুলোর অনেক ফকীহই রাফউল ইয়াদাইন করতেন, ইমামের পিছনে সূরা পাঠ করতেন বা অনুরূপ ভিন্নমত পালন করতেন। মাযহাবকে মান্য করার পাশাপাশি বিশেষ কোনো মাসআলায় ভিন্নমত গ্রহণ করলে বা কোনো সহীহ হাদীস পেয়ে আমল করলে মাযহাব নষ্ট হয় না। **"ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) রচিত "আল-ফিকহুল আকবার"-এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা"** গ্রন্থে আমি বিষয়টি আলোচনা করেছি।

(৪) যারা সহীহ হাদীস পালন করতে চান তাদের অন্তর সহীহ হাদীস অনুসারে প্রশস্ত হওয়া জরুরী। যে সকল বিষয়ে একাধিক সহীহ বা হাসান হাদীস বিদ্যমান সে সকল বিষয়ে ভিন্নমতকে কটাক্ষ করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের প্রমাণিত সুন্নাতকে কটাক্ষ করা।

(৫) সহীহ হাদীসকে সহীহভাবে পালন করা প্রয়োজন। যেমন রুকু-সাজদা ও দাঁড়ানো-বসায় ধীরস্থিরতা বা 'তা'দীলুল আরকান' এবং 'রাফউল ইয়াদাইন উভয় বিষয় সহীহ হাদীসে বর্ণিত; তবে উভয়ের গুরুত্ব ভিন্ন। তা'দীলুল আরকান ত্যাগ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপত্তি করেছেন। কিন্তু রাফউল ইয়াদাইন ত্যাগ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ কারো প্রতি আপত্তি বা কটাক্ষ করেছেন বলে কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। কাজেই এ বিষয়ে কটাক্ষ বা ঝগড়া করলে সহীহ হাদীসের সঠিক আমল হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্মকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি বা কম গুরুত্ব দেওয়া বিদআতের পথ।

(৬) এ সকল মতভেদীয় বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীগণের আচরিত সুন্নাত পদ্ধতি নিজের নিকট গ্রহণযোগ্য মতটি পালন করা এবং

অন্য মতকে সম্মান কর। যেমন, যে ব্যক্তি আস্তে আমিন বলেন বা রুকু-সাজদার সময় হস্তদ্বয় উঠান না তিনি তার মতের পক্ষের সহীহ হাদীসটির উপর নির্ভর করবেন এবং যারা জোরে আমিন বলেন বা 'রাফউল ইয়াদাইন' করেন তাদের কর্মটিও সহীহ হাদীসে বর্ণিত বলে স্বীকার করবেন এবং কর্মটির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করবেন। কারণ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত। অপর পক্ষকেও একইরূপ নিজ মত পালন ও অপর মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতে হবে। এতে আমরা এ বিষয়ক সুন্নাত পালনের পাশাপাশি 'আল্লাহর জন্য ভালবাসা' নামক মহান ইবাদত পালন করতে পারব এবং উম্মাতের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির ভয়ঙ্কর পাপ থেকে বাঁচতে পারব। আল্লাহই তাওফীক দাতা।

৩. ২. সালাতই শ্রেষ্ঠ যিকর, মুনাজাত ও দুআ

সালাত মহান প্রতিপালকের সাথে বান্দার সর্বোচ্চ সংযোগ এবং বান্দার একান্ত 'মুনাজাত'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাই মূলত দু'আর সময়। আল্লাহর প্রশংসা করা, স্তুতি গাওয়া ও প্রার্থনা করা, এটাই তো সালাত।

হাদীস শরীফে পুরো সালাতকেই মুনাজাত বলা হয়েছে। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ (فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيْهِ، مَا يُنَاجِيْهِ بِهِ)

"যখন কেউ নামাযে থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে 'মুনাজাতে' (গোপন কথাবার্তায়) রত থাকে।" "কাজেই তার ভেবে দেখা উচিত কিভাবে এবং কী বলে সে তাঁর সাথে মুনাজাত বা আলাপ করছে।"[১]

অর্থাৎ, নামাযের সব কিছু হৃদয় দিয়ে অনুভব করে ও বুঝে পাঠ করতে হবে, না বুঝে, আন্দাযে বা অমনোযোগিতার সাথে নয়।

সালাতের পুরো সময়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত আবেগী ও সুন্দর ভাষায় দু'আ করতেন। সালাত শুরু করেই, তাকবীরে তাহরীমার পরেই তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার করে দু'আ করতেন। সূরা ফাতিহা মানব ইতিহাসের মহোত্তম প্রার্থনা। এরপর কুরআন তিলাওয়াতের সময় থেমে থেমে তিনি দু'আ করতেন। রুকুতে তাসবীহের পাশাপাশি দু'আ করতেন মাঝে মাঝে।

সালাতের মধ্যে দু'আর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সময় সাজদার সময়। সাজদা সালাতের মধ্যে মহান প্রভুর কাছে বান্দার সমর্পণের চূড়ান্ত পর্যায়। সাজদা আল্লাহর সাথে বান্দার চূড়ান্ত সংযোগ। মানব জীবনে দু'আ কবুলের অন্যতম সময় সাজদার সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ কথাই শিখিয়েছেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

"বান্দা যখন সাজদায় রত থাকে তখন সে তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা এ সময়ে বেশি বেশি দু'আ করবে।"[২]

অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ওফাত দিবসের ফজরের সময়) তাঁর ঘরের পর্দা তুলে দেখলেন সাহাবীগণ আবু বকরের (রা) পিছে কাতারবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করছেন। তখন তিনি বলেন:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"হে মানুষেরা, নবুয়্যতের সুসংবাদগুলোর আর কিছুই বাকি থাকল না, শুধুমাত্র নেক স্বপ্ন ছাড়া, যা মুসলিম দেখে বা তার বিষয়ে দেখা হয়। শুনে রাখ, আমাকে রুকু ও সাজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকু অবস্থায় তোমরা তোমাদের মহান প্রভুর মর্যাদা-বাচক স্তুতি পাঠ করবে। আর সাজদা রত অবস্থায় তোমরা খুব বেশি করে দু'আ করবে, কারণ এ সময়ে তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।"[৩]

এভাবে আমরা দেখছি যে, সালাতের মধ্যে সানার সময়ে, তিলাওয়াতের সময়ে এবং বিশেষ করে সাজদার সময়ে এবং তাশাহ্হুদের পরে দুআ-মুনাজাত করা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আচরিত ও নির্দেশিত সুন্নাত।

এখানে একটি ভুল ধারণা অপনোদন করা অতীব প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় আমরা অজ্ঞতাবশত মাযহাবকে সুন্নাতের বিপরীতের দাঁড় করায় এবং মাযহাবের অযুহাতে সুন্নাত পরিত্যাগ করি বা অস্বীকার করি। এর একটি বড় নমুনা সালাতের মধ্যে দুআ করা। অনেকে অজ্ঞতাবশত বলেন: আমাদের মাযহাবে সালাতের মধ্যে বা ফরয সালাতের মধ্যে নির্ধারিত তাসবীহ-তাহলীল ও দুআ ছাড়া অন্য কোনো দুআ করা যায় না। ধারণাটি অজ্ঞতার প্রমাণ ছাড়া কিছুই নয়। হানাফী মাযহাবের মূল গ্রন্থ, ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানীর 'আল-মাবসূত' গ্রন্থে তিনি বলেন:

باب الدعاء في الصلاة: قلت أرأيت رجلا قد صلى فدعا الله فسأله الرزق وسأله العافية هل يقطع ذلك الصلاة قال لا قلت

وكذلك كل دعاء من القرآن وشبه القرآن فإنه لا يقطع الصلاة قال نعم قلت فإن قال اللهم اكسني ثوبا اللهم زوجني فلانة قال هذا يقطع الصلاة وما كان من الدعاء مما يشبه هذا فهو كلام وهو يقطع الصلاة. قلت فإن قال اللهم أكرمني اللهم أنعم علي اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار اللهم أصلح لي أمري اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم وفقني وسددني اللهم اصرف عني شر كل ذي شر أعوذ بالله من شر الجن والإنس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء ومن شماتة الأعداء اللهم ارزقني حج بيتك وجهادا في سبيلك اللهم استعملني في طاعتك وطاعة رسولك اللهم اجعلنا صادقين اللهم اجعلنا حامدين عابدين شاكرين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين قال هذا كله حسن وليس شيء من هذا يقطع الصلاة وهذا من القرآن وما يشبه القرآن وإنما يقطع الصلاة ما يشبه حديث الناس.

قلت أرأيت الرجل يمر بالآية فيها ذكر النار فيقف عندها ويتعوذ بالله ويستغفر الله وذلك في التطوع وهو وحده قال هذا حسن قلت فإن كان الإمام قال أكره له ذلك قلت فإن فعل قال صلاته تامة قلت أرأيت الرجل يكون خلف الإمام فيقرأ الإمام بسورة فيها ذكر الجنة وذكر النار أو ذكر الموت أينبغي لمن خلفه أن يتعوذ بالله من النار ويسأل الله الجنة قال يسمعون وينصتون أحب إلي قلت أرأيت الرجل يكون خلف الإمام فيفرغ الإمام من السورة أتكره للرجل أن يقول صدق الله وبلغت رسله قال أحب إلي أن ينصت ويستمع قلت فإن فعل هل يقطع ذلك صلاته قال لا صلاته تامة ولكن أفضل ذلك أن ينصت قلت أرأيت الإمام يقرأ الآية فيها ذكر قول الكفار أينبغي لمن خلفه أن يقولوا لا إله إلا الله قال أحب ذلك إلي أن يستمعوا وينصتوا قلت فإن فعلوا قال صلاتهم تامة.

"সালাতের মধ্যে দুআর অধ্যায়: আমি (ইমাম আবূ হানীফাকে) বললাম: বলুন তো, যদি কোনো মানুষ সালাতের মধ্যে দুআ করে, আর দুআয় আল্লাহর কাছে রিযক চায় বা সুস্থতা-নিরাপত্তা চায় তাহলে কি তার সালাত ভেঙ্গে যাবে? তিনি (ইমাম আবূ হানীফা) বলেন: না, সালাত ভাঙ্গবে না। আমি বললাম: কুরআনের সকল দুআ ও কুরআনের দুআর মত সকল দুআই কি এরূপ (এ ধরনের কোনো দুআতেই কি সালাত ভাঙ্গবে না?) তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, যদি লোকটি বলে: আল্লাহ আমাকে একটি কাপড় পরিয়ে দিন, আমাকে অমুক মহিলার সাথে বিবাহ দিন- তাহলে কি হবে? তিনি বলেন: এগুলো মানুষের সাথে কথাবার্তা, এরূপ কথা বললে সালাত ভেঙ্গে যাবে।

আমি বললাম: যদি সে বলে: হে আল্লাহ, আমাকে সম্মানিত করুন; হে আল্লাহ, আমাকে নিয়ামত প্রদান করুন; হে আল্লাহ, আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান; আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন; হে আল্লাহ, আমার কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন; হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করুন; হে আল্লাহ, আমাকে তাওফীক দিন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন; হে আল্লাহ, সকল ক্ষতি-অমঙ্গলকে আমার থেকে সরিয়ে নিন; আমি মানুষ ও জিনের ক্ষতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি; আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি; আমি কঠিন বিপদ, ভাগ্যের বিপর্যয়, আমার বিপদে শত্রুদের আনন্দলাভের অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি; হে আল্লাহ, আমাকে আপনার ঘরের হজ্জ করার এবং আপনার রাস্তায় জিহাদ করার ক্ষমতা প্রদান করুন; হে আল্লাহ, আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের (ﷺ) আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করুন; হে আল্লাহ, আমাদেরকে সত্যবাদী বানিয়ে দিন; হে আল্লাহ, আমাদেরকে প্রশংসাকারী, ইবাদতকারী ও কৃতজ্ঞ বানিয়ে দিন; হে আল্লাহ, আমাদেরকে রিযক প্রদান করুন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা- সালাতের মধ্যে এ সকল দুআ করার বিধান কী? তিনি বলেন: এগুলো সবই সুন্দর। এগুলোর কোনো কিছুতেই সালাত নষ্ট হবে না। এগুলো সবই তো কুরআনের দুআ বা কুরআনের দুআর সাথে মিলসম্পন্ন দুআ। সালাত তো নষ্ট হয় মানুষের কথাবার্তার মত কথা বললে।

আমি বললাম: আপনি বলুন তো, একজন মানুষ একাকী সুন্নাত-নফল সালাত আদায়ের সময় জাহান্নামের কথা আছে এমন একটি আয়াত অতিক্রম (পাঠ) করলো, তখন সে সেখানে থেমে গেল এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো- তার বিধান কী? তিনি বলেন: এ তো সুন্দর কর্ম। আমি বললাম: যদি জামাতে সালাতে ইমামতি করার সময় এরূপ করে? তিনি বলেন: ইমামের জন্য এরূপ করা আমি অপছন্দ করি। আমি বললাম: যদি কোনো ইমাম এরূপ করে তাহলে কী হবে? তিনি বলেন: তার সালাত পরিপূর্ণ হবে (এরূপ করা অপছন্দনীয় হলেও তাতে সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না)। আমি বললাম: বলুন তো, কোনো ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করছে এমতাবস্থায় ইমাম জান্নাত, জাহান্নাম বা মৃত্যু বিষয়ক কোনো সূরা পাঠ করেন, তখন মুক্তাদির জন্য জাহান্নাম থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া এবং আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করা কি উচিত হবে? তিনি বলেন: মুক্তাদিদের জন্য চুপ করে শ্রবণ করাই আমি অধিক পছন্দ করি। আমি বললাম: যদি কেউ ইমামের পিছনে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের সূরা পাঠ শেষ হলে 'সাদাকাল্লাহ ও বাল্লাগাত রুসুলুহু' 'আল্লাহ সত্য বলেছেন এবং রাসূলগণ প্রচার করেছেন' বলা কি তার জন্য অপছন্দনীয়? তিনি বলেন: নীরবে শ্রবণ করাই আমার বেশি পছন্দ। আমি বললাম: মুক্তাদি যদি এরূপ বলে তাহলে কী সালাত ভেঙ্গে যাবে? তিনি বলেন: না, তার সালাত পরিপূর্ণ হবে, তবে এরূপ না বলে নীরবে শ্রবণ করাই অধিক ফযীলত বা উত্তম। আমি বললাম: ইমাম যদি কাফিরদের আলোচনা বিষয়ক কোনো আয়াত পাঠ করেন তাহলে মুক্তাদিগণের জন্য "লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু" বলা কি উচিত? তিনি বলেন: নীরবে শ্রবণ করা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আমি বললাম: যদি তারা এরূপ বলে তাহলে

কী হবে? তিনি বলেন: তাদের সালাত পরিপূর্ণ বা শুদ্ধ হবে।"[১]

এ দীর্ঘ উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা এ বিষয়ে ইমাম আযমের প্রকৃত মত বুঝতে পারছি। ফরয সালাত যেহেতু জামাতে আদায় করতে হয় এজন্য যথাসম্ভব নির্ধারিত যিক্‌র আযকার ও দু'আর মাধ্যমে আদায় করাই উত্তম। এরপরও কুরআন তিলাওয়াতের সময় যদি ইমাম বা মুক্তাদী দুআ বা যিকর-মুনাজাত করেন তাহলে তা অবৈধ বা নিষিদ্ধ নয়। পাশাপাশি ফরয-নফল সকল সালাতের মধ্যে কুরআনের দুআ বা কুরআনের অর্থবোধক দুআ পাঠ করাকে ইমাম আবূ হানীফা সুন্দর বা উত্তম বলেছেন। সুন্নাত, নফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সালাতের শুরুতে, তিলাওয়াতের সময়ে, রুকুতে, সাজদায় ও শেষে তাশাহহুদের পরে বেশি বেশি করে দু'আ করতে হবে। তাঁর এ মতটি সুন্নাতের আলোকে জোরদার। কারণ আমরা অধিকাংশ হাদীসেই দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অতিরিক্ত দু'আ সাধারণত তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সুন্নাত বা নফল সালাতের মধ্যে বলতেন। প্রত্যেক মুমিনের জন্য তাঁর মনের সকল আবেগ, আকুতি, বেদনা ও প্রার্থনা মহান প্রভুর দরবারে পেশের সর্বোত্তম সুযোগ সালাত, বিশেষত সাজদার অবস্থায়। পৃথিবীর কোনো নেতা যদি আমাদের বলতেন, অমুক সময় আমার কাছে আবেদন করলে আমি তা কবুল করব, তাহলে আমরা সে সময়টিকে সদ্ব্যবহার করতে প্রাণপণে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আফসোস! মহান রাব্বুল আলামীনের এ মহান সুযোগ আমরা অবহেলা করে এড়িয়ে চলছি। আমাদের সকলেরই উচিত, যথাসম্ভব মাসনূন দু'আ মুখস্থ করে সেগুলো দিয়ে সাজদায় দু'আ করা।

আমরা এখানে সালাতের মধ্যে সাজদায় ও তাশাহ্হুদের পরের কয়েকটি মাসনূন দুআ উল্লেখ করব। এছাড়া আমার লেখা 'মুনাজাত ও নামায' বইটিতে পাঠক আরো অনেক মাসনূন দুআ দেখতে পাবেন।

৩. ৩. সালাতের পূর্বে ও সালাতের জন্য

ইসতিনজা, ওযূ, গোসল, আযান, ইকামত ইত্যাদি বিষয়গুলো সালাতের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এ বিষয়ক যিকরগুলো এখানে উল্লেখ করছি।

৩. ৩. ১. ইস্তিঞ্জার যিক্‌র

যিক্‌র নং ৩৩: ইস্তিঞ্জার পূর্বের যিকর

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُـــبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-ইসি।

অর্থ: "আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি – অপবিত্রতা, অকল্যাণ, খারাপ কর্ম থেকে বা পুরুষ ও নারী শয়তান থেকে।"

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিঞ্জার জন্য গমন করলে এ দু'আটি পাঠ করতেন। সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থের হাদীসে 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া দু'আটি বর্ণিত হয়েছে। মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা গ্রন্থে সংকলিত অন্য হাদীসে দু'আটির শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

কোনো কোনো বর্ণনায় এ দুআর শেষে "ওয়াশ শাইত্বা-নির রাজীম" (এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে) কথাটুকু সংযুক্ত। এ সংযুক্তির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।[৩]

এছাড়া অন্য হাদীসে আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِى آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ

"তোমাদের কেউ যখন প্রকৃতির ডাকে নির্জনস্থানে গমন করে তখন জিন- দের চক্ষু থেকে আদম-সন্তানদের গুপ্তাঙ্গের আবরণ হলো "বিসমিল্লাহ" বলা।"[৪]

ইস্তিঞ্জার সময় মুখের যিক্‌র অনুচিত

আমরা দেখেছি যে, সর্বাবস্থায় মুখে আল্লাহর যিকর করা-ই সুন্নাত। তবে দু'টি অবস্থায় মুখে যিক্‌র না করাই উচিত বলে ফকীহগণ মত প্রকাশ করেছেন। প্রথমত, ইস্তিঞ্জায় রত থাকা অবস্থা। অধিকাংশ ফকীহ এ অবস্থায় মুখে যিক্‌র মাকরুহ তানযিহী বা অনুচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম নববী লিখেছেন : প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার সময় কোনো প্রকার আল্লাহর যিক্‌র করা মাকরুহ। তাসবীহ, তাহলীল, সালামের উত্তর প্রদান, হাঁচির উত্তর প্রদান, হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা, আযানের জবাব দেওয়া ইত্যাদি কোনো প্রকারের যিক্‌র মুমিন এ অবস্থায় এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলন অবস্থায় করবেন না। যদি তিনি হাঁচি দেন তাহলে জিহ্বা না নেড়ে মনে মনে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবেন। এছাড়া প্রয়োজন ছাড়া কথাবার্তা বলাও এ সময়ে মাকরুহ। এ দু অবস্থায় কথাবার্তা বা যিক্‌র মাকরুহ তাহরীমি বা হারাম পর্যায়ের মাকরুহ নয়, বরং মাকরুহ তানযীহী বা

"অনুচিত" পর্যায়ের মাকরুহ। এ অবস্থায় যিক্‌র করলে গোনাহ হবে না, তবে যিক্‌র না করাই উচিত। ইস্তিঞ্জায় রত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করাও মাকরুহ। অধিকাংশ ইমাম ও ফকীহের এ মত। ইবনু সীরীন, ইবরাহীম নাখয়ী প্রমুখ এ মতের বিরোধিতা করেছেন। তারা এ অবস্থায় যিক্‌র, তাসবীহ-তাহলীল, সালামের উত্তর ইত্যাদি জায়েয বলেছেন।[১]

যিক্‌র নং ৩৪ : ইস্তিঞ্জার পরের যিক্‌রঃ

غُفْرَانَكَ

উচ্চারণ : গুফরা-নাকা। **অর্থ :** "আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইস্তিঞ্জা শেষে বেরিয়ে আসলে এ দু'আটি বলতেন। হাদীসটি হাসান। কোনো কোনো যয়ীফ সূত্রে এ বাক্যটির পরে অতিরিক্ত কিছু বাক্য বলা হয়েছে।[২]

৩. ৩. ২. ওযূ ও গোসলের যিক্‌র

যিক্‌র নং ৩৫: ওযূর পূর্বের যিক্‌র

بِسْمِ اللهِ/ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হ। **অথবা:** বিসমিল্লা-হির রা'হমা-নির রা'হীম।

অর্থ: আল্লাহর নামে। **অথবা** পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

ওযুর পূর্বে "বিসমিল্লা-হ" অথবা "বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম" বলা সুন্নাত। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

"ওযূর শুরুতে যে আল্লাহর নাম যিক্‌র করল না তার ওযূ হবে না।"[৩]

ওযূর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলা ছাড়া অন্য কোনো মাসনূন যিক্‌র নেই। আমাদের দেশে অনেকে ওযুর পূর্বে 'নাওয়াইতু আন...' ইত্যাদি শব্দে ওযূর নিয়্যাত পাঠ করেন। নিয়্যাত অর্থ উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা। যে কোনো ইবাদতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকা প্রয়োজন। এ নিয়্যাত মানুষের অন্তরের অভ্যন্তরীণ সংকল্প বা ইচ্ছা, যা মানুষকে উক্ত কর্মে অনুপ্রাণিত করেছে। নিয়্যাত, উদ্দেশ্য বা সংকল্প করতে হয়, বলতে বা পড়তে হয় না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো জীবনে একটিবারের জন্যও ওযু, গোসল, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি কোনো ইবাদতের জন্য কোনো প্রকার নিয়্যাত মুখে বলেননি। তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, ইমাম আবু হানীফা (রহ)-সহ চার ইমাম বা অন্য কোনো ইমাম কখনো কোনো ইবাদতের নিয়্যাত মুখে বলেননি বা বলতে কাউকে নির্দেশ দেননি।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো আলিম এগুলো বানিয়েছেন। তাঁরাও বলেছেন যে, মুখের উচ্চারণ জরুরী নয়, মনের নিয়্যাতই মূল, তবে এগুলো মুখে উচ্চারণ করলে মনের নিয়্যাত একটু দৃঢ় হয়। এজন্য এগুলো বলা ভাল। তাঁদের এ ভাল-কে অনেকেই স্বীকার করেননি। মুজাদ্দিদে আলফে সানী ওযু, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি যে কোনো ইবাদতের জন্য মুখে নিয়্যাত করাকে খারাপ বিদ'আত হিসেবে নিন্দা করেছেন এবং এর কঠোর বিরোধিতা করেছেন। কারণ এভাবে মুখে নিয়্যাত বলার মাধ্যমে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের আজীবনের সুন্নাত – 'শুধুমাত্র মনে মনে নিয়্যাত করা'-কে পরিত্যাগ করছি।[৪]

ওযূ করাকালীন যিকরের বিধান

ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলার পরে ওযূ শেষ করার আগে কোনো মাসনূন যিক্‌র নেই। ধার্মিক মানুষদের মধ্যে ওযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় কিছু কিছু দু'আ পাঠের রেওয়ায আছে। এগুলো সবই বানোয়াট দু'আ। ইমাম নাবাবী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, ওযূর সময় বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়া বা মাস্‌হ করার সময় যে সকল দু'আ পাঠ করা হয় তা সবই 'মাউযূ' বা বানোয়াট মিথ্যা হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ থেকে এ বিষয়ে সহীহ বা গ্রহণযোগ্য সনদে একটি দু'আও বর্ণিত হয়নি।[৫]

কোন কোন আলিম ও বুজুর্গ এ সকল দু'আ গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি, মুমিন যে কোনো সময় দু'আ ও যিক্‌র করতে পারে। কোনো সময়ে বা স্থানে মাসনূন যিক্‌র বা দু'আ না থাকলে সেখানে আমরা আমাদের বানানো দু'আ করতে পারি। এ সকল দু'আ না-জায়েয হবে না।

কথাটি বাহ্যত ঠিক হলেও এর ভিন্ন একটি দিক রয়েছে। মুমিন সর্বাবস্থায় যিক্‌র বা দু'আ করতে পারেন। তিনি মাসনূন শব্দ ছাড়াও নিজের বানানো শব্দে দু'আ ও যিক্‌র করতে পারেন, যদি তার অর্থ শরীয়ত-সঙ্গত হয়। কিন্তু মুমিন কোনো মাসনূন ইবাদত বা যিক্‌র পরিবর্তন করতে পারেন না। এ ছাড়া মাসনূন ব্যতীত অন্য কোনো যিক্‌রকে রীতি হিসেবে গ্রহণ করাও অনুচিত। এখানে কয়েকটি

বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত :

প্রথমত: যে সকল ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ পালন করেছেন সে সকল ইবাদতের মধ্যে বানোয়াট যিক্‌র প্রবেশ করানো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। যেমন, সালাত, আযান, ওযূ, হাঁচি, ইত্যাদির মাসনূন পদ্ধতি ও যিক্‌র নির্ধারিত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করার অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ যতটুকু শিখিয়েছেন তাতে আমরা তৃপ্ত হতে পারলাম না। অথবা একথা মনে করা যে, তিনি যতটুকু শিখিয়েছে ততটুকু ভাল, তবে আরেকটু বেশি করলে তা আরো ভাল হবে। এ চিন্তা খুবই অন্যায়।

তাহলে প্রশ্ন, হাদীসে যতটুকু বর্ণিত আছে তার বেশি কি আমরা দু'আ করতে পারব না? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। মাসনূন ইবাদত, যিক্‌র ও দু'আর মধ্যে আমরা কোনো কম-বেশি করব না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অতিরিক্ত দু'আ, যিক্‌র ও ইবাদতের সময় ও সুযোগ শিক্ষা দিয়েছেন, সে সময়ে ও সুযোগে আমরা যত খুশি বেশি বেশি দু'আ ও যিক্‌র করতে পারব।

উদাহরণ হিসেবে সালাতের উল্লেখ করা যায়। সালাত মুমিনের জীবনের অন্যতম যিক্‌র ও ইবাদত। মুমিন যত ইচ্ছা বেশি সালাত পড়তে পারেন এবং পড়া উচিত। তবে তিনি মাসনূন সালাতের মধ্যে বৃদ্ধি করতে পারেন না। তিনি যোহরের আগে বা পরে আসর পর্যন্ত যত ইচ্ছা নফল সালাত পড়তে পারেন। কিন্তু তিনি যোহরের আগের সুন্নাত সালাত বা পরের সুন্নাত সালাত ৬ রাকাত পড়তে পারেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আজীবন ওযূ করেছেন, কিন্তু তাঁরা ওযূর সময় কোনো যিক্‌র বা দু'আ পাঠ করেছেন বলে কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। এ সময়ে দু'আ বা যিক্‌রের কোনো ফযীলতও তাঁরা বলেননি। কাজেই, এ সময়ে বিশেষভাবে কোনো দু'আ করা সুন্নাতের সুস্পষ্ট খেলাফ।

দ্বিতীয়ত: ওযূর সময়ে যিক্‌র বা দু'আ না-জায়েয বা মাকরুহ নয়। মুমিন এ সময়ে মনের আবেগ হলে তাসবীহ তাহলীল করতে পারেন বা কোনো বিষয় মনে পড়লে সে জন্য দু'আ করতে পারেন। হাঁচি দিলে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বা কেউ হাঁচি দিলে উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে পারেন, কাউকে সালাম দিতে পারেন বা কেউ সালাম দিলে উত্তর দিতে পারেন। এভাবে যিক্‌র বা দু'আ তিনি করলে তা না-জায়েয হবে না। কিন্তু এ সময়ের জন্য কোনো দু'আ বা যিক্‌র তিনি রীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺএর রীতি পরিবর্তন করা হবে এবং তাঁর সুন্নাত আংশিকভাবে নষ্ট হবে।

তৃতীয়ত: আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সুন্নাতেই নিরাপত্তা এবং সুন্নাতের বাইরে গেলেই ভয়। কাজেই, একান্ত বাধ্য না হয়ে সুন্নাতের বাইরে আমরা কেন যাব? বিভিন্ন যুক্তিতর্ক দিয়ে খেলাফে সুন্নাত কর্মকে জায়েয করার চেয়ে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক দিয়ে নিজের মন ও প্রবৃত্তিকে সুন্নাতের মধ্যে আবদ্ধ রাখা উত্তম নয় কি? অগণিত সুন্নাত যিক্‌র, দু'আ ও ইবাদত আমরা করছি না, করতে চেষ্টা বা আগ্রহও করছি না। অথচ খেলাফে সুন্নাত কিছু কর্মের জন্য আমাদের আগ্রহ বেশি। এটা কি সুন্নাতের মহব্বতের পরিচায়ক? মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রবৃত্তিকে সুন্নাতের অধীন করে দিন ; আমীন।

যিক্‌র নং ৩৬ : ওযূর পরের যিক্‌র-১

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ)، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ : আশহাদু আল্ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু [ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু] ওয়া আশহাদু আন্না মু'হাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : "আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই [তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই] এবং সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্ররিত বার্তাবাহক)।"

উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ সুন্দরভাবে এবং পরিপূর্ণভাবে ওযূ করে এরপর উক্ত যিক্‌র পাঠ করে তাহলে জান্নাতের আটটি দরজাই তাঁর জন্য খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"[১]

যিক্‌র নং ৩৭ : ওযূর পরের যিক্‌র-২

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ্ 'আলনী মিনাত তাওয়া-বীন ওয়াজ্ 'আলনী মিনাল মুতাতাহ্ হিরীন।

অর্থ : "হে আল্লাহ আপনি আমাকে তাওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং যারা গুরুত্ব ও পূর্ণতা সহকারে পবিত্রতা অর্জন করেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

পূর্ববর্তী যিকরের পরেই এ বাক্যগুলো একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত।[২]

যিক্‌র নং ৩৮ : ওযূর পরের যিক্‌র-৩

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাকা আল্লা-হুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা, আশহাদু আল্ লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, আস্তাগ্বফিরুকা, ওয়া আতূবু

ইলাইকা।

অর্থ: "আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ, এবং আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।"

আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেউ ওযুর পরে এ দু'আটি বললে তা একটি পত্রে লিখে তা মোহরাঙ্কিত করে (আরশের নিচে) রাখা হবে। কিয়ামতের আগে সে মোহর ভাঙ্গা হবে না। হাদীসটি সহীহ।[১]

যিকর নং ৩৯: ওযূর পরে তাহিয়্যাতুল ওযূ

ওযূর পরেই দু রাক'আত সালাতের গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুন্দর ও পরিপূর্ণরূপে ওযূর পর যখন মুমিন সালাত পড়েন তখন তার গোনাহ ক্ষমা করা হয়। উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে কোনো মুসলিম যদি সুন্দরভাবে ওযূ করার পর নিজের মন ও মুখ সালাতের দিকে ফিরিয়ে (দেহ-মনের অনুভূতি ও মনোযোগ সহকারে) দু রাক'আত সালাত আদায় করে, তবে তার জন্য জান্নাত পাওনা হয়ে যায়।"[২]

এ অর্থে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে ওযূর পরে মনোযোগ-সহ দু রাক'আত সালাতের অভাবনীয় পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে।[৩]

উল্লেখ্য যে, গোসলের জন্য পৃথক কোনো মাসনূন যিক্‌র নেই। ওযূর আগে-পরে পালনীয় যিকরগুলো গোসলের আগে-পরেও পালনীয়।[৪]

৩. ৩. ৩. আযান ও ইকামত

আযান দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ফযীলতের ইবাদত। সকল মুসলিমের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে সুযোগ পেলে সালাতের জন্য আযান দেওয়া। সর্বাবস্থায় আমরা অধিকাংশ মানুষই আযান দিতে পারি না, বরং শ্রবণ করি। আমরাও যেন আযানকে কেন্দ্র করে অগণিত পুরস্কার ও বরকত অর্জন করতে পারি সে সুযোগ প্রদান করছেন মহান রাব্বুল আলামীন।

অনেক স্থানে আযানের পূর্বে মুয়াযযিন নিজে বা শ্রোতাগণ দরুদ সালাম পাঠ করেন বা মুয়াযযিন আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলেন। এগুলো সুন্নাত বিরোধী কর্ম। এ সকল কর্মকে যারা পছন্দ করেন তাঁদের যুক্তি: আ'উযুবিল্লাহ- বিসমিল্লাহ বা দরুদ সালাম পাঠ তো ভাল কাজ এবং কখনো না-জায়েয নয়।

কথাটি শুনতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু এখানে সমস্যা জায়েয বা না-জায়েয নিয়ে নয়, সুন্নাত নিয়ে। সুন্নাত অনুসারে সাহাবীদের মতো আযান দিলে কি আমাদের কোনো অসুবিধা আছে ? তাতে কি আমাদের সাওয়াব কম হবে?

এ সময়ে এসকল যিক্‌র সুন্নাত-সম্মত নয়, বরং সুন্নাত বিরোধী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে প্রায় ১০ বছর তাঁর মুয়াযযিনগণ এবং অন্যান্য অগণিত মুয়াযযিন মুসলিম জনপদগুলোতে আযান দিয়েছেন। তাঁর পরে সাহাবীগণের যুগে শতবছর ধরে অগণিত মুয়াযযিন আযান দিয়েছেন। তাঁরা কেউ কখনো একটিবারও আযানের আগে বা পরে আ'উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বা দরুদ পাঠ করে নেননি; যদিও এগুলোর ফযীলত তাঁরা জানতেন। এজন্য এগুলো আযানের আগে না বলাই সুন্নাত। বললে সুন্নাত বর্জন করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতকে ছোট করা হবে। মনে করা হবে যে, তাঁর শেখানো ও আচরিত আযানের মধ্যে একটু কমতি রয়ে গেছে, তাই শুরুতে এগুলো যুক্ত করে তাকে পূর্ণতা দেওয়া হলো।

এসকল মাসনূন যিক্‌র বা ইবাদতের সাথে কোনো রকম সংযুক্তির ভয়াবহ পরিণতি সুন্নাতের মৃত্যু ও অপসারণ। যদি কোনো এলাকায় কয়েক বছর যাবৎ আ'উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বলে অথবা দরুদ পাঠ করে আযান দেওয়া হয় তবে একসময় এগুলো আযানের অংশে পরিণত হবে। তখন যদি কেউ এগুলো বাদে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের মতো আযান প্রদান করেন, তাহলে তাকে খারাপ মনে করা হবে, তার আযানকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হবে ও সমালোচনা করা হবে। যদি কেউ বলে – এগুলোতো আযানের অংশ নয়; তাহলে বলা হবে – আমরাও বলছি না যে, এগুলো আযানের অংশ, তবে এগুলো বলা ভাল, এগুলোর ফযীলত আছে, কেন সে এগুলো বলবে না? ... ইত্যাদি। এভাবে একসময় আমাদের আযান ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযান ভিন্ন রকমের হয়ে যাবে। সুন্নাত মৃত্যুবরণ করবে, সুন্নাতকে ঘৃণা করা হবে এবং অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হবে।

যিক্‌র নং ৪০ : আযানের জাওয়াব

বিভিন্ন হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মুয়াযযিন আযানে যা যা বলবেন শ্রোতাও তা-ই বলবেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে (আযান দিতে) শুনবে, তখন সে যা বলে তদ্রূপ বলবে।"[১]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন বিলাল (রা) আযান দিলেন। আযান শেষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন:

مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"এ ব্যক্তি (মুয়াযযিন) যা বলল, তা যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" হাদীসটি হাসান।[২]

উপরের হাদীসদুটি থেকে বুঝা যায় যে, মুয়াযযিন যা বলবেন, উত্তরে অবিকল তাই বলা হবে। কোনো ব্যতিক্রম বলতে বলা হয়নি। তবে উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম শিক্ষা দিয়েছেন- মুয়াযযিন 'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বললে, শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন। এ হাদীসে তিনি আরো বলেন:

إِذا قَالَ ... مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"এভাবে যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের সাথে সাথে আযানের বাক্যগুলো অন্তর থেকে বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩]

আমাদের দেশের একটি বহুল প্রচলিত রীতি, ফজরের আযানের সময় যখন মুয়াযযিন "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" – বলেন, তখন শ্রোতা "সাদাকতা ও বারিরতা (বারারতা)" অর্থাৎ, "তুমি সত্য বলেছ এবং পুণ্য করেছ" বলেন। আযানের জবাবে এ কথাটি খেলাফে সুন্নাত। ইবনু হাজার আসকালানী, মুল্লা আলী কারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস বলেছেন যে, আযানের জবাবে এ বাক্যটি বানোয়াট, মাওযূ ও ভিত্তিহীন। কোনো সহীহ বা যয়ীফ সনদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা কোনো সাহাবী থেকে এই দু'আটি বর্ণিত হয়নি। মূলত শাফেয়ী মাযহাবের কোনো কোনো ফকীহ নিজের মন থেকে এ বাক্যটিকে এ সময়ে বলার জন্য মনোনীত করেন। পরবর্তী যুগে তা অন্যান্য মাযহাবের অনেক আলিম গ্রহণ করেছেন।[৪]

এ সকল আলিম এ বাক্যটিকে এ সময়ে বলা পছন্দনীয় বলে মনে করেছেন। কারণ, "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" –বাক্যের অর্থের সাথে এ কথাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে:

প্রথমত, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের বিরোধিতা করা হচ্ছে। কারণ উপরের হাদীসগুলোতে তিনি আমাদেরকে অবিকল মুয়াযযিনের অনুরূপ বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। একমাত্র "হাইয়া আলা ... "-এর সময় ছাড়া অন্য কোনো ব্যতিক্রম তিনি শিক্ষা দেননি। এ সকল হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ যে, একমাত্র এ ব্যতিক্রম ছাড়া হুবহু মুয়াযযিনের মতই বলতে হবে। মুয়াযযিন যখন "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" বলবেন, তখন শ্রোতাও অবিকল তা-ই বলবেন। এর ব্যতিক্রম করলে উপরের হাদীসগুলো পূর্ণরূপে মান্য করা হবে না।

দ্বিতীয়ত, এতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুন্নাতে নববীর প্রতি অবজ্ঞা করা হচ্ছে। কারণ আযান দেওয়া ও আযানের জবাব দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আচরিত ও শেখানো একটি অত্যন্ত জরুরি ও প্রতিদিনে বহুবার পালন করার মত ইবাদত। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে আযান ও আযানের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি সাহাবীগণকে শিখিয়েছেন এবং তাঁরা তা পালন করেছেন। তিনি আযানের উত্তরে এ বাক্যটি বলেন নি বা শেখান নি। সাহাবীগণও বলেন নি। এখানে অর্থের সামঞ্জস্যতার কথাও তাঁরা অনুভব করেন নি। তাঁদের পরে আমরা কী-ভাবে একটি মাসনূন ইবাদতের মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারি? কী জন্যই-বা করব? অবিকল তাঁদের মতো আযানের জবাব দিলে কি আমাদের সাওয়াব কম হবে? না সেভাবে জবাব দিতে আমাদের কোনো কঠিন বাধা বা অসুবিধা আছে?

প্রিয় পাঠক, সুন্নাতের মধ্যে থাকা আমাদের নিরাপত্তা। সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত তৈরি করে আমরা কিভাবে বুঝব যে তা আল্লাহ কবুল করবেন? আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের মধ্যে থাকার তৌফিক প্রদান করুন; আমীন।

যিক্‌র নং ৪১ : মুয়াযযিনের শাহাদতের জন্য বিশেষ যিক্‌র

(وَأَنَا) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وبَالإِسْلاَمِ دِيْناً

উচ্চারণ: [ওয়া আনা] আশ্‌হাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু, লা- শারীকা লাহু, ওয়া আন্না মু'হাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদ্বীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমু'হাম্মাদিন নাবিয়্যান।

অর্থ : "এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি তুষ্ট ও সন্তুষ্ট আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদকে (ﷺ) নবী হিসাবে (বিশ্বাস ও গ্রহণ করে)।"

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি মুআযযিনকে শুনে এ বাক্যগুলো বলবে তার সকল পাপ ক্ষমা

করা হবে।"[১]

যিক্‌র নং ৪২ : আযানের পরে দরুদ পাঠ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন সে যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে। এরপর আমার উপর সালাত পাঠ করবে ; কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁকে দশবার সালাত (রহমত) প্রদান করবেন। এরপর আমার জন্য 'ওসীলা' চাইবে ; কারণ 'ওসীলা' জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই এ মর্যাদা লাভ করবেন এবং আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে, তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হয়ে যাবে।"[২]

যিক্‌র নং ৪৩: আযানের পরে ওসীলার দুআ

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ اَلدَّعْوَةِ اَلتَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اَلَّذِيْ وَعَدْتَهُ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, রাব্বা হা-যিহিদ দা'অ্ওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস স্বালা-তিল ক্বা-য়িমাতি, আ-তি মু'হাম্মাদান আল-ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াব'আসহু মাকা-মাম মা'হমুদানিল্লাযী ও'য়াদতাহু।

অর্থ: "হে আল্লাহ, এ পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদ ﷺ-কে ওসীলা (নৈকট্য) এবং মহা মর্যাদা এবং তাঁকে উন্নীত করুন সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন।"

'ওসীলা' অর্থ নৈকট্য। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর যা আল্লাহর আরশের সবচেয়ে নিকটবর্তী তাকে 'ওসীলা' বলা হয়। এ স্থানটি আল্লাহর একজন বান্দার জন্য নির্ধারিত, তিনিই মুহাম্মাদ ﷺ। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুয়াযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি উপরের বাক্যগুলো বলবে, তাঁর জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত পাওনা হয়ে যাবে।"[৩]

আযানের দু'আর মধ্যে দুটি বাক্যাংশ অতিরিক্ত বলা হয় যা সহীহ সনদে বর্ণিত নয়। প্রথমত: (**والفضيلة** : ওয়াল ফাদীলাতা)-র পরে **والدرجة الرفيعة** (এবং সুউচ্চ মর্যাদা) বলা হয়। দ্বিতীয়: এ দু'আর শেষে: ' **إنك لا تخلف الميعاد** ' (নিশ্চয় আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না) বলা। এ দ্বিতীয় বাক্যটি একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] আর প্রথম বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ) একেবারেই ভিত্তিহীন।

ইবনু হাজার আসকালানী, সাখাবী, যারকানী, আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন যে, এ বাক্যটি (ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'য়াহ) বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মাসনূন দু'আর মধ্যে এ ভিত্তিহীন বাক্যটি বৃদ্ধি করা সুন্নাত বিরোধী ও অন্যায়।[৫]

আযানের পর দরুদ পাঠ, ওসীলার দু'আ পাঠ ও নিজের জন্য দু'আ চাওয়া সবই ব্যক্তিগতভাবে মনে মনে আদায় করা সুন্নাত। এগুলো সশব্দে বা সমবেতভাবে আদায় করা খেলাফে সুন্নাত। আযানের পরে মাইকে ওসীলার দু'আ পাঠ করার অর্থ মিনারে দাঁড়িয়ে আযান দিয়ে আযানের পরে ঠিক আযানের মতো চিৎকার করে দু'আ পাঠ, যা সুন্নাত বিরোধী।

এভাবে দু'আ পাঠের রীতি প্রচলনের ফলে আযানের পরে দরুদ পাঠের সুন্নাত ও আযানের পরে ওসীলার দু'আ মনে মনে পাঠের সুন্নাতের মৃত্যু ঘটছে। সর্বোপরি একটি নতুন বিদ'আত জন্মগ্রহণ করবে। কিছুদিন পরে দেখা যাবে, যদি কেউ অবিকল বিলাল (রা) ও অন্যান্য সাহাবীগণের মতো আযান জোরে দেন এবং পরের দু'আ মৃদু শব্দে বা মনে মনে পাঠ করেন তখন মানুষ বলতে থাকবে, 'আহা, দু'আটা পড়ল না!' – এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়কার আযান তাদের নিকট 'অসম্পূর্ণ আযান' বলে প্রতিপন্ন হবে।

যিকর নং ৪৪: ইকামত-এর বাক্যাবলি

ইকামতে বাক্যগুলি কিভাবে বলতে হবে? অবিকল আযানের মত দুবার করে? না শুধু একবার করে? এ নিয়ে আমাদের সমাজে মুসলিমগণ ঝগড়া ও বিতর্কে লিপ্ত হন। অথচ উভয় বিষয়ই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং কোনো বিষয়ই মাযহাবে নিষিদ্ধ নয়। মুহাদ্দিসগণ ও মাযহাবের ইমামগণ এ সকল ক্ষেত্রে মূলত একটি হাদীসকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অন্য হাদীস নির্দেশিত আমল তাঁরা হারাম বা 'না-জায়েয' বলেন নি, বরং অনুত্তম বলে গণ্য করেছেন। একাধিক সহীহ হাদীসে বর্ণিত যে, আযানের বাক্যগুলো দুবার করে এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলতে হবে। শুধু "কাদ কামাতিস সালাত" দুবার বলতে হবে। যেমন এক হাদীসে আনাস (রা) বলেন:

أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ (إِلاَّ الإِقَامَةَ)

"বিলাল (রা)-কে আযনের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের বাক্যগুলো বেজোড় বলতে নির্দেশ দেওয়া হয় (রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন), শুধু 'কাদ কামাতিস সালাত' বাদে"।[১]

অপরদিকে ইকামতের শব্দগুলিকে আযানের মত জোড়ায় জোড়ায় বলাও কয়েকটি সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। একটি হাদীসে তাবিয়ী আব্দুর রাহমান ইবন আবী লাইলা বলেন, আমাদেরকে সাহাবীগণ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ (রা) আযান ও ইকামতের বর্ণনায় বলেন:

فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى

"তিনি জোড়া বাক্যে আযান দেন এবং জোড়া বাক্যে ইকামত দেন।" শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন: হাদীসটি সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ (إسناده في غاية الصحة)। এ অর্থে অন্যান্য সহীহ বা হাসান হাদীস বিদ্যমান।[২]

যে বিষয়গুলোতে উভয় মতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হাদীস বিদ্যমান সেক্ষেত্রে চার ইমাম ও সাহাবী-তাবিয়ীগণের রীতি উভয় আমল বৈধ বলা, অথবা একটিকে অগ্রগণ্য করা, নিজের মতের পক্ষে দলিল পেশ করা, কিন্তু অন্য মতটিকে অবৈধ না বলা। বিশেষত এ ধরনের বিষয়ে ঝগড়া করা বা অপরপক্ষকে হেয় করা কুরআন-হাদীসে নিষিদ্ধ হারাম কর্ম এবং এরূপ হারাম কর্মকে 'দীন' মনে করা বা দীনের নামে এরূপ কর্ম করা একটি কঠিন হারাম বিদআত।

যিকর নং ৪৫: ইকামতের জবাব

ইকামতকেও হাদীসে 'আযান' বলা হয়েছে। এজন্য ইকামত শুনলেও আযানের মতো জবাব দেওয়া উচিত। মুয়াযযিন যা বলবেন, তাই বলতে হবে। "হাইয়া আলা.."-এর সময় "লা হাওলা..." বলতে হবে। উপরের হাদীসগুলোর আলোকে "কাদ কামাতিস সালাহ" বাক্যদ্বয়ও মুয়াযযিনের অনুরূপ বলা প্রয়োজন। একটি দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার মুয়াযযিনের "কাদ কামাতিস সালাহ" বলতে শুনে বলেছিলেন :

أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

"আল্লাহ একে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং স্থায়ী করুন।" বাকি জবাব আযানের জবাবের নিয়মে প্রদান করেন।[৩]

৩. ৪. সালাতের যিকর

৩. ৪. ১. সানা ও তিলাওয়াতকালীন যিক্‌র

সালাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পরেই যে দু'আ বা যিক্‌র পাঠ করা হয় তাকে আমরা 'সানা' বলি। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন আবেগময় মর্মস্পর্শী দু'আ ও যিক্‌র পাঠ করতেন। এগুলোর মধ্য থেকে একটিমাত্র দু'আ আমরা সানা হিসাবে পাঠ করি। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ ফরয সালাতের ক্ষেত্রে এ 'সানা' ও দ্বিতীয় সানাটি পাঠ করতে বলেছেন। সুন্নাত-নফল সালাতের ক্ষেত্রে সকল মাসনূন 'সানা' পাঠ করা যায়। এ সকল মাসনূন 'সানা' অর্থসহ মুখস্থ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 'সানা' পাঠ করলে সালাতের মনোযোগ, ও আন্তরিকতা বহাল থাকে। নইলে মুসল্লী অভ্যস্তভাবে খেয়াল না করেই কখন সানা পড়ে শেষ করেন তা টেরও পান না। এখানে সানার কয়েকটি দু'আ লিখছি।

যিক্‌র নং ৪৬: সানার দুআ-১

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুব'হা-নাকাল্লা-হুম্মা, ওয়া বি'হামদিকা, ওয়া তাবা-রাকাসমুকা, ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা, ওয়া লা- ইলা-হা গ্বাইরুকা।

অর্থ: "আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ, এবং আপনার প্রশংসাসহ। আর মহাবরকতময় আপনার নাম, সুউচ্চ আপনার মর্যাদা। আর কোনো মা'বুদ নেই আপনি ছাড়া।" রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের শুরুতে একথাগুলো বলতেন।[৪]

যিক্‌র নং ৪৭: সানার দুআ-২

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِيْ وَنُسُكِيْ

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِي جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ: ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদা 'হানীফাও ওয়া মা- আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না স্বালা-তী ওয়া নুসূকী ওয়া মাহইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল 'আলামীন। লা- শারীকা লাহু, ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু, ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, ওয়া আনা 'আবদুকা। যালামতু নাফসী, ওয়া'অ-তারাফতু বিযানবী, ফাগ্বফিরলী যুনূবী জামিয়ান; ইন্নাহু লা- ইয়াগ্বফিরুয যুনূবা ইল্লা-আনতা। ওয়াহ্‌দিনী লিআহসানিল আখলা-ক; লা- ইয়াহ্‌দী লিআহসানিহা- ইল্লা-আনতা। ওয়াসরিফ 'আন্নী সাইয়িআহা- লা- ইয়াসরিফু 'আন্নী সাইয়িআহা- ইল্লা- আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা'অ্‌দাইকা। ওয়াল খাইরু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা। ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলাইকা। আনা বিকা ওয়া ইলাইকা। তাবা-রাকতা ওয়া তা'আ-লাইতা। আস্‌তাগ্বফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।

অর্থ: "আমি সুদৃঢ়ভাবে আমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করেছি তাঁর দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন এবং আমি শিরকে লিপ্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানি-ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্যই, তিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক প্রভু। তাঁর কোনো শরীক নেই। এবং এ জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে। এবং আমি আত্মসমর্পণকারীগণের একজন। হে আল্লাহ, আপনিই সম্রাট। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি অত্যাচার করেছি আমার আত্মার উপর এবং আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। আর আপনি পরিচালিত করুন আমাকে উত্তম আচরণের পথে, আপনি ছাড়া কেউ উত্তম আচরণের পথে পরিচালিত করতে পারে না। আর আপনি আমাকে খারাপ আচরণ থেকে দূরে রাখুন, আপনি ছাড়া আর কেউ খারাপ আচরণ থেকে দূরে রাখতে পারে না। আপনার ডাকে আমি সাড়া প্রদান করছি, আমি সানন্দে সাড়া প্রদান করছি। সকল কল্যাণ আপনার হাতে এবং অকল্যাণ আপনার দিকে নয়। আমি আপনারই সাহায্যে ও আপনারই দিকে। মহা বরকতময় আপনি এবং সুমহান আপনি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন (তাওবা) করছি।"

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শুরু করে একথা বলতেন।[১]

হানাফী মযহাবের ফকীহগণ ফরয সালাতের সানা এ দুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে হানাফী ফিকহের অধিকাংশ গ্রন্থে "আনা মিনাল মুসলিমীন" পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসূফ (রহ) দুটি সানা একত্রে প্রত্যেক সালাতের শুরুতে পাঠ করা উত্তম ও মুসতাহাব বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

জায়নামাযের দু'আ খেলাফে সুন্নাত

আমাদের দেশে দ্বিতীয় সানাটি জায়নামাযের দু'আ বলে প্রচলিত। সালাত শুরু করার আগে জায়নামাযে বা সালাতের স্থানে দাঁড়িয়ে এই দু'আটি পাঠ করার রীতি সুন্নাত বিরোধী। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ করেছেন। একদিনও তিনি তাকবীরে তাহরীমার আগে তা পাঠ করেননি। আমাদের ইমামগণও তাকবীরে তাহরীমার পরে পাঠ করা সুন্নাত বলেছেন। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও ইমামগণের মতামতের তোয়াক্কা না করে মনগড়াভাবে এ দু'আটিকে তাকবীরে তাহরীমার আগেই পড়ে নিচ্ছি।

পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ এ দু'আটি তাকবীরে তাহরীমার আগে পড়া যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ দু'আর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ করলে সালাতের মধ্যে 'আল্লাহর জন্যই সালাত পড়া'-এর দৃঢ় ইচ্ছা আরো দৃঢ়তর হয়। এভাবে বানোয়াট যুক্তি দিয়ে যদি আমরা সালাতের জন্য খেলাফে সুন্নাত রীতি তৈরি করতে থাকি তাহলে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতির সালাত অপরিচিত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে শেষ বৈঠকে সালাত বা দরুদ পাঠের রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এখন আমরা কি সালাত কবুল হবে যুক্তি দিয়ে তা বাদ দিয়ে সালাতের তাকবীরে তাহরীমার আগে দরুদ পাঠের রীতি চালু করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ চোখ মেলে সালাত পড়ার রীতি চালু করেছেন। আমরা কি মনোযোগ বৃদ্ধির যুক্তিতে চোখবুজে সালাতের রীতি চালু করব?

কখন কোন্ দু'আ পড়লে সবচেয়ে বেশি ভাল হবে তা তিনিই জানতেন এবং শিখিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব অবিকল তাঁর অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদের সুন্নাতের মধ্যে তৃপ্ত থাকার তাওফীক দান করুন; আমীন।

যিক্‌র নং ৪৮: সানার দুআ-৩

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا

يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা- বা-'আদ্‌তা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্লা-হুম্মা, নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া- কামা- ইউনাক্কাস সাওবুল আব্‌ইয়াদু মিনাদ দানাস। আল্লা-হুম্মাগসিল খাতা-ইয়া-ইয়া বিলমা-ই ওয়াস সাল্‌জি ওয়াল বারাদ।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন আমার ও আমার পাপের মধ্যে যেমন দূরত্ব আপনি রেখেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে (আমাকে সকল প্রকার পাপ থেকে শত যোজন দূরে থাকার তাওফীক প্রদান করুন)। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করুন পাপ থেকে, যেমনভাবে পরিচ্ছন্ন করা হয় ধবধবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। হে আল্লাহ আপনি ধৌত করুন আমার পাপরাশী পানি, বরফ এবং তুষার-শিলা দ্বারা (আমার হৃদয়কে পাপমুক্তি ও অনন্ত প্রশান্তি প্রদান করুন)।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার পরে কিরা'আতের করার আগে অল্প সময় চুপ করে থাকতেন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানি হোক, আপনি তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যবর্তী সময়ে নীরব থাকেন, এ সময়ে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, আমি এ সময়ে বলি: (উপরের বাক্যগুলো)।[১]

যিক্‌র নং ৪৯: সানার দুআ-৪

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, রাব্বা জিবরা-ঈল ওয়া মীকা-ঈল ওয়া ইসরা-ফীল, ফা-তিরাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি, 'আ-লিমাল 'গাইবি ওয়াশহা-দাতি, আন্‌তা তা'হ্‌কুমু বাইনা 'ইবা-দিকা ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়া'খ্‌তালিফূন, ইহ্‌দিনী লিমা'খ্‌তুলিফা ফীহি মিনাল 'হাক্কি বিইয্‌নিকা ইন্নাকা তাহ্‌দী মান্ তাশা-উ ইলা স্বিরাত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম।

অর্থ : "হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনার বান্দারা যে সকল বিষয় নিয়ে মতভেদ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে আপনিই ফয়সালা প্রদান করবেন। যে সকল বিষয়ে সত্য বা হক্ক নির্ধারণে মতভেদ হয়েছে সে সকল বিষয়ে আপনি আপনার অনুমতিতে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আপনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সিরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত করেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাতের শুরুতে এ দুআটি পাঠ করতেন।[২]

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক গবেষক, আলিম, মুফতী ও সত্যসন্ধানী মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদের শুরুতে, সাজদায় ও অন্যান্য সকল সময়ে এ দুআটি বেশি বেশি পাঠ করা। নিজের গবেষণা, ইলম বা অন্য কোনো কিছুর উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে মহান আল্লাহর কাছে এ দুআর মাধ্যমে পথনির্দেশনা চাওয়া খুবই প্রয়োজন।

যিক্‌র নং ৫০: সালাতের তিলাওয়াত কালীন যিকর

আমরা দেখেছি যে, কুরআনই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যিকর। সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত মূল যিকর। এছাড়া তাহাজ্জুদের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াতের ফাঁকে ফাঁকে দুআ করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবূ হানীফা ফরয সালাতে ও জামাতে সালাতেও ইমাম ও মুক্তাদীদের জন্য এরূপ দুআ করার অনুমতি দিয়েছেন, যদি এভাবে দুআ না করে কুরআন তিলাওয়াত বা শ্রবণের শ্রেষ্ঠ যিকরে ব্যস্ত থাকাকেই উত্তম বলে গণ্য করেছেন। তবে তাহাজ্জুদের সালাতে বা একাকী সালাতে এভাবে তিলাওয়াতের মাঝে মাঝে দুআ করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং সালাতের খুশু বা মনোযোগ বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণ তিলাওয়াত-কৃত আয়াতের অর্থের ভিত্তিতে দুআ করতেন। এখানে একটি সাধারণ দুআ উদ্ধৃত করছি।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لاَ يَرْتَدُّ، وَنَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ.

বাকর (রা) ও উমার (রা) উভয়ের সাথে মসজিদে প্রবেশ করেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) তখন সূরা নিসা পাঠ করছিলেন। তিনি সূরা নিসার ১০০ আয়াতে পৌঁছে সালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় দুআ করতে শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বার বললেন: তুমি দুআ কর তোমার দুআ কবুল হবে। তখন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এ কথাগুলো বলে দুআ করেন। হাদীসটি হাসান।[১]

তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন পাঠের সময়, সালাতের মধ্যে, সালামের আগে, পরে ও সকল সময়ে এ দুআটি পাঠ করা উচিত।

৩. ৪. ২. রুকুর যিকর

আমরা উপরে উল্লেখিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে রুকু ও সাজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকু অবস্থায় তোমরা তোমাদের মহান প্রভুর মর্যাদা-বাচক স্তুতি পাঠ করবে। রুকুতে আল্লাহর তাযীম প্রকাশের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক প্রকার বাক্য ব্যবহার করতেন ও করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম:

যিক্‌র নং ৫১ : রুকুর যিক্‌র-১

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ/ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ: সুব'হা-না রাব্বিয়াল 'আযীম (ওয়া বিহামদিহী)।

অর্থ: মহাপবিত্র আমার মহান প্রভু (এবং তাঁর প্রশংসা-সহ)।

মনের আবেগ নিয়ে এ ঘোষণা বার বার দিতে হবে। কমপক্ষে ৩ বার এ তাসবীহ পাঠ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরিত ও নির্দেশিত কর্ম। অধিকাংশ বর্ণনায় "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আযীম" এবং কোনো কোনো হাদীসে "সুবাহানা রাব্বিয়াল আযীম ওয়া বিহামদিহী" বর্ণিত হয়েছে।[২]

যিক্‌র নং ৫২ : রুকুর যিক্‌র-২

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ ও অর্থ: পূর্ববর্তী অধ্যায়ের যিকর নং ৭ দ্রষ্টব্য। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু ও সাজদায় এটি পাঠ করতেন।[৩]

যিক্‌র নং ৫৩ : রুকুর যিক্‌র-৩

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّيْ وَعِظَامِيْ وَعَصَبِىْ

উচ্চারণ: আল্‌-হুম্মা লাকা রাকা'অ্‌তু ওয়া বিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আস্‌লামতু, খাশা'আ লাকা সাম'ই ওয়া বাসারী ওয়া মুখখী ওয়া 'আযমী ওয়া 'আসাবী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনারই জন্য রুকু করেছি, এবং আপনার উপরেই ঈমান এনেছি এবং আপনারই কাছে সমর্পিত হয়েছি। ভক্তিতে অবনত হয়েছে আপনার জন্য আমার শ্রবণ, আমার দৃষ্টি, আমার মস্তিষ্ক, আমার অস্থি ও আমার স্নায়ুতন্ত্র।"

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে এ কথাগুলো বলতেন।[৪]

যিকর নং ৫৪: রুকু থেকে উঠার যিকর

রুকু থেকে উঠার সময় বলতে হয়: (سمع الله لمن حمده): "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ", অর্থাৎ "শ্রবণ (কবুল) করেন আল্লাহ যে তার প্রশংসা করে।" এ বাক্যকে **'তাসমী'** বা শ্রবণের ঘোষণা বলা হয়। স্বভাবতই এ কথার পরে আল্লাহর প্রশংসা করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে যায়। এজন্য রুকু থেকে উঠার পর **'তাহমীদ'** বা আল্লাহর প্রশংসাজ্ঞাপন বিভিন্ন বাক্য বলতে শিখিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।

একা সালাত আদায়কারী "তাসমী" এবং "তাহমীদ" উভয় বাক্যই বলবেন। মুক্তাদীগণ ইমামের তাসমী শুনে "তাহমীদ" বা প্রশংসাজ্ঞাপক বাক্য বলবেন। সামান্য মতভেদ রয়েছে ইমামের "তাহমীদ" বলা নিয়ে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর মতে ইমাম শুধু 'তাসমী' বলবেন, 'তাহমীদ' বলবেন না। পক্ষান্তরে তাঁর দু ছাত্র হানাফী মাযহাবের অন্য দু ইমাম, আবূ ইউসূফ (রাহ) ও মুহাম্মাদ (রাহ) এর মতে ইমামও তাসমী বলার পর তাহমীদ বলবেন।[৫]

সকল ইমামই হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন।

إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আযম (রাহ) বলেছেন যে, ইমাম শুধু 'সামিআল্লাহ...' বলবেন এবং মুক্তাদী 'রাব্বনা...' বলবেন। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের অন্য দু ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ) ও মুহাম্মাদ (রাহ) ইমাম ও মুক্তাদী সকলকেই এ কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের মতের দলীলগুলো হানাফী ফিকহের গ্রন্থগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপঃ

(১) বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণ হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার পর 'রাব্বানা লাকাল হামদ....' বলতেন। এ সকল সুস্পষ্ট হাদীস থেকে প্রমাণ হয় ইমাম দুটি বাক্যই বলবেন। উপরের হাদীসের অর্থ, সালাতের নিয়ম সকল বিষয়ে ইমামের অনুসরণ করা। এজন্য ইমাম তাকবীর বললে মুক্তাদীদেরও তাকবীর বলতে হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ইমাম 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে তোমরা তার অনুসরণ করে 'সামিআল্লাহু ...' না বলে 'রাব্বানা ...' বলবে। ইমাম 'রাব্বানা...' বলবে কি না সে বিষয়টি এ হাদীসে বলা হয় নি, কিন্তু অন্যান্য হাদীস থেকে তা জানা যায়।[১]

(২) একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ ইমাম 'ওয়ালা-দ্বোয়ালীন' বললে তোমরা 'আমীন' বলবে। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম মালিক (রাহ) বলেছেন শুধু মুক্তাদীগণ 'আমীন' বলবেন, ইমাম তা বলবেন না। ইমাম মালিকের দলীলটির বিষয়ে যা বলা হয়, এখানেও সে কথাগুলো প্রযোজ্য।[২]

(৩) ইমাম হাসান ইবনু যিয়াদ লুলুয়ী (রহ) ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনিও ইমামের জন্য 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতে বলেছেন।[৩]

(৪) আলী (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী বলেছেন যে, ইমাম 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে চুপে চুপে বা নিম্নস্বরে।[৪]

(৫) সালাতের মধ্যে এমন কোনো যিকর নেই যা শুধু মুক্তাদী বলবে কিন্তু ইমাম বলতে পারবে না। এরূপ করলে ইমামের মর্যাদা ব্যাহত হয় এবং যে কর্মে ফযীলত ও সাওয়াব রয়েছে সে কর্ম থেকে ইমামকে বঞ্চিত করা হয়।[৫]

ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) মতের পক্ষে হানাফী ফকীহগণ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'সামিআল্লাহ...' ও 'রাব্বানা লাকল' দুটি বাক্যই বলতেন বলে যে সকল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে তাহাজ্জুদ ও নফল সালাত বিষয়ক বলে ধরতে হবে।[৬] তাঁদের এ ব্যাখ্যার কয়েকটি দুর্বলতা রয়েছেঃ

(১) এ সকল হাদীসের বাহ্যিক অর্থ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরয ও নফল সকল সালাতেই এভাবে দুটি বাক্যই বলতেন। বাহ্যিক অর্থ বাতিল করার কোনো কারণও নেই। কোনো হাদীসেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইমামের জন্য 'রাব্বানা লাকল হামদ' বলতে নিষেধ করেন নি, এমনকি কোনো হাদীসেই বর্ণিত হয় নি যে, তিনি কোনোদিন শুধু 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলেছেন কিন্তু 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলেন নি। নির্দেশ ও কর্মের, একাধিক কর্ম বা একাধিক নির্দেশের মধ্যে বাহ্যিক বৈপরীত্য থাকলে সেখানে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়।

(২) বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইমামতির সময়েও দুটি বাক্যই বলতেন। এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেনঃ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ الْفَجْرِ يَقُولُ ... بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতুল ফাজরের শেষ রাকআতে রুকু থেকে উঠে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলার পর বলতেন... ।[৭]

এছাড়া সাহাবীগণ থেকে বিভিন্ন হাদীসে প্রমাণিত যে, তাঁরা ইমামতির সময় দু প্রকারের বাক্যই বলতেন। এজন্য সুন্নাতের আলোকে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদ (রাহ)-এর মতই এক্ষেত্রে উত্তম। মাযহাবের ইমামদের মতভেদকে ভিত্তি করে প্রমাণিত সুন্নাত ব্যাখ্যা করে বাতিল না করে ইমামদের মতভেদকে প্রমাণিত সুন্নাত গ্রহণ করার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা উচিত।

যিক্র নং ৫৫ঃ রুকুর পরে দণ্ডায়মান অবস্থার যিক্র-১

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ / (اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ও অর্থঃ বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বাক্যটি চারভাবে বর্ণিতঃ

(১) রাব্বানা- লাকাল 'হামদঃ হে আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা।

(২) রাব্বানা- ওয়া লাকাল 'হামদঃ হে আমাদের প্রভু, এবং আপনার জন্যই প্রশংসা।

(৩) আল্লা-হুম্মা "রাব্বানা- লাকাল 'হামদ"। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা।

(৪) আল্লা-হুম্মা "রাব্বানা- ওয় লাকাল 'হামদ"। হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, এবং আপনার জন্যই প্রশংসা।

রুকু থেকে উঠে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পরে কয়েক মুহূর্ত পরিপূর্ণ সোজা দণ্ডায়মান থাকা ওয়াজিব। পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগেই সাজদা করলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। এসময় উপরের বাক্যটি বলতে হবে। চারটি বাক্যের যে কোনো বাক্য বললেই সুন্নাত আদায় হবে। একেক সময় একেক বাক্য বলাই উত্তম। হানাফী ফকীহগণ ৪র্থ বাক্যটিকে সর্বোত্তম বলে গণ্য করেছেন। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি) বলেন:

وَالْمُرَادُ بِالتَّحْمِيدِ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَلْفَاظٍ: أَفْضَلُهَا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا فِي الْمُجْتَبَى وَيَلِيه : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَيَلِيه : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَيَلِيه الْمَعْرُوفُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"রুকু থেকে উঠে তাহমীদ বা হামদ পাঠ বলতে চারটি বাক্যের যে কোনো একটি বলা বুঝায়। মুজতাবা গ্রন্থে বলা হয়েছে, চারটির মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ বাক্য 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'। এরপর 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ'। এরপর 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'। সর্বশেষ বা ফযীলতে সর্বনিম্ন হলো সবচেয়ে পরিচিত বাক্যটি: 'রাব্বানা লাকাল হামদ'।"[১]

যিক্‌র নং ৫৬: রুকুর পরে দণ্ডায়মান অবস্থার যিক্‌র-২

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- লাকাল 'হামদু মিলআস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা- বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ মা- শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা, আকাশসমূহ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে, উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব পরিপূর্ণ করে এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা পরিপূর্ণ করে প্রশংসা আপনার।"

ইবনু আবী আউফা, ইবনু আব্বাস, আলী (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এ বাক্যগুলো বলতেন।[২]

যিক্‌র নং ৫৭: রুকুর পরে দণ্ডায়মান অবস্থার যিক্‌র-৩

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, রাব্বানা- লাকাল 'হামদু, মিলআস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিলআল আরদি ওয়া মিলআ মা- বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ মা- শি'তা মিন শাইয়িন বা'দ, আহ্‌লাস্ সানা-ই ওয়াল মাজ্‌দি। লা- মা-নি'আ লিমা- আ'ত্বাইতা, ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'ত্বা, ওয়ালা- ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা, আকাশসমূহ পরিপূর্ণ করে, পৃথিবী পরিপূর্ণ করে, উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব পরিপূর্ণ করে এবং এরপর আপনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা পরিপূর্ণ করে প্রশংসা আপনার। সকল মর্যাদা ও প্রশংসার মালিক আপনিই। আপনি যা প্রদান করেন তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর আপনি যা রোধ করেন তা কেউ প্রদান করতে পারে না। অধ্যবসায়ীর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার পরিবর্তে (আপনার ইচ্ছার বাইরে) তার কোনো উপকারে আসে না।"[৩]

যিক্‌র নং ৫৮: রুকুর পরে দণ্ডায়মান অবস্থার যিক্‌র-৪

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّباً مُبَارَكًا فِيهِ

উচ্চারণ: রাব্বানা- ওয়া লাকাল 'হামদু, 'হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবান মুবা-রাকান ফীহি।

অর্থ: "হে আমাদের প্রভু, এবং আপনারই প্রশংসা, অশেষ প্রশংসা, পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা।"

রিফাআহ ইবনু রাফি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একব্যক্তিকে রুকুর পরে এ বাক্যগুলো বলতে শুনে খুব প্রশংসা করে বলেন: আমি দেখলাম ত্রিশের অধিক ফিরিশতা বাক্যগুলো লিখে নেয়ার জন্য পাল্লা দিচ্ছে।[৪]

৩. ৪. ৩. সাজদার যিকর

ইতোপূর্বে বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, সাজদার মধ্যে আল্লাহর তাসবীহ ও মর্যাদা প্রকাশ এবং বেশি বেশি দু'আ করা প্রয়োজন।

যিক্‌র নং ৫৯: সাজদার যিকর-১

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى/ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ : সুব্‌'হা-না রাব্বিয়াল আ'অ্‌লা- (ওয়া বিহামদিহী) ।

অর্থ: "মহাপবিত্র আমার প্রভু যিনি সর্বোচ্চ (এবং তাঁর প্রশংসা-সহ) ।"

মনের আবেগ নিয়ে এ ঘোষণা বার বার দিতে হবে। কমপক্ষে ৩ বার এ তাসবীহ পাঠ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আচরিত ও নির্দেশিত কর্ম। অধিকাংশ বর্ণনায় "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা" এবং কোনো কোনো হাদীসে "সুবাহানা রাব্বিয়াল আ'লা ওয়া বিহামদিহী" বর্ণিত হয়েছে।[১]

উপরে উল্লেখ করেছি যে তিনি "সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকতি ওয়ার রূহ" রুকু ও সাজাদায় বলতেন।

এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দেখেছি যে, সাজদা অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। এ গ্রন্থে বিভিন্ন কর্মে বা উপলক্ষে যে সকল মাসনূন দুআ উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সবই সাজদায় পাঠ করা যায়। এ ছাড়া কুরআন ও হাদীসের যে কোনো দুআ বা এগুলোর অর্থবোধক যে কোনো দুআ সাজদায় পাঠ করা যায়। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সকল দুআ পাঠ করতেন সেগুলো থেকে কয়েকটি উল্লেখ করছি। উপরের যিকরটি তিনবার বলার পর এ সকল দুআ বা অন্যান্য দুআ পাঠ করবেন।

যিক্‌র নং ৬০: সাজদার যিকর-২

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ ফির লী যাম্বী কুল্লাহু, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউআলাহু ওয়া আ-খিরাহু, ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সকল পাপ, ছোট পাপ, বড় পাপ, প্রথম পাপ, শেষ পাপ, প্রকাশ্য পাপ, গোপন পাপ।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদার মধ্যে বলতেন... ।[২]

যিক্‌র নং ৬১: সাজদার যিকর-৩

اللَّهُمَّ (إِنِّيْ) أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, (ইন্নী) আ'ঊযু বিরিদা-কা মিন সাখাতিক, ওয়া বি মু'আ-ফা-তিকা মিন 'উকূবাতিকা, ওয়া আ'ঊযু বিকা মিনকা, লা- উহসী সানা-আন 'আলাইকা। আনতা কামা- আসনাইতা 'আলা- নাফসিকা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রাথনা করছি এবং আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার কাছে আপনার থেকে। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। আপনি ঠিক তেমনি যেমন আপনি আপনার নিজের প্রশংসা করেছেন।"

আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় পেলাম না। (অন্ধকারে) আমি তাকে খুঁজলাম। তখন আমার হাত তার পায়ের তালুতে লাগল। তিনি তখন সাজদায় ছিলেন ও পা দুটি খাড়া ছিল। তিনি বলছিলেন.. ।[৩]

যিক্‌র নং ৬২: সাজদার যিকর-৪

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَأَمَامِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَفَوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا (وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا) وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا (وَفِيْ عَصَبِيْ نُوْراً وَفِيْ لَحْمِي نُوْراً وَفِيْ دَمِي نُوْراً وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْراً وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْراً)، اللَّهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ্-'আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়াফী সাম'য়ী নূরান, ওয়াফী বাস্বারী নূরান, ওয়া 'আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া 'আন শিমালী নূরান, ওয়া আমা-মী নূরান, ওয়া খালফী নূরান, ওয়া ফাওক্বী নূরান, ওয়া তা'হ্‌তী নূরান, ওয়াজ্-'আল লী নূরান, ওয়াজ্-'আলনী নূরান, ওয়াজ্'আল ফী নাফ্‌সী নূরান, ওয়া ফী 'আসাবী নূরান, ওয়াফী লা'হ্‌মী নূরান, ওয়াফী দামী নূরান, ওয়াফী শা'অ্‌রী নূরান, ওয়াফী বাশারী নূরান, আল্লাহুম্মা, আ'অ্‌তিনী নূরান।

অর্থ: "হে আল্লাহ আপনি প্রদান করুন আমার অন্তরে নূর, আমার শ্রবণে নূর, আমার দৃষ্টিতে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আপনি আমার জন্য নূর দান করুন, আপনি আমাকে নূর বানিয়ে দিন। প্রদান করুন আমার নফসে নূর, আমার স্নায়ুতন্ত্রে নূর, আমার মাংসে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার চুল-পশমে নূর, আমার চামড়ায় নূর। হে

আল্লাহ আমাকে প্রদান করুন নূর।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতের মধ্যে বা সাজদায় এ দুআটি বলেন।"[১]

যিক্‌র নং ৬৩: দুই সাজদার মধ্যবর্তী যিক্‌র-১

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

উচ্চারণ : রাব্বিগ্‌-ফিরলী, রাব্বিগ্‌-ফিরলী।

অর্থ: "হে প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন, হে প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন।"

হুযাইফা (রা) বলেন, "নবীজী ﷺ দু সাজদার মাঝে বসে উপরের দুআটি বলতেন।" হাদীসটি সহীহ।[২]

যিক্‌র নং ৬৪: দুই সাজদার মধ্যবর্তী যিক্‌র-২

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (وَارْفَعْنِيْ) (وَعَافِنِيْ)

উচ্চারণ: রাব্বিগ্‌-ফিরলী, ওয়ার'হামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী [ওয়ার ফা'অ্নী] (ওয়া'আ-ফিনী)।

অর্থ: "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহমত করুন, আমাকে পূর্ণতা দিন, আমাকে হেদায়াত দিন, আমাকে রিযিক দিন [এবং আমাকে সুউচ্চ করুন] {এবং আমাকে সুস্থতা-নিরাপত্তা দান করুন}।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ দু সাজাদার মাঝে বসে এ দু'আ বলতেন। হাদীসটি সহীহ।[৩]

৩. ৪. ৪. তাশাহহুদ ও বৈঠকের যিকর

তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ও সালাত (দরুদ) আমরা সকলেই জানি। তবে অর্থ উল্লেখ করার জন্য এখানে তা লিখছি। আশা করছি, কোনো আগ্রহী পাঠক অর্থ শিখে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে তাশাহহুদ ও সালাত পাঠ করবেন।

যিক্‌র নং ৬৫: তাশাহহুদ (আত-তাহিয়্যাত)

বিভিন্ন সাহাবী থেকে তাশাহহুদ বর্ণিত। ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছে সালাত আদায়ের সময় বসলে বলতাম: আল্লাহর উপর সালাম, ফিরিশতাগণের উপর সালাম, অমুকের উপর সালাম, ...। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদেরকে বললেন : আল্লাহই সালাম (কাজেই, তাঁকে সালাম প্রদান করা ঠিক নয়)। অতএব, তোমরা যখন সালাতের মধ্যে বসবে তখন বলবে :

التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِيْنَ (فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) **أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ** (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ)

অর্থ: "মর্যাদাজ্ঞাপন-অভিবাদন আল্লাহর জন্য এবং ইবাদত-প্রার্থনা এবং পবিত্র কর্ম ও দানসমূহ (সবই আল্লাহর জন্য)। সালাম আপনার উপর, হে নবী; এবং আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ। সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেককার বান্দার উপর। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এ কথা বললে আসমান ও যমিনে আল্লাহর সকল নেক বান্দাকেই সালাম দেওয়া হয়ে যাবে) আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত বার্তাবাহক)। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এরপর মুসল্লী নিজের জন্য পছন্দমতো প্রার্থনা বা দু'আ করবে।)"[৪]

তাশাহহুদের পরে সালামের পূর্বে দুআর গুরুত্ব আমরা জেনেছি। এ সময়ের দুআ আমরা "দুআ মাসুরা' নামে জানি। দুআর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ করতে হবে। ফুদালাহ ইবনু উবাইদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে দু'আ করতে শুনেন, অথচ লোকটি আল্লাহর মর্যাদা ঘোষণা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরে সালাত পাঠ করেনি। তখন তিনি বলেন :

عَجِلَ هَذَا ... إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ

"লোকটি তাড়াহুড়ো করেছে। যখন কেউ সালাত আদায় করে তখন যেন সে প্রথমে তার প্রভুর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এরপর

সে নবীর (ﷺ) উপর সালাত পাঠ করবে। এরপর তার ইচ্ছামত দু'আ করবে।" হাদীসটি সহীহ।[১]

এ সময়ে আমরা সবাই দরুদে ইবরাহীমি পাঠ করি। সালাত বা দরুদের অর্থ ও বাক্যাবলী আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ও হক্কের প্রতি আবেগ ও ভালবাসা নিয়ে তাশাহহুদের শেষে সালাত পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এরপর নিজের জন্য নিম্নের দুআগুলো থেকে কোনো দুআ বা কুরআন বা হাদীসের যে কোনো দুআ বা এগুলোর অর্থের যে কোনো দুআ পাঠ করতে হবে।

যিক্র নং ৬৬ : দুআ মাসূর-১

اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আল্লিফ বাইনা কুলুবিনা-, ওয়া আসলি'হ যা-তা বাইনিনা-, ওয়াহ্দিনা- সুবুলাস সালা-ম, ওয়া নাজ্জিনা- মিনায যুলুমা-তি ইলান নূর। ওয়া জান্নিবনাল ফাওয়া-'হিশা মা যাহারা মিনহা- ওয়া মা- বাতান। ওয়া বা-রিক লানা- ফী আসমা-'ইনা-, ওয়া আবসা-রিনা-, ওয়া কুলুবিনা-, ওয়া আযওয়া-জিনা, ওয়া যুররিয়্যা-তিনা-। ওয়া তুব 'আলাইনা-, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম। ওয়াজ্ 'আলনা- শা-কিরীনা লিনি'মাতিকা, মুসনীনা বিহা- কাবিলীহা, ওয়া আতমিমহা- 'আলাইনা-।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিন। আপনি আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্য প্রদান করুন। আপনি আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোয় নিয়ে আসুন, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন। আপনি আমাদের শ্রবণযন্ত্রে, আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে, আমাদের অন্তরে, আমাদের দাম্পত্য সঙ্গীগণের মধ্যে এবং আমাদের সন্তানগণের মধ্যে বরকত প্রদান করুন। আপনি আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী পরম করুণাময়। আপনি আমাদেরকে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের, নিয়ামতের জন্য আপনার প্রশংসা করার এবং নিয়ামতকে সসম্মানে গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আপনি আমাদের জন্য প্রদত্ত আপনার নিয়ামতকে পূর্ণ করুন।"

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহহুদের পরে দু'আর এ বাক্যগুলো শেখাতেন। হাদীসটির সনদ সহীহ।[২]

যিক্র নং ৬৭ : দুআ মাসূর-২

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'আযা-বি জাহান্নাম, ওয়া মিন 'আযা-বিল ক্বাব্রি, ওয়া মিন ফিতনাতিল মা'হ্ইয়া ওয়াল মামা-তি ওয়া মিন শার্‌রি ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-ল।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই- জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জাগতিক জীবনের ও মৃত্যুর ফিতনা (পরীক্ষা বা বিপদ) থেকে এবং দাজ্জালের অমঙ্গল থেকে।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা যখন তাশাহহুদ শেষ করবে, তখন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে (এ দুআটি) বলবে।[৩]

যিক্র নং ৬৮ : দুআ মাসূর-৩

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্ফির লী মা- কাদ্দামতু ওয়ামা- আখখারতু ওয়ামা- আসরারতু ওয়ামা- আ'লান্তু ওয়ামা- আসরাফতু ওয়ামা- আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখ্খিরু লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করে দেন আমার আগের পাপ, পরের পাপ, গোপন পাপ, প্রকাশ্য পাপ, আমার বাড়াবাড়ি এবং যে সকল পাপের কথা আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন এবং আপনিই পিছিয়ে দেন। আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযের শেষে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে এ কথাগুলো বলতেন।[১]

যিক্‌র নং ৬৯ : দুআ মাসূর-৪

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী যুলমান কাসীরান ওয়ালা- ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা, ফাগফির্‌লী মাগফিরাতান মিন 'ইনদিকা ওয়ার্‌'হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর্‌ রাহীম।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই ক্ষমা করে না, সুতরাং আপনি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে রহম করুন, আপনি বড়ই ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু।"

আবু বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলেন, আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযের মধ্যে পড়ব, তখন তিনি এ দু'আটি শিখিয়ে দেন।[২]

যিক্‌র নং ৭০ : দুআ মাসূর-৫

اَللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ اَللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِيْ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِيْ الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِيْ الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, বি'ইলমিকাল গাইবা ওয়া ক্বুদ্‌রাতিকা 'আলাল খাল্‌ক্বি, আ'হ্‌য়িনী মা- 'আলিম্‌তাল 'হায়া-তা খাইরাল্লী, ওয়া তাওয়াফ্‌ফানী ইযা- 'আলিম্‌তাল ওয়াফা-তা খাইরাল্লী, আল্লা-হুম্মা, ওয়া আস্‌আলুকা খাশ্‌ইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি, ওয়া আস্‌আলুকা কালিমাতাল হাক্বক্বি ফির রিদ্বা- ওয়াল গাদ্বাবি, ওয়া আস্‌আলুকাল ক্বাস্‌দা ফিল ফাক্বরি ওয়াল গিনা- ওয়া আস্‌আলুকা না'য়ীমান লা- ইয়ান্‌ফাদু, ওয়া আস্‌আলুকা ক্বুর্‌রাতা 'আইনিন লা- তান্‌ক্বাতি'উ, ওয়া আস্‌আলুকার রিদ্বা- বা'অ্‌দাল ক্বাদ্বা-, ওয়া আস্‌আলুকা বার্‌দাল 'আইশি বা'অ্‌দাল মাউতি, ওয়া আস্‌আলুকা লায্‌যাতান নাযারি ইলা ওয়াজ্‌হিকা ওয়াশ্‌ শাওক্বা ইলা- লিক্বা-য়িকা ফী গাইরি দ্বার্‌রা-আ মুদ্বির্‌রাতিন ওয়ালা- ফিত্‌নাতিন মুদ্বিল্লাতিন। আল্লা-হুম্মা, যাইয়িন্না- বিযীনাতিল ঈমা-নি ওয়াজ্‌'আলনা হুদা-তাম মুহ্‌তাদীন।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনার গাইবী ইলমের ওসীলা দিয়ে এবং আপনার সৃষ্টির ক্ষমতার অসীলা দিয়ে (প্রার্থনা করছি), আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতক্ষণ আপনি জানবেন যে, জীবন আমার জন্য উত্তম। এবং আপনি আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন আপনি জানবেন যে, মৃত্যু আমার জন্য উত্তম। হে আল্লাহ, আর আমি আপনার কাছে চাচ্ছি গোপনে এবং প্রকাশ্যে আপনার ভীতি। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি মধ্যম পন্থা দারিদ্র্য এবং সচ্ছলতায়। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি অফুরন্ত নেয়ামত। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি অবিচ্ছিন্ন শান্তি-তৃপ্তি। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি তাকদরের (প্রকাশ পাওয়ার) পরে সন্তুষ্টি। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি মৃত্যুর পরে শান্তিময় জীবন। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি আপনার পবিত্র মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাতের আনন্দ, এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ, সকল ক্ষতিকর প্রতিকূলতা এবং বিভ্রান্তিকর ফিতনা-ফাসাদ হতে বিমুক্ত থেকে। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে সৌন্দর্যময় করুন ঈমানের সৌন্দর্যে এবং আমাদেরকে বানিয়ে দিন সুপথপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শনকারী।"

তাবিয়ী সাইব ইবনু মালিক বলেন, একদিন আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা) আমাদেরকে নামায পড়ালেন। তিনি সংক্ষেপে নামায পড়ালেন। তখন জামাতে উপস্থিত কেউ কেউ বলল, আপনি সংক্ষেপেই নামায পড়ালেন। তখন তিনি বললেন, আমি এ নামাযের মধ্যে এমন কিছু দু'আ করেছি যেগুলো আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছি। এ বলে তিনি উপরের দু'আটি তাদেরকে শিখিয়ে দেন। হাদীসটি সহীহ।[৩]

এখানে আম্মার (রা) জামাতে নামাযের মধ্যে এ দোয়াটি পাঠ করেছেন। এতে আমরা বুঝতে পারি যে, ফরয ও অন্যান্য 'নামাযের মধ্যে' সাজদায় বা তাশাহহুদের পরে দুআ মাসুরায় এ মুনাজাত পাঠ করা মাসনূন।

যিক্‌র নং ৭১ : দুআ মাসূর-৬

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ (مُحَمَّدٌ ﷺ) وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ (مُحَمَّدٌ ﷺ) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَداً

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী, 'আ-জিলিহী ওয়া আজিলিহী, মা- 'আলিম্‌তু মিন্‌হু ওয়ামা- লাম্ আ'অ্‌লাম। ওয়া আ'উযু বিকা মিনাশ্ শার্‌রি কুল্লিহী মা- 'আলিম্‌তু মিন্‌হু ওয়ামা- লাম্ আ'অ্‌লাম।। আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকা মিন খাইরি মা- সাআলাকা 'আব্‌দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা (মুহাম্মাদুন ﷺ), ওয়া আ'উযু বিকা মিন শার্‌রি মা 'আ-যা বিহী 'আব্‌দুকা ওয়া নাবিয়্যুকা (মুহাম্মাদুন ﷺ)। আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়ামা- ক্বার্‌রাবা ইলাইহা- মিন ক্বাওলিন আও 'আমাল। ওয়া আ'উযু বিকা মিনান না-রি ওয়ামা- ক্বার্‌রাবা ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আও 'আমাল। ওয়া আস্‌আলুকা মা- ক্বাদ্বাইতা লী মিন আম্‌রিন আন তাজ্'আলা 'আ-ক্বিবাতাহু রাশাদান।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই সকল কল্যাণ থেকে: নিকটবর্তী কল্যাণ, দূরবর্তী কল্যাণ, আমি যে কল্যাণ সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমি যে কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নই। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল অকল্যাণ থেকে: নিকটবর্তী অকল্যাণ, দূরবর্তী অকল্যাণ, আমি যে অকল্যাণ সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমি যে অকল্যাণ সম্পর্কে অবগত নই। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সে সকল কল্যাণ চাই যে সকল কল্যাণ চেয়েছেন আপনার কাছে আপনার বান্দা এবং আপনার নবী (মুহাম্মাদ ﷺ)। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সে সকল অকল্যাণ থেকে যে সকল অকল্যাণ থেকে আপনার আশ্রয় চেয়েছেন আপনার বান্দা এবং আপনার নবী (মুহাম্মাদ ﷺ)। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই জান্নাত এবং জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায় এরূপ সকল কথা বা কাজের তাওফীক। এবং আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা বা কাজ থেকে যা জাহান্নামের কাছে নিয়ে যায়। আর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার জন্য যা কিছু ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন সব কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি আমার জন্য মঙ্গলময় কল্যাণকর করে দিন।"

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ দু'আটি শিক্ষা দেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তিনি সালাতে রত ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তুমি পূর্ণ বাক্যাবলি ব্যবহার করবে। সালাতের পরে তিনি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে এ দুআটি শিখিয়ে দেন। অন্য হাদীসে ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাশাহ্‌হুদের পরে পাঠের জন্য এ প্রকারের দু'আ শিক্ষা দেন।[১]

এ সময়ে পাঠের জন্য আরো অনেক দু'আ সুন্নাতে নববীতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এসকল মাসনূন দু'আ শিক্ষা করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে তদ্দ্বারা দু'আ করা আমদের কর্তব্য। এছাড়া এ বইয়ের অন্যান্য স্থানে যত মাসনূন দুআ লেখা হয়েছে এবং কুরআন হাদীস থেকে যে কোনো দুআ মুসল্লী সালাতের মধ্যে এবং সালামের পূর্বে পড়তে পারেন।

যিক্‌র নং ৭২: সালাতের মনোযোগ বৃদ্ধির যিক্‌র

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ : আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ : আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

উসমান ইবনু আবীল আস (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার ও আমার সালাতের মধ্যে বাধ সাধে এবং আমার কিরাআত এলোমেলো করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: সে শয়তানের নাম: খিনযিব। যখন এরূপ অনুভব করবে তখন (উপরের যিক্‌র) পাঠ করে তোমার বাম দিকে থুথু ফেলবে। তিনবার করবে। উসমান (রা) বলেন : আমি এরূপ করলাম, ফলে আল্লাহ উক্ত শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দিলেন।[২]

সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে ও অবস্থায় এরূপ ওয়াসওয়াসা হলে মুসাল্লী এ যিকরটি এক বা একাধিকবার পালন করতে পারেন।

৩. ৫. ফরয ও নফল সালাত

আমরা দেখেছি, বেলায়াতের জন্য সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ইবাদতকে আল্লাহ ফরয করেছেন। ফরযের অতিরিক্ত সকল ইবাদতকেই মূলত "নফল" (অতিরিক্ত) বা "তাতাওউ" (ঐচ্ছিক) বলা হয়। যে সকল নফল সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত পালন করতেন সেগুলোকে "সুন্নাত" বলা হয়। তিনি যেগুলোর বিষয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে "সন্নাতে মুয়াক্কাদাহ" ও অন্যগুলোকে 'গাইর মুয়াক্কাদাহ' বলা হয়। কিছু সুন্নাত সালাত সম্পর্কে হাদীসে বেশী গুরুত্ব প্রদানের ফলে কোন ইমাম ও ফকীহ তাকে ওয়াজিব বলেছেন।

৩. ৫. ১. সুন্নাত-নফল সালাত বাড়িতে আদায়

সকল প্রকারের নফল সালাত নিজ বাড়িতে, দোকানে বা কর্মক্ষেত্রে আদায় করা উত্তম এবং সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফরয সালাতের আগের ও পরের সকল সুন্নাত সালাত ও অন্যান্য সুন্নাত-নফল সালাত ঘরে আদায় করতেন। তিনি এ সকল সালাত ঘরে আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন। ঘরে আদায় করলে সাওয়াব বেশি হয় বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন :

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

"ফরয সালাত বাদে সকল সালাত নিজ বাড়িতে পড়া সর্বোত্তম।"[১]

তিনি আরো বলেন:

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِى مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا

"মসজিদের (জামাতে) সালাত আদায় হয়ে গেলে তোমরা তোমাদের বাড়ির জন্যও সালাতের কিছু রেখে দেবে। কারণ সালাতের জন্য মহান আল্লাহ তার বাড়িতে কল্যাণ ও মঙ্গল দান করবেন।"[২]

আবদ ইবনু সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে প্রশ্ন করলাম: কোন্‌টি উত্তম, বাড়িতে না মসজিদে সালাত পড়া? তিনি বললেন:

أَلا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبَةً

"তুমি তো দেখছ যে, আমার বাড়ি মসজিদের কত কাছে। তা সত্ত্বেও আমি মসজিদে সালাত না পড়ে বাড়িতে সালাত পড়া পছন্দ করি, একমাত্র ফরয সালাত বাদে।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

সুন্নাত-নফল সালাত ঘরে পড়ার ফযীলতে অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

فَضْلُ صلاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلاَتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ كَفَضْلِ المكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ

"যেখানে মানুষ দেখতে পায় সেখানে সুন্নাত-নফল সালাত পড়ার চেয়ে নিজ বাড়িতে তা আদায় করার ফযীলত এত বেশি যেমন নফল সালাতের উপরে ফরয সালাতের ফযীলত।" হাদীসটি হাসান।[৪]

সকল সুন্নাত-নফল সালাত মসজিদে আদায় করা জায়েয, কিন্তু বাড়িতে পালন করা উত্তম। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ উল্লেখ করেছেন যে, বাড়ি যদি মসজিদ থেকে দূরেও হয় তাহলেও বাড়িতে এসে সুন্নাত আদায় করা উত্তম। পথ চলার কারণে সুন্নাত আদায়ে দেরি হলে কোনো অসুবিধা নেই।[৫]

সুন্নাত-নফল সালাত মসজিদে আদায় করলে স্থান পরিবর্তন বা কথাবার্তার মাধ্যমে ফরয ও সুন্নাতের মধ্যে বিরতি ও ব্যবধান সৃষ্টি করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। সুন্নাত সালাত আদায় করেই সে স্থানেই ফরয শুরু করা বা ফরয আদায় করে সে স্থানেই সুন্নাত শুরু করতে তিনি আপত্তি করেছেন। সাহাবী সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) বলেন:

صَلَّيْت مَعَ مُعَاوِيَةَ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ (نُوصِلَ صَلاةً) بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ

"আমি খলীফা মুআবিয়া (রা)-এর সাথে মসজিদের বিশেষ ঘরে জুমুআর সালাত পড়ি। ইমামের সালাম ফেরানোর পর আমি আমার স্থানে দাঁড়িয়ে (সুন্নাত) সালাত পড়লাম। মুআবিয়া (রা) এসে আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: আর কখনো এরূপ করবে না। যখন জুমুআর সালাত আদায় করবে তখন অন্তত কথাবার্তা না বলে বা উক্ত স্থান থেকে বের না হয়ে তার সাথে অন্য (সুন্নাত-নফল) সালাত জুড়ে দেবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, দু সালাতের মাঝে কথাবার্তা বলা বা সে স্থান থেকে বের হওয়ার আগে এক সালাতের সাথে অন্য সালাত সংযুক্ত না করতে।"[৬]

ইমাম তাহাবী এ বিষয়ে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে বলেন:

فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، أَنْ يُوصِلَ الْمَكْتُوبَةَ بِنَافِلَةٍ ، حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ مِنْ تَقَدُّمٍ إِلَى مَكَان آخَرَ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. ... وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ لا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي بَيْتِهِ ، فَأَرَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﷺ مِنْهُمْ الْفَصْلَ مِنْ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أَيْضًا الْفَصْلَ بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ ، بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ ، فِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ

"এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতের সাথে নফল সালাত সংযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। অন্য স্থানে এগিয়ে যাওয়া বা অনুরূপ কোনো কর্মের মাধ্যমে উভয়ের মাঝে বিরতি ও বিভাজন তৈরি না করে উভয় সালাতকে সংযুক্ত করতে তিনি নিষেধ করেছেন। ... ইবন আব্বাস (রা) মাগরিবের পরের দু রাকআত সুন্নাত নিজের বাড়িতে না গিয়ে পড়তেন না। ফরয ও নফলের মাঝে বিরতি ও বিভাজনের জন্যই তিনি এরূপ করতেন। আবূ জাফর (তাহাবী) বলেন: আমরা (হানাফী ফকীহগণ) ফরয ও নফল সালাতের মধ্যে এ ভাবে বিরতি ও বিভাজন প্রদান করা মুসতাহাব মনে করি। কারণ এ অধ্যায়ের হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ নির্দেশ প্রদান করেছেন।"[১]

ইমাম তাহাবী আরো বলেন:

وكان من سنته ﷺ فيمن صلى صلاة من الصلوات الخمس، ثم أراد أن يتطوع بعدها في المسجد الذي صلاها فيه أن لا يفعل ذلك حتى يتقدم أو يتكلم

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত: কেউ যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে কোনো সালাত আদায় করে এবং এরপর উক্ত মসজিদেই ফরযের পরে নফল পড়তে চায় তবে স্থানপরিবর্তন বা কথাবার্তা না বলে যেন সে তা না করে।"[২]

৩. ৫. ২. সুন্নাত সালাত ও সন্নাত পদ্ধতি

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের আগে ও পরে ১০ বা ১২ রাক'আত নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত পড়তেন ও পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ

"যদি কোনো মুসলিম প্রতিদিন ফরয বাদে অতিরিক্ত ১২ রাকআত ঐচ্ছিক নফল সালাত আদায় করে তবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে বাড়ি বানিয়ে রাখবেন: যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত ও পরে ২ রাকআত, মাগরিবের পরে ২ রাকআত, ইশার পরে ২ রাকআত ও ফজরের পূর্বে ২ রাকআত।"[৩]

আয়েশা (রা) থেকে পৃথক সহীহ সনদে এ অর্থে হাদীস বর্ণিত।[৪] ইবন উমার (রা) যোহরের পূর্বে দু রাকআত সুন্নাত সালাতের কথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী বলেন:

باب صلاة التطوع بعد الفريضة. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين. قال محمد : هذا تطوع وهو حسن وقد بلغنا أن النبي ﷺ كان يصلي قبل الظهر أربعا....

"ফরয সালাতের পর ঐচ্ছিক (নফল) সালাতের অধ্যায়। আমাদেরকে মালিক বলেছেন, আমাদেরকে নাফি বলেছেন, ইবন উমার বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের পূর্বে ২ রাকআত, পরে ২ রাকআত এবং মাগরিবের পরে ২ রাকআত সালাত তাঁর বাড়িতে আদায় করতেন এবং তিনি ইশার পরে ২ রাকআত আদায় করতেন। আর তিনি জুমুআর পরে মসজিদে কোনো সালাত আদায় করতেন না। মসজিদ থেকে (গৃহে) ফিরে তিনি দু রাকআত সালাত আদায় করতেন। মুহাম্মাদ বলেন এ হলো ঐচ্ছিক বা নফল সালাত। এটি সুন্দর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের পূর্বে চার রাকআত আদায় করতেন বলেও আমরা জেনেছি ...।"[৫]

ফজরের দু রাক'আত সুন্নাতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। সফরে, বাড়িতে, ব্যস্ততা বা কোনো কারণে তিনি তা ছাড়তেন না। এজন্য কোনো কোনো আলিম এ দু রাক'আতকে ওয়াজিব বলেছেন। ফজরের সুন্নাত সর্বদা (সফর ছাড়া) তাঁর নিজ বাড়িতেই আদায় করতেন। কখনো আযানের পরেই এবং কখনো জামা'আত শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তিনি নিজ বাড়িতে সুন্নাত সালাত

আদায় করে এরপর মসজিদে গিয়ে জামা'আতে দাঁড়াতেন। তিনি তা সংক্ষেপে আদায় করতেন। সাধারণত তিনি সূরা ফাতিহার পরে প্রথম রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন এবং কখনো প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ আয়াত ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াত বা ৬৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করতেন।[১] আযানের পরেই সুন্নাত আদায় আদায় করলে তিনি সাধারণত জামাত শুরু হওয়া পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতেন অথবা ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে দু রাক'আত সুন্নাত ছাড়া কোনো প্রকার সালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন। ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে কোনো মাসনূন যিক্‌রও নেই।

ফজরের সুন্নাত ফরযের আগে আদায় করতে না পারলে সূর্যোদয়ের পরে বা ফরজের ফরয সালাতের পরেই আদায়ের নির্দেশনা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ

"যে ব্যক্তি ফজরের দু রাকআত সুন্নাত আদায় করতে না পারবে সে যেন সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করে।"[২]

অন্য হাদীসে কাইস ইবন আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করি। তিনি সালামের পর ঘুরে দেখেন আমি আবার সালাত আদায় করছি। তিনি বলেন:

أَصَلاَتَانِ مَعًا/ صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ فَلا إِذَنْ

"দু সালাত কি একসাথে (একই সালাত কি একসাথে দুবার)? ফজরের সালাত তো দু রাকআত! আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি ফজরের দু রাকআত সুন্নাত আগে আদায় করতে পারি নি; এজন্য তা এখন আদায় করছি। তখন তিনি বলেন: তা হলে অসুবিধা নেই।"[৩]

তবে ফজরের ইকামতের পর মসজিদে ফজরের সুন্নাত আদায় করতে তিনি নিষেধ করেছেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ

"সালাতের ইকামত হয়ে গেলে ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত নেই।"[৪] অন্য হাদীসে মালিক ইবন বুহাইনা (রা) বলেন:

أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَجُلاً يُصَلِّى (يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ) وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ « أَتُصَلِّى الصُّبْحَ أَرْبَعًا ».

"ফজরের সালাতের ইকামত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেন মুআয্‌যিনের ইকামতের সময় এক ব্যক্তি (সুন্নাত ২ রাকআত) সালাত আদায় করছে। তখন তিনি বলেন: তুমি কি ফজরের সালাত চার রাকআত পড়বে?"[৫]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন:

أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي (وَأَنَا أُصَلِّيهِمَا) الرَّكْعَتَيْنِ فَجَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِهِ فَقَالَ أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا

"ফজরের সালাতের ইকামত হওয়ার পরে একব্যক্তি (অন্য বর্ণনায় আমি নিজে) দু রাকআত সুন্নাত পড়তে শুরু করি; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাপড় ধরে টান দিয়ে বলেন: তুমি কি ফজর চার রাকআত পড়বে?"[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি এসে মসজিদের এক পার্শ্বে দু রাকআত সালাত আদায় করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জামাতে শরীক হলো। সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন:

يَا فُلاَنُ بِأَىِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا

"তুমি তোমার কোন্ সালাতকে ধর্তব্য বলে গণ্য করবে? তোমার একাকী সালাত? না আমাদের সাথে যে সালাত আদায় করলে সে সালাত?"[১]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রাহ) ও কূফার কোনো কোনো ফকীহ ফজরের ফরয সালাত শুরু হওয়ার পরেও জামাতের স্থান থেকে দূরে সুন্নাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা তিনটি শর্ত করেছেন: (১) ফজরের জামাত না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না, (২) জামাতের কাতারের মধ্যে, সাথে বা সন্নিকটে সুন্নাত পড়া যাবে না এবং (৩) সুন্নাত পড়েই সরাসরি ফরয শুরু করা যাবে না; স্থান পরিবর্তন করে সুন্নাতকে ফরয থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা), আবূ দারদা (রা) প্রমুখ সাহাবী এবং কতিপয় তাবিয়ী থেকে বর্ণিত যে, তারা ফজরের ফরয সালাতের জামাত শুরু হওয়ার পরেও মসজিদের বাইরে, রাস্তায় বা মসজিদের দূরবর্তী কোনো কোণে সুন্নাত পড়ে জামাতে শরীক হতেন।[২]

সামগ্রিক বিবেচনায় জামাত শুরু হওয়ার পরে মসজিদে প্রবেশ করলে সুন্নাত না পড়ে জামাতে শরীক হওয়া এবং জামাতের পরে বা সূর্যোদয়ের পরে সুন্নাত পড়াই নিরাপদ ও অধিক সাবধানতামূলক বলে প্রতীয়মান হয়।

যোহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নাত সালাতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। তিনি বলেন: "যোহরের আগের চার রাকআত সালাত শেষরাতের (তাহাজ্জুদের) সালাতের সাথে তুলনীয়।" (হাদীসটি সহীহ)।[৩] অন্য হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের আগে চার রাকআত ও ফজরের আগে দু রাকআত পরিত্যাগ করতেন না।"[৪]

কোনো কোনো ফকীহ দু রাকআতের পর সালাম বলে আবার দু রাকআত- এভাবে চার রাকআত আদায় করা উত্তম বলেছেন। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে: "রাত ও দিবসের সালাত দু রাকআত করে"।[৫] অন্যান্য ফকীহ বলেছেন যে, চার রাকআত একত্রে আদায় করাই উত্তম। এ মতভেদটি একান্তই উত্তম অনুত্তম নিয়ে। দু রাকআত করে চার রাকআত অথবা একত্রে চার রাকআত যেভাবেই আদায় করা হোক মুমিন নির্ধারিত সাওয়াব পাবেন, ইনশা আল্লাহ।

হাদীস পর্যালোচনায় এ চার রাকআত সালাত একত্রে আদায় করাই সুন্নাত বলে প্রতীয়মান হয়। আবূ আইউব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"যোহরের আগে মাঝে (দ্বিতীয় রাকআতে) সালাম না দিয়ে চার রাকআত সালাতের জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়।[৬]

তাবিয়ী আসিম ইবন দামুরা বলেন, আমরা আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিবসকালীন নফল সালাত (تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ) সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। তিনি বলেন, তোমরা তো তা পালন করতে পারবে না। আমরা বললাম, আপনি বলুন, আমরা যে যতটুকু পারি পালন করব। তখন তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত পড়তেন না। আসরের সময় পশ্চিম আকাশে যেখানে সূর্য থাকে পূর্ব আকাশে সে পরিমান উপরে উঠলে তিনি দু রাকআত সালাত আদায় করতেন। এরপর যখন সূর্য আরেকটু উপরে উঠে যোহরের সময় যতটুকু পশ্চিমে থাকে সে পরিমাণ পূর্বদিকে থাকত তখন তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পরে তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত পড়তেন। যোহরের পরে তিনি দু রাকআত সালাত পড়তেন। এরপর আসরের পূর্বে চার রাকআত সালাত পড়তেন। আলী (রা) বলেন:

يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَيَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِيْ آخِرِه.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল সালাতের প্রতি দুই রাকআতে আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশতাগণ, নবীগণ ও তাদের অনুসারী মুমিন মুসলিমগণের প্রতি সালাম পেশ করতেন (অর্থাৎ প্রতি দু রাকআতে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করতেন)। আর চার রাকআতের শেষে একবারে সালাম বলতেন।" হাদীসটি হাসান।[৭]

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যোহরের আগে, পরে ও আসরের আগে পালনীয় চার রাকআত সুন্নাত সালাত একত্রে পড়াই

সুন্নাত ও উত্তম। এ বিষয়ে শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন: "সর্বশেষে সালাম বলতেন" এ কথা প্রমাণ করে যে, দিবসের চার রাকআত বিশিষ্ট সুন্নাতের ক্ষেত্রে দু রাকআতে সালাম না বলে চার রাকআত একত্রে আদায় করে সালাম বলাই সুন্নাত।.. এ কথাটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, দিবসের চার রাকআত বিশিষ্ট এ সকল সালাতের প্রথম তাশাহ্হুদের পর সালাম বলা হবে না। .... ।"[১]

যোহরের চার রাকআত সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়তে না পারলে জামাতের পরে তা আদায় করা সুন্নাত। আয়েশা (রা) বলেন:

إنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহরের পূর্বে রাকআত আদায় করতে না পারলে তা যোহরের পরে আদায় করতেন।" হাদীসটি হাসান।[২]

যোহরের পরের নিয়মিত সুন্নাত দু রাকআত। তবে এসময়ে চার রাকআত পড়া যেতে পারে। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكْعَات قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

"যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার ও পরে চার রাকআত সালাত নিয়মিত আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে নিষিদ্ধ করবেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

যোহরের পরের নিয়মিত দু রাকআতের পরে আরো দু রাকআত আদায় করে বা পৃথক চার রাকআত আদায় করে এ হাদীসটি পালন করা যায়।

আসরের পূর্বেও দু বা চার রাকআত সালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। উপরের সহীহ হাদীসটিতে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পূর্বে চার রাকআত সালাত পড়তেন। অন্য হাদীসে আলী (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পূর্বে দু রাকআত সালাত পড়তেন।"[৪]

অন্য হাদীসে ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

"যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করে তাকে আল্লাহ রহমত করুন।" হাদীসটি হাসান।[৫]

ফজর, মাগরিব, ইশা ও জুমআর পরের দু রাকআত সুন্নাত সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা বাড়িতে আদায় করতেন। ইবন উমার (রা) বলেন:

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ...كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যোহরের পূর্বে ২, পরে ২, মাগরিবের পরে ২, ইশার পরে ২ ও জুমুআর পরে ২ রাকআত সালাত পড়তাম। মাগরিব, ইশা ও জুমআর পরের সালাত তাঁর সাথে তাঁর বাড়িতে পড়তাম। আর তিনি ফজরের পূর্বে সংক্ষিপ্ত দু রাকআত সালাত পড়তেন; কিন্তু সে সময়ে আমি তাঁর ঘরে প্রবেশ করতাম না।"[৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের সুন্নাতেও ফজরের সুন্নাতের মত প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।[৭]

উপরের নিয়মিত নফল-সুন্নাত সালাত ছাড়াও যত বেশি সম্ভব নফল সালাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। নিষিদ্ধ সময়গুলো ছাড়া সকল সময়ে ইচ্ছামত বেশি বেশি সালাত আদায় করার চেষ্টা করা মুমিনের উচিত। যোহরের আগে, পরে, আসরের আগে, মাগরিবের পরে বা ইশার পরেও ইচ্ছা করলে মুমিন আরো বেশি নফল সালাত দু রাকআত করে আদায় করতে পারেন।

এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি

সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।"[১] অন্য এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেন: "তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।"[২] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, কাজেই সাধ্যমত যত বেশি সম্ভব (নফল) সালাত আদায় করবে।"[৩]

বিশেষত জুমুআর সালাতের আগে বেশি বেশি নফল সালাত আদায়ের বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এক হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِد فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ/ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا (فَلَمْ يَتَخطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ) ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

"যদি কেউ জুমুআর দিনে গোসল করে, তার কাছে কোনো সুগন্ধি থাকলে তা মাখে, তার সবচেয়ে ভাল পোশাক থেকে পরিধান করে, এরপর মসজিদে গমন করে এবং মসজিদে গিয়ে তার সাধ্যমত-আল্লাহর মর্যিমত যতবেশি পারে (সুন্নাত-নফল) সালাত আদায় করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, কারো ঘাড়ের উপর দিয়ে যায় না, দুজনের মাঝে সরিয়ে জায়গা করে না, এরপর নীরবে খুতবা শুনে এবং সালাত আদায় করে, তবে তার এই জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত পাপের মার্জনা হবে।[৪]

তাবিয়ী নাফি বলেন:

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ (يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ) فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

ইবন উমার (রা) মসজিদে প্রবেশ করে জুমুআর আগে দীর্ঘ কিরাআত দ্বারা কয়েক রাকআত সালাত পড়তেন। ইমাম সালাতুল জুমুআ শেষ করার পর তিনি বাড়ি গিয়ে দু রাকআত সালাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।" হাদীসটি সহীহ।[৫]

ইবনু উমার (রা)-এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও জুমুআর আগে দীর্ঘ কিরাআত দিয়ে কয়েক রাকআত সালাত আদায় করতেন এবং জুমুআর পরে বাড়িতে গিয়ে দু রাকআত সালাত আদায় করতেন।

জুমুআর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাকআত সালাত নিয়মিত পড়তেন সে বিষয়ে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। সুনান ইবন মাজাহর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জুমুআর পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল।[৬] তবে আব্দুল্লাহ ইবন ইবন মাসঊদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা), আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য সাহাবী জুমুআর আগে চার রাকআত বা অধিক সালাত আদায় করতেন বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী সাফিয়্যাহ বিনত হুআই (রা) মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বিষয়ে মহিলা তাবিয়ী সাফিয়াহ বলেন:

رَأَيْت صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ رضي الله عنها، صَلَّتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِلْجُمُعَةِ، ثُمَّ صَلَّتْ الْجُمُعَةَ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ

"তিনি দেখেন যে, সাফিয়্যাহ বিনত হুআই জুমুআর সালাতে ইমামের খুতবার জন্য বের হওয়ার আগে চার রাকআত সালাত আদায় করেন এবং ইমামের সাথে দু রাকআত জুমুআর সালাত আদায় করেন।"[৮]

এ হাদীস থেকে জুমুআর আগে চার রাকআত সালাত আদয়ের বিষয়টি জানা যায়। এছাড়া জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পরেও মহিলাগণ জুমুআর সালাতে অংশ গ্রহণ করতেন।

আমরা আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর পরে দু রাকআত সালাত পড়তেন এবং তিনি সাধারণত এ দু রাকআত সালাত বাড়িতে ফিরে আদায় করতেন। এছাড়া জুমুআর পরে চার রাকআত সালাত আদায়েরও উৎসাহ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"তোমাদের কেউ যখন জুমুআর সালাত আদায় করবে তখন এরপর চার রাকআত সালাত আদায় করবে।"[১]

৩. ৫. ৩. ফরয সালাত জামাতে আদায়

আল্লাহর পথের পথিককে অবশ্যই ফজর ও অন্যান্য ফরয সালাত জামাতে আদায় করতে হবে। অনেক যাকির ফজরের সালাত একাকী ঘরে আদায় করেন। এরপর অনেক সময় যিক্‌র ওযীফা করেন। অথচ সারা দিনরাত নফল যিক্‌র ওযীফা করার চেয়ে শুধুমাত্র ফরয সালাতগুলো জামাতে আদায় করা হাজার গুণ বেশি উত্তম। অন্য নফল যিক্‌র তো দূরের কথা মুমিনের জীবনের সবচেয়ে বড় যিক্‌র ও বড় নফল ইবাদত তাহাজ্জুদের চেয়েও জামাতে সালাত আদায় করা বেশি ফযীলতের। উমার (রা) একদিন সুলাইমান ইবনু আবী হাসমা (রা) নামাক একজন সাহাবীকে ফজরের জামাতে উপস্থিত না দেখে তার বাড়িতে গিয়ে তার আম্মাকে তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে সে ক্লান্ত হয়ে যায়। এজন্য ফজরের সালাত ঘরে আদায় করেই ঘুমিয়ে পড়েছে। উমার (রা) বলেন:

لأَنْ أَشْهَدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِيْ جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُوْمَ

"সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে ফজরের সালাত জামাতে আদায় করাকে আমি বেশি ভালবাসি ও ভাল বলে মনে করি।" হাদীসটি সহীহ।[২]

প্রিয় পাঠক, নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করতে পারা মুমিনের অন্যতম কারামত। আওলিয়ায়ে কেরাম জামাতে সালাত আদায়কে বেলায়েতের পরিচয় বলে মনে করেছেন। তাঁরা বার বার বলেছেন: 'যদি কাউকে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে বা বাতাসে উড়ে যেতে দেখ, তাহলে তাকে ওলী ভেব না, কিন্তু যদি কাউকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমতো জামাতে আদায় করতে দেখ তাহলে তাঁকে ওলী জানবে।' কারণ বাতাসে উড়তে, পানিতে হাঁটতে, মনের কথা বলতে ঈমানের দরকার হয় না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, কাফির, মুশরিক সকলের মধ্যেই এরূপ মানুষ পাওয়া যায়। যা মুসলিম ও কাফির সবার মধ্যে পাওয়া যায় তা কখনো বেলায়েতের আলামত হতে পারে না। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক পেয়েছে তাঁকে ওলী জানতে হবে। তার সবচেয়ে বড় কারামত এই যে, তাঁর অন্তর ও প্রবৃত্তি সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গিয়েছে।

সকল ফরয সালাত মসজিদে জামা'আতে আদায় করা ওয়াজিব। "বাদাইউস সানাই" ও হানাফী মাযহাবের অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে জামাতে সালাতকে ওয়াজিবই লিখা হয়েছে। পরবর্তী কোনো কোনো গ্রন্থে সুন্নাত লিখা হলেও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা ওয়াজিবের পর্যায়ের।

সুন্নাতের বিষয়েও আমাদের ধারণা বড় অদ্ভুত। ফিকহের হিসাবে অনেক কাজই সুন্নাত। কিন্তু কোন্ সুন্নাতের কতটুকু গুরুত্ব তা সুন্নাতের আলোকে জানতে হবে। টুপি মাথায় দেওয়া সুন্নাত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আগে-পরে কিছু সালাত সুন্নাত, আবার জামাতে সালাত সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সুন্নাতকে যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন ততটুকু গুরুত্ব দিয়েই তা পালন করতে হবে। গুরুত্বের ক্ষেত্রে তাঁর রীতির ব্যতিক্রম করার অর্থ তাঁর সুন্নাতকে অবহেলা করা ও মনগড়া মতে চলা।

টুপি রাসূলুল্লাহ ﷺ পরেছেন তাই সুন্নাত। কিন্তু তিনি তা পরার কোনো নির্দেশ দেননি। আবার সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাতগুলো তিনি পড়েছেন এবং পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু না পড়লে কোনো ধমক বা শাস্তির কথা বলেননি। আর জামা'আতে সালাত তিনি আজীবন পালন করেছেন, পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পালন না করলে কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন। অথচ আমাদের যাকিরীনদের মধ্যে অনেকে টুপির সুন্নাত বা অন্যান্য অনেক মুস্তাহাব, সুন্নাতে যায়েদা বাধ্য না হলে ত্যাগ করেন না, সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাত ত্যাগ করেন না, অথচ অকাতরে জামাত ত্যাগ করেন। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের প্রবৃত্তি ও মনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অনুগত ও অনুসারী করে দেন।

অগণিত সহীহ হাদীসে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং সাহাবীগণ কখনোই কঠিন ওযর ছাড়া জামা'আত ত্যাগ করেননি। জামা'আতে অনুপস্থিত থাকাকে তাঁরা নিশ্চিত মুনাফিকের পরিচয় বলে জানতেন। অন্ধ ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বলেছেন: "আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোনো মানুষ নেই আর পথও খারাপ। আমি কি জামাতে না এসে ঘরে সালাত আদায় করে নিতে পারব?" তিনি (নবী) তাকেও জামা'আত ত্যাগের অনুমতি দেননি। বরং বলেন, আযান শুনলে তোমাকে জামাতে আসতেই হবে।[৩]

যারা জামাতে সালাতে শরীক হয় না, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি।[৪] এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

"যে ব্যক্তি আযান শুনল কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতে এলো না, তার সালাতই হবে না। তবে যদি ওযর থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।"[১]

অন্য সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِى صَلَّى ». قَالُوا : وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ.

"যে ব্যক্তি ওযর ছাড়া আযান শুনেও সালাতের জামাতে এলো না, সে একা যে সালাত আদায় করল সে সালাত কবুল হবে না।" সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: "ওযর কি?" তিনি বলেন: "ভয় বা অসুস্থতা।"[২]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ বলেছেন :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ... وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

"যার ভাল লাগে যে, সে আগামীকাল মুসলিমরূপে আল্লাহর সাথে দেখা করবে, সে যেন এ সালাতগুলোকে যেখানে আযান দেওয়া হয় সেখানে জামাতে আদায় করে। কারণ আল্লাহ তোমাদের নবীর জন্য হেদায়েতের সুন্নাত প্রচলন করেছেন। আর এসকল হেদায়েতের সুন্নাতের অন্যতম সালাতগুলোকে মসজিদে জামাতে আদায় করা। তোমরা যদি বাড়িতে সালাত পড় তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর (ﷺ) সুন্নাত ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের নবীর সুন্নাত ছেড়ে দিলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ... আমাদের সময়ে আমরা দেখেছি একমাত্র সুপরিচিত মুনাফিক যাকে সবাই মুনাফিক বলে চিনত এরাই শুধু জামাতে সালাতে হাজির হতো না। অসুস্থ মানুষও দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে জামাতে শরীক হয়ে কাতারে দাঁড়িয়ে যেত।"[৩]

জামাত ত্যাগ করা যেমন কঠিন গোনাহের কাজ, তেমনি জামাতে সালাত আদায় অপরিমেয় সাওয়াব ও বরকতের কাজ। জামাতে সালাত আদায় করলে আল্লাহ ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব দান করবেন, যারা সর্বদা জামাতে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদের দিকে মন দিয়ে রাখেন তাঁদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাদের সাথে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, জামাতের অপেক্ষা করা জিহাদের সমতুল্য, ইত্যাদি বিভিন্ন মর্যাদার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীরসহ জামাতের সাথে সালাত আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ দুটি মুক্তি লিখে দিবেন : (১). জাহান্নাম থেকে মুক্তি ; ও (২). মুনাফিকী থেকে মুক্তি।" হাদীসটি হাসান।[৪]

ফজরের জামা'আতের অতিরিক্ত ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে কষ্টের সালাত ফজর ও ইশা'র জামা'আত।"[৫] তিনি আরো বলেন: "ফজর ও ইশা'র সালাত জামাতে আদায় করলে কত ফযীলত তা যদি তারা বুঝত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ দু সালাতে উপস্থিত হতো।"[৬] অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীর মধ্যে প্রবেশ করবে।"[৭] অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

"যে ব্যক্তি ইশা'র সালাত জামাতে আদায় করবে সে যেন অর্ধেক রাত্র সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাতও জামাতে আদায় করবে সে ব্যক্তি যেন সারা রাত সালাত (তাহজ্জুদ) আদায় করল।"[৮]

মুনাফিক ও দুর্বল ঈমান মুসলমানদের জাগতিক লাভ অর্জনে আগ্রহ ও আল্লাহর রহমত ও আখেরাতের লাভ অর্জনে নিঃস্পৃহতার

একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন: "তারা যদি জানত যে, জামাতে হাজির হলে একটি ভাল গোশতওয়ালা হাড় পাওয়া যাবে, তাহলে তারা হাজির হয়ে যাবে।"[১] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন: "আমরা যদি কাউকে ফজর ও ইশা'র জামাতে না দেখতে পেতাম তাহলে তার বিষয়ে ধারণা খারাপ করে ফেলতাম।"[২]

৩. ৫. ৪. বাড়ি-মসজিদ গমনাগমনের যিকর

যে কোনো স্থানে জামাতে সালাত আদায় করা যেতে পারে, তবে মসজিদে তা আদায় করাই মুমিনের মূল দায়িত্ব। এখানে বাড়ি থেকে বের হওয়া, প্রবেশ করা, মসজিদে প্রবেশ করা ইত্যাদি বিষয়ক যিকরগুলো উল্লেখ করছি।

যিক্‌র নং ৭৩: বাড়ি থেকে বের হওয়ার যিক্‌র-১

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি, তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ।

অর্থ: "আল্লাহর নামে। আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম। কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া।"

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এ কথাগুলো বলবে, তাঁকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে: তোমার আর কোনো চিন্তা নেই, তোমার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হলো, (তোমাকে সঠিক পথ দেখানো হলো) এবং তোমাকে হেফাযত করা হলো। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।" অন্য বর্ণনায় : "এক শয়তান অন্য শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ করে বলে, সে ব্যক্তির সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, হেফাযত করা হয়েছে এবং পথ দেখানো হয়েছে, কিভাবে আমরা তার ক্ষতি করতে পারি?" হাদীসটি হাসান সহীহ।[৩]

যিক্‌র নং ৭৪: বাড়ি থেকে বের হওয়ার যিক্‌র-২

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি, তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা, ইন্না না'উযু বিকা মিন আন নাযিল্লা, আও নাদ্বিল্লা, আও নাযলিমা আও নুযলামা, আও নাজহালা আউ ইউজহালা 'আলাইনা।

অর্থ: "আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করছি, হে আল্লাহ, আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমরা পদস্খলিত হব বা বিভ্রান্ত হব, বা আমরা অত্যাচার করব বা অত্যাচারিত হব, বা আমরা কারো সাথে মূর্খতাসুলভ আচরণ করব বা কেউ আমাদের সাথে এরূপ মূর্খতাসুলভ আচরণ করবে।"

উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাড়ি থেকে বাহির হওয়ার সময় এ দু'আ পাঠ করতেন। হাদীসটি সহীহ।[৪]

রাতদিন যে কোনো সময় বাড়ি থেকে বের হতে মুমিনের উচিত এ যিক্‌রগুলো অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু করে পাঠ করা।

যিক্‌র নং ৭৫: বাড়ি প্রবেশের যিক্‌র-১

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাল মাউলিজি ওয়া খাইরাল মাখ্‌রাজি, বিসমিল্লা-হি ওয়লাজনা- ওয়া বিসমিল্লা-হি খারাজনা- ওয়া 'আলা রাব্বিনা- তাওয়াক্কালনা-।

অর্থ: " হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি উত্তম প্রবেশস্থল ও উত্তম বহির্গমনস্থল । আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে বাহির হলাম এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম।"

আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়িতে প্রবেশের সময় আল্লাহর যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, আল্লাহর যিক্‌র করে বাড়িতে প্রবেশ করলে শয়তান সে বাড়িতে অবস্থান করতে পারে না। বাড়ি প্রবেশের মাসনূন মূল যিকর "সালাম"। আবূ মালিক আশআরীর (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: তোমাদের কেউ যখন প্রবেশ করবে তখন যেন সে এ কথাগুলো বলে, এরপর তার স্ত্রী-পরিজনদেরকে সালাম দিবে।" হাদীসটির রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু হাদীসটি "মুরসাল" হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[৫]

যিক্র নং ৭৬: বাড়ি প্রবেশের যিক্র-২ (সালাম)

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

উচ্চারণ: আস-সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রা'হমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ।

অর্থ : আপনাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত।

বাড়িতে প্রবেশের সময় উপরের দু'আ পাঠের পরে বাড়ির যার সাথেই দেখা হবে তাকে সালাম দিতে হবে। উপরের হাদীসে তা বলা হয়েছে। সালাম ইসলামের অন্যতম ইবাদত। সালাম প্রদানকারী ও উত্তর প্রদানকারী উভয়েই অগণিত সাওয়াবের অধিকারী হন। উপরন্তু সালাম মানব জীবনের অন্যতম দু'আ। এতে শান্তি, রহমত ও বরকতের দু'আ করা হয়। একটিবারের সালামও যদি কবুল হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তির জীবনে আর কিছুই অপূর্ণ থাকবে না। জীবনে শান্তি, রহমত ও বরকত পাওয়ার পর আর কী বাকি থাকে?

সমাজে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ছেলে-মেয়েরা পিতা-মাতাকে ও পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েকে সালাম দেন না। এক ধরনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা তাদেরকে এ অতুলনীয় কল্যাণকর কর্ম থেকে বিরত রাখে, যে ওয়াসওয়াসাকে অনেকে 'লজ্জা' নাম দেন। সাধারণ জ্ঞানেই আমরা বুঝতে পারি যে, একজন মানুষের দু'আর সবচেয়ে বড় হকদার তার স্বামী বা স্ত্রী ও সন্তানগণ। অথচ আমরা অন্যান্য মানুষকে সালাম প্রদান করি, তাদেরকে সাওয়াব অর্জনের সুযোগ ও দু'আ প্রদান করি কিন্তু আপনজনদেরকে বঞ্চিত করি।

সবাইকেই সালাম প্রদান সুন্নাত। আর স্বামী, স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যগণকে সালাম দেওয়া অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। হাদীসে বিশেষভাবে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য বিশেষ সাওয়াব ও বরকতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ كُفِيَ وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"তিন ব্যক্তি আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জামিন ও সংরক্ষক, যদি বেঁচে থাকে তবে তার সকল বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষা করা হবে এবং যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল সে আল্লাহর জামিনদারীতে চলে গেল ...।" হাদীসটি সহীহ।[১]

অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُونُ بَرَكَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

"যখন তুমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন তোমার স্ত্রী-পরিজনকে সালাম দেবে; এ সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বরকতের উৎস হবে।" হাদীসটি হাসান।[২]

দিনে বা রাত্রে যে কোনো সময়ে বাড়ি প্রবেশের সময় এ সকল মাসনূন বাক্য দ্বারা আল্লাহর যিক্র করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য।

যিক্র নং ৭৭ : মসজিদে গমনকালীন যিক্র (নূর প্রার্থনা)

আমরা সাজদার যিকর-৪ (যিকর নং ৬২)-এ দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাজদায় মহান আল্লাহর কাছে নূর বা জ্যোতি প্রার্থনা করতেন। তিনি সাজদা ছাড়াও ফজরের সুন্নাত আদায় করে ফরয সালাত জামাতে আদায়ের জন্য মসজিদে গমনের সময়েও এ দুআটি পাঠ করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত।[৩]

যিক্র নং ৭৮: মসজিদে প্রবেশের যিক্র-১

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: আ'উযু বিল্লা-হিল 'আযীম, ওয়া বি ওয়াজ্হিহিল কারীম, ওয়া সুলতা-নিহিল কাদীম মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ: "আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহর এবং তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর অনাদি ক্ষমতার, বিতাড়িত শয়তান থেকে।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদে প্রবেশের সময় এ কথা বলতেন এবং তিনি বলেছেন, "যদি কেউ তা বলে তবে শয়তান বলে, সারাদিনের জন্য এ ব্যক্তি আমার খপ্পর থেকে রক্ষা পেল।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

যিক্র নং ৭৯: মসজিদে প্রবেশের যিক্র-২

اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাফ্‌ তা'হ্‌ লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন ।"[১]

ইমাম মুসলিম এভাবেই সংক্ষিপ্ত দুআটি সংকলন করেছেন । অন্যান্য গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক আরো কয়েকটি বাক্য বর্ণিত । এগুলো-সহ দুআটি নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللهِ، (وَالْحَمْدُ للهِ) اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وسَلِّم، (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ) وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, (ওয়াল 'হামদুলিল্লাহ,) আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি 'আলা- মু'হাম্মাদিন ওয়া সাল্লিম, (আল্লাহুম্মাগফির লী যুনূবী) ওয়াফ্‌তা'হ্‌ লী অক্ষওয়া-বা রা'হ্‌মাতিকা ।

অর্থ : আল্লাহর নামে, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর । হে আল্লাহ মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন । হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার করুণার দরজাগুলো উন্মুক্ত করুন ।"[২]

যিক্‌র নং ৮০: মসজিদ থেকে বের হওয়ার যিক্‌র-১

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা- ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফাদ্বলিকা ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি চাচ্ছি আপনার কাছে আপনার রিযক-প্রশস্ততা ।"[৩]

ইমাম মুসলিম এভাবেই সংক্ষিপ্ত দুআটি সংকলন করেছেন । অন্যান্য গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক আরো কয়েকটি বাক্য বর্ণিত । এগুলো সহ দুআটি নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللهِ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وسَلِّم، (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ) وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি 'আলা- মু'হাম্মাদিন ওয়া সাল্লিম, (আল্লাহুম্মাগফির লী যুনূবী) ওয়াফ্‌তা'হ্‌ লী অক্ষওয়া-বা ফাদ্বলিকা ।

অর্থ: আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম প্রদান করুন । হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার রিয্‌ক-বরকতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করুন ।"[৪]

যিক্‌র নং ৮১: মসজিদ থেকে বের হওয়ার যিক্‌র-২

اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, আজির্‌ নী মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম ।

অর্থ : "হে আল্লাহ আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন ।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ যিক্‌র পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । হাদীসটি সহীহ ।[৫]

৩. ৫. ৫. জামাতে সালাতের কতিপয় অবহেলিত সুন্নাত

মসজিদে প্রবেশের পরে সেখানে পালনীয় অনেক সুন্নাত অজ্ঞানতা বা অবহেলার কারণে আমরা পরিত্যাগ করে থাকি । এ ধরনের মৃত ও পরিত্যক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি । আশা করছি অন্তত কিছু পাঠক এ সুন্নাতগুলো পালন করে মৃত সুন্নাত জীবিত করার অতুলনীয় সাওয়াব অর্জন করবেন এবং লেখকও তাঁদের সাথে সাওয়াবের অংশী হবেন ।

(১). জামাতে গমনের সময় তাড়াহুড়ো করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে । হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, সালাতের ইকামত হওয়ার পরেও যদি তোমরা মসজিদে যাও তাহলে মানসিক অস্থিরতা বা দৌড়াদৌড়ি করে মসজিদে যাবে না । শান্তভাবে ও ধীরে ধীরে যাবে । যতটুকু সালাত ইমামের সাথে পাবে তা আদায় করবে, বাকিটা পরে নিজে আদায় করবে । হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, ঘর থেকে সালাতের জন্য বের হওয়ার সময় থেকেই মুসল্লী সালাতের মধ্যেই থাকেন এবং আল্লাহর কাছে তিনি সালাতরত বলে গণ্য হন । যদি কেউ মসজিদে গিয়ে দেখেন যে পুরো জামাত শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলেও তিনি জামাতের সাওয়াব পাবেন ।

(২). মসজিদে প্রবেশ করার পর আগের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনের কাতারে দাঁড়নো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও গোনাহের কাজ। যথাসম্ভব ধীর স্থিরভাবে আগের কাতারে দাঁড়াতে হবে। এতে ইমাম এক রাক'আত শেষ করে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই। আমরা মসজিদে রাক'আত গণনা করতে যাই না, সাওয়াব অর্জন করতে যাই। তাড়াহুড়ো করলে, পিছনের কাতারে দাঁড়ালে গোনাহ হবে। আর শান্তভাবে আগের কাতারে দাঁড়ালে সাওয়াব বেশি হবে।

(৩). সালাতের কাতারে যথাসম্ভব গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াতে, মাঝের ফাঁক বন্ধ করতে ও কাতার সোজা করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

(৪). মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে 'দুখুলুল মসজিদ' বা 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' সালাত আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে অন্তত দু রাক'আত সালাত আদায় করতে বারবার উৎসাহ দিয়েছেন। মসজিদে প্রবেশ করে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দু রাকআত 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' আদায় করতে হবে। সুন্নাতে মুআক্কাদা বা জামাতে দাঁড়িয়ে গেলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নাত আদায় হবে। কোনো সালাত না পড়ে বসলে এ সুন্নাত পালনের সাওয়াব থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

(৫). সালাতে দাঁড়ানোর সময় সামনে, তিন হাতের মধ্যে সুতরা বা আড়াল রাখা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নির্দেশিত ও আচরিত সুন্নাত।

(৭). অনেক মুসল্লী সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাড়ানো, বসা, হাত উঠানো, হাত রাখা ইত্যাদির খুঁটিনাটি সুন্নাত না জানার ফলে অগণিত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। এগুলো অভিজ্ঞ আলিমগণের নিকট থেকে ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা করা অতি প্রয়োজন।

(৮). জামাআত শেষে সুন্নাত সালাত মসজিদে আদায় করলে ফরযের স্থান থেকে সরে যাওয়া সুন্নাত। ইমাম আবু হানীফার মতে ইমামের জন্য যে স্থানে ফরয পড়েছেন সে স্থানে অবস্থান বা সুন্নাত আদায় মাকরুহ। তিনি বলেন: .... যোহর, মাগরিব ও ইশার সালতে ইমামের জন্য সালামের পর স্বস্থানে বসে থাকা মাকরূহ। তার উঠে যাওয়া আমার পছন্দ। ফজর ও আসরে ইচ্ছানুসারে উঠে যাবে অথবা ... ঘুরে বা মুসল্লীদের দিকে মুখ করে .... বসে থাকবে। যোহর, মাগরিব ও ইশার পরে 'তাতাওউ' (ঐচ্ছিক বা সুন্নাত) আদায় করতে চাইলে সে মুসল্লীদের পিছনে বা যেখানে ফরয পড়েছে সেখানে ছাড়া মসজিদের অন্য কোথাও তা পড়বে। মুক্তাদীগণ যদি স্বস্থানে সুন্নাত আদায় করে তবে অসুবিধা নেই। তবে দু-এক পা সরে যাওয়া তাদের জন্য উত্তম।[১]

৩. ৬. সালাতুল বিতর

৩. ৬. ১. সালাতুল বিতর-এর রাকআত ও পদ্ধতি

ইশা'র সালাত আদায়ের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিতির সালাতের সময়। শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের শেষে বিতির আদায় করা উত্তম ও অধিক সাওয়াব। তবে কেউ শেষ রাতে উঠতে পারবেন না বলে সন্দেহ করলে তাঁর জন্য ঘুমানোর আগে বিতির আদায় করা ভাল।

উল্লেখ্য যে, হাদীসের পরিভাষায় বিতর বলতে "কিয়ামুল্লাইল" বা "তাহাজ্জুদ" বুঝানো হয়। "বিতর" অর্থ বেজোড়। কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদের শেষে "বিতর" আদায় করলে পুরো কিয়ামুল্লাইল-ই 'বিতর' বা বেজোড় সালাতে পরিণত হয়। তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু আবী কাইস বলেন:

قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاثٍ وَسِتٍّ وَثَلاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلاثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَ عَشْرَةَ

"আমি আয়েশা (রা)- কে বললাম: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কত রাক'আত বিতর পড়তেন? আয়েশা (রা) বলেন: তিনি ৪ ও ৩ রাকআত, ৬ ও ৩ রাকআত, ৮ ও ৩ রাকআত এবং ১০ ও ৩ রাকআত বিতর পড়তেন। তিনি ৭ রাকআতের কম এবং ১৩ রাকআতের অধিক বিতর পড়তেন না।" হাদীসটি সহীহ।[২]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে বিতর বলতে কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ-সহ বিতর বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু রাকআত করে চার, ছয় বা আট বা দশ রাকআত "কিয়ামুল্লাইল" সালাত আদায় করে এরপর "তিন রাকআত" "বিতর" আদায় করতেন এবং এভাবে পুরো সাত, নয়, এগারো বা তেরো রাকআত কিয়ামুল্লাইলই "বিতর" বা বেজোড় সালাতে পরিণত হতো।

এ হাদীসে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ৪+৩=৭ রাকআতের কম বিতর বা কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন না। অন্য হাদীসে তিনি ন্যূনতম পাঁচ রাকআতের কম বিত্‌র আদায় করতে নিরুৎসাহিত করেছেন। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ (لاَ) تُشَبِّهُوهُ بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ، (وَلَكِنْ) أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ (بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ).

"তোমরা তিন রাকআত বিতর পড়বে না; বিতরকে সালাতুল মাগরিবের মত বানাবে না; বরং তোমরা পাঁচ বা সাত রাকআত বিতর

পড়বে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: পাঁচ, সাত বা এগারো রাকআত বা তার চেয়ে বেশি রাকআত বিতর পড়বে)।”[১]

এ বিষয়ে আয়েশা (রা) বলেন:

لاَ تُوتَرُ بِثَلاَثٍ بُتْرٍ، صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ أَرْبَعًا

“তুমি শুধু তিন রাকআত ‘বিতর’ পড়বে না; তুমি তিন রাকআতের পূর্বে দু রাকআত বা চার রাকআত (কিয়ামুল্লাইল সালাত) পড়বে।” হাদীসটি সহীহ।[২]

তিন বা এক রাকআত বিতরের অনুমোদন প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

“বিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক্ক (দায়িত্ব)। কাজেই যে পাঁচ রাকআত বিতর আদায় করতে ভালবাসে সে যেন তাই করে; যে তিন রাকআত বিতর আদায় করতে ভালবাসে সে যেন তাই করে এবং যে এক রাকআত বিতর আদায় করতে ভালবাসে সে যেন তাই করে।” হাদীসটি সহীহ।[৩]

অন্যান্য হাদীসে তিন রাকআত বিতর বর্ণিত। উবাই ইবনু কা'ব বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

“রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক'আত বিতির পড়তেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। তিনি রুকুর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।” হাদীসটি সহীহ।[৪]

অনুরূপভাবে আলী (রা), ইবনু আব্বাস (রা), আয়েশা (রা), ইমরান ইবনুল হুসাইয়িন (রা), ইবনু মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন।[৫] বাহ্যত এ সকল হাদীসে ‘বিতর’ বলতে কিয়ামুল্লাইল-এর শেষের ‘বেজোড়’ সালাত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রথমে দু রাকআত করে চার, ছয়, আট বা দশ রাকআত সালাত আদায়ের পরে এভাবে তিন রাকআত সালাত আদায় করতেন।

পূর্ববর্তী সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাতুল বিতর তিন রাকআত পালন করা নিষিদ্ধ নয়। তবে মুমিনের উচিত সুন্নাতের নির্দেশ অনুসারে অন্তত সাত বা পাঁচ রাকআত বিতর আদায় করা। অর্থাৎ প্রথমে দু রাকআত করে চার রাকআত বা অন্তত দু রাকআত ‘কিয়ামুল্লাইল’ সালাত আদায় করে এরপর তিন রাকআত বিতর আদায় করা।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ বিভিন্নভাবে সালাতুল বিতর আদায় করতেন। হাদীসের আলোকে তিন রাকআত বিতর আদায়ের তিনটি পদ্ধতি বিদ্যমান: (১) দু রাকআতের শেষে বসে ‘আত-তাহিয়্যাতু’ পাঠ করে উঠে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকআত আদায় করা (২) দু রাকআত শেষে আত-তাহিয়্যাতু, দরুদ ও দুআ পাঠ করে সালাম ফেরানোর পরে নতুন তাকবীরে তাহরীমা-সহ পৃথক এক রাকআত আদায় করা এবং (৩) দু রাকআত শেষে না বসে তৃতীয় রাকআতে উঠে দাঁড়ানো এবং তিন রাকআত একত্রে শেষ করা।

প্রথম পদ্ধতিটিই হানাফী মাযহাব সমর্থিত এবং আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত। কোনো কোনো আলিম এ পদ্ধতিতে বিতর পালনে নিরুৎসাহিত করে বলেন এতে মাগরিবের মত বিতর পড়া হয় যা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। তাঁদের এ ধারণাটি সঠিক নয়। নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

(১) “মাগরিবের মত বিতর না পড়ার” হাদীসগুলোতে পদ্ধতিগত পার্থক্যের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি; বরং রাকআতের পার্থক্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুস্পষ্টত বলা হয়েছে সালাতুল বিতর “মাগরিবের মত তিন রাকআত” না পড়ে “পাঁচ” বা “সাত” রাকআত পড়। অর্থাৎ তিন রাকআত পড়লেই তা মাগরিবের মত হয়ে গেল; যে পদ্ধতিতেই তা পড়া হোক না কেন।

(২) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিন রাকআত বিতর পালন করেছেন বলে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অধিকাংশ হাদীস থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি **১**ম পদ্ধতিতেই তিন রাকআত বিতর আদায় করেছেন।

(৩) অনেক সাহাবী-তাবিয়ী “মাগরিবের মত”, অর্থাৎ প্রথম পদ্ধতিতে ৩ রাকআত বিতর আদায় করতেন বলে প্রমাণিত।[৬]

মুমিনগণের উচিত পদ্ধতি বিষয়ক বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া। উপরের তিনটি পদ্ধতির যে পদ্ধতিটি আপনার নিকট অধিক

গ্রহণযোগ্য সে পদ্ধতিতে বিতর আদায় করুন এবং হাদীসে প্রমাণিত অন্যান্য পদ্ধতিকে সম্মান করুন।

আমরা সাধারণত ইশা'র সালাতের সাথেই বিতির আদায় করি। এতে দোষ নেই। তবে যারা শেষ রাতে উঠতে পারবেন না তাদের উচিত রাত ১০/১১ টায় বা ঘুমাতে যাওয়ার সময় সম্ভব হলে কয়েক রাক'আত নফল সালাত আদায় করে বিতির আদায় করা। এতে আমাদের অতিরিক্ত লাভ:

(ক) দ্বিতীয় উত্তম সময়ে বিতির আদায় : হাদীসের আলোকে বিতিরের সর্বোত্তম সময় শেষ রাত্র এবং দ্বিতীয় উত্তম সময় ঘুমানোর পূর্বে।

(খ) তাহাজ্জুদের সালাতের আংশিক সাওয়াব: এ সময়ের সালাতও রাতের সালাত হিসাবে গণ্য। বিশেষত রাতের একতৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে সালাত ও দু'আর বিশেষ ফযীলত আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

(গ) ওযূ অবস্থায় ঘুমানোর ফযীলত: ঘুমের জন্য ওযূ অবস্থায় শয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এ জন্য বিশেষ দুটি পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

طَهِّرُوا هٰذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِراً إلاَّ بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إلاَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً

"তোমরা তোমাদের দেহগুলোকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ তোমাদের পবিত্র করুন। যদি কোনো বান্দা ওযূ অবস্থায় ঘুমান, তাহলে তার পোশাকের মধ্যে একজন ফিরিশতা শুয়ে থাকেন। রাত্রে যখনই এ ব্যক্তি নড়াচড়া করে তখনই এ ফিরিশতা বলেন : হে আল্লাহ আপনি এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ সে ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়েছে।" হাদীসটি হাসান।[১]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ طَاهِرًا (عَلَى ذِكْرِ اللهِ)، فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

"যে কোনো মুসলিম যদি ওযু অবস্থায় (আল্লাহর যিক্‌রের উপর) ঘুমায়; এরপর রাত্রে কোনো সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে (ঐ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে) আল্লাহর কাছে তাঁর জাগতিক বা পারলৌকিক কোনো কল্যাণ কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেনই।"[২]

যিক্‌র নং ৮২ : বিতরের পরের যিক্‌র-১:

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ ও অর্থ: পূর্ববর্তী যিক্‌র নং ৬১: সাজদার যিকর-৩ দেখুন।

আলী (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ (يَدْعُو) فِى آخِرِ وِتْرِهِ....

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতরের শেষে কথাগুলো বলতেন। হাদীসটি সহীহ।[৩]

এখানে বিতরের শেষ বলতে সালামের আগে না সালামের পরে তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। এজন্য মুমিন এ দুআটি সালাতুল বিতরের শেষে সালামের আগে অথবা সালামের পরে পাঠ করতে পারেন।

যিক্‌র নং ৮৩: বিতরের পরের যিক্‌র-২

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।

অর্থ : "ঘোষণা করছি পবিত্রতা মহা-পবিত্র সম্রাটের।"

উবাই ইবনু কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতিরের শেষে তিন বার এ যিকরটি বলতেন, শেষবারে লম্বা করে বলতেন। হাদীসটি

Contents

সহীহ।[১]

৩. ৬. ২. সালাতুল বিতর-এর কুনুত

কুনুত শব্দের অর্থ আনুগত্য, দণ্ডায়মান হওয়া, প্রার্থনা করা বা দণ্ডায়মান অবস্থায় দু'আ করা। সালাতের মধ্যে দু'আর অন্যতম মাসনূন সময় বিতিরের সালাতের কুনুত। বিতির সালাতের শেষ রাক'আতে রুকুর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতেন, যা কুনুত বা দু'আ কুনুত নামে পরিচিত। আমাদের সমাজে 'দু'আ কুনুত' নামে পরিচিত দু'আটিও সহীহ সনদে বর্ণিত।[২] কিন্তু আমরা অজ্ঞতাবশত মনে করি যে, আমাদের মাযহাব অনুসারে কুনুতের সময় এ দু'আটিই পাঠ করতে হবে, অন্য কোনো দু'আ পাঠ করা যাবে না। ধারণাটি ভুল। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, কুনুতের জন্য কোনো দু'আ নেই, কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ) বলেন:

قلت فما مقدار القيام في القنوت قال كان يقال مقدار إذا السمآء انشقت والسمآء ذات البروج قلت فهل فيه دعاء موقت قال لا

"আমি বললাম: তাহলে কুনুতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'আ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন: বলা হতো যে, সূরা 'ইযাস সামাউনশাক্কাত' ও সূরা 'ওয়াস সামাই যাতিল বুরুজ' পরিমাণ। আমি বললাম: কুনুতের জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট দু'আ আছে? তিনি বললেন: না।"[৩]

ইমাম মুহাম্মাদের অন্য গ্রন্থ "আল-হুজ্জাত"-এ তিনি লিখেছেন:

قلت فهل في القنوت كلام موقت قال لا ولكن تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتدعو بما بدا لك

"আমি বললাম: কুনুতের জন্য কি কোনো নির্ধারিত কথা বা দুআ আছে? না। বরং তুমি আল্লাহর প্রশংসা করবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ করবে এবং তোমার সুবিধা ও ইচ্ছামতো যে কোনো দু'আ করবে।"[৪]

এভাবে হানাফী ফকীহগণ কুনুতের জন্য এবং সালাতের মধ্যে কোনো দু'আ নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এতে দু'আর প্রাণ থাকে না। মুসাল্লী ঠোঁটস্থভাবে অমনোযোগের সাথে সালাতের যিক্‌র ও দু'আ আউড়ে যান। সর্বদা একটি নির্ধারিত দু'আ পাঠ করলে সালাতের প্রাণবন্ততা নষ্ট হয়ে যায়। তবে ক্রুসেড ও তাতার আক্রমণে বিপর্যস্ত মুসলিম বিশ্বে সামগ্রিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে কোনো কোনো ফকীহ সালাতের দুআ ও যিকর নির্ধারণ করে দেওয়া উত্তম বলে মনে করেছেন। অশিক্ষিত ও দীনী শিক্ষা থেকে একেবারে বঞ্চিত সাধারণ মুসলিম দুআ বা যিকর বাছাই করতে ভুল করতে পারে বা দুআর নামে বানোয়াট ও নিষিদ্ধ কথাবার্তা বলে সালাত নষ্ট করে ফেলতে পারে ভয়ে তারা এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতই মাসনূন দুআর ক্ষেত্রে এরূপ কোনো আশঙ্কা থাকে না। দশম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবন নুজাইম (৯২৬-৯৭০ হি) আল-বাহরুর রায়িক গ্রন্থে কুনুত প্রসঙ্গে বলেন:

وَأَمَّا دُعَاؤُهُ فَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ كَذَا ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ أَدْعِيَةٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي حَالِ الْقُنُوتِ وَلِأَنَّ الْمُؤَقَّتَ مِنْ الدُّعَاءِ يَذْهَبُ بِالرِّقَّةِ كَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فَيَبْعُدُ عَنْ الْإِجَابَةِ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤَقَّتُ فِي الْقِرَاءَةِ لِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ فَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ أَوْلَى وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ مَا سِوَى اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك ... فَالْأَوْلَى أَنْ يَقْرَأَهُ وَلَوْ قَرَأَ غَيْرَهُ جَازَ وَلَوْ قَرَأَ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَ حَسَنًا وَالْأَوْلَى أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَهُ ... {اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت} إلَى آخِرِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَفْضَلُ فِي الْوِتْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ رُبَّمَا يَكُونُ جَاهِلًا فَيَأْتِي بِدُعَاءٍ يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ

"কুনূতের দুআ হিসেবে কোনো নির্ধারিত দুআ নেই। ইমাম কারখী 'কিতাবুস সালাত' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। প্রথম কারণ সাহাবীগণ থেকে কুনূতের জন্য বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নির্ধারিত দুআ হৃদয়ের আবেগ ও বিনম্রতা নষ্ট করে দেয়। ফলে দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। তৃতীয়ত, সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো সূরা নির্ধারণ করা হয় না; কাজেই কুনূতের দুআর ক্ষেত্রেও কোনো দূআ নির্ধারণ না করাই উত্তম। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, কুনূতের জন্য কোনো দুআ নির্ধারিত নেই, এ কথার অর্থ হলো, 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়ীনুকা... দুআটি ছাড়া অন্য কোনো দুআ নির্ধারিত নয়। ... এ দু'আটি পাঠ করা উত্তম। তবে যদি অন্য কোনো দুআ পাঠ করে তাহলেও তা বৈধ। আর যদি এ দুআটির সাথে অন্যান্য দুআ পাঠ করে তাহলে তা সুন্দর। সর্বোত্তম হলো 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়ীনুকা...' দুআটির পর "আল্লাহুম্মা, ইহদিনী

ফীমান হাদাইতা ..... শেষ পর্যন্ত" দুআটি পাঠ করা। .... কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, বিতরের কুনুতের জন্য দুআ নির্ধারিত থাকাই উত্তম; কারণ ইমাম হয়ত জাহিল হবে এবং তার অজ্ঞতার কারণে, নিজে বানিয়ে দুআ পড়ার নামে দুআর মধ্যে মানুষে মানুষে কথোপকথনের মত বাক্যাদি ব্যবহার করবে, ফলে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।"[১]

এভাবে আমরা দেখছি যে, সালাতের পরিপূর্ণ সাওয়াব-বরকত লাভ করতে এবং আল্লাহর কাছে দুআ কবুলের তাওফীক লাভ করতে প্রত্যেক মুমিনের উচিত বিভিন্ন মাসনূন শব্দের দু'আ অর্থ বুঝে মুখস্থ করে একেক সময় একেক দু'আ পাঠ করা। এতে মনের আবেগ দিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে খুশু ও বিনয়ের সাথে দু'আ করা সহজ হয়। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। এখানে আমরা কুনুতের কয়েকটি মাসনূন দুআ উল্লেখ করছি। এগুলো ছাড়াও এ গ্রন্থে উল্লেখিত যে কোনো মাসনূন দুআ বা কুরআন-হাদীসের যে কোনো দুআ এ সময়ে পাঠ করা যায়। হানাফী ফকীহগণ এবং অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, কুনুতের সময় কুরআন-হাদীসের যে কোনো দুআ বা ভাল অর্থের যে কোনো বাক্য ব্যবহার করে দু'আ করা বৈধ।[২]

যিক্‌র নং ৮৪: মাসনূন কুনূত-১

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتُوْبُ إِلَيْكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ (كُلَّهُ) نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ (الْجِدَّ) بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মা, ইন্না- নাস্‌তা'য়ীনুকা, ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা, ওয়া নাস্‌তাহ্‌দীকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাতূবু ইলাইকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলাইকা, ওয়া নুস্‌নী 'আলাইকাল খাইরা (কুল্লাহু)। নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা- নাক্‌ফুরুকা, ওয়া নাখলা'উ ওয়া নাতরুকু মান ইয়াফজুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা- না'বুদু, ওয়া লাকা নুস্বাল্লী, ওয়া নাস্‌জুদু, ওয়া ইলাইকা নাস্‌'আ- ওয়া না'হফিদু, নারজূ রা'হমাতাকা, ওয়া নাখ্‌শা 'আযা-বাকা, ইন্না 'আযাবাকা(ল্ জিদ্দা) বিল কুফ্‌ফা-রি মুলহিক্ব (মুল'হাক্ব)।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে হেদায়াত প্রার্থনা করছি, আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, আপনার কাছে তাওবা করছি, আপনার উপর তাওয়াক্কুল করছি, সকল কল্যাণের প্রশংসা ও গুণকীর্তন আপনার জন্যই করছি। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞতা-অবিশ্বাস প্রকাশ করি না। আমরা বিচ্ছিন্ন হই এবং পরিত্যাগ করি তাকে যে আপনার অবাধ্য হয়। হে আল্লাহ, আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি, কেবলমাত্র আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং সাজদা করি, শুধু আপনার দিকেই ধাবিত হই এবং আপনার আনুগত্যেই কর্ম করি। আমরা আপনার রহমত আশা করি এবং আপনার শাস্তির ভয় করি। নিশ্চয় আপনার প্রকৃত শাস্তি কাফিরদেরকে স্পর্শ করবে।"

কুনূতের এ দু'আটি এভাবে বা কাছাকাছি শব্দে বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে পরিচিত। এ দু'আটি "হানাফী কুনূত" হিসেবেও পরিচিত। হানাফী ফিকহের বিভিন্ন গ্রন্থে দু'আটির শব্দ ও বাক্যের মধ্যে কিছু কমবেশি ও আগপিছু থাকলেও মূল কথাগুলো একই। এ কুনূতটির মূল কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে এবং একাধিক সাহাবী (রা) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত।

তাবিয়ী খালিদ ইবন আবী ইমরান (১২৫ হি) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুদার গোত্রের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ) এসে তাকে থামতে ইঙ্গিত করে বলেন, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহ আপনাকে গালিদাতা বা অভিশাপকারী হিসেবে প্রেরণ করেন নি; রবং আপনাকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন.... এরপর তিনি তাকে নিম্নের কুনূতটি শিক্ষা দেন:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ.

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মা, ইন্না- নাস্‌তা'য়ীনুকা, ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাখ্‌দ্বা'উ লাকা, ওয়া নাখলা'উ ওয়া নাতরুকু মান ইয়াক্‌ফুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা- না'বুদু, ওয়া লাকা নুস্বাল্লী, ওয়া নাস্‌জুদু, ওয়া ইলাইকা নাস্‌'আ- ওয়া না'হফিদু, নারজূ রা'হমাতাকা, ওয়া নাখা-ফু 'আযা-বাকাল জিদ্দা, ইন্না 'আযাবাকা বিল কাফিরীনা মুলহিক্ব।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে অনুগত হচ্ছি। আমরা বিচ্ছিন্ন হই এবং পরিত্যাগ করি তাকে যে আপনার কুফরী করে। হে আল্লাহ, আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি, কেবলমাত্র আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং সাজদা করি, শুধু আপনার দিকেই ধাবিত হই এবং আপনার আনুগত্যেই কর্ম করি। আমরা আপনার রহমত আশা করি এবং আপনার প্রকৃত শাস্তির ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি কাফিরদেরকে স্পর্শ করবে।"

হাদীসটির সনদ দুর্বল। উপরন্তু হাদীসটি মুরসাল।[৩] তবে কুনূতের নিম্নের দুআটির প্রথম অংশে এ কুনুতটি সহীহ সনদে বর্ণিত।

যিক্‌র নং ৮৫: মাসনূন কুনূত-২

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ (وَنَشْكُرُكَ) وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَلَكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمَ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِى لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.

উচ্চারণ: "বিসমিল্লা-হির রা'হ্মা-নির রা'হীম। আল্লা-হুম্মা, ইন্না- নাস্‌তা'য়ীনুকা, ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা, ওয়া নুস্‌নী 'আলাইকা, ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা- নাক্‌ফুরুকা, ওয়া নাখলা'উ ওয়া নাতরুকু মান ইয়াফজুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা- না'বুদু, ওয়া লাকা নুস্বাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু, ওয়া লাকা নাস্‌'আ- ওয়া না'হফিদু, নাখ্‌শা 'আযা-বাকাল জিদ্দা, ওয়া নারজূ রা'হমাতাকা, ইন্না 'আযাবাকা বিল কাফিরীনা মুল'হিক্ব।"

আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লানা- ওয়ালিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনা-তি, ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমা-তি, ওয়া আল্লিফ্‌ বাইনা ক্বুলূবিহিম, ওয়া আস্বলি'হ যাতা বাইনিহিম, ওয়ানস্বুরহুম 'আলা 'আদুওয়িকা ওয়া 'আদুওয়িহিম। আল্লা-হুম্মাল'আন কাফারাতা আহলিল কিতাবিল্‌ লাযীনা ইয়াস্বুদ্দূনা 'আন সাবীলিকা ওয়া ইউকায্‌যিবূনা রুসূলাকা ওয়া ইউক্বা-তিলূনা আওলিয়া-য়িকা। আল্লা-হুম্মা, খালিফ বাইনা কালিমাতিহিম, ওয়া যালযিল আক্বদামাহুম, ওয়া আনযিল বিহিম বা'সাকাল্‌ লাযী লা- তারুদ্দুহূ 'আনিল ক্বাওমিয যালিমীন।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করছি। আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞতা-অবিশ্বাস প্রকাশ করি না। আমরা বিচ্ছিন্ন হই এবং পরিত্যাগ করি তাকে যে আপনার অবাধ্য হয়। হে আল্লাহ, আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি, কেবলমাত্র আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং সাজদা করি, শুধু আপনার দিকেই ধাবিত হই এবং আপনার আনুগত্যেই কর্ম করি। আমরা আপনার প্রকৃত শাস্তির ভয় করি এবং আপনার রহমত আশা করি। নিশ্চয় আপনার শাস্তি কাফিরদেরকে স্পর্শ করবে।"

হে আল্লাহ, ক্ষমা করুন আমাদেরকে, এবং মুমিন পুরুষদেরকে এবং মুমিন নারীদেরকে, এবং মুসলিম পুরুষদেরকে এবং মুসলিম নারীদেরকে, তাদের অন্তরের মধ্যে সম্প্রীতি প্রদান করুন, তাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সুন্দর করে দিন, আপনার ও তাদের শত্রুদের উপর তাদের বিজয় প্রদান করুন। হে আল্লাহ, যে সকল আহল কিতাব আপনার পথ থেকে মানুষদেরকে বাধা দেয়, আপনার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে এবং আপনার ওলীগণের সাথে যুদ্ধ করে তাদের অভিশপ্ত করুন, তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করুন, তাদের পদসমূহ কম্পমান করুন, তাদের উপর আপনার শাস্তি নাযিল করুন, যে শাস্তি অপ্রতিরোধ্যভাবে পাপাচারী সম্প্রদায়কে পাকড়াও করে।"

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী উবাইদ ইবনু উমাইর (৬৮ হি) বলেন, আমি উমার (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তিনি রুকু থেকে উঠার পর- অন্য বর্ণনায়: তিনি কুরআন পাঠ শেষে রুকুর আগে- নিম্নের কুনূত পাঠ করেন:

হাদীসটির সনদ সহীহ। উল্লেখ্য যে, আলী (রা), ইবন মাসঊদ (রা), উবাই ইবন কাব (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় কুনুতের অনুরূপ দু'আ বিভিন্ন সহীহ ও যয়ীফ সনদে বর্ণিত।[১]

যিক্‌র নং ৮৬: মাসনূন কুনুত-৩

اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহ্‌ দিনী ফীমান হাদাইতা, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়া বা-রিক লী ফীমা- আ'অ্‌ তাইতা, ওয়া ক্বিনী শাররা ক্বাদ্বাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বদ্বী, ওয়ালা- ইউক্বদ্বা 'আলাইকা, ইন্নাহু লা- ইয়াযিল্লু মান ওয়া-লাইতা, [ওয়ালা- ইয়া'ইয্‌যু মান 'আ-দাইতা] , তাবা-রাক্‌তা রাব্বানা- ওয়া তা'আ-লাইতা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাকে হেদায়েত দান করুন, যাদেরকে আপনি হেদায়েত করেছেন তাদের সাথে। আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করুন (আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন), যাদেরকে আপনি ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে। আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে

বরকত প্রদান করুন। আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন, আপনার বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আপনি যাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না। আর আপনি যাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কখনো সম্মানিত হবে না। মহামহিমান্বিত বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভু, মহামর্যাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি।"

কুনুত বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, হানাফী ফকীহগণ কুনুতের প্রথম দুআটি পাঠের পরে উপরের এ দুআটি পাঠ করাকে উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। এ কুনুতটি সম্পর্কে হাসান ইবন আলী (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়েছেন বিতিরের সালাতে বা বিতরের কুনুতে বলার জন্য।" হাদীসটি সহীহ।[১]

যিক্‌র নং ৮৭: মাসনূন কুনূত-৪

رَبِّ أَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدَى لِـــيْ (إِلَـــيَّ) وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْـــكَ أَوَّاهًـــا مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْـــلُلْ سَـــخِيْمَةَ قَلْبِيْ (صَدْرِيْ)

"হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে শক্তি-সহায়তা প্রদান করুন, আর আমার বিরুদ্ধে সহায়তা প্রদান করবেন না। এবং আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আর আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন না। এবং আপনি আমার জন্য কৌশল করুন, আর আমার বিরুদ্ধে কৌশল করবেন না। এবং আপনি আমাকে হেদায়াত করুন এবং আমার জন্য হেদায়াত সহজ করুন। আপনি আমাকে সাহায্য করুন যে আমার উপর অত্যাচার করেছে তার বিরুদ্ধে। হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে বানিয়ে দিন আপনার জন্য অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, আপনার অধিক যিক্‌রকারী, আপনার প্রতি অধিক ভীতিসম্পন্ন, আপনার অধিক আনুগত্যকারী, আপনার প্রতি বিনয়ী এবং আপনার দিকে বেশি বেশি তাওবা কারী। হে আমার প্রতিপালক, আপনি কবুল করুন আমার তাওবা, ধুয়ে দিন আমার পাপ, কবুল করুন আমার দু'আ, প্রতিষ্ঠিত করুন আমার প্রমাণ, পবিত্র-সুসংরক্ষিত করুন আমার জিহ্বা, সুপথে পরিচালিত করুন আমার অন্তর, বের করে দিন আমার অন্তরের সব হিংসা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা।"

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ দু'আ করতেন। হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবুল হাসান তানাফিসী বলেন, আমি হাদীসের রাবী ইমাম ওকী' ইবনুল জার্‌রাহকে (১৯৬হি) জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি বিত্‌র-এর কুনুতে এ দু'আটি বলব? তিনি বললেন: হ্যাঁ। হাদীসটি সহীহ।[২]

আমরা একেক সময় একেকটি দুআ পাঠ করব। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও অন্যান্য সকল ইমাম এ সময়ে যে কোনো বিষয়ে দু'আ চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবে মাসনূন দু'আ পাঠের চেষ্টা করতে হবে। কুনুতের এ চারটি মাসনূন দুআ ছাড়াও এ বইয়ে উল্লেখিত যে কোনো মাসনূন দুআ অথবা কুরআন ও হাদীসের যে কোনো দুআ আমরা মুখস্থ করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে 'কুনূত' হিসেবে পাঠ করতে পারি।

৩. ৬. ৩. কুনুতের জন্য হস্তদ্বয় উত্তোলন

আমরা দেখেছি যে, দু'আর সময় দুহাত উঠানো উত্তম। এজন্য অনেক ফকীহ কুনুতের মুনাজাতের সময়ও দুহাত তুলে দু'আ করার বিধান দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ফকীহ এ সময় হাত না তুলে হাত বাঁধা অবস্থায় অথবা দুপাশে ঝুলিয়ে রেখে কুনুত পাঠের বিধান দিয়েছেন। যাঁরা দুহাত তুলে মুনাজাত করে কুনুত পাঠ করার বিধান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম কাযী আবূ ইউসূফ।[৩] এছাড়া শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীগণও এভাবে দু হাত তুলে মুনাজাতের মাধ্যমে কুনুত পাঠ করেন। তাঁদের দলিলগুলো নিম্নরূপ:

(১) বিভিন্ন হাদীসে দু'আর সময় হাত উঠানোর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলোর আলোকে কুনুতের দু'আর সময়েও হাত উঠানো উত্তম।

(২) রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের ভিতরে দু'আ করার সময়েও কখনো কখনো দু হাত উঠাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের নামাযে তিনি নামাযের মধ্যে হাত তুলে দু'আ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[৪] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে উমার

(রা), আলী (রা) প্রমুখ সাহাবী কুনুতে নাযিলার সময় দু' হাত তুলে দু'আ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[১]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্‌র-এর কুনুতের সময় হাত উঠিয়েছেন বলে বর্ণিত না হলেও, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবূ হুরাইরা প্রমুখ সাহাবী (রা) বিত্‌র-এর কুনুতে দু হাত তুলে মুনাজাত করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[২]

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বিত্‌র-এর কুনুত পাঠের সময় হাত না তুলে স্বাভাবিকভাবে হাত বাঁধা অবস্থায় কুনুত পাঠ করতে বিধান দিয়েছেন।[৩] যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্‌র-এর কুনুতের সময় হাত তুলে দু'আ করেছেন বলে বর্ণিত হয় নি, সেহেতু হাত তুলে দু'আ করার ফযীলতের হাদীস দিয়ে বা কুনুতের নাযিলার উপর কিয়াস করে বিত্‌র-এর কুনুতে হাত উঠানোর বিধান প্রদান করেন নি তিনি। তিনি সুন্নাতের হুবহু অনুকরণ করতে ভালবাসতেন।

৩. ৬. ৪. মনে মনে বা সশব্দে কুনুত পাঠ ও আমীন বলা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিপদাপদের কুনুত সশব্দে পাঠ করতেন এবং পিছনের মুক্তাদীগণ "আমীন" বলতেন বলে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[৪] তবে বিতরের কুনূত তিনি সশব্দে পড়তেন বলে স্পষ্টত বর্ণিত হয় নি। ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, বিতরের কুনুত মনে মনে বা সশব্দে পড়া বৈধ।[৫] হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, বিতরের কুনুত মনে মনে পড়া উত্তম, তবে জোরে বা সশব্দে পড়া বৈধ। এ প্রসঙ্গে ষষ্ঠ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা আবূ বাকর আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি) বলেন:

وَأَمَّا صِفَةُ دُعَاءِ الْقُنُوتِ مِنْ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ غَيْرَهُ وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ أَسَرَّ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَ إمَامًا يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ لَكِنْ دُونَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ يُتَابِعُونَهُ هَكَذَا إلَى قَوْلِهِ إنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ ، وَإِذَا دَعَا الْإِمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يُتَابِعُهُ الْقَوْمُ ؟ ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى اخْتِلَافًا بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُتَابِعُونَهُ وَيَقْرَءُونَ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ لَا يَقْرَءُونَ وَلَكِنْ يُؤَمِّنُونَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ شَاءَ الْقَوْمُ سَكَتُوا .

"কুনূতের দুআ সশব্দে বা মনে মনে পাঠের পদ্ধতির বিষয়ে মুখতাসারুত তাহাবী গ্রন্থের ব্যাখ্যায় কাযী বলেন: একাকী সালাত আদায়কারীর বিষয়টি তার ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে অন্যদের শোনানোর মত জোরে পাঠ করবেন, ইচ্ছা করলে নিজে শোনার মত জোরে পাঠ করবেন এবং ইচ্ছা করলে মনে মনে পাঠ করবেন। কিরাআত বা কুরআন পাঠের বিষয়টিও অনুরূপ। আর যদি তিনি ইমাম হন তবে কুনূত সশব্দে পাঠ করবেন, তবে কুরআন পাঠের চেয়ে একটু কম শব্দে কুনূত পাঠ করবেন। মুক্তাদীগণ (১ম কুনূতের শেষে) 'ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক' পর্যন্ত ইমামের অনুসরণ করবেন। এরপর যখন ইমাম দুআ পাঠ করবেন তখন মুক্তাদীগণ কি ইমামের অনুসরণ করবেন? এ বিষয়ে ফাতাওয়া গ্রন্থে আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মাদের মধ্যে মতভেদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ ইউসূফ বলেন: মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবেন এবং ইমামের সাথে সাথে দুআ পাঠ করবেন। মুহাম্মাদ বলেন: মুক্তাদীগণ দুআ পাঠ করবেন না, বরং তারা ইমামের দুআর সাথে আমীন আমীন বলবেন। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন: মুক্তাদীগণ ইচ্ছা করলে চুপ করে থাকতে পারেন।"[৬]

হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মারাকীল ফালাহ"-এর রচয়িতা একাদশ হিজরী শতকের মিসরীয় হানাফী ফকীহ আল্লামা হাসান ইবন আম্মার ইবন আলী শুরনুবলালী (১০৬৯ হি) বলেন:

(والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام) على الأصح ويخفي الإمام والقوم على الصحيح لكن استحب للإمام الجهر في بلاد العجم ليتعلموه كما جهر عمر رضي الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفد العراق ولذا فصل بعضهم إن لم يعلم القوم فالأفضل للإمام الجهر ليتعلموا وإلا فالإخفاء أفضل (وإذا شرع الإمام في الدعاء) وهو اللهم اهدنا الخ كما سنذكره (بعد ما تقدم) من قوله اللهم إنا نستعينك الخ (قال أبو يوسف رحمه الله يتابعونه ويقرؤونه معه) أيضا (وقال محمد لا يتابعونه) فيه ولا في القنوت الذي هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك (ولكن يؤمنون) على دعائه

"অধিকতর সহীহ মতে মুকতাদীও ইমামের মত কুনুত পাঠ করবেন। সহীহ মতে ইমাম এবং মুক্তাদীগণ সকলেই মনে মনে কুনুত পাঠ করবেন। তবে অনারব দেশগুলোতে ইমামের জন্য জোরে জোরে কুনুত পাঠ করা মুসতাহাব; যেন মুক্তাদীগণ শিক্ষালাভ করতে পারে। এজন্যই ইরাকের প্রতিনিধিগণ যখন উমার (রা)-এর নিকট আগমন করেন তখন তিনি সালাতের সানা সশব্দে পাঠ করেন। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, যদি মুক্তাদীগণ কুনূত না জানেন তবে ইমামের জন্য সশব্দে কুনুত পাঠ উত্তম। আর যদি মুক্তাদীগন কুনূত জানেন তবে

ইমামের জন্য মনে মনে পাঠ করা উত্তম। আর যখন ইমাম দুআ শুরু করবেন, অর্থাৎ প্রথম কুনূত: আল্লাহুম্মা ইন্না- নাসতায়ীনুকা... পাঠ শেষ করার পর দ্বিতীয় কুনূত: আল্লা-হুম্মাহ্ দিনী ফীমান হাদাইতা.... পাঠ শুরু করবেন তখন আবূ ইউসূফ (রাহ)-এর মতে মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবেন এবং তাঁর সাথে কুনূত পড়বেন। মুহাম্মাদ বলেন: কুনুতের প্রথম দুআ (আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়ীনুকা....) এবং দ্বিতীয় দুআ (আল্লা-হুম্মাহ্ দিনী...) কোনো দুআতেই মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবেন না এবং কুনুত পড়বেন না; বরং সর্বাবস্থায় তারা ইমামের দু'আর সাথে আমীন আমীন বলতে থাকবেন।"[১]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, একাকী সালাতুল বিতর আদায়ের ক্ষেত্রে মুসাল্লী নিজের মনের আবেগ ও অবস্থার ভিত্তিতে একেবারে মনে মনে বা সামান্য শব্দে কুনুত পাঠ করতে পারেন। আর রামাদান মাসে জামাতে বিতর আদায়ের সময় ইমামের জন্য সশব্দে কুনুত পাঠই উত্তম ও মুস্তাহাব। কারণ তারাবীহের জামাতে উপস্থিত মুক্তাদীগণের অনেকেই কুনুতের দুআ জানেন না। কেউ কেউ ১ম দুআটি জানলেও ২য় ও অন্যান্য দুআ জানেন না। কাজেই ইমাম যদি সশব্দে দুআ পাঠ করেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন বলে তবে তা দুআর আবেগ এবং কবুলিয়্যাতের জন্য অনেক সহায়ক হবে।

৩. ৬. ৫. বিতর ও রাতের সালাতে জোরে বা আস্তে কিরাআত

সালাতুল বিতর, কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন জোরে বা আস্তে পাঠ করা যায়। হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, নফল সালাতের বিধান ফরয সালাতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য দিবসে যে সকল নফল-সুন্নাত সালাত আদায় করা হয় সেগুলোতে কুরআন মনে মনে পাঠ করতে হবে। পক্ষান্তরে সালাতুল বিতর, তাহাজ্জুদ ও রাত্রিকালিন সকল নফল সালাত একাকী আদায়ের সময় মুসাল্লী ইচ্ছামত সশব্দে বা মনে মনে কুরআন পাঠ করতে পারেন। তবে রাতের নফল সালাত জামাতে আদায় করলে সশব্দে কুরআন পাঠ করা ওয়াজিব। এজন্য রামাদানে তারাবীহ ও বিতর জামাতে আদায় করলে ইমামের জন্য কুরআন সশব্দে পাঠ ওয়াজিব।[২] এ প্রসঙ্গে ইমাম কাসানী বলেন:

وَأَمَّا فِي التَّطَوُّعَاتِ فَإِنْ كان فِي النَّهَارِ يُخَافِتُ وَإِنْ كان فِي اللَّيْلِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ خَافَتَ وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ لِأَنَّ النَّوَافِلَ اتباع الْفَرَائِضِ وَالْحُكْمُ فِي الْفَرَائِضِ كَذَلِكَ حتى لو كان بِجَمَاعَةٍ كما فِي التَّرَاوِيحِ يَجِبُ الْجَهْرُ وَلَا يَتَخَيَّرُ كما فِي الْفَرَائِضِ وقد رُوِيَ عن النبي ﷺ أَنَّهُ كان إذَا صلى بِاللَّيْلِ سُمِعَتْ قِرَاءَتُهُ من وَرَاءِ الْحِجَابِ. وَرُوِيَ أَنَّ النبي ﷺ مَرَّ بِأَبِي بَكْرٍ رضي اللَّهُ عنه وهو يَتَهَجَّدُ بِاللَّيْلِ وَيُخْفِي الْقِرَاءَةَ وَمَرَّ بِعُمَرَ وهو يَتَهَجَّدُ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ .. فقال النبي ﷺ يا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ من صَوْتِكَ قَلِيلا وَيَا عُمَرُ اخْفِضْ من صَوْتِكَ قَلِيلا

"দিবসের নফল সালাতে মনে মনে কুরআন পাঠ করতে হবে। আর রাতের সালাতে বিষয়টি মুসাল্লীর ইচ্ছাধীন; তিনি মনে মনে বা সশব্দে কুরআন পড়তে পারবেন। তবে সশব্দে পড়াই উত্তম। কারণ নফল হলো ফরযের অনুসারী। রাতের ফরয সালাতগুলো একাকী পড়লে যেমন কিরাআত জোরে পড়াই উত্তম; তেমনি নফলের ক্ষেত্রেও একই বিধান। একইভাবে রাতের ফরয সালাতের জামাতে যেমন কুরআন জোরে পাঠ ওয়াজিব তেমনি রাতের নফল সালাত জামাতে আদায় করলে কুরআন জোরে পড়া ওয়াজিব; এজন্যই তারাবীহ-এর জামাতে ইমামকে জোরে কুরআন পড়তে হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের (তাহাজ্জুদ-বিতর-কিয়ামুল্লাইল) সালাতে এমনভাবে কুরআন পাঠ করতেন যে, পর্দার বাইরে থেকে তা শোনা যেত। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাতে তিনি তাহাজ্জুদের সালাতে আবূ বাকর (রা)-কে চুপে চুপে এবং উমার (রা)- কে উচ্চঃস্বরে কুরআন পাঠ করতে দেখেন। ... তিনি বলেন: হে আবূ বাকর, তুমি তোমার আওয়াজ একটু উচু করবে এবং হে উমার, তুমি তোমার আওয়াজ একটু নিচু করবে।... ।"[৩]

৩. ৬. ৬. কুনুতে নাযিলা বা বিপদাপদের কুনুত

সমাজ, রাষ্ট্র বা উম্মাতের কোনো কঠিন বিপদ, রোগব্যাধি বা বিপর্যয়ের সময় ফজরের সালাতে এবং প্রয়োজনে সকল সালাতের শেষ রাকআতের রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর পর সমবেত মুসল্লীদের নিয়ে দুআ করাকে 'কুনুতে নাযেলা' বলা হয়। এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আমাদের সমাজে অনেকেই মনে করেন যে, হানাফী মাযহাবে এরূপ কুনুত বৈধ নয়। চিন্তাটি অজ্ঞতাপ্রসূত। হানাফী ফকীহগণ বলেন, বিপদ-বিপর্যয় ছাড়া কুনুতে নাযেলা পাঠ করবে না। তবে বিপদ-বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ফজরের সালাতে ও অন্যান্য সালাতে কুনুতে নাযেলা পাঠ করবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী হানাফী (১০৮৮ হি) বলেন:

ولا يقنت لغيره إلا لنازلة فيقنت الإمام في الجهرية وقيل في الكل

"বিতর ছাড়া অন্য কোনো সালাতে কুনুত পাঠ করবে না; তবে বিপদ-বিপর্যয়ের সময় সশব্দে কুরআন পাঠের সালাতে (ফযর, মাগরিব, ইশা) ইমাম কুনুত পাঠ করবেন। দ্বিতীয় মতে সকল সালাতেই কুনুত পাঠ করবেন।"[৪]

এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবন আবিদীন শামী উল্লেখ করেছেন যে, অধিকাংশ হানাফী ফকীহ বিপদ-বিপর্যয়ের সময় শুধু ফজর সালাতে কুনুত পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ সশব্দ সালাতগুলোতে কুনুত পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা বলেছেন যে, সালাতুল

ফজরের কুনুত মানসূখ বা রহিত হয়েছে তাদের কথার অর্থ সাধারণ অবস্থায় বিতর ছাড়া অন্য সালাতে কুনুত পাঠ রহিত হয়েছে। তবে বিপদাপদ বা বিপর্যয়ের সময় ফজরের বা সশব্দের সালাতে কুনুত পাঠ সুন্নাত। ইমাম যদি মনে মনে কুনুত পড়েন তবে মুক্তাদীও মনে মনে পড়বেন। আর ইমাম যদি সশব্দে কুনুত পড়েন তবে মুক্তাদী আমীন বলবেন। আর নাযিলা বা বিপদাপদের কুনুত শেষ রাকাতের রুকুর পড়ে পড়তে হবে।[১]

৩. ৭. অতিরিক্ত কিছু নফল সালাত

৩. ৭. ১. সালাতুল ইসতিখারা

ইস্তিখারার অর্থ কারো কাছে সঠিক বিষয় বেছে দেওয়ার প্রার্থনা করা। যে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা একাধিক বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার অবকাশ আছে সেখানে আল্লাহর সাথে পরামর্শ না করে কোনো কিছু বেছে নেয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুমিনের উচিত নয়। ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করা, অর্থাৎ তাঁর মহান দরবারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক চাওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব।

যিক্‌র নং ৮৫: ইস্তিখারার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ [يسمي حاجته] خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِينِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. [اللهم] وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِينِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা, ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু, ওয়ালা- আক্বদিরু, ওয়া তা'অ্লামু ওয়ালা- আ'অ্লামু, ওয়া আনতা 'আল্লা-মুল গুইউব। আল্লা-হুম্মা, ইন কুনতা তা'অ্লামু আন্না হা-যাল আমরা (উদ্দিষ্ট বিষয়ের নাম বলবে) খাইরুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী ফাক্বদুরহু লী, ওয়া ইয়াসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহি। আল্লা-হুম্মা, ওয়া ইন কুনতা তা'অ্লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আমরী ফাস্বরিফহু 'আন্নী, ওয়াস্বরিফনী 'আনহু ওয়াক্ব দুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না, সুম্মা আরদ্বিনী বিহী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করি আপনার জ্ঞান থেকে, আমি আপনার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি আপনার ক্ষমতা থেকে এবং আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি আপনার মহান অনুগ্রহ। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম, আপনি জানেন আর আমি জানি না, আর আপনি সকল গাইবের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ, যদি আপনি জানেন যে, এ কাজটি (নির্দিষ্ট বিষয়টির উল্লেখ বা স্মরণ করবে) কল্যাণকর আমার জন্য, আমার ধর্ম, আমার পার্থিব জীবন এবং আমার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে, তবে নির্ধারণ করুন একে আমার জন্য, সহজ করুন একে আমার জন্য এবং বরকত প্রদান করুন এতে আমার জন্য। হে আল্লাহ, আর আপনি যদি জানেন যে, এ কর্মটি অকল্যাণকর আমার জন্য, আমার ধর্ম, জাগতিক জীবন ও আমার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে তবে সরিয়ে নিন একে আমার নিকট থেকে, সরিয়ে নিন আমাকে এর নিকট থেকে, নির্ধারণ করুন আমার জন্য কল্যাণকে যেখানেই তা থাকুক এবং সন্তুষ্ট করে দিন আমাকে তার মধ্যে।"

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সকল বিষয়ে 'ইস্তিখারা' করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন: যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তা করবে তখন (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে) নফল দু রাক'আত সালাত আদায় করবে অতঃপর উপরের দুআটি বলবে।[২]

৩. ৭. ২. সালাতুত তাওবা

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কোনো বান্দা যদি গোনাহ করার সাথে সাথে সুন্দর করে ওযু করে দু রাক'আত সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

৩. ৭. ৩. সালাতুত তাসবীহ

আমরা দেখেছি যে, যিক্‌রের মূল চারটি বাক্য: তাসবীহ 'সুবহানাল্লাহ', তাহমীদ 'আল-হামদু লিল্লাহ', তাহলীল 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং তাকবীর 'আল্লাহু আকবার'। "সালাতুত তাসবীহ"-এর মধ্যে সালাতরত অবস্থায় এ যিক্‌রগুলো পাঠ করা হয়। চার রাক'আত সালাতে প্রতি রাক'আতে ৭৫ বার করে চার রাক'আতে মোট ৩০০ বার উক্ত যিক্‌রগুলো আদায় করা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচা আব্বাস (রা)-কে বলেন: "চাচাজি, আমি আপনাকে একটি বিশেষ উপহার ও বিশেষ অনুদান প্রদান করব, যা পালন করলে আল্লাহ আপনার ছোট, বড়, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য, গোপন সকল

গোনাহ ক্ষমা করবেন। – তা এই যে, আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো একটি সূরা পাঠ করবেন। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো সূরা পাঠের পর দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَر

উচ্চারণ: 'সুব'হা-নাল্লাহ, ওয়াল'হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লা-হু আকবার ।' **(পূর্বোক্ত যিকর নং ৫, ৪, ১ ও ১০ একত্রে)**।

এরপর রুকুতে গিয়ে রুকু অবস্থায় উপরের যিক্‌রগুলো ১০ বার, রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ১০ বার, সাজদা রত অবস্থায় ১০ বার, প্রথম সাজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে (বসা অবস্থায়) ১০ বার। এ মোট এক রাক'আতে ৭৫ বার (চার রাক'আতে মোট ৩০০ বার)। সম্ভব হলে আপনি প্রতিদিন একবার, না হলে প্রতি সপ্তাহে একবার, না হলে প্রতি মাসে একবার, না হলে প্রতি বছর একবার, না হলে সারা জীবনে একবার এ সালাত আপনি আদায় করবেন।"

"সালাতুত তাসবীহ" সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীসই অত্যন্ত যয়ীফ সনদে বর্ণিত। একমাত্র এ হাদীসটিকে অনেক মুহাদ্দিস সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যদিও অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটির ভাব ও ভাষা বিষয়েও আপত্তি করেছেন।

ইমাম তিরমিযী প্রখ্যাত তাবে-তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) থেকে "সালাতুত তাসবীহ"-এর আরেকটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এ অতিরিক্ত যিক্‌র আদায়ের নিয়ম: নামায শুরু করে শুরুর দু'আ বা সানা পাঠের পরে ১৫ বার, সূরা ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা শেষ করার পরে ১০ বার, রুকুতে ১০ বার, রুকু থেকে উঠে ১০ বার, প্রথম সাজদায় ১০ বার, দুই সাজাদার মাঝে ১০ বার ও দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার মোট ৭৫ বার প্রতি রাক'আতে।

অর্থাৎ, এ নিয়মে কিরাআতের পূর্বে ও পরে দাঁড়ানো অবস্থায় ২৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হয় আর দ্বিতীয় সাজদার পরে বসা অবস্থায় কোনো তাসবীহ পড়া হয় না। পূর্বের হাদীসে বর্ণিত নিয়মে কিরাআতের পূর্বে কোনো তাসবীহ নেই। দাঁড়ানো অবস্থায় শুধু কিরাআতের পরে ১৫ বার তাসবীহ পড়তে হবে। প্রত্যেক রাক'আতে দ্বিতীয় সাজদার পরে বসে ১০ বার তাসবীহ পড়তে হবে।

ইবনুল মুবারক বলেন, যদি এ সালাত রাত্রে আদায় করে তবে দু রাক'আত করে তা আদায় করবে। অর্থাৎ, দু রাক'আত শেষে সালাম ফিরিয়ে আবার দু রাক'আত আদায় করবে। আর দিনের বেলায় ইচ্ছা করলে একত্রে চার রাক'আত অথবা ইচ্ছা করলে দু রাক'আত করেও আদায় করতে পারে।

"সালাতুত তাসবীহ"-এ রুকু ও সাজদায় প্রথমে রুকু ও সাজদার তাসবীহ 'সুবহানার রাব্বিয়্যাল আযীম' ও 'সুবহানা রাব্বিয়্যাল আ'লা' নূন্যতম তিন বার করে পাঠ করার পরে অতিরিক্ত তাসবীহগুলো পাঠ করতে হবে।[1]

৩. ৮. সালাতুল জানাযা

৩. ৮. ১. সালাতুল জানাযার গুরুত্ব ও পদ্ধতি

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরেই অন্যতম ফরয ইবাদত জানাযার সালাত। অনেকে মনে করেন, যেহেতু ফরযে কেফায়া সেহেতু কেউ পালন করলেই তো হলো। এটি পলায়নী মনোবৃত্তি। মুমিনের এ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয়। মুমিন দেখবেন, এ কর্মে আল্লাহ কত খুশি হবেন এবং কত সাওয়াব ও বরকত আমি লাভ করব। জানাযার সালাতের জন্য অচিন্তনীয় সাওয়াব ও বরকতের কথা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি কারণ এ ইবাদতটি সৃষ্টির সেবা কেন্দ্রিক, আর আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন তাঁর সৃষ্টির সেবাতে। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

"কেউ যদি কারো জানাযায় উপস্থিত হয়ে সালাতে অংশ গ্রহণ করে তবে সে এক 'কীরাত' সাওয়াব অর্জন করবে। আর যদি সে তার দাফন (কবরস্থ করা) পর্যন্ত উপস্থিত থাকে তাহলে সে দু কীরাত সাওয়াব অর্জন করবে। এক কীরাত উহদ পাহাড়ের চেয়েও বড়।"[2]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বলেন: "তোমাদের মধ্যে আজ কে সিয়ামরত ছিলে? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযায় শরীক হয়েছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি বলেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করেছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি বলেন: আজ তোমাদের কে অসুস্থ কোনো মানুষকে দেখতে গিয়েছ? আবু বকর বলেন: আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا اجْتَمَعْنَ فِى امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

এ কর্মগুলো যদি কোনো মানুষের মধ্যে একত্রিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতী হবেন।"[১]

পাঠক দেখছেন যে, এখানে চারটি ইবাদতের তিনটিই সৃষ্টির সেবা বিষয়ক। আল্লাহ আমাদেরকে এ গুণগুলো একত্রিত করার তাওফীক দিন।

অনেক ধার্মিক মুসলিম জানাযার সালাতের নিয়ম অথব নিয়্যাত জানেন না বা ভয় পান। জানাযার সালাত অত্যন্ত সহজ ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার সালাত আদায় করছি, এ কথাটুকু মনের মধ্যে থাকাই যথেষ্ট। এরূপ নিয়্যাত-সহ তাকবীরে তাহরীমা এবং পরে আরো তিনটি তাকবীর ও সালামের মাধ্যমে এ সালাত আদায় করা হয়। ইমাম ও মুক্তাদীগণ সকলেই এ তাকবীরগুলো ও সালাম মুখে উচ্চারণ করবেন। প্রথমে মৃতের জন্য দু'আ করার আন্তরিক নিয়্যাত-সহ তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে সালাত শুরু করবেন। তাকবীরে তাহরীমার পরে আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সালাতের সানা (**যিক্‌র নং ৪৬: সানার দুআ-১**) পাঠ করবেন।

এ সময়ে সূরা ফাতিহা পড়ার বিষয়ে সাহাবীগণ মতভেদ করেছেন। তাবিয়ী তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আউফ বলেন:

صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (وَجَهَرَ) ... (فَسَأَلْتُهُ) قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ (إِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ)

আমি ইবনু আব্বাস (রা)-এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করি। তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করেন (সশব্দে) ... আমি তাকে প্রশ্ন করলে তিনি বলে: যেন তারা জানে যে, এটি সুন্নাত (এটি সুন্নাতের অংশ বা সুন্নাতের পূর্ণতার অংশ)।[২]

অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা) বলেন:

السُّنَّةُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ

"সালাতুল জানাযায় সুন্নাত নিয়ম প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পাঠ করা, এরপর তিনটি তাকবীর বলা এবং শেষ তাকবীরের সময় সালাম বলা।" হাদীসটি সহীহ।[৩] অন্য হাদীসে তাবিয় নাফি বলেন:

إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﷺ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

"আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) সালাতুল জানাযায় কুরআনের কিছুই পাঠ করতেন না।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

অন্য সহীহ হাদীসে আবূ সাঈদ মাকবুরী বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, সালাতুল জানাযা কিভাবে আদায় করব। তিনি বলেন:

فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتَ فَحَمِدْتَ اللهَ وَصَلَّيْتَ عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ قُلْتَ: اللَّهُمَّ...

"যখন মৃতদেহ রাখা হবে তখন তাকবীর বলবে, অতপর আল্লাহর হামদ- প্রশংসা করবে, নবী (ﷺ)-এর উপর সালাদ পড়বে, অতঃপর দুআ করবে...।"[৫]

সাহাবীগণের মতভেদের কারণে ফকীহগণও মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহ সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ আবশ্যক বলেছেন। হানাফী ফকীহগণের মতে প্রথম তাকবীরের পর আল্লাহর গুণবর্ণনা বা সানা পাঠ করতে হবে। তবে হামদ-সানা বা দুআর উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে। মোল্লা আলী কারী, শুরনুবলালী ও অন্যান্য হানাফী ফকীহ এ সময়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করা মুস্তাহাব বলেছেন।[৬] এভাবে আমরা দেখছি যে, হাদীস ও ফিকহের আলোকে সালাতুল জানাযার প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করাই উত্তম।

এরপর দ্বিতীয় 'তাকবীর' বলে দরুদে ইবরাহীমী পাঠ করবেন। এরপর তৃতীয় 'তাকবীর' বলে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবেন। এরপর ৪র্থ তাকবীরের পর সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

"যখন তোমরা মৃতের উপর (জানাযার) সালাত আদায় করবে তখন তার জন্য দু'আ করার বিষয়ে আন্তরিক হবে।" হাদীসটি হাসান।[৭]

এ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন দু'আ পাঠ করতেন। শুধু (**اللهم اغفر لـه**) (আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লাহু) "আল্লাহ তাকে মাফ করে

দিন" বা অনুরূপ বাক্যের মাধ্যমে দু'আ করলেই দু'আর ন্যূনতম দায়িত্ব পলিত হবে। তবে মুমিনের উচিত একাধিক মাসনূন দু'আ মুখস্থ করে তা এ সময়ে পাঠ করা।

যিক্‌র নং ৮৬: জানাযার দু'আ-১

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগফিরলি 'হাইয়িনা- ওয়ামাইয়িতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়াগা-ইবিনা- ওয়া স্বাগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসা-না। আল্লা-হুম্মা, মান আ'হইয়াইতাহূ মিন্না- ফাআ'হয়িহী 'আলাল ইসলা-ম। ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহূ মিন্না- ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমা-ন। আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা'দাহু।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমাদের মৃতকে এবং জীবিতকে, উপস্থিতকে এবং অনুপস্থিতকে, ছোটকে এবং বড়কে, পুরুষকে এবং নারীকে। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য থেকে যাকে আপনি জীবিত রাখবেন, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে আপনি মৃত্যু দান করবেন, তাকে আপনি ঈমানের উপর মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ তার (তার জন্য দু'আ করার বা সবর করার) পুরস্কার থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলবেন না।" হাদীসটি সহীহ।[১]

সালাতুল জানাযার এ মাসনূন দুআটি আমাদের সমাজে প্রচলিত। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, এ দুআটিই 'হানাফী মাযহাবের' নির্ধারিত দুআ। অথবা মনে করি যে, অন্য কোনো দুআ পাঠ হানাফী মাযহাবে বৈধ নয়। এ সকল ধারণা একান্তই অজ্ঞতা প্রসূত। আমরা দেখব যে, হানাফী ফকীহগণ জানাযার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অন্যান্য দুআ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া হানাফী ফকীহগণ সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, জানাযার জন্য কোনো নির্ধারিত দুআ নেই। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনুল হুমাম কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ (৬৮১ হি) হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল কাদীর"-এর বলেন:

وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمَيِّتِ وَلِنَفْسِهِ وَلِأَبَوَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَوْقِيتَ فِي الدُّعَاءِ سِوَى أَنَّهُ بِأُمُورِ الْآخِرَةِ ، وَإِنْ دَعَا بِالْمَأْثُورِ فَمَا أَحْسَنَهُ وَأَبْلَغَهُ . وَمِنْ الْمَأْثُورِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

"তৃতীয় তাকবীরের পরে মৃতের জন্য, নিজের জন্য, নিজের পিতামাতার জন্য এবং মুসলিমদের জন্য দুআ করবে। এজন্য কোনো দুআ নির্ধারিত নেই। শুধু আখিরাত বিষয়ক দুআ করলেই হবে। তবে যদি কোনো মাসনূন দুআ করে তবে খুবই ভাল হয়। একটি মাসনূন দুআ আওফ ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত...(**যিকর নং ৮৭: জানাযার দুআ-২**)।"[২]

ফাখরুদ্দীন উসমান ইবন আলী যাইলায়ী হানাফী (৭৪৩ হি) বলেন:

وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ وَلِنَفْسِهِ وَلأَبَوَيْهِ وَلِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ ؛ لِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِرِقَّةِ الْقَلْبِ

"মৃতের জন্য, নিজের জন্য, নিজের পিতামাতার জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য দুআ করবে। এ সময়ে পড়ার জন্য কোনো নির্ধারিত দুআ নেই। কারণ এতে অন্তরের নম্রতা-আবেগ নষ্ট হয়ে যায়।"[৩]

যিক্‌র নং ৮৭: জানাযার দু'আ-২

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [عَذَابِ النارِ]

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ, ওয়ার'হামহূ, ওয়া'আ-ফিহী, ওয়া'অ্‌ফু 'আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহূ, ওয়া ওয়াসসি'য় মুদখালাহূ, ওয়াগসিলহু বিলমা-ই ওয়াস্‌সালজি ওয়াল বারাদি। ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাতা-ইয়া- কামা- নাক্কাইতাস সাওবাল আবইয়াদ্বা মিনাদ দানাস। ওয়া আবদিলহূ দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহী, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহী, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ'ইযহু মিন আযাবিল ক্বাবরি (আযাবিন না-র)।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করুন, রহমত করুন, নিরাপত্তা দান করুন, তাকে মাফ করে দিন, তাকে সম্মানের সাথে আপনার কাছে স্থান দান করুন, তার প্রবেশস্থান (আবাসস্থান) প্রশস্থ করুন, তাকে পানি, বরফ ও শীল দিয়ে ধৌত করুন, তাকে পাপরাশি থেকে এমনভাবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করুন যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে করেছেন। তাকে দান করুন তার (ফেলে যাওয়া) বাড়ির চেয়ে উত্তম বাড়ি, তার পরিজনের চেয়ে উত্তম পরিজন, তার দাম্পত্য সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী। তাকে আপনি জান্নাত

প্রদান করুন এবং কবরের বা জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

আওফ ইবন মালিক (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতুল জানাযা আদায় করেন, তখন আমি তাঁর থেকে এ দুআটি মুখস্থ করি। এ দুআ শুনে আমার বাসনা হচ্ছিল যে, মৃত দেহটি যদি আমারই হতো!"[১]

যিক্‌র নং ৮৮: জানাযার দু'আ-৩

اللَّهُمَّ (إِنَّهُ) عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَن سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মা, (ইন্নাহু) 'আব্‌দুকা, ওয়াব্‌নু 'আব্‌দিকা, ওয়াব্‌নু আমাতিকা, কা-না ইয়াশ্‌হাদু আন লা- ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা, ওয়া আন্না মু'হাম্মাদান 'আব্‌দুকা ওয়া রাসূলুকা, ওয়া আন্‌তা আ'অলামু বিহী। আল্লা-হুম্মা, ইন্ কানা মু'হ্‌সিনান ফাযিদ্ ফী ই'হসা-নিহী, ওয়া ইন্ কা-না মুসীআন ফাতাজা-ওয়ায 'আন সাইয়িআ-তিহী। আল্লা-হুম্মা লা- তা'হরিমনা- আজ্‌রাহু, ওয়ালা- তাফ্‌তিন্‌না বা'অদাহু।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, এ ব্যক্তি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার পুত্র, আপনার বান্দীর পুত্র। সে সাক্ষ্য দিত যে, আপনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল। আর আপনি তার বিষয়ে অধিক অবগত। হে আল্লাহ, যদি সে নেককর্মকারী হয়ে থাকে তবে আপনি তার নেকি বৃদ্ধি করে দিন। আর যদি সে পাপাচারী হয়ে থাকে তবে আপনি তার পাপরাশি ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদেরকে ফিতনাগ্রস্থ করবেন না।" হাদীসটি সহীহ।[২]

যিক্‌র নং ৮৯: জানাযার দু'আ-৪

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِيْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্না 'ফুলানাবনা ফুলান' (এখানে উক্ত ব্যক্তির নাম বলতে হবে) ফী যিম্মাতিকা ওয়া 'হাব্‌লি জিওয়ারিকা, ফক্বিহি মিন ফিত্‌নাতিল ক্বাবরি ওয়া আযাবিন না-রি, ওয়া আনতা আহ্‌লুল ওয়াফা-য়ি। আল্লা-হুম্মা ফাগ্‌ফির লাহু, ওয়ার'হামহু, ইন্নাকা আন্‌তাল 'গাফূরুর রা'হীম।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, অমুকের সন্তান অমুক (মৃত ব্যক্তি ও তার পিতার নাম) আপনার যিম্মায় ও আপনার নৈকট্যের রশির মধ্যে। আপনি তাকে কবরের ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা পালন ও প্রশংসার অধিকারী। অতএব আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং রহমত করুন। নিশ্চয় আপনিই ক্ষমাশীল করুণাময়।" হাদীসটি হাসান।[৩]

যিক্‌র নং ৯০: জানাযার দু'আ-৫

اَللّهُمَّ، (أَنْتَ رَبُّهَا وَ) أَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا (لِلإِسْلاَمِ) وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلاَنِيَتَهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বুহা-, ওয়া আনতা খালাক্বতাহা-, ওয়া আনতা হাদাইতাহা- লিল ইসলা-ম, ওয়া আনতা ক্বাবাদ্বতা রূহাহা-, তা'অ্‌লামু সিররাহা ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহা-, জিয়্‌না শুফা'আ-আ ফাগফির লাহা-।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি তার প্রভু, আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, আপনি তাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন, আপনি তার রূহ গ্রহণ করেছেন, আপনি তার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানেন। আমরা তার জন্য সুপারিশ (শাফা'আত) করতে এসেছি, অতএব আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।" হাদীসটি হাসান।[৪]

যিক্‌র নং ৯১: জানাযার দু'আ-৬

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হাসান বসরী (রাহ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন:

اللهم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّأَجْرًا

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা- ফারাত্বাও ওয়া সালাফাও ওয়া আজরান।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি একে আমাদের জন্য (জান্নাতের দিকে) অগ্রবর্তী, অগ্রগামী ও পুরস্কার হিসেবে সংরক্ষিত করুন।"[১]

৩. ৮. ২. সালাতুল জানাযার পরে দু'আ সুন্নাত বিরোধী

অনেকে সালাতুল জানাযা শেষ করার পর আবার সমবেত হয়ে দুআ করেন। কর্মটি সুন্নাত বিরোধী। জানাযার সালাতের মধ্যে যে সময়ে মৃতের জন্য দু'আ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন ও যে সময়কে দু'আর জন্য নির্ধারণ করেছেন সে সময়ে মন দিয়ে মুনাজাত না করে, অনেকে জানাযার সালাতের সালাম ফেরানোর পরে সেখানে দাঁড়িয়ে আবারো দু'আ-মুনাজাত করেন। জানাযার সালাতের সালামের পরের মুনাজাতের এ রেওয়াজটি আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলেই ছিল না। কিন্তু এখন এ সুন্নাত বিরোধী কর্মটি ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে।

যারা এটির প্রচলন করছেন তারা এর পক্ষে অনেক 'যুক্তি' ও 'দলিল' (!!) প্রদান করেন, কিন্তু কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের 'সুন্নাত' বা আমল পেশ করতে পারেন না। তাঁরা বলেন, মৃতের জন্য সাওয়াব রেসানীর নিয়্যাতে আমরা তা করি, জানাযার পরে একটু দেরি করা নিষিদ্ধ নয়... ইত্যাদি। তাঁদের কেউ কেউ হাদীস থেকে 'দলিল' (!) পেশ করেন। আমরা দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যখন তোমরা মৃতের উপর (জানাযার) সালাত আদায় করবে তখন তার জন্য দু'আ করার বিষয়ে আন্তরিক হবে।" তাঁরা বলেন যে, এ হাদীস থেকে মৃতের জানাযার পরে দু'আ করার নির্দেশ প্রমাণিত হয়। তাঁরা ভুলে যান অথবা মনে করতে চান না যে, দু'আর ক্ষেত্রে ও সাওয়াব রেসানীর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণের সুন্নাতই সর্বোত্তম। দুআ ও সাওয়াব রেসানীর ক্ষেত্রেও তাঁদের নির্ধারিত ও আচরিত সময় ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তাদের পদ্ধতি হলো তৃতীয় তাকবীরের পরে দুআ ও সাওয়াব রেসানী করা। তাঁরা কখনোই জানাযার সালাত আদায়ের পরে এভাবে সাওয়াব রেসানী করেন নি।

একটি যয়ীফ বা মিথ্যা হাদীসও নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা পরবর্তী ইমামগণ কখনো একবারও জানাযার সালাতের সালাম ফেরানোর পরে আবার মৃতের জন্য মুনাজাত করেছেন। তাঁরা জানাযার সালাম ফেরানোর পরে কাতার ভেঙ্গে বা কাতার ঠিক রেখে, অথবা কোনোভাবে কখনোই দু'আ-মুনাজাত করেন নি। তাঁরা জানাযার সালাতের মধ্যে- সালামের পূর্বে- আন্ত রিকতার সাথে মৃতের জন্য দু'আ করেছেন।

এ কারণে প্রাচীন যুগ থেকেই মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ বারংবার বলেছেন যে, হাদীস নির্দেশিত এ দু'আর সময় জানাযার সালাতের মধ্যে তৃতীয় তাকবীরের পরে এবং জানাযার সালামের পরে আর কোনো দু'আ করা যাবে না।[২] কারণ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো দু'আ-পদ্ধতির সাথে বৃদ্ধি ও সংযোগ করা হবে এবং তাঁর পদ্ধতি অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম আবূ বাকর ইবনু হামিদ বলেন:

إِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوْهٌ

"সালাতুল জানাযার পরে দু'আ করা মাকরূহ।"[৩]

৫ম-৬ষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধতম হানাফী ফকীহ ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমূদ ইবনু আহমদ ইবনু আব্দুল আযীয ইবনু মাযাহ (৫৫১-৬১৬ হি) বলেন:

لاَ يَقُوْمُ الرَّجُلُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

"সালাতুল জানাযার পরে দুআর জন্য কোনো মানুষ দাঁড়াবে না।"[৪]

অনুরূপভাবে হানাফী মাযহাবের অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ইমাম জানাযার সালাতের পরে দু'আ-মুনাজাত করা নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আত বলে উল্লেখ করেছেন। দশম-একাদশ হিজরী শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি) তার প্রসিদ্ধ 'মিরকাত' গ্রন্থে বলেন:

لاَ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ؛ لأَنَّهُ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ عَلَى صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

"সালাতুল জানাযার পরে মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করবে না; কারণ তা সালাতুল জানাযার সাথে অতিরিক্ত সংযোজন বলে মনে হবে।"[৫]

বস্তুত, আমরা অনারব। আরবী ভাষায় সালাতুল জানাযার মধ্যে যে দু'আ করি তাতে নিজেদের মনের আবেগ আসে না। আমাদের মনে আবেগ থাকে অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য। এজন্য এ খেলাফে সুন্নাত রীতিটি আমরা সহজেই গ্রহণ করি। একে হালাল করার জন্য অনেকে জানাযার কাতার ভেঙ্গে দেন, যেন জানাযার সাথে অতিরিক্ত সংযোগ বলে মনে না হয়। কিন্তু যেভাবেই আমরা তা করি না কেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত জানাযার সাথে অতিরিক্ত সংযোজন হবে। জানাযার সালামের পরেই

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত ছিল মৃতদেহ তুলে দাফনের জন্য অগ্রসর হওয়া। আর আমাদের সুন্নাত, মৃতদেহ রেখে দিয়ে কিছু সময় দু'আ করা। এখন অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতিতে কেউ জানাযার সালাত শেষে মৃতদেহ উঠিয়ে কবরের দিকে রাওয়ানা হলে আমাদের মনে হবে মৃতের জন্য দু'আ পুর্ণ হলো না। আর এভাবেই সকল বিদ'আতের উৎপত্তি।

আমাদের দায়িত্ব সুন্নাতের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখা। জানাযার মধ্যে যথাসম্ভব মনোযোগের সাথে মৃতের জন্য দু'আ করা। যদি না বুঝতে পারি তবুও মনে করতে হবে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো সময়ে তাঁর শেখানো ভাষায় দু'আ করেছি। হাদীসে বলা হয়েছে যে, সুন্নাতের খেলাফ কর্ম কবুল হবে না। আমরা জানাযার পরের দু'আয় যতই কাঁদি না কেন, সুন্নাতের খেলাফ বিধায় তা কবুল হবে না। আর তৃতীয় তাকবীরের পরে যে দুআ করি তা বুঝি অথবা না বুঝি, যেহেতু তা সুন্নাত সময়ে সুন্নাত দু'আ সেহেতু তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। মাইয়েতের নাজাতের জন্য এ দুআই যথেষ্ট। এরপর মনের আবেগ দিয়ে দু'আ করার জন্য সারাটি জীবন আমাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

৩. ৮. ৩. জানাযা বহনের সময় সশব্দে যিক্‌র মাকরূহ

জানাযার সালাতের পরে মৃতদেহের সাথে কবর পর্যন্ত গমন করা ও দাফন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা মাসনূন ইবাদত। আমাদের দেশে অনেকে মৃতদেহ বহনের সময় মুখে শব্দ করে বিভিন্ন যিক্‌র করেন যা সুন্নাতের খেলাফ। আল্লামা কাসানী লিখেছেন :

وَيُطِيلُ الصَّمْتَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثَةٍ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ ، وَالذِّكْرِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ مَكْرُوهًا

"জানাযার অনুসরণের সময় নীরবতাকে প্রলম্বিত-স্থায়ী করবে (পরিপূর্ণ নীরবতা পালন করবে)। এ সময়ে সশব্দে যিক্‌র করা মাকরূহ। কারণ কাইস ইবনু উবাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তিন সময়ে শব্দ করা মাকরূহ জানতেন: যুদ্ধের সময়, জানাযার সময় ও যিক্‌রের সময়। এছাড়া এতে ইহুদী-নাসারাদের অনুকরণ করা হয়, কাজেই তা মাকরূহ।"[১]

পঞ্চম অধ্যায়
বিষয় সংশ্লিষ্ট যিক্‌র ও দু'আ

সময়, স্থান, ঘটনা বা বিষয় নিরপেক্ষ অগণিত যিকর ও দুআর পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে বিভিন্ন কর্ম ও ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্য বিভিন্ন রকম বিশেষ যিক্‌র শিক্ষা দিয়েছেন। এ অধ্যায়ে এরূপ কিছু যিক্‌র, দু'আ ও সালাতের আলোচনা করতে চাই। আল্লাহই তাওফীক-দাতা।

৫. ১. সিয়াম, ইফতার, পানাহার, মেহমানদারি ইত্যাদি

যিক্‌র নং ১৭৩: নতুন চাঁদ দেখার যিক্‌র

اَللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ [بِالْيُمْنِ] وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى رَبُّنَا [رَبِّيْ] وَرَبُّكَ اللهُ

উচ্চারণ: আল্লা-হু আকবার। আল্লা-হুম্মা, আহিল্লাহু 'আলাইনা- বিল আম্‌নি ওয়াল ঈমান, ওয়াস সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-ম। {ওয়াততাওফীক্বি লিমা- ইউহিব্বু রাব্বুনা- ওয়া ইয়ারদ্বা- ।} রাব্বুনা- ওয়া রাব্বুকাল্লা-হু।

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, আপনি এ নতুন চাঁদের (নতুন মাসের) সূচনা করুন কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ঈমানের সাথে, শান্তি ও ইসলামের সাথে {এবং আমাদের প্রভু যা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন তা পালনের তাওফীকসহ।} (হে নতুন চাঁদ), আমাদের ও তোমার প্রভু আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল বা নতুন চাঁদ দেখলে এ দু'আ বলতেন।[১] রমযান ও সকল মাসের নতুন চাঁদ দেখে এ দু'আ পাঠ করা মাসনূন।

যিক্‌র নং ১৭৪: সিয়াম শুরুর যিক্‌র

সিয়ামের শুরুতে কোনো মাসনূন যিক্‌র নেই। তবে সিয়াম শুরুর পূর্বেই-রাতেই- সিয়ামের জন্য 'নিয়্যাত' করা জরুরী। মনের মধ্যে জাগরুক উদ্দেশ্যকে নিয়্যাত বলে। সিয়ামের পূর্বে রাতে শয়নের আগে বা সাহরির সময় মুমিনের মনের মধ্যে সিয়াম পালনের যে ইচ্ছা এটিই নিয়্যাত। "নাওয়াইতুআন" বলে বা অন্য কোনোভাবে মুখে নিয়্যত করা খেলাফে সুন্নাত।

যিক্‌র নং ১৭৫: ইফতারের দু'আ-১

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণ : যাহাবায যামাউ, ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূকু, ওয়া সাবাতাল আজরু, ইন শা-আল্লা-হ।

অর্থ: পিপাসা চলে গেল, শিরা উপশিরা আর্দ্র হলো এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় পুরস্কার নিশ্চিত (পাওনা) হলো।" হাদীসটি হাসান।[২]

যিক্‌র নং ১৭৬: ইফতারের দু'আ-২

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ

উচ্চারণ : "আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসআলুকা বিরা'হমাতিকাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাইয়িন আন তাগফিরালী।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনার সর্বব্যাপী রহমতের ওসীলা দিয়ে আমি আপনার কাছে চাইছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) ইফতারের সময় এ দুআ বলতেন।[৩]

যিক্‌র নং ১৭৭: ইফতারের দু'আ-৩

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ [فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ]

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনার জন্যই আমি সিয়াম পালন করেছি এবং আপনার রিযক দ্বারা ইফতার করেছি। অতএব আপনি আমার কর্ম কবুল করুন নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।" দুআটি একাধিক যয়ীফ সনদে বর্ণিত।[৪]

যিক্‌র নং ১৭৮: খাবারের পূর্বের যিক্‌র

Contents

بِسْمِ اللهِ، بِسْمِ اللهِ فِيْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

(বিসমিল্লা-হ), অর্থাৎ "আল্লাহর নামে"। শুরুতে আল্লাহর নাম বলতে ভুলে গেলে বলবে: (বিসমিল্লা-হি ফী আউআলিহী ওয়া আ-খিরিহী), অর্থাৎ "আল্লাহর নামে এর প্রথমে এবং এর শেষে"। হাদীসটি সহীহ।[১]

যিক্‌র নং ১৭৯: খাবারের পরের যিক্‌র-১

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

উচ্চারণ: আল'হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত'আমানী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি 'হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- কুওয়াহ।

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এ খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন আমার কোনো অবলম্বন ও ক্ষমতা ছাড়াই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি কেউ খাদ্য গ্রহণ করে এ কথাগুলো বলে তাহলে তার পূর্বাপর গোনাহ ক্ষমা করা হবে।" হাদীসটি হাসান।[২]

যিক্‌র নং ১৮০: খাবারের পরের যিক্‌র-২

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

উচ্চারণ: (১) আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া আত্বি'য়িমনা খাইরান মিন্‌হু। (২) আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফীহি ওয়া যিদ্‌না- মিন্‌হু।

অর্থ: (১) হে আল্লাহ আপনি এতে বরকত প্রদান করুন এবং আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম কিছু খাওয়ান। (২) হে আল্লাহ, আপনি এতে বরকত প্রদান করুন এবং আমাদেরকে এটি আরো অধিক পরিমাণ প্রদান করুন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা কোনো খাদ্য গ্রহণ করলে বলবে (১ম বাক্যটি)। আর যদি কেউ দুধ পান কর তবে বলবে: (২য় বাক্যটি)।" হাদীসটি হাসান।[৩]

যিক্‌র নং ১৮১: গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-১

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي (وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي)

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী, ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী।

অর্থ: হে আল্লাহ, যে আমাকে খাইয়েছে তাকে আপনি খাদ্য প্রদান করুন এবং যে আমাকে পান করিয়েছে তাকে আপনি পানীয় প্রদান করুন।[৪]

যিক্‌র নং ১৮২: গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-২

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ

উচ্চারণ: আফত্বারা 'ইনদাকুমুস স্বা-ইমূন, ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-র, ওয়া স্বাল্লাত 'আলাইকুমুল মালা-ইকাহ।

অর্থ: তোমাদের কাছে রোযাদারগণ ইফতার করুন, তোমাদের খাদ্য নেককারগণ ভক্ষণ করুন এবং তোমাদের জন্য ফিরিশতাগণ দু'আ করুন।

কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইফতার করালে বা সিয়াম ছাড়া অন্য সময়ে কোনো খাদ্য খাওয়ালে তিনি এ কথা বলে তার জন্য দু'আ করতেন।[৫]

যিক্‌র নং ১৮৩: গৃহকর্তার জন্য অতিথির দু'আ-৩

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি এদের যে রিয্‌ক প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে রহমত করুন।"

আব্দুল্লাহ্ বিনু বিশ্‌র বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতার বাড়িতে আগমন করেন। তিনি কিছু খাদ্য পেশ করেন। তিনি তা থেকে কিছু খাদ্য গ্রহণ করেন। আমার পিতা তাঁর কাছে দু'আ চান। তখন তিনি এ কথাগুলো বলেন।[৬]

৫. ২. ঋণ, শত্রুতা, বিপদাপদ, জুলম ইত্যাদি

যিক্‌র নং ১৮৪: ঋণমুক্তির দু'আ-১

اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আ'গনিনী বিফাদলিকা 'আম্মান সিওয়াকা।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আপনার হালাল প্রদান করে আমাকে হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার দয়া ও বরকত প্রদান করে আমাকে আপনি ছাড়া অন্য সকলের অনুগ্রহ থেকে বিমুক্ত করে দিন।"

আলী (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তি ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য চাইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন, আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমার পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেবেন এবং তোমাকে ঋণমুক্ত করবেন। তুমি বলবে... (উপরের দুআ)। হাদীসটি সহীহ।[১]

যিক্‌র নং ১৮৫: ঋণমুক্তির দু'আ-২

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল 'হাযানি ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া দিলা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থ: "হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি দুশ্চিন্তা , দুঃখ-বেদনা, মনোকষ্ট, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের প্রাধান্য বা প্রভাবের অধীনতা থেকে।"

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি এ দু'আটি বলতেন।[২]

যিক্‌র নং ১৮৬: ঋণমুক্তি ও রহমতের দু'আ-৩

اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا تُعْطِيْهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ ارْحَمْنِيْ رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, মা-লিকাল মুলকি, তু'তিল মুলকা মান তাশা-উ ওয়া তানযি'উল মুলকা মিম্মান তাশা-উ। ওয়াতু'ইয্যু মান তাশা-উ ওয়া তুযিল্লু মান তাশা-উ বিইয়াদিকাল খাইরু, ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাহমা-নাদ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাতি ওয়া রাহীমাহুমা-, তু'অ্তিহিমা- মান তাশা-উ ওয়া তামনা'উ মিনহুমা- মান তাশা-উ। ইর'হামনী রাহামতান তুগনীনী বিহা- 'আন রা'হ্মাতি মান্ সিওয়া-কা।

অর্থ : "হে আল্লাহ, সকল রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রাদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান। পার্থিব জগৎ এবং পারলৌকি জগতের মহাকরুণাময় ও অপার দয়াশীল। আপনি যাকে ইচ্ছা করুণা প্রদান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। আপনি আমাকে এমন রহমত প্রদান করুন যা আমাকে আপনি ছাড়া অন্য কারো করুণা থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দেবে।"

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মু'আযকে (রা) বলেন, যদি তুমি এ দু'আটি বলে প্রার্থনা কর তাহলে তোমার পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তা তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দেবেন। হাদীসটি হাসান।[৩]

যিক্‌র নং ১৮৭: ব্যর্থতার যিক্‌র

قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

উচ্চারণ : ক্বাদারুল্লা-হি ওয়ামা- শা-আ ফা'আলা।

অর্থ: আল্লাহর নির্ধারণ এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন তা করেছেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে বেশি প্রিয় ও বেশি ভাল, যদিও সকল মুমিনের মধ্যেই কল্যাণ বিদ্যমান। তোমার জন্য কল্যাণকর বিষয় অর্জনের জন্য তুমি সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে চেষ্টা করবে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। কখনোই দুর্বল বা হতাশ হবে না। যদি তুমি কোনো সমস্যায় নিপতিত হও (তুমি ব্যর্থ হও বা

তোমার প্রচেষ্টার আশানুরূপ ফল না পাও) তাহলে কখনই বলবে না যে, যদি আমি ঐ কাজটি করতাম! যদি আমি অমুক তমুক কাজ করতাম। বরং বলবে: (উপরের বাক্যটি); কারণ, অতীতের আফসোস মূলক (যদি করতাম) ধরনের বাক্যগুলো শয়তানের দরজা খুলে দেয়।"[১]

মুমিন ব্যর্থতায় হাহুতাশ না করে আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ সমর্পণ ও আস্থা নিয়ে পূর্ণোদ্যমে সামনে এগিয়ে চলেন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দেহ, মন, ঈমান ও কর্ম সকল বিষয়ে শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তাওফীক দিন, আমীন!

যিক্‌র নং ১৮৮: কঠিন কর্মকে সহজ করার দু'আ

اَللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, লা- সাহলা ইল্লা- মা- জা'আলতাহূ সাহলান। ওয়া আনতা তাজ'আলুল হাযনা ইযা- শিয়্‌তা সাহলান।

অর্থ : হে আল্লাহ আপনি যা সহজ করেন তা ছাড়া কিছুই সহজ নয়। আর আপনি ইচ্ছা করলে সুকঠিনকে সহজ করেন। হাদীসটি সহীহ।[২]

যিক্‌র নং ১৮৯: কারো ক্ষতির আশঙ্কা করলে আত্মরক্ষার দু'আ-১

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্না- নাজ'আলুকা ফী নু'হূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমরা আপনাকে তাদের কণ্ঠদেশে রাখছি এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি তাদের অকল্যাণ থেকে। হাদীসটি সহীহ।[৩]

যিক্‌র নং ১৯০: কারো ক্ষতির আশঙ্কা করলে আত্মরক্ষার দু'আ-২

اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাক্ ফিনীহিম বিমা- শিঅ্‌তা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি যেভাবে ইচ্ছা আমাকে তাদের থেকে সংরক্ষণ করুন।[৪]

যিক্‌র নং ১৯১: কারো জুলুমের ভয় পেলে আত্মরক্ষার দু'আ

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السبع وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلانِ بْنِ فُلاَنٍ وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلاَئِقِكَ (وَمِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا) أَن يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ولاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তিস সাব'ই ওয়া রাব্বাল 'আরশিল 'আযীম, কুন লী জা-রান মিন ফুলা-ন ইবনু ফুলা-ন (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম) ওয়া আ'হযা-বিহী মিন খালা-ইক্বিকা (ওয়া মিন শাররি খালকিকা কুল্লিহিম জামি'আন) আইঁ ইয়াফরুত্বা 'আলাইয়্যা আ'হাদুম মিনহুম আও ইয়াত্বগা-, 'আযযা জা-রুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা, ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ, সাত আসমানের প্রভু ও মহান আরশের প্রভু, আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করেন অমুকের পুত্র অমুক (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম) থেকে এবং আপনার সৃষ্টির মধ্য থেকে যারা তার দলবলে রয়েছে তাদের থেকে (এবং সকল খারাপ সৃষ্টির অমঙ্গল থেকে), তাদের কেউ যেন আমার বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করতে না পারে বা আমার উপর অত্যাচার বা বিদ্রোহ করতে না পারে। আপনি যাকে আশ্রয় দেন সে-ই সম্মানিত। আপনার প্রশংসা মহিমামণ্ডিত। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।"

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: কেউ কোনো শাসক, প্রশাসক বা ক্ষমতাধর থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করলে এ দুআটি পাঠ করবে। হাদীসটি সহীহ।[৫]

যিক্‌র নং ১৯২: বিপদ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তির দু'আ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

উচ্চারণ: ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জিঊন। আল্লা-হুম্মাঅ্ জুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফ লী খাইরাম মিনহা-।

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব। হে আল্লাহ আপনি আমাকে এ বিপদ মুসিবতের পুরস্কার প্রদান করুন এবং আমাকে এর পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম কিছু প্রদান করুন।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) বলতে শুনেছি, যদি কোনো মুসলিম বিপদগ্রস্ত হয়ে এ কথাগুলো বলে তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই উক্ত ক্ষতির পরিবর্তে উত্তম বিষয় দান করে ক্ষতিপূরণ করে দিবেন। উম্মু সালামাহ বলেন,

আমার স্বামী আবু সালামাহর মৃত্যুর পরে আমি চিন্তা করলাম, আবু সালামার চেয়ে আর কে ভাল হতে পারে! ... তারপরও আমি এ কথাগুলো বললাম। তখন আল্লাহ আমাকে আবু সালামার পরে রাসূলুল্লাহকে (ﷺ) স্বামী হিসাবে প্রদান করেন।[১]

যিকর নং ১৯৩: বিপদগ্রস্তকে দেখলে বলার দুআ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

উচ্চারণ: আল-'হামদু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্‌ তালা-কা বিহী ওয়া ফাদ্বদ্বালানী 'আলা- কাসীরিম মিম্মান 'খালাক্বা তাফ্‌দ্বীলান।

অর্থ: প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তোমাকে যে বিপদটি দিয়ে পরীক্ষা করেছেন সে বিপদ থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির থেকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং আবূ হুরাইরা (রা) থেকে পৃথক সনদে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কেউ কোনো বিপদগ্রস্ত দেখে উপরের কথাগুলো বলে তবে সে উক্ত বিপদ বা অসুবিধা থেকে (আজীবনের জন্য) নিরাপত্তা লাভ করবে, (বিপদ যেমনই হোক না কেন)। ইমাম হুসাইনের (রা) পৌত্র মুহাম্মাদ আল-বাকির বলেন, বিপদ বা অসুবিধায় নিপতিত মানুষ দেখলে তাকে না শুনিয়ে নিজের মনে এ কথা বলতে হবে। হাদীসটি সহীহ।[২]

সুপ্রিয় পাঠক, কোনো সমস্যাগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দেখে তাকে দুআ ও নসিহত করার পাশাপাশি নিজের মনে আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা সাধারণত এক্ষেত্রে বিপদগ্রস্তকে উপহাস বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখি ও অহঙ্কারে আক্রান্ত হই। যেমন কোনো বদরাগী, হটকারি, ঝগড়াটে, বদমেজাজি, ধুমপায়ী, অপরিচ্ছন্ন, তোতলা, পাপেলিপ্ত, অশোভন কর্মে লিপ্ত বা যে কোনো ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, দৈহিক বা অর্থনৈতিক সমস্যা, বিপদ বা অসুবিধায় লিপ্ত মানুষকে দেখলে তার প্রতি অবজ্ঞার অনুভূতি আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। এভাবে আমরা অহঙ্কার ও অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হই। এ সময়ে মুমিনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে যে, মহান আল্লাহ দয়া করে তাকে উক্ত স্বভাব বা অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন। হৃদয়ে এরূপ অনুভূতি লালন করে মুখে উপরের দুআটি বললে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতের অফুরন্ত সাওয়াব, বরকত ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারব।

বিপদমুক্তির অন্যান্য দুআ

অন্যান্য যে কোনো কষ্ট, উৎকণ্ঠা, সন্তানলাভ, বিপদমুক্তি ইত্যাদির জন্য এ বইয়ের ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ১৫৭ নং যিক্‌র পাঠ করে দুআ করবেন। মহান আল্লাহর ইসম আযম ও দরুদ সাধ্যমত বেশি করে পড়বেন এবং পড়ার ফাঁকেফাঁকে নিজের ভাষায় আল্লাহর কাছে দুআ করা। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে রোগব্যাধি বিষয়ক যিকর আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৫. ৩. অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের যিকর

যিক্‌র নং ১৯৪: ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের যিক্‌র

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ : আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ : আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।

- সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এ কথাগুলি বললে ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ক্রোধ দূরীভূত হবে।[৩]
- আমরা দেখেছি, ক্রোধ দমন করা এবং যার উপরে রাগ হয়েছে তাকে ক্ষমা করা আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম পথ। কাজেই মুমিনের উচিত ক্রোধ অনুভব করলে অর্থের দিকে লক্ষ্য করে এ বাক্যটি বারবার বলা।

যিক্‌র নং ১৯৫: হাঁচির যিক্‌রসমূহ

(ক). কারো হাঁচি হলে তিনি বলবেন:

اَلْحَمْدُ لِلهِ (عَلَى كُلِّ حَالٍ)

উচ্চারণ : আল-'হামদু লিল্লা-হি ('আলা- কুল্লি 'হাল)।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য (সকল অবস্থায়)।

(খ). হাঁচি-দানকারীকে (আলহামদুলিল্লাহ) বলতে শুনলে শ্রোতা বলবেন:

يَرْحَمُكَ اللهُ

উচ্চারণ: ইয়ার'হামুকাল্লা-হু। **অর্থ:** আল্লাহ আপনাকে রহমত করেন।

(গ). হাঁচিদাতাকে (ইয়ারহামুকাল্লাহ) বললে তিনি উত্তরে বলবেন:

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

উচ্চারণ : ইয়াহদিকুমুল্লা-হু ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাকুম।

অর্থ: "আল্লাহ আপনাদেরকে সুপথে পরিচালিত করুন এবং আপনাদের অবস্থাকে ভাল ও পরিশুদ্ধ করুন।"

- হাঁচি দিলে সুন্নাত– 'আল'হামদু লিল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বা 'আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল' বলা। হাঁচি-দাতা এ যিক্‌র করলে তাঁর পাওনা যে, যিনি উক্ত যিক্‌র শুনবেন তিনি তাঁকে দু'আ করে বলবেন: ইয়ার'হামুকাল্লা-হু। এ দু'আর উত্তরে হাঁচি প্রদানকারী বলবেন: ইয়াহদিকুমুল্লা-হু, অথবা ইয়াহদিকুমুল্লা-হু ওয়া ইউস্বলিহু বা-লাকুম।

সালামের উত্তর প্রদানের ন্যায় হাঁচির দু'আর উত্তর প্রদানের জন্য হাদীসে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সমাজে এ সুন্নাতগুলি অবহেলিত।

যিক্‌র নং ১৯৬: পোশাক পরিধানের দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ

উচ্চারণ: আল'হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যাসসাওবা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরি 'হাওলিম মিন্নী ওয়ালা- ক্বুওয়াহ।

অর্থ: প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এ পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমাকে তা প্রদান করেছেন, আমার কোনো অবলম্বন ও শক্তি ছাড়া-ই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি কেউ পোশাক পরিধানের সময় এ কথা বলে তাহলে তার পূর্বাপর গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"[১]

যিক্‌র নং ১৯৭: নতুন পোশাক পরিধানের দু'আ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, লাকাল 'হামদু, আনতা কাসাওতানীহি। আসআলুকা খাইরাহু ওয়া খাইরা মা স্বুনি'আ লাহূ, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা স্বুনি'আ লাহূ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনারই সকল প্রশংসা। আপনি আমাকে এটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এর কল্যাণ এবং যে কল্যাণের জন্য তা উৎপাদিত। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অকল্যাণ এবং যে অকল্যাণের জন্য তা উৎপাদিত।[২]

যিক্‌র নং ১৯৮: নতুন পোশাক পরিহিতেরে জন্য দু'আ

تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى

উচ্চারণ : তুবলা- ওয়া ইউখলিফুল্লা-হু তা'আ-লা।

অর্থ: "এটি ব্যবহারে নষ্ট হোক এবং আল্লাহ এর বদলে অন্য পোশাক প্রদান করুন। (আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করুন যাতে আপনি এ নতুন পোশাক ব্যবহার করে নষ্ট করে নতুন পোশাক ব্যবহারের সুযোগ পান)।"

সাহাবীগণ কাউকে নতুন পোশাক পরতে দেখলে এ দু'আ করতেন।[৩]

যিক্‌র নং ১৯৯: পরিধানের কাপড় খোলার দু'আ

بِسْمِ اللهِ

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

سَتْرُ بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ أَنْ يَقُولَ ...

"যখন তোমাদের কেউ কাপড় খুলবে বা অনাবৃত হবে তখন মানুষের গুপ্তাঙ্গ ও জিনদের দৃষ্টির মাঝে পর্দা 'বিসমিল্লাহ' বলা।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

যিক্‌র নং ২০০: উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশক দু'আ

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

উচ্চারণ: জাযা-কাল্লা-হু খাইরান।

অর্থ: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

আমরা দেখেছি যে, মুমিন কাউকে উপকরার করলে কখনোই তার থেকে কৃতজ্ঞতা বা প্রতিদানের আশা করে না। পক্ষান্তরে উপকৃত মুমিনের দায়িত্ব, উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তার প্রশংসা করা, তার উপকারের কথা অকপটে স্বীকার করা এবং তার জন্য দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ কারো উপকার করলে সে যদি উপকারীকে এ কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানায় তাহলে তা সর্বোত্তম প্রশংসা করা হবে। হাদীসটি হাসান।[১]

যিক্‌র নং ২০১: কাউকে প্রশংসা করার মাসনূন যিক্‌র

কোন মানুষের পিছনে নিন্দা করা এবং সামনে ঢালাও প্রশংসা করা অপরাধ। প্রশংসার ক্ষেত্রে কারো বিশেষ স্বভাব বা গুণের প্রশংসা করা যেতে পারে। কারো ঢালাও প্রশংসা করতে বা নিশ্চিতরূপে কাউকে 'ভাল' বলতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। প্রশংসার ক্ষেত্রে বলতে হবে: আমার ধারণা, অমুক ব্যক্তি ভাল; নিশ্চয়তা প্রকাশ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের যদি কখনো কাউকে প্রশংসা করতে-ই হয় তাহলে বলবে :

أَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللهُ حَسِيْبُهُ وَلا أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا

"আমি অমুককে এরূপ মনে করি, আল্লাহই তাকে ভাল জানেন (তিনি তার পরিপূর্ণ হিসেব সংরক্ষক), আল্লাহর উপরে আমি কাউকে ভাল বলছি না। আমি তাকে অমুক অমুক গুণের অধিকারী বলে মনে করি।[২]

যিক্‌র নং ২০২: প্রশংসিতের দু'আ

সাহাবী-তাবেয়ীগণের রীতি ছিল, কেউ তাঁদেরকে ধার্মিক বললে বা প্রশংসা করলে তাঁরা কষ্ট পেতেন। কেউ তাঁদের 'ভাল' বললে তারা বলতেন:

اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ (وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ)

অর্থ : "হে আল্লাহ, এরা যা বলছে এজন্য আমাকে দায়ী করবেন না, আর তারা যা জানে না, আমার সে সব পাপ আপনি ক্ষমা করে দিন (এবং তারা যেরূপ ধারণা করছে আমাকে তার চেয়েও উত্তম বানিয়ে দিন।)"।[৩]

যিকর নং ২০৩: তিলাওয়াতের সাজদার দু'আ

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাক্‌তুব লী বিহা- 'ইনদাকা আজ্‌রান, ওয়াদ্বা'অ্‌ 'আন্নী বিহা- বিয্‌রান, ওয়াজ্‌'আল্‌হা- লী 'ইন্‌দাকা যুখ্‌রান, ওয়া তাক্বাব্বালহা- মিন্নী কামা- তাক্বাব্বাল্‌তাহা- মিন 'আব্‌দিকা দাউদ।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি লিপিবদ্ধ করুন আমার জন্য এ সাজদার বিনিময়ে পুরস্কার, এবং অপসারণ করুন আমার থেকে এর বিনিময়ে পাপ-বোঝা, এবং বানিয়ে দিন একে আপনার নিকট সম্পদ, এবং কবুল করুন একে আমার থেকে যেমন কবুল করেছিলেন আপনার বান্দা দাউদ থেকে।"

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদা করেন এবং এ দুআটি পাঠ করেন।" হাদীসটি হাসান।[৪]

যিকর নং ২০৪: দাজ্জালের ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার দুআ

আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

"যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফ-এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জাল থেকে সংরক্ষিত থাকবে।"[৫] এর পাশাপাশি দুআ মাসুরাগুলো পড়া উচিত।

যিকর নং ২০৫: স্বপ্ন বিষয়ক দুআ

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الرُّؤْيَا ثَلاَثَةٌ فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ. ... لاَ تُقَصُّ الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ

"স্বপ্ন তিন প্রকারের: (১) নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, (২) খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত করার জন্য এবং (৩) মানুষের নিজের মনের কল্পনা। কাজেই কেউ যদি এমন স্বপ্ন দেখে যা তার পছন্দ নয় তবে সে যেন উঠে সালাত আদায় করে এবং কাউকে এ স্বপ্নের কথা না বলে।... আর কোনো আলিম বা কল্যাণকামী ব্যক্তি ছাড়া কারো কাছে স্বপ্নের কথা বলবে না।"[১]

তাবিয়ী আবূ সালামা বলেন, দুঃস্বপ্ন দেখে আমি আতঙ্কিত ও অসুস্থ হয়ে পড়তাম। আমি আবূ কাতাদা (রা)-কে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন, আমিও স্বপ্ন দেখে অসুস্থ হয়ে পড়তাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শুনে আমার এ অবস্থার অবসান ঘটে। আমি আর কোনো দুঃস্বপ্নকে পরোয়া করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

(الرُّؤْيَا) الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ وَ(الْحُلْمُ) الرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَرِهَ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُثْ (فَلْيَتْفُلْ) (حِينَ يَسْتَيْقِظُ) عَنْ يَسَارِهِ (ثَلاثًا) وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ (وَمِنْ شَرِّهَا) (وفي حديث جابر: ثلاثاً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ)، (وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ)، (فَإِنَّهَا) لَا تَضُرُّهُ (فَلَنْ يَضُرَّه) وَلَا يُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبْشِرْ (وفي حديث أبي سعيد: فليحمد الله عَلَيْهَا)، وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ

"ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং খারপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই কেউ যদি অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তবে সে যেন ঘুম ভাঙলে তার বাম দিকে তিনবার ফুঁক বা থুক দেয় এবং উক্ত স্বপের ও শয়তানের অমঙ্গল-অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে (অন্য হাদীসে: সে যেন তিনবার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে) (এবং সে যেন উঠে সালাত পড়ে)। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনোই ক্ষতি করবে না। আর সে যেন এ স্বপ্নের কথা কাউকে না বলে। আর যদি কেউ কোনো ভাল স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন স্বপ্নটিকে সুসংবাদ হিসেবে গ্রহণ করে- আনন্দিত হয় (অন্য হাদীসে: সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে) এবং স্বপ্নটির কথা তার প্রিয়ভাজন কোনো ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বলবে না।"[২]

তাহলে, ভাল স্বপ্ন দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। অন্তত আল-'হামদু লিল্লা-হ' কয়েকবার বলতে হবে। আর অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তিন বার বামে থুক দিতে হবে এবং স্বপ্নটির অকল্যাণ ও শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় নিতে হবে। অন্তত তিনবার "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' বলা এবং অন্তত তিনবার বাংলায়: আল্লাহ, আমি এ স্বপ্নের অমঙ্গল থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি"-বলা উচিত। সম্ভব হলে দু'-চার রাকআত কিয়ামুল্লাইল সালাত আদায় করা।

যিক্‌র নং ২০৬: স্ত্রী বা স্বামীকে গ্রহণের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসআলুকা খাইরা**হা-** ওয়া খাইরা মা- জাবালতা**হা-** 'আলাইহি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররি**হা-** ওয়া শাররি মা- জাবালতা**হা-** 'আলাইহি।

অর্থ: "হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে চাই, এ নারীর কল্যাণ এবং যা কিছু কল্যাণ এর প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আপনি একে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই এ নারীর অকল্যাণ থেকে এবং যা কিছু অকল্যাণকর বিষয় এর প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে আপনি একে সৃষ্টি করেছেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

স্ত্রীও নতুন স্বামীকে গ্রহণের জন্য এ দুআ করতে পারেন। আরবীতে (হা-)–এর স্থলে (হূ/ হী): খাইরাহূ, জাবালতাহূ, শাররিহী... বলবেন।

যিকর নং ২০৭: নবদম্পতির দুআ

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

উচ্চারণ: বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকা, ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা বি'খাইর।"

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে বরকত প্রদান করুন, তোমাকে বরকমতয় করুন এবং তোমাদেরকে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত করুন।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, "নব বিবাহিতকে অভিনন্দন জানাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলতেন।" হাদীসটি সহীহ।[৪]

যিকর নং ২০৮: দাম্পত্য সম্পর্কের দুআ

بِاسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ: "বিসমিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মা, জান্নিব্‌নাশ্ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বা-না মা- রাযাক্বতানা-।"

অর্থ: "আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ, আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যা রিযক দিবেন তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দাম্পত্য মিলনের পূর্বে যদি কেউ এ কথা বলে তবে তাদের মিলনে সন্তান জন্ম নিলে তাকে শয়তান ক্ষতি করবে না।[১]

যিকর নং ২০৯: নবজাতকের জন্য অভিনন্দন

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ الْمَوْهُوْبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ.

উচ্চারণ: বা-রাকাল্লাহু লাকা ফিল মাউহূবি লাকা, ওয়া শাকারতাল ওয়া-হিবা, ওয়া বালা'গা আশুদ্দাহু, ওয়া রুযিক্বতা বির্‌রাহু।"

অর্থ: আপনাকে আল্লাহ যে নবজাতক উপহার দিয়েছেন তাকে আল্লাহ বরকতময় করুন, আপনি উপহারদাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন, নবজাতক পূর্ণ বয়স লাভ করুক এবং আপনি তার খিদমত লাভ করুন।

যিকর নং ২১০: নবজাতকের অভিনন্দনের উত্তর

بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ

উচ্চারণ: "বা-রাকাল্লাহু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকা, ওয়া জাযা-কাল্লাহু খাইরান, ওয়া রাযাক্বাকাল্লাহু মিসলাহু, ওয়া আজযালা সাওয়া-বাকা।"

অর্থ: আল্লাহ আপনাকে বরকত প্রদান করুন, আপনাকে বরকতময় করুন, আপনাকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন, আপনাকে অনুরূপ উপহার প্রদান করুন, আপনার সাওয়াব বহুগুণে বাড়িয়ে দিন।"

কোনো কোনো সাহাবী থেকে উপরের অভিনন্দন ও উত্তরটি বর্ণিত।[২]

যিকর নং ২১১: ঝড়ের দুআ

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা- ফীহা, ওয়া খাইরা মা- উর্‌সিলাত্‌ বিহী। ওয়া আ'উযু বিকা মিন শার্‌রিহা, ওয়া শার্‌রি মা- ফীহা, ওয়া শার্‌রি মা- উর্‌সিলাত্‌ বিহী।

অর্থ: "হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এর (এ বাতাসের) কল্যাণ, এর মধ্যে বিদ্যমান কল্যাণ ও এ যা বহন করে এনেছে সে কল্যাণ। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অনিষ্ট এর মধ্যে বিদ্যমান অনিষ্ট এবং যে অনিষ্ঠ সে বহন করে এনেছে তা থেকে।"

আয়েশা (রা) বলেন, ঝড় উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলতেন।[৩]

যিকর নং ২১২: বজ্রধ্বনি শ্রবণের দুআ

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

উচ্চারন: সুব্‌'হা-নাল্লাযী ইউসাব্বি'হুর্‌ রা'অ্দু বি'হাম্‌দিহী ওয়াল মালা-য়িকাতু মিন খিফাতিহী।

অর্থ: পবিত্রতা তাঁর বজ্রধ্বনি তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফিরিশ্‌তাগণও তা-ই করে তাঁর ভয়ে।

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) বজ্রধ্বনি শুনলে এ দুআ বলতেন।[৪]

যিকর নং ২১৩: বৃষ্টিপাতের দুআ

(اللَّهُمَّ) صَـــيِّـــبًا نَافِعًا

উচ্চারন: আল্লা-হুম্মা, স্বাইয়িবান না-ফি'আন।

অর্থ: হে আল্লাহ, কল্যাণময় প্রবল বৃষ্টিপাত প্রদান করুন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি দেখলে এ কথা বলতেন।[৫]

যিকর নং ২১৪: শিরক থেকে আশ্রয়লাভের দুআ

اللهمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা আন্‌ উশ্‌রিকা বিকা ওয়া আনা আ'অ্‌লামু, ওয়া আস্‌তাগফিরুকা লিমা- লা- আ'অ্‌লামু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি জ্ঞাতসারে শিরক করা থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং অজ্ঞাতসারে যা ঘটে তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে শিরক পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম। আবূ বাকর (রা) বলেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা বা ডাকাই কি শুধু শিরক নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ... বরং তা পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি তোমাকে একটি বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি যা পালন করলে ছোট ও বড় শিরক তোমার থেকে দূরিভূত হবে। তুমি -উপরের দুআটি- বলবে।" হাদীসটি সহীহ।[১]

যিকর নং ২১৫: অশুভ বা অযাত্রা ধারণার কাফ্‌ফারা

اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ ، وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, লা- ত্বাইরা ইল্লা- ত্বাইরুকা, ওয়ালা- খাইরা ইল্লা- খাইরুকা, ওয়া লা- ইলা-হা গাইরুকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনার শুভাশুভ ছাড়া কোনো অশুভত্ব নেই, আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই এবং আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "অশুভ বা অযাত্রা চিন্তা করে যে ব্যক্তি তার কর্ম থেকে বিরত থাকল সে ব্যক্তি শিরকে নিপতিত হলো। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এরূপ চিন্তা মনে আসলে তার কাফ্‌ফারা কী? তিনি বলেন, সে যেন (উপরের কথাগুলো) বলে।" হাদীসটি সহীহ।[২]

যিকর নং ২১৬: বাহনে আরোহণের দুআ

بِاسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، الْحَمْدُ للهِ، الْحَمْدُ للهِ، الْحَمْدُ للهِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، (لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ) سُبْحَانَكَ، إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণ: বিস্‌মিল্লা-হ, আল-'হামদু লিল্লা-হ, সুব্‌'হা-নাল্লাযী সা'খ্‌খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্‌না- লাহূ মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না- ইলা- রাব্বিনা- লামুন্‌ক্বালিবূন। আল-'হামদু লিল্লা-হ, আল-'হামদু লিল্লা-হ, আল-'হামদু লিল্লা-হ, আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার, (লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা,) সুব্‌'হা-নাকা, ইন্নী যালাম্‌তু নাফ্‌সী ফা'গ্‌ফির্‌লী, ফাইন্নাহূ লা- ইয়া'গফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা- আনতা।

অর্থ: "আল্লাহর নামে, প্রশংসা আল্লাহর জন্য। 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। প্রশংসা আল্লাহর জন্য (৩ বার), আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (৩ বার) (আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই), আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করে না।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে আরোহণের সময় বিসমিল্লাহ বলতেন, উঠে বসার পর বাকী কথাগুলো বলেন। হাদীসটি সহীহ।[৩]

যিকর নং ২১৭: সফর ও প্রত্যাবর্তনের দুআ

اَللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِيْ الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِيْ الْمَالِ وَالْأَهْلِ .... آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

উচ্চারণ: আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হু আক্‌বার। সুব্‌'হা-নাল্লাযী সা'খ্‌খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্‌না- লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না- ইলা- রাব্বিনা- লামুন্‌ক্বালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা- হা-যা- আল-বির্‌রা ওয়াত্‌ তাক্ব্‌ওয়া, ওয়া মিনাল 'আমালি মা- তারদ্বা-। আল্লা-হুম্মা, হাওয়িন 'আলাইনা- সাফারানা- হা-যা- ওয়াত্বয়ি 'আন্‌না বু'উ্দাহু। আল্লা-হুম্মা, আনতাস স্বা-'হিবু ফিস সাফারি ওয়াল 'খালীফাতু ফিল আহ্‌লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন্‌ ওয়া'আসা-য়িস সাফারি ওয়া কাআ-বাতিল মান্‌যারি, ওয়া সূয়িল মুন্‌কালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্‌ল। ... **(ফেরার সময়):** আ-য়িবূনা, তা-য়িবূনা, 'আ-বিদূনা লিরাব্বিনা 'হা-মিদূন।

অর্থ: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (৩ বার)। পবিত্র তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। হে আল্লাহ, আমরা আমাদের এ সফরে আপনার কাছে মঙ্গলময় কর্ম এবং তাকওয়া প্রার্থনা করছি এবং আপনার পছন্দনীয় কর্ম করার তাওফীক প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য এ সফরটি সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব সংকুচিত করে দিন। হে আল্লাহ,

সফরে আপনিই আমাদের সাথী এবং পরিবার-পরিজনের কাছে আপনিই আমাদের খলীফা-স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ, আমি সফরের কাঠিন্য, মনোকষ্টকর দৃশ্য এবং সম্পদ ও পরিবারে অকল্যাণময় প্রত্যাবর্তন থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।"**(ফেরার সময়)** 'আমরা প্রত্যাবর্তন করছি, তাওবা করছি, আমাদের রব্বের ইবাদত করছি এবং প্রশংসা করছি।'

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের শুরুতে এ দুআটি পড়তেন। ফেরার সময় দুআটির সাথে শেষের বাক্যগুলো বলতেন।[১]

যিকর নং ২১৮: সফরের সময় বিদায়ী দুআ

أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ/ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

উচ্চারণ: আস্‌তাউদি'উ**কা**ল্লা-হা (বহুবচনে: আস্‌তাউদি'উ**কুমু**ল্লা-হা) আল্লাযী লা- তাদ্বী'উ ওয়াদা-য়ি'উহু।

অর্থ: তোমাকে (বহুবচনে: তোমারেদকে) গচ্ছিত রাখছি আল্লাহর কাছ, যার কাছে গচ্ছিত কিছুই বিনষ্ট হয় না।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিদায়কালে উপরের কথাগুলি বলেন। অন্য বর্ণনায় তাবিয়ী মূসা ইবন ওয়ারদান বলেন, আমি একটি সফরের নিয়্যাত করে আবূ হুরাইরা (রা)-এর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। তিনি বলেন, ভাতিজা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় নেওয়ার সময় আমাকে একটি কথা বলতে শিখিয়েছিলেন, আমি কি তোমাকে তা শিখিয়ে দেব? এরপর তিনি উপরের দুআটি শিখিয়ে দিলেন। হাদীসটি সহীহ।[২]

তাহলে, মুসাফির বিদায়-দাতাকে এ দুআ বলবেন। তবে বিদায়কালে মুসাফির ও বিদায়দাতা উভয়েই এ দুআ পরস্পরকে বলতে পারেন।

যিকর নং ২১৯: মুসাফিরকে বিদায় জানানোর দুআ-১

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

উচ্চারণ: আস্‌তাউদি'উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া 'খাওয়া-তিমা আ'অ্মা-লিকা।

অর্থ: আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখছি তোমার দীন, তোমার আমানত এবং তোমার কর্মের পরিণতি। (সফরের কারণে এগুলি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।)

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কাউকে বিদায় জানাতেন তখন তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করতেন এবং উপরের কথাগুলি বলতেন। অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ খাতমী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ যখন কোনো বাহিনীকে বিদায় জানাতেন তখন এ কথা বলতেন। তবে এক্ষেত্রে একবচন (কা)-এর পরিবর্তে বহুবচন (কুম: তোমাদের) শব্দ ব্যবহার করতেন: আস্‌তাউদি'উল্লা-হা দীনা**কুম** ওয়া আমা-নাতা**কুম** ওয়া 'খাওয়া-তিমা আ'অ্মা-লি**কুম:** আল্লাহর নিকট গচ্ছিত রাখছি তোমা**দের** দীন, তোমা**দের** আমানত এবং তোমা**দের** কর্মের পরিণতি। হাদীস দু'টি সহীহ।[৩]

যিকর নং ২২০: মুসাফিরকে বিদায় জানানোর দুআ-২

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

উচ্চারণ: যাওআদাকাল্লা-হুত তাক্বওয়া, ওয়া 'গাফারা লাকা যানবাকা, ওয়া ইয়াস্‌সারা লাকাল 'খাইরা 'হাইসুমা কুনতা।

অর্থ: আল্লাহ তাকওয়াকে তোমার পাথেয় হিসেবে প্রদান করুন, তোমার গোনাহ ক্ষমা করুন এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন তোমার জন্য মঙ্গলকে সহজ করুন।

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলে, আমি সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাকে পাথেয় দিন। তখন তিনি এ কথাগুলো বলে তার জন্য দুআ করেন। হাদীসটি হাসান।[৪]

যিকর নং ২২১: কোনো স্থানে প্রবেশ বা অবস্থানের দুআ-১

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণ: আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি, মিন শার্‌রি মা- খালাক্বা।

অর্থ: "আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে।" **(পূর্বোক্ত ১৪৬ নং যিকর)**

আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ কোনো স্থানে গমন করে বা সফরে কোথাও থামে এবং এ দু'আটি বলে, তাহলে তথায় অবস্থানকালে কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

যিকর নং ২২২: কোনো স্থানে প্রবেশ বা অবস্থানের দুআ-২

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، (وَخَيْرَ مَا فِيْهَا) وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামাওয়া-তিস সাব্‌'য়ি ওয়ামা- আয্‌লাল্‌না, ওয়া রাব্বাল আরাদ্বীনাস সাব্‌'য়ি ওয়ামা- আক্বলাল্‌না, ওয়া রাব্বাশ শাইয়াত্বীনি ওয়ামা- আদ্বলাল্‌না ওয়া রাব্বার রিয়া-'হি ওয়া যারাইনা আস্‌আলুকা খাইরা হা-যিহিল ক্বার্‌ইয়াতি ওয়া খাইরা আহ্‌লিহা, (ওয়া 'খাইরি মা- ফীহা), ওয়া না'উযু বিকা মিন্‌ শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি আহ্‌লিহা- ওয়া শার্‌রি মা- ফীহা।

অর্থ: হে আল্লাহ, সাত আসমান ও সেগুলোর নিম্নের সবকিছুর প্রতিপালক, সাত যমিন ও সেগুলোর উপরের সবকিছুর প্রতিপালক, শয়তানগণ ও তাদের দ্বারা বিভ্রান্তদের প্রতিপালক, বায়ুপ্রবাহ এবং যা কিছু তা বহন করে তার প্রতিপালক, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এ জনপদের কল্যাণ, এর বাসিন্দাদের কল্যাণ (এবং এর মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তার কল্যাণ)। এবং আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এ জনপদের অকল্যাণ, এর বাসিন্দাদের অকল্যাণএবং এর মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তার অকল্যাণ থেকে।

সুহাইব (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো জনপদ দেখলেই তথায় প্রবেশের পূর্বে এ কথাগুলো বলতেন।" হাদীসটি সহীহ।[১]

যিকর নং ২২৩: বাজার বা কর্মস্থলে প্রবেশের দুআ

اَللّهُمَ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ أَهْلِهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্‌ 'খাইরিহা- ওয়া 'খাইরি আহ্‌লিহা ওয়া আ'উযু বিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি আহ্‌লিহা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এস্থানের কল্যাণ ও এখানে অবস্থানরতদের কল্যাণ এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অকল্যাণ এবং এখানে অবস্থানরতদের অকল্যাণ থেকে।

আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ থেকে বর্ণিত, তিনি বাজারের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে বাজারের দিকে মুখ করে এ দুআটি পড়ে বাজারে প্রবেশ করেন।[২]

উপরে জনপদে প্রবেশের দুআ দুটি বাজারে প্রবেশের সময়েও পড়া প্রয়োজন। এছাড়া পূর্বোক্ত ৯৫/১৪৫ নং যিকরও পড়া উচিত।

যিকর নং ২২৪: পছন্দ ও অপছন্দনীয় বিষয়ের যিকর

(١) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ (٢) الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

উচ্চারণ: (১) আল্‌'হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী বিনি'অ্‌মাতিহী তাতিম্মুস্‌ স্বা-লিহা-ত। (২) আল্‌'হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি 'হা-ল।

অর্থ: (১) প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত যার নিয়ামতে ভালকর্মগুলো সাধিত হয়। (২) প্রশংসা আল্লাহর সর্বাবস্থায়।

আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো আনন্দদায়ক বিষয় দেখলে বা জানলে প্রথম বাক্যটি বলতেন এবং কোনো অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে বা দুসংবাদ পেলে দ্বিতীয় বাক্যটি বলতেন।" হাদীসটি সহীহ।[৩]

যিকর নং ২২৫: কটুবাক্য বললে

اللّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ফাআইউমা- মুঅ্‌মিনীন সাবাব্‌তুহূ ফাজ্‌'আল্‌ যা-লিকা লাহু ক্বুরবাতান ইলাইকা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, যে কোনো মুমিন বান্দাকে আমি কটুবাক্য বলে থাকলে বা গালি দিয়ে থাকলে আপনি সেটিকে তার জন্য কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্যে (সাওয়াবে) পরিণত করুন।" আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেন।[৪]

যিকর নং ২২৬: আল্লাহর সাড়া লাভ ও ক্ষমা লাভের দুআ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، لاَ إِله إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার'। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া'হদাহু। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল 'হামদ। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া লা- 'হাওলা ওয়া লা- ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর (সাহায্য) ছাড়া।"

আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) ও আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোনো বান্দা এ বাক্যগুলো বলে তখন আল্লাহ তাঁর সাথে সাড়া দেন এবং যদি কেউ অসুস্থ অবস্থায় এ কথাগুলি বলে এরপর সে মৃত্যুরণ করে তবে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। হাদীসটি হাসান।[১]

যিকর নং ২২৭: গবেষক, মুফতী ও সত্যানুসন্ধানীর দুআ

তৃতীয় অধ্যায়ে সালাত শুরুর চতুর্থ যিকর (**যিকর নং ৪৯**) দেখুন। প্রত্যেক গবেষক, আলিম, মুফতী ও সত্যসন্ধানী মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদের শুরুতে, সাজদায় ও অন্যান্য সকল সময়ে এ দুআটি বেশি বেশি পাঠ করা।

৫. ৪. আরো কয়েকটি বরকতময় মাসনূন দুআ

এখানে সহীহ বা হাসান সনদে বর্ণিত ১৫টি মাসনূন দুআ উল্লেখ করছি। জীবনের যা কিছু চাওয়ার সবই এ সকল দুআর মধ্যে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও আবেগময় ভাষায় আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ দুআগুলো, এ বইয়ে উল্লেখিত অন্যান্য সকল দুআ এবং কুরআন ও হাদীসের যে কোনো দুআ মুমিন সালাতের মধ্যে সাজদায়, সালাতের শেষ বৈঠকে সালামের আগে, সালামের পরে এবং সকল সময়ে পাঠ করতে পারেন।

اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

(দুআ-১) উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মা, আ'উযু বিকা মিন জাহ্‌দিল বালা-য়ি ওয়া দারাকিশ শাক্বা-য়ি, ওয়া সূয়িল ক্বাদা-য়ি ওয়া শামাতাতিল আ'অ্দা-য়ি।"

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি কষ্টদায়ক বিপদ, গভীর দুর্ভাগ্য, খারাপ তাকদীর এবং শত্রুদের উপহাস থেকে।"[২]

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا

(দুআ-২) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল 'আজ্‌যি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি, ওয়াল হারামি ওয়া 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি। আল্লা-হুম্মা, আ-তি নাফ্‌সি তাক্বওয়া-হা-, ওয়া যাক্‌কিহা- আনতা খাইরু মান যাক্কা-হা-, আনতা ওয়ালিইউহা- ওয়া মাওলা-হা-। আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিন্ 'ইলমিন লা- ইয়ানফা'উ, ওয়ামিন ক্বালবিন্ লা- ইয়াখ্‌শা'উ ওয়ামিন নাফ্‌সিন লা- তাশ্‌বা'উ ওয়ামিন দা'অ্ওয়াতিন লা- উস্‌তাজা-বু লাহা-।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, অক্ষমতা থেকে, আলসেমি থেকে, কাপুরুষতা থেকে, কৃপণতা থেকে, অতি-বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ, আমার নফসকে আপনি তার তাকওয়া প্রদান করুন এবং আপনি তাকে তাযকিয়া-পবিত্রতা দান করুন, নফসকে পবিত্রতা-তাযকিয়া প্রদানে আপনিই সর্বোত্তম, আপনিই আমার নফসের অভিভাবক ও বন্ধু। হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান উপকারে লাগে না, এমন হৃদয় (কলব) থেকে যে হৃদয় ভীত হয় না, এমন নফস থেকে যে নফস পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যে দু'আ কবুল হয় না।"[৩]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

(দুআ-৩) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন যাওয়ালি নি'অ্মাতিকা, ওয়া তা'হাওউলি 'আ-ফিয়াতিকা, ওয়া ফুজা-আতি নাক্বমাতিকা ওয়া জামীয়ি সাখাতিক।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, আপনার দেওয়া নেয়ামতের বিলুপ্তি থেকে, আপনার দেওয়া শান্তি-সুস্থতার পরিবর্তন থেকে, আপনার হঠাৎ শাস্তি থেকে এবং আপনার সর্ব প্রকারের অসন্তুষ্টি থেকে।"[৪]

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبُّ

(দুআ-৪) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মার্ যুক্বনী 'হুব্বাকা ওয়া 'হুব্বা মান ইয়ান্‌ফা'উনী 'হুব্বুহু 'ইনদাকা, আল্লা-হুম্মা মা- রাযাক্বতানী মিম্মা- উ'হিব্বু ফাজ্'আলহু ক্বুওয়াতান্ লী ফীমা- তু'হিব্বু। আল্লা-হুম্মা, ওয়ামা- যাওয়াইতা 'আন্নী মিম্মা উ'হিব্বু ফাজ'আল্‌হু ফারা-'গান লী ফীমা- তু'হিব্বু।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে দান করুন আপনার প্রেম এবং যার প্রেম আপনার কাছে আমার উপকারে আসবে তার প্রেম। হে আল্লাহ, আমার যে কাঙ্খিত বিষয় আপনি আমাকে দান করেছেন আপনি তাকে আপনার প্রিয় বিষয় অর্জনের শক্তিতে রূপান্তরিত করুন। হে আল্লাহ, আর আমার যে কাঙ্খিত বিষয় থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করেছেন তাকে আপনি আপনার প্রিয় বিষয় অর্জনের অবসরে রূপান্তরিত করুন।"[১]

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا

(দুআ-৫) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, যিদ্‌না- ওয়ালা- তান্‌ক্বুস্‌না- ওয়া আক্‌রিম্‌না- ওয়ালা- তুহিন্‌না- ওয়া আ'অ্‌ত্বিনা- ওয়ালা- তা'হ্‌রিম্‌না- ওয়া আ-সির্‌না- ওয়ালা- তুঅ্‌সির 'আলাইনা- ওয়া আর্‌দ্বিনা ওয়ার্‌দ্বা 'আন্না-

অর্থ: "হে আল্লাহ, আপনি আমদেরকে বাড়িয়ে দিন, কমাবেন না, আপনি আমাদেরকে সম্মানিত করুন, অপমানিত করবেন না, আমাদেরকে প্রদান করুন, বঞ্চিত করবেন না, আমাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করুন, আমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকার দিবেন না, আপনি আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন এবং আমাদের উপর আপনি সন্তুষ্ট হোন।"[২]

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

(দুআ-৬) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল হুদা- ওয়াত্ তুক্বা, ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল 'গিনা-।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি চাচ্ছি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, সচ্ছলতা ও সংযম-শুদ্ধতা-শালীনতা।[৩]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِيْنِكَ

(দুআ-৭) উচ্চারণ: ইয়া- মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূব সাব্‌বিত ক্বাল্‌বী 'আলা- দীনিক্

অর্থ: হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, সুপ্রতিষ্ঠিত-স্থির রাখুন আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর। হাদীসটি সহীহ।[৪]

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا ، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

(দুআ-৮) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আ'হ্‌সিন্ 'আ-ক্বিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা- ওয়া আজির্‌না- মিন্ খিয্‌ইয়িদ্ দুনইয়া- ওয়া 'আযা-বিল আ-খিরাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি সুন্দর করুন আমাদের পরিণতি সকল কাজে এবং আমাদের রক্ষা করুন দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে।[৫]

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئْ الأَسْقَامِ

(দুআ-৯) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল বারাস্বি, ওয়াল জুনূনি, ওয়াল জুযা-মি ওয়া মিন সাইয়িয়িল আস্‌ক্বা-ম।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি শ্বেতী রোগ, পাগলামি-মানসিক রোগ, কুষ্ঠ রোগ এবং সকল খারাপ রোগব্যাধি থেকে।"[৬]

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بالإِسْلاَمِ قائِماً واحْفَظْنِي بالإِسْلاَمِ قاعِداً واحْفَظْنِي بالإِسْلاَمِ راقِداً ولا تُشْمِتْ بِي عَدُوّاً ولا حاسِداً اللَّهُمَّ إِنِّيْ أسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خزائِنُهُ بِيَدِكَ وأعُوذُ بكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

(দুআ-১০) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা'হ্‌ফায্‌নী বিল্ ইস্‌লা-মি ক্বা-য়িমান্ ওয়া'হ্‌ফাযনী বিল্ ইস্‌লা-মি ক্বা-'য়িদান, ওয়া'হ্‌ফাযনী বিল্ ইসলা-মি রা-ক্বিদান, ওয়ালা- তুশ্‌মিত্ বী 'আদুওয়ান্ ওয়ালা- 'হা-সিদান। আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকা মিন্ কুল্লি 'খাইরিন্ খাযা-য়িনুহূ

বিইয়াদিকা, ওয়া আ'উযু বিকা মিন কুল্লি শাররিন খাযা-য়িনুহূ বিইয়াদিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমাকে হিফাযত করুন ইসলামের ওসিলায় দাঁড়ানো অবস্থায়, আমাকে হিফাযত করুন ইসলামের ওসিলায় বসা অবস্থায়, আমাকে হিফাযত করুন ইসলামের ওসিলায় শোয়া অবস্থায়। আমাকে আপনি এমন অবস্থায় ফেলবেন না যে শত্রুরা আমার দুরবস্থায় খুশি হয়। আমি আপনার নিকট চাচ্ছি সকল কল্যাণ যা আপনার ভাণ্ডারে বিদ্যমান এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল অকল্যাণ থেকে যা আপনার ভাণ্ডারে বিদ্যমান।[১]

اللهمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عندَ كِبَرِ سِنِّي وانْقِطاعِ عُمْرِي

(দুআ-১১) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাজ্'আল আউসা'আ রিয্কিকা 'আলাইয়া 'ইনদা কিবারি সিন্নী ওয়ান্‌ক্বিত্বা'য়ি উমুরী।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার সবচেয়ে প্রশস্ত রিযক আপনি আমাকে প্রদান করবেন আমার বাধ্যর্কের সময় এবং জীবনের শেষ সময়ে।[২]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ والقَسْوَةِ والغَفْلَةِ والعَيْلَةِ والذِّلَّةِ والمَسْكَنَةِ وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ والكُفْرِ والفُسُوقِ والشِّقاقِ والنِّفاقِ والسُّمْعَةِ والرِّياءِ وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ والبَكَمِ والجُنُونِ والجُذامِ والبَرَصِ وَسَيِّيءِ الأَسْقامِ

(দুআ-১২) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল 'আজ্‌যি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়াল হারামি ওয়াল কাস্‌ওয়াতি ওয়াল গাফ্‌লাতি ওয়াল 'আইলাতি ওয়ায্ যিল্লাতি ওয়াল মাস্‌কানাতি ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল ফাক্বরি ওয়াল কুফ্‌রি ওয়ল ফুসূক্বি ওয়াশ শিক্বা-ক্বি, ওয়ান্ নিফা-ক্বি, ওয়াস সুম্'আতি ওয়ার রিইয়া-য়ি, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাস স্বামামি ওয়াল বাকামি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়াল বারাস্বি ওয়া সাইয়িয়িল আসক্বা-ম।

অর্থ: হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি অক্ষমতা, আলস্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য-জরাগ্রস্ততা, রূঢ়তা-কঠোরতা, অসতর্কতা, হীনতা-নিঃস্বতা, লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্ব থেকে। এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি দারিদ্র, অবিশ্বাস, পাপাচার, বিচ্ছিন্নতা-অবাধ্যতা, মুনাফিকী, সুনামের লোভ এবং প্রদর্শনেচ্ছা থেকে। এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি বধিরতা, বাকশক্তিহীনতা, পাগলামি-মানসিক অসুস্থতা, কুষ্ঠ, শ্বেতী এবং সকল খারাপ রোগব্যাধি থেকে।[৩]

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ

(দুআ-১৩) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আ'উযু বিকা মিন ইয়াওমিস সূয়ি ওয়া মিন লাইলাতিস সূয়ি ও মিন সা-'আতিস সূয়ি, ওয়া মিন স্বা-হিবিস সূয়ি, ওয়া মিন জা-রিস সূয়ি ফী দারিল মুক্বা-মাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি খারাপ দিন থেকে, খারাপ রাত থেকে, খারাপ মুহূর্ত থেকে, খারাপ সঙ্গী-সাথী থেকে এবং বসতবাড়ির খারাপ প্রতিবেশী থেকে।[৪]

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

(দুআ-১৪) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মান্‌ফা'নী বিমা- 'আল্লাম্‌তানী, ওয়া 'আল্লিমনী মা- ইয়ানফা'উনী, ওয়া যিদ্‌নী 'ইলমান।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেন তদ্বারা আমাকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন, আমার উপকার করে এমন জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দিন এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।[৫]

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي

(দুআ-১৫) উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, মাত্তি'অ্‌নী বিসাম'ঈ, ওয়া বাস্বারী, ওয়াজ্'আলহুমাল ওয়া-রিসা মিন্নী, ওয়ান্‌স্বুর্‌নী 'আলা- মান যালামানী ওয়া খুয্ মিন্‌হু বিসাঅ্‌রী।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ন রাখুন এবং উভয়কে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিন (মৃত্যুর সময় এগুলোকে অক্ষুণ্ন রেখে মরতে পারি)। আমার উপর অত্যাচারকারীর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন এবং তার থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।[৬]

৫. ৫. কুরআনের দুআ ও পারিবারিক দুআ

কুরআনে মুমিনের প্রয়োজনীয় অনেক দুআ বিদ্যমান। এ বইয়ে সেগুলো উল্লেখ করা হয় নি; কারণ যে কোনো আগ্রহী মুমিন একটু কষ্ট করলেই কুরআন থেকে সেগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। এখানে কয়েকটি দুআর সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করছি। আগ্রহী পাঠক দুআগুলো শিখে নিতে পারেন।

- সূরা (১) ফাতিহা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুআ।
- সূরা (২) বাকারা ১২৭, ১২৮, ২০১, ২৮৫ আয়াত।
- সূরা (৩) আল ইমরান: ৮, ১৬, ২৬, ৩৮, ৫৩, ১৪৭, ১৯১-১৯৪ আয়াত।
- সূরা (৪) সূরা নিসা: ৭৫ আয়াত।
- সূরা (৭) আ'রাফ ২৩, ৪৭, ৮৯ আয়াত।
- সূরা (১০) ইউনুস: ৮৫, ৮৬ আয়াত।
- সূরা (১১) হূদ: ৪৭ আয়াত।
- সূরা (১৪) ইবরাহীম: ৩৫, ৪০, ৪১ আয়াত।
- সূরা (১৭) ইসরা (বনী ইসরাঈল) ২৪, ৮০ আয়াত।
- সূরা (১৮) কাহফ: ১০ আয়াত।
- সূরা (১৯) মরিয়ম ৫, ৬ আয়াত।
- সূরা (২০) তাহা: ২৫-২৮, ১১৪ আয়াত।
- সূরা (২১) আম্বিয়া: ৮৯, ১১২ আয়াত।
- সূরা (২৩) মুমিনূন: ৯৭-৯৮, ১০৯, ১১৮ আয়াত।
- সূরা (২৫) ফুরকান: ৬৫-৬৬, ৭৪ আয়াত।
- সূরা (২৬) শুআরা: ৮৩-৮৫, ৮৭ আয়াত।
- সূরা (২৭) নামল: ১৯ আয়াত।
- সূরা (২৮) কাসাস: ১৬, ২৪ আয়াত।
- সূরা (২৯) আনকাবূত: ৩০ আয়াত।
- সূরা (৩৭) সাফফাত: ১০০ আয়াত।
- সূরা (৪০) গফির (মুমিন): ৭, ৮ আয়াত।
- সূরা (৪৬) আহকাফ: ১৫ আয়াত।
- সূরা (৫৯) হাশর: ১০ আয়াত।
- সূরা (৬০) মুমতাহিনা: ৪, ৫ আয়াত।
- সূরা (৬৬) তাহরীম: ৮ আয়াত।
- সূরা (৭১) নূহ: ২৮ আয়াত।

কুরআনী দুআর অন্যন্য বৈশিষ্ট্য পারিবারিক দুআ। সন্তান লাভ, সন্তান ও পরিবারের সদস্যতের সফলতা ও শান্তি এবং পিতামাতার জন্য দুআ কুরআনের বৈশিষ্ট্য।

- সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের হেদায়াত, সফলতা ও পারিবারিক শান্তির জন্য সূরা (১৪) ইবরাহীম ৩৫ ও ৪০ আয়াত; সূরা (২৫) ফুরকান ৭৪ আয়াত; ও সূরা (৪৬) আহকাফ ১৫ আয়াত।
- সন্তান লাভের জন্য সূরা (৩) আল-ইমরান ৩৮ আয়াত; সূরা (১৯) মরিয়ম ৫-৬ আয়াত; সূরা (২১) আম্বিয়া: ৮৯ আয়াত ও সূরা (৩৭) সাফফাত: ১০০ আয়াত।
- পিতামাতার জন্য দুআ সূরা (১৪) ইবরাহীম: ৪১ আয়াত, সূরা (১৭) ইসরা ২৪ আয়াত এবং সূরা (৭১) নূহ ২৮ আয়াত।

সম্মানিত পাঠক, এ আয়াতগুলোর মধ্যে দুআ বিদ্যমান। অধিকাংশ আয়াতে দুআর আগে ও পরে অন্য বক্তব্য বিদ্যমান। **রাব্বানা** (হে আমাদের রব), **রাব্বি** (হে আমার রাব) বা **আল্লাহুম্মা** (হে আল্লাহ) দিয়ে দুআর শুরু হয় এবং অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে দুআর শেষ বুঝে নিতে হবে।

মহান আল্লাহ আমদের সকলের দুআ কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সমস্যা মিটিয়ে আমাদেরকে শান্তিময় পবিত্র জীবন ও পরিবার দান করুন । আমীন।

সপ্তম অধ্যায়

মাজলিসে যিক্‌র ও যিক্‌রের মাজলিস

'মাজলিস' অর্থ বৈঠক, বসা বা বসার স্থান। এক ব্যক্তি একাকী কোথাও সামান্য সময়ের জন্য বসলেও তাকে আরবীতে 'মাজলিস' বলা হবে। অনুরূপভাবে দুই বা ততোধিক মানুষ একত্রে কিছুক্ষণের জন্য বসলে তাকেও মাজলিস বলা হবে। ব্যবহারিকভাবে মাজলিস বলতে সাধারণত একাধিক ব্যক্তির একত্র বৈঠক, মিটিং সমাবেশ, পরিষদ (meeting, gathering, assembly, council) ইত্যাদি বুঝায়।

৭. ১. মাজলিসে আল্লাহর যিক্‌র

মাজলিসে আল্লাহর যিক্‌র দু প্রকারে হতে পারে (ক) মাজলিস বা বৈঠকটি জাগতিক কোনো বিষয় কেন্দ্রিক, তবে মাজলিসের মধ্যে মুমিন মাঝে মধ্যে আল্লাহর স্মরণ করবেন এবং (খ) মাজলিসটি মূলতই আল্লাহর যিক্‌র-কেন্দ্রিক। প্রথম প্রকারের মাজলিসে মুমিন দুভাবে আল্লাহর যিক্‌র করতে পারেন: (ক) একাকী নিজের মনে বা সশব্দে যিক্‌র করা এবং (খ) অন্যদেরকে যিক্‌রের কথা স্মরণ করানো। মুমিনের উচিত কোনো অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র থেকে মনকে বিরত না রাখা। বিশেষত যখন কয়েকজন বন্ধুবান্ধব বা কিছু মানুষের সাথে বসে কথাবার্তা বলবেন তখন মাঝে মাঝে আল্লাহর যিক্‌র করা খুবই প্রয়োজনীয়।

মানুষ সামাজিক জীব। কর্মস্থলে, চায়ের দোকানে, বাজারে, বাড়িতে বা অন্য কোথাও আমরা দু বা ততোধিক মানুষ একত্রিত হলে কখনোই চুপ থাকতে পারি না। 'টক অব দা কান্ট্রি' , 'টক অব দা ডে' বা এ জাতীয় অপ্রয়োজনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক,

পারিবারিক বা ব্যক্তিগত বিভিন্ন কথাবার্তায় আমারা মেতে উঠি। এ সকল কথাবার্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকারক এবং আখিরাত ধ্বংসকারী হয়ে যায়; কারণ আমাদের কথাবার্তা অধিকাংশ সময় পরচর্চা, হিংসা, ঘৃণা বা বেদনা উদ্রেককারী হয়ে থাকে। যদি আমরা এসকল ক্ষতিকারক বিষয় পরিহার করে শুধু জাগতিক 'নির্দোষ' বিষয়; যেমন, - দ্রব্যমূল্য, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পরিবার, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ করি তাহলেও তা আমাদের জন্য নিম্নরূপ ক্ষতি বয়ে আনে:

প্রথমত: এ ধরনের 'নির্দোষ' কথাবার্তা সর্বদাই 'দোষযুক্ত' পরচর্চা বা বিদ্বেষ উদ্রেককারী আলোচনায় পর্যবসিত হয়। অনুপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তির কথা আলোচনায় চলে আসে এবং কোনো না কোনোভাবে আমরা গীবতে লিপ্ত হই।

দ্বিতীয়ত: এ সকল 'নিদোর্ষ' আলোচনার মধ্যে যদি আমরা আল্লাহর যিক্‌র-মূলক কোনো বাক্য না বলি তবে কিয়ামতের দিন আমাদের আফসোস করতে হবে। আমরা দেখেছি যে, যদি একাধিক মুসলিম কোথাও একত্রে কিছু সময়ের জন্যও বসেন এবং কিছু কথাবার্তা বলে উঠে যান, কিন্তু তাদের কথার মধ্যে আল্লাহর যিক্‌র ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর সালাত (দরুদ) জ্ঞাপক কোনো কথা না থাকে, তবে কিয়ামতের দিন এ বৈঠকটি তাদের জন্য আফসোস ও ক্ষতির কারণ হবে। অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, কোনো ব্যক্তি যদি একাকী বা সমাবেশে কোথাও কিছু সময়ের জন্য দাঁড়ায়, বসে, হাঁটে বা শয়ন করে, কিন্তু বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা বা শোয়া অবস্থায় সে আল্লাহর যিক্‌র না করে, তবে তা তার জন্য আফসোস ও ক্ষতির বিষয়ে পরিণত হবে।

অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً

"যদি কিছু মানুষ এমন কোনো বৈঠক শেষ করে উঠে, যে বৈঠকে তারা আল্লাহর যিক্‌র করেনি, তবে তারা যেন একটি গাধার মৃতদেহ (ভক্ষণ করে বা ঘাঁটাঘাঁটি করে) রেখে উঠে গেল। আর এ বৈঠক তাদের জন্য আফসোসে পরিণত হবে।" হাদীসটি সহীহ।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ فَتَفَرَّقُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ ، إِلاَّ كَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"কিছু মানুষ যদি একটি বৈঠকে বসে এবং এরপর বৈঠক ভেঙ্গে চলে যায়, কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে তারা আল্লাহর যিক্‌র না করে তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ বৈঠক তাদের জন্য আফসোসের বিষয় হবে।" হাদীসটি সহীহ।[২]

তৃতীয়ত, এ প্রকারের 'নির্দোষ' গল্পগুজব বা আলোচনার 'মাজলিস' আমাদের অন্তরগুলোকে শক্ত করে দেয়। দীর্ঘসময় এরূপ আলোচনা আমাদের মনকে কঠিন করে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

"তোমরা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বেশি কথা বলবে না; কারণ আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বেশি কথা হৃদয়কে কঠিন করে তোলে। আর আল্লাহর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী মানুষ কঠিন হৃদয়ের মানুষ।" হাদীসটি হাসান।[৩]

মুমিনের দায়িত্ব, যে কোনো বৈঠক, গল্পগুজব বা কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মহান প্রভুর যিক্‌র করবেন। মাজলিসের অন্য কেউ যদি আল্লাহর যিক্‌র না করে বা গরম গরম আবেগী কথায় মেতে থাকে তাহলেও মুমিন নিজের মনে মাঝে মাঝে আল্লাহর যিক্‌র করবেন। আর জনসমক্ষে, মাজলিসে, গাফিলদের মধ্যে মুমিনের এ প্রকার একাকী যিক্‌রের ফযীলতে অনেক হাদীস বর্ণিত। এক হাদীসে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

"আমার বান্দা আমার বিষয়ে যেরূপ ধারণা করে আমি তার সে ধারণার কাছেই। আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাঁর সাথে থাকি। যদি সে আমাকে তাঁর নিজের মধ্যে স্মরণ করে, তবে আমিও তাঁকে আমার নিজের মধ্যে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোনো সমাবেশে বা মানুষের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাঁকে স্মরণ করি তাঁর সমাবেশের চেয়ে উত্তম সমাবেশে- উত্তম ব্যক্তিবর্গের মধ্যে।"[৪]

"সমাবেশে আল্লাহর যিক্‌রের" এ ফযীলত বান্দা দুভাবে লাভ করতে পারেন: **(১)** সমাবেশে বা অন্যান্য বিষয়ে আলোচনারত মানুষের মধ্যে বসে বান্দা নিজের মনে আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকবেন। **(২)** সমাবেশে অন্যদের সাথে তিনি আল্লাহর যিক্‌র করবেন। দ্বিতীয়টিই "আল্লাহর যিক্‌রের মাজলিস"।

৭. ২. আল্লাহর যিক্‌রের মাজলিস

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আল্লাহর জন্য ভালবাসা, সাক্ষাৎ ও সাহচর্য বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ঈমানী পরিবেশে

নেককার মানুষদের সাথে কিছু সময় দীনী আলোচনায় কাটানো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। ঈমান উদ্দীপক এ সকল মাজলিসকেই যিকরের মাজলিস বলা হয়। আমরা এ অধ্যায়ে যিকরের মাজলিসের ফযীলত ও যিক্‌রের মাজলিসের মাসনূন পদ্ধতি আমরা জানতে চেষ্টা করব। যেন আমরা যথাসম্ভব সুন্নাত পদ্ধতিতে সুন্নাত যিকরের মাজলিস পালন করে সর্বোচ্চ পুরস্কার ও বেলায়াত লাভ করতে পারি। সাথে সাথে যিক্‌রের মাজলিসের নামে খেলাফে সুন্নাত কর্মে নিপতিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

৭. ৩. যিক্‌রের মাজলিসের ফযীলত

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা যিকরের মাজলিসের ফযীলত বিষয়ক কয়েকটি হাদীস জেনেছি। এ বিষয়ক অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلا حَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণ (যিক্‌র) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ (যিক্‌র) করেন তাঁর (আল্লাহর) কাছে যারা আছেন তাদের মধ্যে।"[১]

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ [لاَ يُرِيْدُوْنَ بِذَلِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ] إِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: قُوْمُوْا مَغْفُوْرًا لَكُمْ فَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ

"যখনই কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিক্‌রে রত হয়, এদ্বারা তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া কিছুই চায় না, তখনই আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী তাঁদেরকে ডেকে বলেন, তোমরা পরিপূর্ণ ক্ষমাপ্রাপ্ত-গোনাহমুক্ত হয়ে উঠে যাও, তোমাদের পাপগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে।"[২]

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, আজ জমায়েতের দিনে সবাই জানবে কারা সম্মানের অধিকারী। সাহাবীগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, সম্মানের অধিকারী কারা? তিনি বলেন:

مَجَالِسُ الذِّكْرِ فِيْ الْمَسَاجِدِ

"মসজিদের ভিতরের যিক্‌রের মাজলিসগুলো।" হাদীসটি হাসান।[৩]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যিক্‌রের মাজলিসের গনীমত (লাভ) কী ? তিনি বলেন :

غَنِيْمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ

"যিক্‌রের মাজলিসসমূহের গনীমত জান্নাত।" হাদীসটি হাসান।[৪]

৭. ৪. যিক্‌রের মাজলিসের যিক্‌র

বিভিন্ন হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের যিকরের মাজলিসের সুন্নাত আমল ও যিকর সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলো জানা যায়:

৭. ৪. ১. কুরআন তিলাওয়াত, শিক্ষা ও আলোচনা

কুরআন পাঠ, শিক্ষা ও অর্থালোচনা যিকরের মাজলিসের অন্যতম যিকর। উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকর করলে আল্লাহর ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ করেন...। " কুরআনী যিক্‌রের আলোচনায় আমরা দেখছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ যিকর-এর বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা, তিলাওয়াত ও পরস্পরে আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়.....।"

সাহাবীগণ আল্লাহর যিকর বলতে কুরআন তিলাওয়াত ও পারস্পরিক আলোচনা-ই বুঝতেন। তাবিয়ী আনতারা ইবন আব্দুর রাহমান বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম: সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কী? তিনি বলেন:

ذِكْرُ اللهِ أكبر– ثَلاَثَ مَرَّاتٍ– وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ (مِنْ بُيُوْتِ اللهِ) يَتَعَاطَوْنَ فِيهِ كِتَابَ اللهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ

وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلاَّ أَظَلَّتْهُمَ الْمَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَكَانُوا أَضْيَافَ اللهِ مَا دَامُوا فِيهِ حَتَّى يُفِيضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ.

"আল্লাহর যিকরই সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহর যিকরই সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহর যিকরই সর্বশ্রেষ্ঠ!! যখনই কিছু মানুষ একটি ঘরে (আল্লাহর ঘরগুলোর একটি ঘরে) বসে নিজেদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব আলোচনা ও পারস্পরিক অধ্যয়ন করেন তখনই ফিরিশতাগণ তাঁদের পাখা দ্বারা তাদেরকে আবৃত করেন এবং তারা আল্লাহর মেহমান হিসেবে গণ্য হন। যতক্ষণ না তারা অন্য আলোচনায় রত হন ততক্ষণ তাদের এ মর্যাদা অব্যাহত থাকে।"[১]

৭. ৪. ২. ওয়ায ও ইল্‌ম

কয়েকটি হাদীসে যিক্‌রের মাজলিসকে জান্নাতের বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এক হাদীসে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ

"যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে গমন করবে তখন ভক্ষণ-উপভোগ করবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন : জান্নাতের বাগান কি ? তিনি বলেন : যিক্‌রের বৃত্তসমূহ (মাজলিসসমূহ)।" তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[২]

বিভিন্ন হাদীসে জান্নাতের বাগানে আল্লাহর যিক্‌র বলতে মসজিদে বা অন্যত্র বসে তাসবীহ, তাহলীল, তাহ্‌মীদ, তাকবীর ও ওয়াজ বা ইল্‌মী আলোচনা বুঝানো হয়েছে।[৩]

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إذا مَرَرْتُمْ بِرِياضِ الجَنَّةِ فارْتَعُوا قالُوا وما رِياضُ الجَنَّةِ قالَ مَجالِسُ العِلْمِ

"তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে গমন করবে, তখন বিচরণ ও ভক্ষণ করবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: জান্নাতের বাগান কী? তিনি বলেন: ইল্‌মের মাজলিসসমূহ।" হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে।[৪]

সাহাবীগণ এ ধরনের ঈমান বৃদ্ধিকারক ইল্‌ম ও ওয়াজের মাজলিস খুবই পছন্দ করতেন। আনাস (রা) বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা) কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন: আসুন কিছুক্ষণের জন্য আমরা আমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনি । একদিন তিনি এ কথা বলাতে একব্যক্তি রেগে যান। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার আচরণ দেখছেন না! তিনি আপনার ঈমান ফেলে রেখে কিছু সময়ের ঈমান তালাশ করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন :

يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تُبَاهَى بِهَا الْمَلائِكَةُ

"ইবনু রাওয়াহাকে আল্লাহ রহমত করুন! সে তো ঐসব মাজলিস পছন্দ করে যে মাজলিস নিয়ে ফিরিশতাগণ গৌরব করেন।" হাদীসটি হাসান।[৫]

এ সকল মাজলিসে ইবনু রাওয়াহা (রা) ঈমান বৃদ্ধিকারক ওয়ায করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, ইবনু রাওয়াহা (রা) তাঁর সঙ্গীগণকে ওয়ায করছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের কাছে গমন করেন। তিনি বলেন, "তোমরাই সে সমাবেশ যাঁদের সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন ... ।"[৬]

ইল্‌ম, ওয়ায ও আলোচনাই ছিল সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে যিক্‌রের মাজলিসের মূল বিষয়। মু'আয ইবন জাবাল (রা) ইন্তিকালের পূর্বে বলেন যে,

اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا... ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر

"হে আল্লাহ আপনি জানেন যে, আমি পার্থিব কোনো কারণে দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসিনি, কিন্তু আমার আনন্দই ছিল সিয়াম পালন করে দিনে পিপাসার্ত থাকা, রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাত আর যিক্‌রের হালাকায় (মাজলিসে) আলিমদের সাথে হাটু গেড়ে বসে আলোচনা করা।[৭]

প্রখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনু আবী মুসলিম খুরাসানী (৫০-১৩৫ হি) বলেন:

مَجَالِسُ الذِّكْرِ هِيَ مَجَالِسُ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ، كَيْفَ تَشْتَرِيْ وَتَبِيْعُ وَتُصَلِّيْ وَتَصُوْمُ وَتَنْكِحُ وَتُطَلِّقُ وَتَحُجُّ وَأَشْبَاهُ هَذَا

"যিক্‌রের মাজলিস হালাল হারাম আলোচনার মাজলিস। কিভাবে বেচাকেনা করবে, ব্যবসা করবে, কিভাবে সালাত আদায় করবে, সিয়াম পালন করবে, কিভাবে বিবাহ করবে, তালাক দিবে, কিভাবে হজ্ব পালন করবে এবং অনুরূপ সকল বিষয় আলোচনার

মাজলিসই যিক্‌রের মাজলিস।"[১]

৭. ৪. ৩. আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা ও হামদ-সানা

সাহাবীগণের যিক্‌রের মাজলিসের একটি বিশেষ দিক ছিল আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মু'আবিয়া (রা) বলেন :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে সাহাবীগণের একটি বৃত্তে (কয়েকজন সাহাবী বৃত্তাকারে বসে ছিলেন সেখানে) উপস্থিত হন। তিনি বলেন, তোমরা কিজন্য বসেছ? তাঁরা বললেন: আমারা বসে বসে আল্লাহর যিক্‌র করছি এবং তাঁর হামদ বা প্রশংসা করছি, কারণ তিনি আমাদেরকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের মাধ্যমে আমাদের উপর তিনি করুণা করেছেন। তিনি বললেন: আল্লাহর নামে প্রশ্ন করছি, সত্যিই কি তোমরা শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যে বসেছ? তাঁরা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা একমাত্র এ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে বসিনি। তিনি বলেন: আমি তোমাদের প্রতি সন্দেহবশত তোমাদেরকে শপথ করাইনি। বরং জিবরীল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ফিরিশতাগণের কাছে তোমাদের জন্য গৌরব প্রকাশ করছেন। (এ সুসংবাদ প্রদানের জন্যই শপথ করিয়েছি)।"[২]

সুবহানাল্লাহ! কত বড় মর্যাদা। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে নিয়ে গৌরব প্রকাশ করেন। কারণ তাঁরা জাগতিক বিষয়াদি আলোচনার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নিয়ামত আলোচনা, তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁরই কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সমবেত হয়েছে। জাগতিক ব্যস্ততা, প্রয়োজন, লোভ, মোহ বা অন্য কোনো কিছুই তাঁদেরকে প্রভুর স্মরণ ও তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এভাবে তাঁরা ফিরিশতাগণের ঊর্ধ্বে উঠেছেন।

এ হাদীস থেকে আমরা সাহাবীগণ কিভাবে যিক্‌রের মাজলিস করতেন তা বুঝতে পারি। তাঁরা একত্রে বসে আল্লাহর নিয়ামতের কথা আলোচনা করতেন এবং আলোচনার সাথে সাথে তাঁর হামদ, সানা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

৭. ৪. ৪. তাসবীহ-তাহীলল ও দুআ-ইসতিগফার

অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা মাজলিসের যিক্‌রের আরো বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلا يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَئُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ وَمَاذَا يَسْأَلُونِي قَالُوا يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا لا أَيْ رَبِّ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي قَالُوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونَنِي قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا لا قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا قَالَ فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ قَالَ فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

"আল্লাহর কিছু অতিরিক্ত পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন (যারা বিশ্বে ঘুরে) যিক্‌রের মাজলিসগুলোর খোঁজ করেন। যদি কোনো যিক্‌রের মাজলিস পেয়ে যান, তারা সেখানে তাঁদের সাথে বসে পড়েন এবং তাঁদের একে অপরকে পাখা দিয়ে ঘিরে ধরেন। এভাবে তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পূর্ণ করেন। যখন মাজলিসের মানুষেরা বিচ্ছিন হয়ে যান (মাজলিস শেষে চলে যান) তখন তারা ঊর্ধ্বে উঠেন। মহান আল্লাহ যিনি সবই জানেন, তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: তোমরা কোথা থেকে আসছ? তাঁরা বলেন: আমরা দুনিয়ায় আপনার কিছু বান্দার নিকট থেকে এসেছি যাঁরা আপনার 'তাসবীহ' (সুব'হানাল্লাহ) বলেছে, 'তাকবীর' (আল্লাহু আকবার) বলেছে, 'তাহলীল' (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলেছে, 'তাহমীদ' (আল 'হামদু লিল্লাহ) বলেছে এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করেছে। মহান আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন: তাঁরা কী প্রার্থনা করেছে? তাঁরা বলেন: তারা আপনার জান্নাত (বেহেশত) প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'লা বলেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন: হে প্রভু, না, তারা জান্নাত দেখেনি। তিনি বলেন: যদি তারা জান্নাত দেখত তাহলে কী

হতো! ফেরেশতারা বলেন: তারা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন: তারা আমার কাছে কী থেকে আশ্রয় চেয়েছে? তাঁরা বলেন: হে প্রভু, তারা আপনার জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চেয়েছে। তিনি বলেন: তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা উত্তরে বলবেন: না, হে প্রভু। তিনি বলেন: যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত তাহলে কী অবস্থা হতো! তাঁরা বলেন: এছাড়া তারা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন: আমি তাদের ক্ষমা করলাম, তাদের প্রার্থনা কবুল করলাম, তারা যা থেকে আশ্রয় চায় তা থেকে তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করলাম। ফিরিশতাগণ বলেন: হে প্রভু, তাঁদের মধ্যে একজন পাপাচারী বান্দা আছে যে, মাজলিস অতিক্রম করে যাচ্ছিল তাই একটু বসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি তাঁকেও ক্ষমা করলাম, তাঁরা এমন মানুষ (জনগোষ্ঠী) যাদের সাথে কেউ বসলে সে আর অপমানিত-দুর্ভাগা হবে না।"[১]

৭. ৪. ৫. তিলাওয়াত, দরুদ, দু'আ ও নিয়ামত আলোচনা

উপরের হাদীসে যিক্‌রের মাজলিসের সাতটি কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে: **(১).** তাসবীহ, **(২).** তাকবীর, **(৩).** তাহলীল, **(৪).** তাহমীদ, **(৫).** দু'আ বা জান্নাত প্রার্থনা, **(৬).** জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, এবং **(৭).** ইসতিগফার। কোনো কোনো অপ্রসিদ্ধ বর্ণনায় ৮ম কাজ হিসাবে সালাত (দরুদ) পাঠের কথা বলা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

إِنَّ للهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، إِذَا مَرُّوا بِحِلَقِ الذِّكْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اقْعُدُوْا، فَإِذَا دَعَا الْقَوْمُ أَمَّنُوا عَلَى دُعَائِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ صَلُّوا مَعَهُمْ، حَتَّى يَفْرَغُوْا، ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: طُوْبَى لِهَؤُلاَءِ يَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْراً لَهُمْ.

"আল্লাহর কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন যাঁরা যিক্‌রের মাজলিস দেখলে একে অপরকে বলেন: বসে পড়। যখন মাজলিসের মানুষেরা দু'আ করে তখন তারা তাঁদের দু'আর সাথে 'আমীন' বলেন। আর যখন তাঁরা রাসূলুল্লাহর (ﷺ) উপর সালাত বলে তখন তারাও তাঁদের সাথে সালাত পাঠ করেন। শেষে যখন মজলিস ভেঙ্গে সবাই চলে যায় তখন তারা একে অপরকে বলেন: এ মানুষগুলোর জন্য কত বড় সুসংবাদ! কত বড় সৌভাগ্য!! তাঁরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।" হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা আছে।[২]

অন্য একটি হাদীসে সালাত (দরুদ) পাঠ ছাড়া আরো ৩ টি আমলের কথা বলা হয়েছে: (১). কুরআন তিলাওয়াত, (২). আল্লাহর নিয়ামতের মহত্ত্ব বর্ণনা ও (৩). দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করা ; – যে বিষয়ে অন্যান্য হাদীস আমরা আলোচনা করেছি। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ للهِ سَيَّارَةً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يَطْلُبُوْنَ حِلَقَ الذِّكْرِ ... رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُوْنَ آلاَءَكَ وَيَتْلُوْنَ كِتَابَكَ، وَيُصَلُّوْنَ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيَسْأَلُوْنَكَ لآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: غَشُّوْهُمْ رَحْمَتِيْ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبِّ، إِنَّ فِيْهِمْ فُلاَنَاً الْخَطَّاءَ، إِنَّمَا اعْتَنَقَهُمْ اعْتِنَاقاً، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: غَشُّوْهُمْ رَحْمَتِيْ، فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

"মহান আল্লাহর কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছেন যাঁরা যিক্‌রের মাজলিস অনুসন্ধান করেন। ...তাঁরা যিক্‌রের মাজলিস সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে বলেন: হে প্রভু, আমরা আপনার এমন কিছু বান্দার কাছে থেকে এসেছি যাঁরা আপনার নিয়ামতসমূহের মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে, আপনার গ্রন্থ কুরআন করীম তিলাওয়াত করেছে, আপনার নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর সালাত পাঠ করেছে এবং তাঁদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ বলেন : তাঁদেরকে আমার রহমত দিয়ে আবৃত করে দাও। তারা বলবেন : ইয়া রাব, তাঁদের মধ্যে একজন পাপী মানুষ আছে, যে হঠাৎ করে তাঁদের মাঝে এসে বসেছে। আল্লাহ বলবেন : তাঁদেরকে আমার রহমত দিয়ে ঢেকে দাও, কারণ তাঁরা এমন সাথী, তাঁদের সাথে যে বসবে সে আর দুর্ভাগা থাকবে না (সেও রহমত পাবে, যদিও সে অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের সাথে বসেছে)।"[৩]

৭. ৫. যিক্‌রের মাজলিসের যিক্‌র-পদ্ধতি

উপরের হাদীসগুলোর আলোকে আমরা মাজলিসের যিকর তিনভাগে ভাগ করতে পারি: (১) কুরআন তিলাওয়াত, শিক্ষা ও অধ্যয়ন বিষয়ক যিকর, (২) ওয়ায-নসিহত ও ইলম চর্চার যিকর এবং (৩) তাসবীহ-তাহলীল, দরুদ-সালাম, দুআ-ইসতিগফার জাতীয় যিকর। হাদীস শরীফে এ সকল যিকর পালনে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্যাবলি জানা যায়:

৭. ৫. ১. কুরআনী যিক্‌রের মাজলিস পদ্ধতি

কুরআন কেন্দ্রিক যিকরের মাজলিস নিম্নরূপ হতে পারে:

(ক) কুরআন শিক্ষার মাজলিস। আমরা দেখেছি, হাদীসের আলোকে কুরআন শিক্ষা যিকরের মাজলিসের অন্যতম কর্ম। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে কুরআন শিক্ষার মাজলিসকে সর্বশ্রেষ্ঠ মাজলিস হিসেবে গণ্য করা হতো। সুপ্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন হাবীব আবূ আব্দুর রাহমান সুলামী (৭২ হি) চল্লিশ বৎসর যাবৎ কুফার জামি মাসজিদে কুরআন শিক্ষার মাজলিস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সাহাবী-তাবিয়ীগণের

কুরআন শিক্ষার মাজলিসের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন:

حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ آيَاتٍ فَلا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ قَالُوا فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যারা আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন তাঁরা বলেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দশটি আয়াত পড়া শিখতেন। এ দশটি আয়াতের মধ্যে কি ইলম ও আমল বিদ্যমান তা না শিখে তাঁরা পরবর্তী দশ আয়াত শুরু করতেন না। তাঁরা বলেন: এভাবে আমরা ইলম ও আমল শিখি।"[১]

তাহলে আমরা দেখছি যে, তিলাওয়াত শিক্ষা, হিফয শিক্ষা, অর্থ শিক্ষা, তাফসীর শিক্ষা, কুরআনী ভাষা শিক্ষা বা কুরআন সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয় শিক্ষার মাজলিস যিকরের মাজলিস। দশটি আয়াতের উচ্চারণ, তিলাওয়াত, ভাষা, অর্থ, ইলম ও আমল শিক্ষা করার পর নতুন দশ আয়াত শুরু করাই সুন্নাত পদ্ধতি।

(২) পারস্পরিক তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন। কুরআনী যিকরের অন্য দিক 'তাদারুস' বা পরস্পর অধ্যয়ন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যের মুখে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ ও অর্থচিন্তা করে হৃদয় নাড়াতে ভালবাসতেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন: তুমি আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি কিভাবে আপনাকে কুরআন পড়ে শোনাব? অথচ আপনার উপরেই তো কুরআন নাযিল হয়েছে! তিনি বলেন: আমি অন্যের মুখে শুনতে ভালবাসি। তখন আমি সূরা নিসা পাঠ করে তাঁকে শোনাতে লাগলাম। আমি যখন সূরা নিসার ৪১ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছালাম তখন তিনি আমাকে বললেন: থাম। তখন আমি দেখি যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরছে।"[২]

সাহাবী-তাবিয়ীগণও সালাতুল ফাজরের পরে বা অন্যান্য সময়ে মসজিদে বা অন্যত্র পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত, শ্রবণ, অধ্যয়ন, কুরআন ও হাদীস থেকে ফিকহ ও মাসাইল শিক্ষার মাজলিস করতেন।[৩]

বিভিন্নভাবে কুরআন অধ্যয়ন বা 'তাদারুস'-এর মাজলিস করা যায়। একজন তিলাওয়াত করবেন এবং অন্যরা শুনবেন। প্রত্যেকে কিছু আয়াত তিলাওয়াত করবেন এবং অন্যরা শুনবেন। পঠিত আয়াতগুলের অর্থ আলোচনা করবেন অথবা তিলাওয়াত ও শ্রবণের মাঝে আয়াতের মধ্যে বিদ্যমান অর্থ, ফিকহ, তাফসীর ইত্যাদি বিষয় আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর করবেন। এভাবে কুরআন কেন্দ্রিক ওয়ায, তাফসীর, দরস, তাযকিয়া, ফিকহ সবই এ প্রকারের তাদারুসের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনী মাজলিস বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ

"তোমরা কুরআন পাঠ কর যতক্ষণ তোমাদের অন্তরগুলো মিল-মহব্বতে থাকবে। যখন তোমরা মতভেদ করবে তখন উঠে যাবে।"[৪]

কুরআন শিক্ষার, তিলাওয়াতের, তাদারুসের বা পারস্পরিক অধ্যয়নের মাজলিসে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অধ্যয়নের সময় ও পরিমাণ সীমিত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আলোচনা পদ্ধতি যেন উপস্থিত মুমিনদের মধ্যে বিতর্ক বা বিদ্বেষ সৃষ্টি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্লান্তি, বিরক্তি বা বিতর্ক সৃষ্টি হলে কুরআনী মাজলিস শেষ করতে হবে।

(৩) সমস্বরে তিলাওয়াত। কুরআনী মাজলিসের একটি খেলাফে সুন্নাত পদ্ধতি মাজলিসের সকলেই একত্রে বা সমস্বরে তিলাওয়াত করা। তাবিয়ী-তাবি-তাবিয়ীগণের যুগের শেষ দিক থেকে এরূপ পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বালের প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম হারব ইবন ইসমাঈল ইবন খালাফ কিরমানী (২৮০ হি) বলেন: তিনি দেখেছেন যে, দামিশক, হিমস, মক্কা ও বসরার অধিবাসীরা ফজরের সালাতের পরে মসজিদে বসে কুরআনের মাজলিস করতেন। বসরা ও মক্কার অধিবাসীদের নিয়ম ছিল একজন দশটি আয়াত পড়তেন এবং অন্যরা নীরবে মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এরপর অন্য আরেকজন দশটি আয়াত পড়তেন। এভাবেই মাজলিস চলত। কিন্তু সিরিয়ার (দামিশক ও হিমস-এর) অধিবাসীরা সকলে একত্রে উচ্চৈঃস্বরে একই সূরা পাঠ করতেন। ইমাম মালিক সিরিয়াবাসীদের এরূপ সমস্বরে তিলাওয়াতে ঘোর আপত্তি করেন। তিনি বলেন: মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ আমাদের এখানে ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কখনো এরূপ করেছেন বলে আমরা জানতে পরি নি।...এরূপ করা বিদআত।"[৫]

৭. ৫. ২. ওয়ায-ইলমের হালাকায়ে যিকর পদ্ধতি

আমরা দেখেছি, সুন্নাতের আলোকে যিকরের মাজলিসের অন্যতম বিষয় ঈমান, আমল ও ইলম বৃদ্ধিকর ওয়ায, নসীহত ও ফিকহ আলোচনা। ওয়ায-মাহফিল, তাফসীর মাহফিল, সেমিনার, গ্রন্থভিত্তিক ইলমী দরস, হালাকা যে নামেই করা হোক্ না কেন সবই এ প্রকারের যিকরের মাজলিস হিসেবে গণ্য। যে নামেই এরূপ মাজলিস প্রতিষ্ঠা করা হোক্ সাধারণ মাজলিসের মাসনূন আদবগুলো রক্ষা করতে হবে।

যেমন হামদ ও তাশাহ্হুদ দিয়ে শুরু করা, কুরআন ও সহীহ সুন্নাত নির্ভর আলোচনা করা, গীবত, হিংসা ও দলাদলির থেকে মুক্ত থেকে আখিরাত মুখিতা, ঈমান, তাকওয়া, ইলম, তাওবা ও ক্রন্দন বৃদ্ধিকারী আলোচনা করা।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ সকল আলোচনা, দরস, খুতবা বা বক্তব্য হামদ-সানা এবং তাশাহ্হুদ বলে শুরু করতেন। আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খুতবাতুল হাজাত নিম্নরূপ শিক্ষা দিতেন:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ [وَنَسْتَغْفِرُهُ] وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"নিশ্চয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নফসের অকল্যাণ থেকে এবং আমাদের খারাপ কর্মগুলি থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা (দাস) ও তাঁর রাসূল।"

তিনি বলতেন, "তুমি যদি তোমার বক্তব্যের সাথে কুরআনের কয়েকটি আয়াত সংযুক্ত করতে চাও তাহলে বলবে: (সূরা আল ইমরানের ১০২ আয়াত, সূরা নিসার ১ আয়াত ও সূরা আহযাবের ৭০-৭১ আয়াত)। এরপর তুমি বলবে, "আম্মা বা'দু": অতঃপর, এরপর তুমি তোমার প্রয়োজন বলবে।"[১]

ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাতের খুতবা ও হাজতের খুতবা শিক্ষা দেন। সালাতের খুতবা: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি .... । আর হাজতের খুতবা (উপরের বাক্যগুলো)।[২] এ অর্থে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত।

এজন্য সকল প্রকার বক্তব্য, খুতবা বা ওয়াযের শুরুতে এ কথাগুলি বলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আমাদের সকলেরই উচিত সাধ্যমত সকল বক্তব্যের শুরতে এগুলি বলা। তাশাহ্হুদের শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখের সময় দরুদ ও সালাম পাঠ করতে হবে। অন্তত হামদ, তাশাহ্হুদ ও দরুদ-সালামের মাধ্যমে সকল মাজলিস বা বক্তব্য শুরু করার মাধ্যমে সুন্নাত পালন ছাড়াও বরকত ও কুবলিয়্যাত লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

"যে বক্তব্যের শুরুতে তাশাহ্হুদ নেই তা কর্তিত হস্তের ন্যায়।"[৩]

৭. ৫. ৩. মাজলিসে 'তাসবীহ' জাতীয় যিকর পালনের পদ্ধতি

মাজলিসী যিকরের মধ্যে তাসবীহ-তাহলীল, ইসতিগফার, তাকবীর ইত্যাদি একাকী পালনীয় যিকরও রয়েছে। মাজলিসে দুভাবে এগুলো পালন করা যায়:

(ক) কুরআন, ইলম বা ওয়াযের জন্য মাজলিস করে আলোচনার মধ্যে আবেগ অনুসারে প্রত্যেকে নিজের মত এগুলো বলা। যেমন আলোচনার মধ্যে আবেগভরে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি..., আল্লাহ ক্ষমা করুন, জান্নাত প্রদান করুন, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন... ইত্যাদি প্রত্যেকে নিজে নিজে বলবে অথবা একজন বললে অন্যরা 'আমীন' বলবে।

(খ) শুধু এগুলো জপ করার জন্য মাজলিস করা এবং সকলে সমস্বরে এগুলো জপ করা। অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা... রাব্বিগফির ইত্যাদি বাক্য সকলে একত্রে সমস্বরে পড়তে থাকা।

প্রথম পদ্ধতিটিই সুন্নাত পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ সমবেতভাবে বা সমস্বরে জপ করা খেলাফে সুন্নাত। তাবিয়ীগণের যুগ থেকে কোনো কোনো আবেগী মুসলিম এরূপ সমবেত যিকর করতে শুরু করেন। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ ও পরবর্তী আলিমগণ কঠোরভাবে এ পদ্ধতির আপত্তি করেছেন। উপরে আমরা সমস্বরে তিলাওয়াত বিষয়ক আপত্তি জেনেছি। সমবেত যিকর সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর আপত্তি বিষয়ক হাদীস আমরা **'এহইয়াউস সুনান'** গ্রন্থে আলোচনা করেছি। যারা এভাবে যিকর শুরু করেন তাঁদের দলীল ছিল: আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন যিকর করছি। মাজলিসে বসে এ সকল যিকর করতে হাদীসে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাজলিসে সকলে সশব্দে সমবেতভাবে বা সমস্বরে তা পালন করা কোনোভাবেই অন্যায় হতে পারে না। সাহাবী-তাবিয়ীগণ যারা নিষেধ করতেন তাদের দলীল ছিল: এ সকল যিকর মাসনূন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ মাজলিসেও এগুলো পালন করেছেন। কখনো তাঁরা সশব্দে সমবেতভাবে বা সমস্বরে তা পালন করেন নি। যদি তোমাদের পদ্ধতি উত্তম হয় তবে সাহাবীদেরকে অনুত্তম বলতে হবে। আর যদি সাহাবীগণ পূর্ণতার আদর্শ হন তবে তোমার বিভ্রান্তির দরজা উন্মুক্ত করেছ।[৪]

ফজরের সালাত বা অন্য সময়ে সাহাবীগণ একত্রে বসে তিলাওয়াত বা জপমূলক যিকর করলে প্রত্যেকে নিজের মত তা করতেন; সমস্বরে করতেন না। ইমাম মালিক বলেন: "সাহাবীগণ ও পরবর্তী আলিমগণ এরূপ সমবেত বা সমস্বরে যিকর করতেন না। তাঁরা সালাত

আদায়ের পর প্রত্যেকে নিজের মত তিলাওয়াত ও যিকরে ব্যস্ত থাকতেন। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেই যিকর শেষ করতেন। সমবেত বা সমস্বরে যিকর-তিলাওয়াত নব-উদ্ভাবিত বিদআত।[১]

৭. ৫. ৪. সাহাবীগণের যিক্রের মাজলিস

সামগ্রিকভাবে আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণের যিকরের মাজলিস ছিল মূলত কুরআন, ইলম ও ঈমান বৃদ্ধিকর ওয়ায-আলোচনা। আবেগানুসারে এর মধ্যে তাঁরা তাসবীহ, তাহলীল, ইসতিগফার ইত্যাদি বলতেন।

এক হাদীসে তাবিয়ী আবু সাঈদ মাওলা আবী উসাইদ বলেন, উমর (রা) রাতে মসজিদে নববীর মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখতেন। সালাতরত ব্যক্তিগণকে ছাড়া সবাইকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। তিনি একদিন এভাবে মসজিদ ঘুরে দেখার সময় কয়েকজন সাহাবীকে একত্রে বসা অবস্থায় দেখতে পান, যাঁদের মধ্যে উবাই ইবনু কা'ব (রা) ছিলেন। উমর (রা) বলেন: এরা কারা? উবাই (রা) বলেন: হে আমীরুল মুমিনীন, এরা আপনারই পরিবারের কয়েকজন। তিনি বলেন: আপনারা সালাতের পরে বসে আছেন কী জন্য? উবাই বলেন: আমরা আল্লাহর যিক্র করতে বসেছি। তখন উমর (রা) তাঁদের সাথে বসলেন। এরপর তাঁর সবচেয়ে কাছের ব্যক্তিকে বললেন : শুরু কর। তখন সে ব্যক্তি দু'আ করলেন। এরপর উমর (রা) একে একে প্রত্যেককে দিয়ে দু'আ করালেন এবং শেষে আমার পালা এসে গেল। আমি তাঁর পাশেই ছিলাম। তিনি বললেন: শুরু কর। কিন্তু (উমরের উপস্থিতিতে) আমি একদম আটকে গেলাম ও কাঁপতে লাগলাম। আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হলো না। তিনি আমার কাঁপুনি অনুভব করতে লাগলেন। তখন বললেন: কিছু অন্তত বল, নাহলে অন্তত বল:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমাদেরকে রহমত করুন।" আবু সাঈদ বলেন: এরপর উমর (রা) শুরু করলেন, তখন সমবেত মানুষদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউ কাঁদল না। সবার চেয়ে বেশি ক্রন্দন করলেন এবং বেশি অশ্রুপাত করলেন তিনি নিজে। এরপর তিনি সবাইকে বললেন: মাজলিস শেষ। তখন সবাই যার যার পথে চলে গেলেন।"[২]

অন্য হাদীসে তাবিয়ী আবূ সালামা ও আবূ নাদ্‌রা বলেন:

كان عمرﷺ يقول: يا أبا موسى! ذكّرنا ربّنا فيقرأ (وهو جالس/وهم يستمعون)

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ মূসা আশআরী (রা)- কে বলতেন: হে আবূ মূসা, আপনি আমারেদকে আমাদের রবের যিকর করান। তখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং উমার (রা) ও সাহাবীগণ বসে শুনতেন।"[৩]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আবূ নাদরা বলেন:

كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرءوا سورة

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ সমবেত হলে ইলমের যিকর করতেন এবং কুরআনের সূরা তিলাওয়াত করতেন।"[৪]

এভাবে আমরা দেখছি, সাহাবীগণ মাজলিসে সমস্বরে 'আস্তাগ-ফিরুল্লাহ' অথবা অন্য কোনো যিকর আদায় করতেন না বা সমস্বরে তিলাওয়াত করতেন না। বরং তাঁরা ইলমের আলোচনা করতেন, একজন তিলাওয়াত করতেন এবং অন্যরা শুনতেন অথবা তাঁরা প্রত্যেকে পালা করে আলোচনা করতেন এর মধ্যে সকলেই নিজের মত ইসতিগফার, দুআ ও যিকর করতেন।

সম্মানিত পাঠক, ইমাম আবূ হামিদ গাযালী (৫০৫ হি) রচিত **'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন'** গ্রন্থ পাঠ করলে আপনি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হবেন যে, ৫ম-৬ষ্ঠ হিজরী শতক পর্যন্ত যিকরের মাজলিস ও হালকায়ে যিকর বলতে ইলম ও ওয়াযের মাজলিসই বুঝানো হতো। তিনি এ গ্রন্থে ইসলামী পরিভাষার অর্থবিকৃতি প্রসঙ্গে যিকর ও তাযকীর পরিভাষা উল্লেখ করে বলেন, তাঁর সময়ে (৫ম হিজরী শতকে) যিকরের মাজলিস বলতে গল্পকারদের ওয়ায বুঝানো হতো। কিন্তু পূর্ববর্তী যুগগুলোতে যিকরের মাজলিস বলতে ঈমান, আখিরাত ইত্যাদি আলোচনা ও কুরআনের অর্থ অনুধাবন বুঝানো হতো। এ গ্রন্থের সর্বত্র তিনি যিকরের মাজলিস বলতে ঈমান বৃদ্ধিকারক ও আখিরাতমুখী ওয়ায, কুরআন অধ্যয়ন ও আমলমুখী ফিকহ-চর্চা বুঝিয়েছেন।[৫]

৭. ৫. ৫. মাজলিসের আখেরি মুনাজাত

মাজলিসের ভিতরে বারবার বিভিন্ন দুআ করা যিকরের মাজলিসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উপরের কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখেছি যে, যিকরের মাজলিসের অন্যতম বিষয় দুনিয়া ও আখিরাতের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে চাওয়া। তারপরও 'যিকরের মাজলিসের' শেষে দুআ-মুনাজাত করা আমাদের অভ্যাস। মুমিনের হৃদয়ের চাহিদাও তাই। কিছু সময় মহান প্রতিপালকের স্মরণে কাটিয়ে শেষে নিজের মনের কিছু আবেগ, অনুভূতি, ব্যাথা-বেদনা ও চাওয়া-পাওয়া মহান মালিকের মহান দরবারে পেশ করতে চান মুমিন। এছাড়া যিকরের মাজলিসে কিছু সময় অবস্থানের কারণে মুমিনের হৃদয় বিনম্র হয় এবং দুআর পরিবেশ তৈরি হয়। সর্বোপরি সুন্নাতের আলোকে আমরা জানি যে, বিভিন্ন নেক আমলের পরে দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এভাবে আমরা ঈমানী চেতনা, হৃদয়ের আবেগ ও সুন্নাতের আলোকে যিকরের

Contents

মাজলিসের শেষে দুআ বা আখিরি মুনাজাতের যৌক্তিকতা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি এ সকল "দলীল" ও "যুক্তি"-র ভিত্তিতে আমাদের ইচ্ছামত "আখিরি মুনাজাত" নামক ইবাদতটি পালন করব, না "ইবাদতের গুরুত্ব" বিষয়ে "দলীল" খুঁজার পাশাপাশি "ইবাদতের পদ্ধতি" বিষয়েও দলীল ও সুন্নাত অনুসন্ধান করব?

সুন্নাত অনুসন্ধান করে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাজলিসের শেষে দু প্রকারের দুআ করতে শিক্ষা দিয়েছেন। প্রথম প্রকার মাজলিসের কাফ্ফারা যা মাজলিসে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি মাজলিসের শেষে নিজে নিজে বলবেন।

যিকর নং ২৪৯: আখিরী দুআ ও মাজলিসের কাফ্ফারা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ: সুব্'হা-নাকাল্ লা-হুম্মা ওয়া বি'হামদিকা, আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা, আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা"

অর্থ: "মহাপবিত্রতা আপনার, হে আল্লাহ, এবং আপনারই প্রশংসা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি।"

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা), আবূ বারযা আসলামী (রা), আবূ হুরাইরা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে পৃথক সহীহ সনদে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাজলিসের শেষে মাজলিস থেকে উঠার আগে এ কথাগুলি বলতেন। তিনি বলেছেন, কোনো মাজলিস বা বৈঠক থেকে উঠার সময় যদি কেউ এ কথাগুলো বলে তবে তা মাজলিসের কাফ্ফারা হবে, এর কারণে মহান আল্লাহ তার মাজলিসের অন্যায় কথাবার্তা ও পাপগুলো ক্ষমা করবেন।[১] হাদীসটি সহীহ।

দ্বিতীয় প্রকার দুআ মাজলিসের শেষে সকলের সাথে একত্রে দুআ:

যিকর নং ২৫০: মাজলিসের আখিরী দুআ

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাক্বসিম্ লানা- মিন্ 'খাশ্ইয়াতিকা মা- ইয়া'হূলু বাইনানা- ওয়া বাইনা মা'আ-স্বীকা, ওয়া মিন্ ত্বা-'আতিকা মা- তুবাল্লি'গুনা- বিহী জান্নাতাকা, ওয়া মিনাল ইয়াক্বীনি মা- তুহাওয়িনু বিহী 'আলাইনা মুস্বীবা-তিদ্ দুন্ইয়া। ওয়ামাত্তি'অ্না বিআস্মা-য়িনা- ওয়াআব্স্বারিনা- ওয়াক্বুওয়াতিনা- মা- আ'হ্ইয়াইতানা-, ওয়াজ্'আল্হুল ওয়া-রিসা মিন্না-, ওয়াজ্'আল সা'অ্রানা 'আলা- মান্ যোয়ালামানা- ওয়ান্স্বুর্না- 'আলা- মান্ 'আ-দা-না-, ওয়ালা- তাজ্'আল্ মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা ওয়ালা- তাজ্'আলিদ্ দুন্ইয়া আকবারা হাম্মিনা- ওয়ালা- মাব্লা'গা 'ইলমিনা ওয়ালা- তুসাল্লিত্ব 'আলাইনা- মান্ লা ইয়ার্'হামুনা-।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে আপনার ভয় করার তাওফীক দিন যে ভয় আমাদেরকে আপনার অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করবে। এবং আপনি আমাদেরকে আপনার আনুগত্য করার তাওফীক প্রদান করুন, যে আনুগত্যের দ্বারা আপনি আমাদেরকে আপনার জান্নাতে পৌঁছাবেন। এবং আপনি আমাদেরকে দৃঢ়বিশ্বাস প্রদান করুন, যে বিশ্বাস আমাদের জন্য দুনিয়ার বিপদ-আপদকে সহজ করে দেবে। আপনি আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও দেহের শক্তিকে আমাদের জন্য মরণ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখুন এবং এগুলোকে বহাল রেখে আমাদের মৃত্যু দান করুন। যারা আমাদের জুলুম করেছে তাদের উপর আমাদের প্রতিশোধ অর্পণ করুন এবং যারা আমাদের শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের দীনকে বিপদযুক্ত করবেন না, দুনিয়াকে আমাদের চিন্তাভাবনার মূল বিষয় বানাবেন না এবং আমাদের জ্ঞানকে দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। আমাদের প্রতি মমতাবিহীন কাউকে আমাদের উপর ক্ষমতাবান করবেন না।

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বলেন,

قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মাজলিস থেকে উঠার আগে এ কথা বলে তাঁর সাথীদের জন্য দুআ না করে খুব কমই মাজলিস ত্যাগ করতেন।" হাদীসটি হাসান।[২]

অন্য বর্ণনায় তাবিয়ী নাফি বলেন,

كان ابنُ عمر ﷺ إذا جلس مجلسا لم يَقُمْ حتى يدعوَ بهنَّ لِجُلَسَائِه...

"আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) কোনো মাজলিসে বসলে মাসলিসে বসা মানুষদের জন্য এ কথাগুলো বলে দুআ না করে দাঁড়াতেন না।[৩]

লক্ষণীয় যে, এ দুআ করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর মাজলিসের সাহাবীগণ, আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) বা তাঁর মাজলিসের

মানুষেরা তাঁদের হাত উঠিয়ে দুআ করতেন বলে বর্ণিত হয় নি। আমরা দেখেছি যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত বর্ণনায় অত্যন্ত আগ্রহী ও সচেষ্ট থাকতেন। কখনো দুআর সময় হাত উঠালে তাঁরা তা বর্ণনা করেছেন। এজন্য যেখানে হাত উঠানোর কথা নেই সেখানে উঠান নি বলেই প্রমাণিত হয়। পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে, দুআর সময় হাত উঠানো দুআর একটি আদব। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো একাকী এবং কখনো কখনো সাহাবীদের সাথে হাত তুলে দুআ করেছেন। হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, মাজলিসের শেষে আলোচক মুখে দুআর বাক্যগুলো বলবেন এবং উপস্থিত মানুষেরা আমীন বলবেন। কখনো যদি সকলে হাত তুলে এ কথাগুলো বলে দুআ করেন তবে তা অবৈধ বা বিদআত বলে গণ্য করার সুযোগ নেই। তবে সাধারণ ফযীলতের হাদীসের উপর নির্ভর করে এরূপ দুআর ক্ষেত্রে হাত উঠানো জরুরী বলে গণ্য করা বা হাত না উঠানোকে দুষণীয় বলে মনে করা বিদআত। হাদীসে যেহেতু বিষয়টি উন্মুক্ত সেহেতু বিষয়টিকে উন্মুক্ত রাখতে হবে।

উল্লেখ্য যে, সর্বদা সকল মাজলিসের শেষে দুআ করার প্রচলন সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে ছিল না। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ, ইমাম যুহাইর ইবন হারব আবু খাইসামা নাসায়ী (১৬০-২৩৪ হি) তার কিতাবুল ইলম এবং পঞ্চম হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবূ নুআইম ইসপাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি) কূফার প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবরাহীম নাখয়ী (৯৬ হি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

كانوا يجلسون ويتذاكرون العلم والخير ثم يتفرقون لا يستغفر بعضهم لبعض ولا يقول يا فلان ادع لي

"তাঁরা (সাহাবী-তাবিয়ীগণ) মাজলিসে বসে ইলম চর্চা করতেন এবং নেক বিষয়গুলো যিকর করতেন, এরপর তারা মাজলিস ভেঙ্গে উঠে যেতেন, একে অপরের জন্য দুআ-ইসতিগফার করতেন না এবং "হে অমুক আমার জন্য দুআ করুন"- পরস্পরে এ কথাও বলতেন না।" হাদীসটি সহীহ।[১]

৭. ৬. যিক্রের মাজলিসঃ আমাদের করণীয়

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও সাহচর্য প্রসঙ্গে আমরা সাহচর্য ও মাজলিসের গুরুত্ব আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, এরূপ সাহচর্য ও মাজলিস মূলত নফল পর্যায়ের হলেও ফরয তাকওয়া অর্জনে ও বেলায়াতের পথে তা অত্যন্ত উপকারী। আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক ও জাগতিক কাজকর্ম, সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে আমাদের সংমিশ্রণ, লেনদেন ও কথাবার্তা আমাদের হৃদয় কঠিন করে তোলে। মৃত্যুর চিন্তা, আখিরাতের চিন্তা, তাওবার চিন্তা ইত্যাদি কল্যাণময় অনুভূতি মন থেকে দূরে সরে যায়। নিয়মিত ও সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত যিক্র, দুআ ও ইলম চর্চার পাশাপাশি যিক্রের মাজলিস আমাদের হৃদয়গুলোকে পবিত্র ও আখিরাতমুখী করার জন্য খুবই উপকারী।

হৃদয়ের কাঠিন্য দূর করতে, হৃদয়কে আখিরাতমুখী করতে, মহান আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল ﷺ-এর মহব্বত দিয়ে হৃদয়কে পূর্ণ করতে, আল্লাহর স্মরণে ও তাঁর ভয়ে চোখের পানি দিয়ে হৃদয়কে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে যিক্রের মাজলিস অতীব প্রয়োজনীয়। যিক্রের মাজলিসে একজন শাইখ, পরিচালক বা আলোচক থাকতে পারেন। আবার মাজলিসের প্রত্যেকেই কিছু কিছু আলোচনা করতে পারেন। 'যিক্রের মাজলিসের' ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

৭. ৬. ১. পরিবার দিয়ে শুরু করুন

আমরা দেখেছি, যিকরের মাজলিস পরিবার থেকে শুরু করা জরুরী। পরিবারের সদস্যগণ আপনার জাগতিক আনন্দ ও বেদনার সাথী। পাশাপাশি তাঁদেরকে রূহানী আনন্দ ও বেদনার সাথী বানিয়ে নিন। এতে আপনার পারিবারিক জীবন অনেক বেশি বরকতময় হবে। অনেক সময় পরিবারের দু-একজন সদস্য আল্লাহর পথে চলতে চান কিন্তু অন্যরা বাধা দেন অথবা চলতে চান না। এটি মুমিনের জন্য কষ্টকর। এতে হতাশ না হয়ে পারিবারিক আনন্দ ও গল্প-আড্ডার সাথে যিকরের মাজলিস জড়িয়ে নিন। ক্রমান্বয়ে সকলে আল্লাহর পথের আনন্দময় যাত্রার সহযাত্রী হয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে দায়িত্ব পরিবারের কর্তার, তবে পরিবারের যে সদস্য আল্লাহর পথে যাত্রা শুরু করেছেন তাকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে।

পরিবারের সকল সদস্য একত্রে বসে অন্তত ১০/২০ মিনিট কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত, অর্থ পাঠ ও আলোচনা করুন। সম্ভব হলে এর সাথে 'রিয়াদুস্সালিহীন' জাতীয় গ্রন্থ থেকে একটি হাদীস অর্থসহ পাঠ করুন। শিশু-কিশোরদের অবশ্যই এতে শরীক করবেন। শিশু-কিশোররা যখন অনুভব করে যে, মাত্র ১০/১৫ মিনিটে মাজলিস শেষ হবে তখন তারা তাদের খেলাধুলা বা কার্টুন রেখে মাজলিসে বসতে আপত্তি বোধ করে না। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে বা অন্তত প্রতি মাসে একবার বাড়িতে কোনো আলিমকে এনে যিকরের মাজলিস প্রতিষ্ঠা করবেন। মহল্লা, শহর বা দেশের যে কোনো পর্যায়ের যিকরের মাজলিসে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একত্রে অংশগ্রহণের চেষ্টা করবেন। এছাড়া সুযোগ থাকলে রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, ভিডিও ইত্যাদিতে ইসলামী অনুষ্ঠানগুলো পরিবারের সকলকে নিয়ে একত্রে উপভোগের অভ্যাস করুন।

সম্মানিত পাঠক, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এরূপ মাজলিস প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বা কষ্টকর মনে হতে পারে। কেউ হয়ত কথা শুনবে না বলে মনে হতে পারে। এগুলো সবই শয়তানী ওয়াসওয়াসা। সকল দ্বিধা এড়িয়ে শুরু করুন। দেখবেন তা খুবই সহজ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ইলমী বা দাওয়াতী ব্যস্ততা থেকে সময় কাটছাট করে পরিবারের সাথে এরূপ মাজলিসের জন্য অধিক পরিমাণ সময় নির্ধারণ করুন।

৭. ৬. ২. যিক্রের মাজলিসের সাথী

(ক). পারিবারিক মাজলিসের ক্ষেত্রে সাথী বাছাইয়ের সুযোগ নেই। অন্যান্য সকল পর্যায়ে সাথী বাছাই করতে হবে। যাঁদের মধ্যে ইল্‌ম ও আমলের সমন্বয় আছে, যাঁদেরকে দেখলে ও যাঁদের কাছে বসলে আল্লাহর পথে চলার, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পথে চলার এবং তাঁর সুন্নাত অনুসরণের প্রেরণা পাওয়া যায় তাদেরকে সাথী হিসেবে গ্রহণ করুন।

(খ). সাথী নির্বাচনে সুন্নাতের দিকে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। পূর্ববর্তী সকল বুজুর্গই 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বা সুন্নাত প্রেমিক মানুষদের সাহচর্য গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে সকলেই 'আহলুস সুন্নাত' বা 'সুন্নী' বলে দাবি করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপরে রয়েছি, তার উপরে যারা থাকবে তারাই' মুক্তিপ্রাপ্ত দল। কাজেই যারা প্রতিটি কর্মেই সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবা অনুসরণের চেষ্টা করেন এবং যাঁরা নিজেদের পছন্দ অপছন্দকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অধীন করে দিয়েছেন তাঁদেরকে শাইখ বা সাথী হিসাবে নির্বাচিত করুন।

(গ) অসতর্কতা, ইজতিহাদ, আলসেমি বা না জানার কারণে সুন্নাতের খেলাফ কর্ম করা খুবই স্বাভাবিক। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল নেককার মানুষের মধ্যেই খেলাফে সুন্নাত কিছু বিষয় বিদ্যমান। তবে সুন্নাতকে অপছন্দ করা বা খেলাফে সুন্নাতকে সুন্নাতের চেয়ে অধিক মহব্বত করা কঠিন বিষয়। যারা বিভিন্ন অজুহাতে ও যুক্তিতে সুন্নাতে রাসূল (ﷺ) ও সুন্নাতে সাহাবার ব্যতিক্রম কর্ম করতে পছন্দ করেন, বিদআতকে বহাল রাখতে আগ্রহী বা সুন্নাতের চেয়ে বিদ'আতে হাসানাকে বেশি মহব্বত করেন তাঁরা নিজেদেরকে 'আহলুস সুন্নাত' বলে দাবি করলেও তাদের কর্ম তাদের দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর উম্মাতের মধ্যে এরূপ মানুষ আসবে, যারা মুখে যা দাবি করবে কর্মে তা করবে না, আর এমন কর্ম করবে যে কর্ম করতে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় নি। এদের বিরোধিতা করতে ও বিচ্ছিন্ন থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।[১] এরূপ বিদআত-প্রেমিক মুমিনের কর্ম সুস্পষ্ট শিরক বা কুফর না হলে তাকে ঈমানের জন্য ভালবাসুন এবং তাঁর হেদায়াত ও নাজাতের জন্য প্রাণখুলে দুআ করুন। তবে তার সাহচর্য বর্জন করুন।

(ঘ). সাথী নির্বাচনে আর্থ বা সামাজিক মর্যাদার কোনোরূপ বিবেচনা করবেন না। বিশেষত আপনার মসজিদে, মহল্লায় বা শহরে যে সকল দরিদ্র, শ্রমিক বা সামাজিকভাবে অবহেলিত মানুষ নিয়মিত জামাতে সালাত আদায় করেন ও তাকওয়ার পথে চলেন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন, সাক্ষাৎ করুন, হাদিয়া প্রদান করুন এবং তাদেরকে যিকরের মাজলিসের সাথী বানান।

(ঙ) সাথীদের সকলের বা কয়েকজনের সাথে মসজিদে অথবা অন্য কোথাও প্রতিদিন কিছু সময়, তা নাহলে অন্তত সপ্তাহে কিছু সময় যিকরের মাজলিসে বসুন। এছাড়া প্রতি মাসে বা অনিয়মিতভাবে কোনো সুন্নাত-অনুসারী আলিম বা বুজুর্গের মাজলিসে কিছু সময় কাটান।

৭. ৬. ৩. দলাদলির চোরাবালিতে যিক্‌রের মাজলিস

ধার্মিক মুসলিমগণ সাধারণভাবে কোনো না কোনো ব্যক্তি বা দলের মাধ্যমেই ধার্মিকতার দিক নির্দেশনা পেয়েছেন। এজন্য কোনো ব্যক্তি বা দলের প্রতি অধিক মহব্বত থাকা স্বাভাবিক। তবে ব্যক্তি বা দলকে দীন বানাবেন না।

শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর বেলায়াত চান; তবে শিরকের চোরাবালিতে আটকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেন না। তার হৃদয় 'গাইরুল্লাহ', অর্থাৎ যাকে আল্লাহর 'মাধ্যম' বা কারামতের মালিক মনে করেন তার কাছেই আবর্তিত হয়। তাঁর নেক-নযর অনুভব করেন, বিপদে তাঁকেই ডাকেন, নিয়ামত পেলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন। বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করতে চান; কিন্তু বিদআতের চোরাবালিতে পড়ে তাঁর কাছে যেতে পারেন না। সকল ইবাদতে তাঁর মনে পড়ে 'গাইরুন্নবী' অর্থাৎ যাকে বা যাদেরকে তিনি মুরশিদ বা ইবাদতের পূর্ণাজ্ঞ ও নির্ভুল আদর্শ মনে করেন- তাঁর বা তাঁদেরই কথা। তাঁরা যে সকল সুন্নাত গ্রহণ করেছেন সেগুলোই তিনি গ্রহণ করেন; এর বাইরের সুন্নাতগুলো গ্রহণ করতে তার অন্তর সায় দেয় না। মুরশিদের কারণে বিভিন্ন অজুহাতে বিশুদ্ধ সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবী পরিত্যাগ তার জন্য সহজ; কিন্তু সুন্নাতের অজুহাতে মুরশিদ বা মুরব্বীগণের তরিকা তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন না।

সম্মানিত পাঠক, একইভাবে দলাদলিতে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসতে ও যিকরের মাজলিস করতে চান। তবে দলাদলির চোরাবালিতে পড়ে যান। তিনি ব্যক্তি বা দলকে ভালবাসা ও সাহচর্যের মাপকাঠি বানান। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ আর তাঁর হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থানে থাকেন না। ব্যক্তি বা দলের প্রভাবে বিভিন্ন অজুহাতে তিনি ছোট পাপ বা পুণ্যকে বড়, বড় পাপ বা পুণ্যকে ছোট এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে জরুরী বলে দাবি করেন।

এজন্য আপনার দল, ফিকহী মত বা পীরের প্রতি মহব্বত-সহ অন্য দল ও মতের অনুসারী কুরআন ও সুন্নাহর মাপকাঠিতে বাহ্যিকভাবে মুত্তাকী মানুষদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাছাই করে তাঁদের সাথে বন্ধুত্ব করুন, সাক্ষাৎ করুন এবং মাঝে মাঝে তাদের সাথে যিকরের মাজলিসে উপস্থিত হোন। না হলে নিজের অজান্তেই 'দীনকে দলেদলে বিভক্ত করার' মহাপাপে নিপতিত হয়ে যাবেন।

৭. ৬. ৪. কুরআনী মাজলিসে করণীয়

যিকরের মাজলিসের অন্যতম মাসনূন যিকর কুরআন। অনেকে অর্ধ শতাব্দী যিকরের মাহফিল করছেন, কিন্তু বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারেন না এবং কুরআনের অর্থও বুঝেন না। এ বিষয়ে সচেতন হওয়া খুবই জরুরী। সকল যিকরের মাজলিসে কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ও অর্থ শিক্ষার জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করতে হবে। শুধু কুরআন শিক্ষার জন্য কিছু মাজলিস করা যায়। প্রতিদিন ফজর, ইশা বা অন্য কোনো সালাতের পরে মসজিদে অথবা অন্য কোনো স্থানে এরূপ মাজলিস করুন। কিছু সময় বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের অনুশীলন করুন। এরপর অর্থ অধ্যয়ন করুন। ইমাম বা অন্য কেউ কুরআনের কোনো নির্ভরযোগ্য অনুবাদ বা তাফসীর পাঠ করে 'তাদারুস'-এর সুন্নাত আদায় করা যায়। এছাড়া মাজলিসের প্রত্যেকে কিছু তিলাওয়াত, তরজমা ও আলোচনা করতে পারেন।

৭. ৬. ৫. ওয়ায ও ইলমী মাজলিসে করণীয়

আমরা দেখেছি যে, যিকরের মাজলিস মূলত ঈমান, ইলম ও তাকওয়া বৃদ্ধিকারক ওয়ায ও আলোচনার মাজলিস। ওয়ায-আলোচনা করা ও শোনাই মাজলিসের মুল যিকর। এর সাথে সাথে মুমিনগণ তাসবীহ, তাহলীল, ইসতিগফার, দুআ, দরুদ ইত্যাদি যিকর পালন করেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার যে, এ সকল মাজলিসের আলোচনা যেন মহান আল্লাহর দিকে প্রেরণাদায়ক, আখিরাতমুখী, নিজেদের গোনাহ ও অপরাধের স্মারক ও ক্রন্দন উদ্দীপক হয়। বিতর্ক, উপস্থিত বা অনুপস্থিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমালোচনা, অহঙ্কার, বিদ্বেষ ইত্যাদি কেন্দ্রিক সকল আলোচনা পরিহার করা প্রয়োজন।

সকল আলোচনা কুরআন কারীম ও শুধুমাত্র সহীহ হাদীস কেন্দ্রিক হতে হবে। মিথ্যা, বানোয়াট, অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা, গল্প, কাহিনী ইত্যাদি সতর্কতার সাথে পরিহার করতে হবে। এছাড়া আলোচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ কেন্দ্রিক হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের জীবনী আলোচনা না করে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সীরাত, সাহাবীগণের জীবনী, তাঁদের বুজুর্গী, কারামত, তাকওয়া, বেলায়াত ইত্যাদি আলোচনা করা উচিত। এতে দুটি উপকার হয়।

প্রথমত: আমাদের অন্তরগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মহব্বত বেশি বেশি অর্জন করতে থাকে। আর তাঁদের মহব্বতই ঈমান ও কামালাত।

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে তাঁর সাহাবীগণ আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ। পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের কাহিনী আলোচনা করলে অনেক সময় ভুল বুঝার অবকাশ থাকে। এ সব যুগের অনেক বুজুর্গ তাঁদের বুজুর্গী সত্ত্বেও বিভিন্ন সুন্নাত বিরোধী কর্ম করেছেন। কেউ সামা কাওয়ালী করেছেন, কেউ খেলাফে সুন্নাতভাবে নির্জনবাস করেছেন। কেউ খেলাফে সুন্নাত বিভিন্ন আবেগী কথা বিভিন্ন হালতে বলেছেন। এ সব কথা সাধারণ শ্রোতা বুঝতে নাও পারেন। এছাড়া সাহাবীগণ সম্পর্কিত বর্ণাগুলোর সহীহ, যয়ীফ বা জাল সনদ বিদ্যমান এবং সনদের কারণে যাচাই-বাছাই সম্ভব। পক্ষান্তরে পরবর্তী বুজুর্গগণ বিষয়ক বর্ণনাগুলোর সাধারণত কোনো সনদ নেই। এজন্য বুজুর্গদের নামে প্রচারিত কাহিনীগুলোর মধ্যে জালিয়াতি ব্যাপক, কিন্তু যাচাইয়ের সুযোগ নেই।

৭. ৬. ৬. রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জীবন কেন্দ্রিক যিক্‌র

যিক্‌রের মাজলিসের অন্যতম একটি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত, শামায়েল ও তাঁর জীবন ও কর্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়। আমরা দেখেছি, সাহাবীগণের মাজলিসের অন্যতম যিকর ছিল ঈমান বৃদ্ধিকারক ও আল্লাহর নিয়ামত সংক্রান্ত আলোচনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন্দ্রিক যে কোনো আলোচনা তাঁর প্রতি আমাদের মহব্বত বৃদ্ধি করবে, যা আমাদের ঈমানের অন্যতম অংশ। এছাড়া আমাদের জীবনে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত তাঁর মহান নবীর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য। এগুলো সর্বদা আলোচনা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

সাহাবী-তাবেয়ীগণের জীবনের অধিকাংশ মাজলিসই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন্দ্রিক। বিভিন্ন কাজে তাঁর সুন্নাত, তাঁর রীতি, তাঁর কর্ম, তাঁর জীবনী, তাঁর বাণী, তাঁর শিক্ষা, তাঁর মুবারাক আকৃতি, তাঁর উঠা-বসা, শোওয়া, তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ, তাঁর জন্ম, তাঁর ওফাত, তাঁর পরিবার পরিজন ইত্যাদি তাঁদের সকল মাজলিসের অন্যতম বিষয় ছিল। এগুলো আলোচনা করতে তাঁরা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছেন, আবেগ ও মহব্বতে হৃদয়কে পূর্ণ করেছেন। আমাদের যিক্‌রের মাহফিলের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হবে এগুলো। এ সকল আলোচনার সময় স্বভাবতই বারবার তাঁর উপর প্রত্যেক যাকির নিজের মত মহব্বত ও আবেগসহ সালাত ও সালাম পাঠ করবেন। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, সালাত-সালাম যিক্‌রের মাহফিলের অন্যতম যিক্‌র।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে এ ধরনের যিক্‌রের মাহফিল সাধারণভাবে মীলাদ মাহফিল নামে পরিচিত। মীলাদ মাহফিলের উদ্ভাবন ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমি **"এহ্ইয়াউস সুনান"** গ্রন্থে বিস্তারিত লেখার চেষ্টা করেছি। আমরা দেখেছি, মীলাদ অনুষ্ঠানে অনেকগুলি মাসনূন ইবাদত পালন করা হয়, যেমনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেলাদাত, ওফাত, জীবনী, কর্ম ইত্যাদি আলোচনা, সালাত, সালাম, তাঁর প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি ইত্যাদি। অপরদিকে এগুলি পালনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে আমরা কিছু খেলাফে সুন্নাত কাজ করিঃ

প্রথমত: রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে এবং পরবর্তী যুগে সাহাবী-তাবেয়ীগণ এসকল ইবাদতকে 'যিক্‌রের মাহফিল', 'সুন্নাতের মাহফীল', 'হাদীসের মাজলিস', 'সীরাতের মাজলিস' ইত্যাদি নামে করতেন। "মীলাদ" নামে কোনো মাহাফিল বা অনুষ্ঠান উদযাপন তাঁদের মধ্যে ছিল না। নাম বা পরিভাষার চেয়ে বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবুও নাম ও পরিভাষার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মধ্যে প্রচলিত নাম ও পরিভাষা ব্যবহার উত্তম। বাধ্য না হলে কেন আমরা তাঁদের রীতি, নীতি বা সুন্নাতের বাইরে যাব?

দ্বিতীয়ত: শুধু মীলাদ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম আলোচনা ও উদ্‌যাপনের জন্য মাজলিস করা, সালাত বা সালাম পাঠের জন্য উঠে দাঁড়ানো, সমস্বরে ঐক্যতানে সালাত বা সালাম পাঠ করা ইত্যাদি সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সুন্নাতে সাহাবার খেলাফ। এ প্রকারের যিক্‌রের মাজলিসে আলোচক সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করে আদব ও মহব্বতের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক আকৃতি, কর্ম ও জীবনীর বিভিন্ন দিক, তাঁর প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহর মহান নিয়ামতের আলোচনা করবেন। আলোচনার মধ্যে তিনি এবং যাকিরগণ যিক্‌রের সকল আদবসহ পরিপূর্ণ মহব্বত, ভয়, ভক্তি ও বিনয়ের সাথে অনুচ্চস্বরে প্রত্যেকে নিজের মতো করে সালাত ও সালাম পাঠ করতে হবে। আর এ-ই 'মীলাদ'-এর সুন্নাত সম্মত রূপ।

তৃতীয়ত: খেলাফে-সুন্নাত পদ্ধতির সবচেয়ে মারাত্মক দিক দলাদলি ও হানাহানি। বস্তুত মুসলিম উম্মাহর সকল দলাদলি-হানাহানির অন্যতম কারণ মাসনূন ইবাদতের জন্য 'খেলাফে সুন্নাত' পদ্ধতির উদ্ভাবন। সাহাবীগণের যুগ থেকে প্রায় ৬০০ বছর মুসলিম উম্মাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম, জীবনী, শিক্ষা, মহব্বত ইত্যাদি আলোচনা করেছেন এবং সালাত-সালাম পাঠ করেছেন। কখনোই এ বিষয়ে মতভেদ ঘটেনি। কারণ বিষয়টি উন্মুক্ত ছিল, প্রত্যেকেই তাঁর সুবিধামত তা পালন করেছেন। যখনই এ সকল ইবাদত পালনের জন্য 'মীলাদ' নামক পদ্ধতির

উদ্ভাবন ঘটল তখনই মতভেদ শুরু হলো। এরপর প্রায় ৪০০ বছর পরে যখন 'কিয়াম'-এর উদ্ভাবন ঘটল তখন আবার 'মীলাদ'-এর পক্ষের মানুষদের মধ্যে নতুন করে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা শুরু হলো। ক্রমান্বয়ে 'পদ্ধতি'ই ইবাদতে পরিণত হলো। এখন যদি কেউ সারাদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম, জীবনী, মুজিযা, মহব্বত ইত্যাদি আলোচনা করেন এবং সালাত-সালাম পাঠ করেন, কিন্তু মীলাদের পদ্ধতিতে কিয়াম না করেন, তবে মীলাদ-কিয়ামের পক্ষের মানুষেরা তাকে পছন্দ করবেন না। এ পর্যায় থেকে আমাদের অবশ্যই আত্মরক্ষা করতে হবে।

৭. ৬. ৭. যিক্রের মাজলিসের বিদ'আত ও পাপ

যিক্রের মাজলিসের প্রকার, প্রকৃতি, পদ্ধতি, বাক্য, শব্দ সবকিছু সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সুন্নাতের ব্যতিক্রম সকল কর্ম সযত্নে বর্জন করতে হবে। আমাদের দেশে 'যিক্রের মাহফিল' বা 'হালকায়ে যিকর' নামের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান খেলাফে সুন্নাত কর্মের মধ্যে রয়েছেঃ সমবেতভাবে ঐক্যতানে যিক্র, উচ্চৈঃস্বরে যিক্র, বিশেষ পদ্ধতিতে শব্দ করে যিক্র, যিক্রের নিয়্যাত, 'ইল্লাল্লাহ' বা 'আল্লাহ-আল্লাহ' যিক্র, 'ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন' ইত্যাদি বাক্যের যিক্র, গজল গেয়ে যিকর, গানের তালে যিক্র, শরীর দুলিয়ে, হেলেদুলে, লাফালাফি বা নাচানাচি করে যিক্র ইত্যাদি অগণিত খেলাফে সুন্নাত, বিদ'আত বা শিরকমূলক শব্দ, বাক্য ও পদ্ধতি আমাদের দেশে "যিক্র" নামে পরিচিত।

আমারা যিক্র বলতে এসকল খেলাফে সুন্নাত বা বিদ'আত কর্মগুলোই বুঝি। যে যত বেশি খেলাফে সুন্নাত বা বিদ'আতভাবে যিক্র করছে সে ততবড় যাকির ও তত বেশি মারেফাতের অধিকারী। আর যে সুন্নাত অনুসারে সাহাবীগণের মতো যিক্র করছে সে 'ওহাবী' অথবা নীরস আলিম; কোনো মারেফাত তার নেই। যত মারেফাতের উৎস মনে হয় বিদ'আত। তাঁদের দাবি অনুসারে মনে হয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণের কোনো মারেফাতই ছিল না! বিদ'আত উদ্ভাবনের পরেই মারেফাতের শুভ সূচনা এবং বিদ'আতেই সকল মারিফাত! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন !!

মুহতারাম পাঠক, এ সকল বড় বড় ফাঁকা বুলিতে ধোঁকাগ্রস্ত হবেন না। আমরা দেখেছি যে, 'ইত্তেবায়ে সুন্নাত' বা সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া কোনো ইবাদত, বেলায়েত বা মারিফাত হয় না। সুন্নাতের বাইরে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নেই, তা যতই চকচক করুক বা চমকদার হোক।

যিক্র সংক্রান্ত খেলাফে সুন্নাত কর্ম দু প্রকারেরঃ যিক্রের শব্দের মধ্যে উদ্ভাবন ও যিক্রের পদ্ধতিতে উদ্ভাবন। পদ্ধতিগত খেলাফে সুন্নাত কর্মের মধ্যে রয়েছে – বিশেষ পদ্ধতিতে বসে, মাথা বা শরীর ঝাঁকিয়ে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে যিক্রের শব্দ দ্বারা ধাক্কা বা আঘাতের কল্পনা করে, বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চারণ করে, গান বা গজলের তালে তালে, সমস্বরে ঐক্যতানে, উচ্চৈঃস্বরে, চিৎকার করে, লাফালাফি করে বা নেচে নেচে যিক্র করা।

এগুলো সবই খেলাফে সুন্নাত। কেউ কোনোভাবে একটি হাদীসও খুঁজে পাবেন না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা তাঁর সাহাবীগণ এভাবে যিক্র করেছেন। বিভিন্ন সাধারণ যুক্তি ও বিশেষভাবে মনোযোগ সৃষ্টির যুক্তিতে এগুলো করা হয়। আমরা ইতোপূর্বে এ সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, শিক্ষা, অনুশীলন বা মনোযোগের জন্য কোনো জায়েয পদ্ধতি ব্যক্তিগতভাবে কিছু সময়, প্রয়োজনমতো বা মাঝে মাঝে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এগুলোকে নিয়মিত রীতিতে পরিণত করলে বা ইবাদতের অংশ হিসেবে গ্রহণ করলে তা সুন্নাতের বিপরীতে বিদ'আতে পরিণত হয় এবং এর ফলে মূল সুন্নাত পদ্ধতি 'মৃত্যুবরণ করে' বা সমাজ থেকে উঠে যায়।

পদ্ধতিগত খেলাফে সুন্নাতের চেয়েও মারাত্মক শব্দগত খেলাফে সুন্নাত যিক্র। একজন যাকির মাসনূন শব্দে যিক্র করতে করতে আবেগে হয়ত মাথা নাড়াতে পারে বা যিক্রের আবেগ তার নড়াচড়ায় প্রকাশ পেতে পারে। ব্যক্তিগত ও সাময়িকভাবে তা অনেক সময় জায়েয, যদিও সুন্নাত নয়। কিন্তু একজন মুমিন কেন এমন শব্দ ব্যবহার করে যিক্র করবেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যবহার করেননি? এ ক্ষেত্রে ওযর খুঁজে বের করা আরো কষ্টকর। কী প্রয়োজন আমার বিভিন্ন যুক্তি ও 'অকাট্য দলিল' দিয়ে কষ্ট করে এমন একটি যিক্র পালন করা এবং প্রচলন করা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি এবং যা করলে কী পরিমাণ সাওয়াব হবে তা আমাদের মোটেও জানা নেই?

৭. ৭. কারামত, হালাত ও ওলীগণ

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আপনি যে সকল কাজকে বিদ'আত বা খেলাফে সুন্নাত বলছেন যুগযুগ ধরে আল্লাহর ওলীগণ তো সে কাজই করে আসছেন। এ সকল কাজের মাধ্যমেই তারা বেলায়াত, কারামত, হালাত ও ফয়েযের উচ্চমার্গে আরোহণ করেছেন। এখনো দেশে দেশে এ সকল কর্মের মাধ্যমে অগণিত মানুষ বেলায়াত, কারামত, হালাত, ফয়েয ইত্যাদি লাভ করছেন। আপনার কথা ঠিক হলে তা কিভাবে সম্ভব হলো? এগুলো কি প্রমাণ করে না যে, আপনার কথা ভুল? নিম্নের বিষয়গুলো এ প্রশ্নের উত্তর জানতে সাহায্য করবেঃ

৭. ৭. ১. সুন্নাতের পক্ষে সকল বুজুর্গ একমত

যুগ যুগ ধরে আল্লাহর ওলীগণ কখনোই এ সকল সুন্নাত বিরোধী কাজ করেন নি। সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগের আবিদ, যাকির ও সূফী-দরবেশগণের জীবনের কর্ম, যিক্র ও যিক্রের মাজলিসের পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, বেলায়াত ও তাযকিয়ার পথে তাঁদের কর্মগুলি ছিল একান্তই মাসনূন কর্ম। এ গ্রন্থে যা কিছু লিখা হয়েছে তা তাঁদের জীবনী ও কর্মের আলোকেই লিখা হয়েছে। ৫ম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও সূফী আল্লামা আবু নু'আইম ইসপাহানী (৪৩০ হি) "হিলয়্যাতুল আউলিয়া" গ্রন্থে সাহাবীগণের যুগ থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সূফী, দরবেশ, বুজুর্গ ও যাহিদগণের জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের যিক্র ও যিক্রের মাজলিসের আলোচনা করেছেন। এ সকল আলোচনায় আমরা দেখছি যে, তাঁদের যিক্রের মাজলিস ছিল ঈমান বৃদ্ধিকারক, দুনিয়ার মোহ, লোভ, লালসা, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত-করা বিষয়ক ও হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয়, তাওবা ও ইস্তি

গফারের প্রেরণা-দানকারী আলোচনা ও আলোচনার সাথে ইসতিগফার, ক্রন্দন ইত্যাদি। পাঠককে অনুরোধ করছি "হিলয়্যাতুল আউলিয়া", "সিফাতুস সাফওয়া", "সিয়ারু আ'লামিন নুবালা" ইত্যাদি প্রথম যুগের ও নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থে তাঁদের জীবনী পাঠ করতে।

বস্তুত, আল্লাহর ওলীগণের নামে অগণিত মিথ্যা কথা সমাজে প্রচলিত। মুহাদ্দিসগণের অতন্দ্র প্রহরা ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় কঠিন শাস্তি সত্ত্বেও হাদীসের নামে অগণিত মিথ্যা ও জাল কথা প্রচার করেছে জালিয়াতগণ। ওলীদের নামে জাল কথা প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো প্রহরা বা শাস্তির ব্যবস্থাই ছিল না। একারণে জালিয়াতগণ এ ক্ষেত্রে বেশি সফল হয়েছে। আমি 'হাদীসের নামে জালিয়াতি' গ্রন্থে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী, মুঈনুদ্দীন চিশতী, নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রাহ) প্রমুখ বুজুর্গের নামে লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে এমন সব তথ্য বিদ্যমান যা নিশ্চিত করে যে, তাঁদের যুগের পরে জালিয়াতগণ তাঁদের নামে এ সকল পুস্তক রচনা করেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের রচিত পুস্তকাদির মধ্যে অনেক মিথ্যা কথা ঢুকিয়েছে।

এর পরেও আমরা এ সকল বুজুর্গের লেখা পুস্তকাদির মধ্যে মাসনূন ইবাদত ও যিক্‌রের কথাই দেখতে পাই। শাইখ আব্দুল কাদির জীলানীর (রাহ) গুনিয়াতুত তালিবীন ও অন্যান্য গ্রন্থ, শাইখ মুঈনুদ্দীন চিশতীর (রাহ) আনিসুল আরওয়াহ, মুজাদ্দিদে আলফে সানীর (রাহ) মাকতুবাত ও অন্যান্য গ্রন্থ, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর (রাহ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার 'ইহসান ও তাসাউফ' অংশ, তাঁর রচিত কাশফুল খাফা গ্রন্থের উমার (রা)-এর তরীকা ও তাসাউফ বিষয়ক অংশ, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর (রাহ) "সেরাতে মুস্ত াকিম' গ্রন্থ ইত্যাদি পাঠ করতে পাঠককে অনুরোধ করছি। 'রাহে বেলায়াত'-এ পাঠক যা কিছু দেখেছেন উপরের গ্রন্থগুলোতেও প্রায় তাই দেখতে পাবেন।

৭. ৭. ২. নিয়মিত ইবাদত বনাম সাময়িক অনুশীলন

আমরা দেখেছি যে, খেলাফে সুন্নাত সকল কর্মই বিদ'আত বলে গণ্য হয় না। বরং খেলাফে সুন্নাত কর্মকে দীনের অংশ মনে করলে, সাওয়াবের মূল উৎস মনে করলে বা সুন্নাতের মত রীতিতে পরিণত করলে তা বিদ'আতে পরিণত হয়। জায়েয বিষয় কিভাবে বিদ'আতে পরিণত হতে পারে তার একটি উদাহারণ এ বই থেকেই প্রদান করছি। সকাল সন্ধ্যার যিক্‌র আলোচনার সময়ে আমি অনেক প্রকারের যিক্‌র উল্লেখ করেছি। এগুলো সবই মাসনূন যিক্‌র। এগুলোকে লিখার জন্য স্বভাবতই আমাকে একটির পরে একটি লিখতে হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে সাজাতে হয়েছে। এ ক্রমানুসারে সাজানোটা সুন্নাত নয়, আমার নিজের তৈরি। সুন্নাত এসব যিক্‌রগুলো পালন করা। যিক্‌র পালন করতে গেলে অবশ্যই একটি ক্রম প্রয়োজন। একটির পর একটি তো করতে হবে। সাজানোর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। যাকির নিজের সুবিধামতো যিক্‌রগুলি সাজিয়ে নেবেন। আমার ক্রমটিও এ প্রকারের। এ সাজানো নিঃসন্দেহে জায়েয ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি কোনো যাকির সুন্নাতের নির্দেশনা ছাড়া মনে করেন যে, এ যিক্‌রটি আগে ও এ যিক্‌রটি পরে দিতেই হবে, বা এ নির্দিষ্ট ক্রমান্বয় মেনে চলাটা একটি ইবাদত, বা এ নিয়মের মধ্যে বিশেষ সাওয়াব আছে তাহলে তা বিদ'আতে পরিণত হবে।

যিক্‌র বিষয়ক অধিকাংশ বিদ'আত এরূপ ভুল ধারণা থেকে এসেছে। পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন আলিম ও নেককার মানুষ তাঁদের ছাত্র বা মুরীদকে সুন্নাতের আলোকে কিছু যিক্‌র বেছে দিয়েছেন, সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ক্বলবের অমনোযোগিতা বা আলসেমী দূর করতে বা মনোযোগ অর্জনের জন্য কিছু সাময়িক নিয়মকানুন বলে দিয়েছেন। যেমন, কাউকে জোরে যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাউকে নির্জনবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যিক্‌র করার নিয়ম করেছেন। কেউ নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে বসে পায়ের নির্দিষ্ট রগ চেপে ধরে অথবা দেহের নির্দিষ্ট স্থানে আঘাতের কল্পনা করে যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো সবই ছিল সাময়িক ও বিশেষ পরিস্থিতির আলোকে তাদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ মাত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই সেগুলো দীনের অংশ মনে করেছেন। কেউ ভেবেছেন, এভাবে বসা বা এভাবে যিক্‌র করা একটি বিশেষ ইবাদত। এভাবে না বসলে বা এভাবে যিক্‌র না করলে সাওয়াব বা বরকত কম হবে। কেউ ভেবেছেন, এ পদ্ধতিতে না হলে আজীবন মাসনূন যিক্‌র করলেও বেলায়াত বা তাযকিয়া অর্জন হবে না। এভাবে তাঁরা বিদআতের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

৭. ৭. ৩. ক্রমান্বয় অবনতি ও সংশোধন

বুজুর্গদের শেখানো ইবাদত ও রিয়াযতের পদ্ধতিও তাঁদের মৃত্যুর পরে অনুসারীদের হাতে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। মুজাদ্দিদ আলফ সানী (৯৭১-১০৩৪হি)-র মাকতূবাত শরীফ থেকে বিষয়টি ভালভাবে অনুভব করা যায়। তাঁর ২০০ বছর পূর্বে বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (৭৯১ হি) নকশবন্দীয়া তরীকার উদ্ভাবন করেন। এ ২০০ বছরের মধ্যে নকশবন্দীয়া তরীকার মধ্যে অনেক বিদ'আত প্রবেশ করে বলে তিনি তাঁর মাকতূবাতের বিভিন্ন পত্রে আফসোস করেছেন।

আমাদের সমাজের দিকে তাকালেও আমরা তা বুঝতে পারব। কাদিরীয়া, চিশতীয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া ইত্যাদি তরীকার দাবিদার বিভিন্ন দরবারে গেলে আপনি দেখবেন যে, একেক দরবারের যিক্‌র, ওযীফা ও কর্ম-পদ্ধতি একেক রকম, অথচ সকলেই একই তরীকা দাবি করছেন। আবার এদের অনেকেই মাত্র তিন-চার ধাপ পূর্বে একই পীর বা উস্তাদের শিষ্যত্ব দাবি করছেন, অথচ তাদের কর্ম পদ্ধতি এক নয়।

৭. ৭. ৪. সুন্নাতে প্রত্যাবর্তনেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

একজন বুজুর্গ বেলায়াত অর্জন করেন তার সামগ্রিক কর্মের ভিত্তিতে। হাজার হাজার নেক আমলের পাশে দু-একটি ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের বুজুর্গী নষ্ট হয় না। বরং কুরআনের বাণী অনুসারে অনেক নেকীর কারণে এ সকল ভুল বা অন্যায় ক্ষমা হয়ে যায়। পরবর্তী যুগের বুজুর্গগণের মধ্যে বিভিন্ন ভুলত্রুটি রয়েছে। কখনো বিশেষ হালতে, কখনো অনুশীলনের জন্য, কখনো ব্যক্তিগত ইজতিহাদে তাঁরা ভুল

কর্ম করেছেন। এ সকল কর্মের ফলে যেমন তাদের বুজুর্গী নষ্ট হয় না, তেমনি তাঁরা করেছেন বলে এগুলো আমাদের জন্য করণীয় আদর্শ হতে পারে না। কোনো বুজুর্গ গান-বাজনা করেছেন এবং নেচেছেন, কেউ বা ধুমপান করেছেন... এরূপ অগণিত বিষয় রয়েছে। এজন্য সুন্নাতে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ বুজুর্গদের নামে অনেক কিছুই দাবি করা হচ্ছে, কোনটি সঠিক তা বাছাই করার কোনো সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। অনুরূপভাবে কোন্ কর্মটি তাঁরা ইবাদত হিসেবে করেছেন এবং কোন্টি সাময়িক অনুশীলন অথবা ব্যক্তিগত ইজতিহাদের কারণে করেছেন তাও স্পষ্টরূপে জানার কোনো উপায় নেই। পক্ষান্তরে সুন্নাতের ক্ষেত্রে সহীহ ও বানোয়াট জানার মাপকাঠি রয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল কিছুই আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। বুজুর্গগণের বুজুর্গী ও বেলায়াতের জন্য তাঁদেরকে সম্মান করতে হবে এবং ভালবাসতে হবে। কিন্তু অনুকরণীয় পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। তাঁর সুন্নাত অনুসরণের পুর্ণাঙ্গ আদর্শ সাহাবীগণ। বুজুর্গগণকে নির্ভুল, নিষ্পাপ ও সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের মতের অযুহাতে সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবী অস্বীকার বা অমান্য করার পরিণতি কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বুজুর্গগণের কর্ম অনুসরণ করে আমরা সাওয়াব ও বেলায়াত আশা করি। আর সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করলে পঞ্চাশ জন সাহাবীর সমান মর্যাদা ও পুরস্কার পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলেন: "তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি অবিকল তোমাদের পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সাওয়াব না তাদের মধ্যকার?" তিনি বলেন, "না, বরং তোমাদের মধ্যকার ৫০ জনের সমপরিমাণ সাওয়াব।"[১]

৭. ৭. ৫. কারামত-ফয়েয বনাম বেলায়াত-তাযকিয়া

এর চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো বুজুর্গ কে? কে কতবড় ওলী তা কিভাবে আমরা জানতে পারব? ইরানে, আরবে ও অন্যান্য দেশে শিয়াদের মধ্যে অগণিত পীর-দরবেশ বিদ্যমান যাদের কারামত ও কাশফের কথা লক্ষ কোটি মানুষের মুখে মুখে। অথচ সুন্নীগণ তাদের মুসলিম বলে মানতেই নারায। এভাবে প্রত্যেক দলই দাবি করছেন যে, তাদের নেতৃবৃন্দ সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওলী-আল্লাহ। তাদের কাশফ, কারামত ও ফয়েযের অগণিত গল্প তাদের মুখে মুখে। পক্ষান্তরে অন্য দল এদেরকে কাফির, ফাসিক, ওহাবী, বিদ'আতী ইত্যাদি বলে গালি দিচ্ছে।

বস্তুত বুজুর্গী চেনার জন্য কাশফ, কারামত ইত্যাদির উপর নির্ভর করাই সকল বিভ্রান্তির মূল। মুসলিম উম্মাহর সকল বুজুর্গই বলেছেন যে, বুজুর্গী চেনার জন্য এগুলোর উপর নির্ভর করা যাবে না, বরং সুন্নাতের উপরে নির্ভর করতে হবে। সুন্নাতের অনুসরণের পূর্ণতার উপরেই বুজুর্গীর পূর্ণতা নির্ভর করবে। সাহাবীগণের মত যিনি সকল ইবাদত বন্দেগি পালন করতে চেষ্টা করেন, তাঁদেরই মত হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, গীবত, গালাগালি ইত্যাদি পরিহার করেন, তাঁদেরই মত বিনয় ও সুন্দর আচরণ করেন, তাকে আপনি বুজুর্গ বলে মনে করতে পারেন। সুন্নাতের অনুসরণ যত বেশি হবে বুজুর্গীও তত বেশি হবে।

অলৌকিক কর্ম করা, মনের কথা বলা ইত্যাদি কাশফ-কারামত হতে পারে, আবার শয়তানী ইসতিদরাজ হতে পারে। কোন্টি রাব্বানী এবং কোন্টি শয়তানী তা চেনার একমাত্র উপায় সুন্নাতের অনুসরণ। মুজাদ্দিদে আলফে সানী, সাইয়্যিদ আহমদ ব্রেলবী ও অন্যান্য বুজুর্গ উল্লেখ করেছেন যে, কাফির-মুশরিকও রিয়াযত-অনুশীলন করলে কাশফ, কারামত ইত্যাদি অর্জন করতে পারে। এছাড়া শিরক বা বিদ'আতে লিপ্ত করতে শয়তান মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। স্বপ্নে, কাশফে বা জাগ্রত অবস্থায় সে আল্লাহকে বা ওলীদেরকে বারবার দেখতে পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে প্রকৃতই আমাকে দেখল, কারণ শয়তান আমার রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না।"[২] মুসলিম উম্মাহ একমত যে, শয়তান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। তবে অন্য কোনো আকৃতিতে এসে নিজেকে নবী বলে দাবি করতে পারে কি না সে বিষয়ে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। অনেকে বলেন, শয়তান যেমন তাঁর রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে না, তেমনি সে অন্য রূপে এসেও নিজেকে নবীজি বলে দাবি করতে পারে না। অন্য অনেকে বলেন যে, শয়তানের জন্য অন্য আকৃতিতে এসে নিজেকে নবীজি বলে দাবি করা অসম্ভব নয়; কারণ কোনো হাদীসে তা অসম্ভব বলা হয় নি। উপরন্তু মানুষ শয়তান যেমন জাল হাদীস বানাতে পারে, তেমনি জিন শয়তানও স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে জালিয়াতি করতে পারে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবী ইবনু আব্বাস অনুরূপ মত পোষণ করতেন। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ও স্বপ্ন-বিশারদ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীনও (১১০হি) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন।[৩]

বাস্তব অনেক ঘটনা দ্বিতীয় মতটি সমর্থন করে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের ভাই 'মারফতী ন্যাড়ার ফকীর' দলে যোগ দেন। তিনি তার বাড়িতে রাতভর গানবাজনা-সহ যিক্‌রের আয়োজন করেন। এতে গ্রামবাসীরা আপত্তি করলে তিনি দাবি করেন যে, তিনি যখন এভাবে গানবাজনাসহ যিক্‌রের মাজলিসে বসেন, তখন তার মৃত পিতামাতা কবর থেকে উঠে তাদের মাজলিসে যোগ দেন। উপরন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে তাকে এভাবে গানবাজনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ পীর সাহেব ধূমপান করতেন। তাঁর নিকটতম একজন খলীফা জানান যে, স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়েই তিনি ধূমপান করতেন। আগের যুগের কোনো কোনো গ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনার কথা পাওয়া যায়। এরা ভুল দেখেছেন, মিথ্যা বলেছেন, না বাস্তবেই শয়তান এরূপ স্বপ্ন দেখিয়েছে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

সর্বোপরি কাশফ, ফয়েয, হালাত ইত্যাদি ইবাদত কবুল না হওয়ার লক্ষণ হতে পারে। সহীহ সুন্নাত-সম্মত ইবাদতে লিপ্ত হলে শয়তান আবিদের মনে ওয়াসওয়াসা দিয়ে মনোযোগ নষ্ট করতে চেষ্টা করে। যেন মুমিন ইবাদতে মজা না পেয়ে ইবাদত পরিত্যাগ করে বা অন্তত সাওয়াব কম পায়। পক্ষান্তরে ইবাদতের নামে বিদ'আতে রত থাকলে শয়তান কখনোই মনোযোগ নষ্ট করে না, বরং তার মনোযোগ ও হালত বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়। কারণ উক্ত মুমিন তো সাওয়াব পাচ্ছেই না, বরং গোনাহ অর্জন করছে, কাজেই তাকে যত বেশি উক্ত কর্মে রত রাখা যায় ততই শয়তানের লাভ। এজন্যই অনেকে ধার্মিক মানুষকে দেখবেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর সালাত আদায়ে তাড়াহুড়ো করছেন। অথচ বিদ'আত মিশ্রিত যিক্‌র-ওযীফার মধ্যে মহা আনন্দে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিচ্ছেন। তাহাজ্জুদে বা কুরআন তিলাওয়াতে ক্রন্দন আসছে না। কিন্তু বিদ'আত মিশ্রিত যিক্‌র বা দু'আয় অঝোরে কাঁদছেন। অনেকে সালাতের মধ্যে কিছু খেলাফে সুন্নাত নিয়ম পদ্ধতি বা যিক্‌র যোগ করে সালাতে মনোযোগ ও মজা পাচ্ছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ সুন্নাত-সম্মতভাবে সালাত আদায় করলে সেরূপ মজা পাচ্ছেন না। এভাবে আমরা দেখি যে, কাশফ, ফয়েয, হালাত, মজা, ক্রন্দন, স্বপ্ন এগুলো কোনোটিই ইবাদত কবুলের আলামত নয়, বেলায়াতের আলামত হওয়া তো দূরের কথা।

৭. ৭. ৬. বেলায়াত-তাযকিয়াঃ দাবি ও বাস্তবতা

বেলায়াত ও তাযকিয়া-তাসাউফের দাবি সকলেই করছেন। কিন্তু বাস্তবে কী দেখতে পাই? হিংসা, ঘৃণা, বিচ্ছিন্নতা, লোভ, অহঙ্কার, ক্রোধ, অসদাচরণ, গালাগালি, বান্দার হক্ক বিনষ্ট করা ইত্যাদি অগণিত কর্মে লিপ্ত দেখতে পাই এ সকল মানুষদের। অথচ তাঁরা তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াত, যিক্‌র ও অন্যান্য তাযকিয়ার কর্মে লিপ্ত! এর কারণ ঔষধের বিকৃত প্রয়োগ। তাযকিয়া ও বেলায়াতের নামে ইসলামের আংশিক কিছু শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে কাশফ, কারামত, হালাত ইত্যাদিকে মানদণ্ড হিসেবে পেশ করা হচ্ছে। ফলে সত্যিকার তাকওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে না। উপরন্তু অগণিত হারামে লিপ্ত থেকেই 'ওলী' হয়ে গিয়েছি বলে আত্মতৃপ্তি ও অহঙ্কার হৃদয়কে গ্রাস করছে।

৭. ৭. ৭. নবীপ্রেম-ওলীপ্রেমঃ দাবি ও বাস্তবতা

আশেকে রাসূল (ﷺ) হওয়ার দাবি অনেকেই করছেন। ওলীগণের মহব্বত ও অনুসরণের দাবি করছেন সকলেই। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এ সকল প্রেমিককে যেয়ে বলুন, আপনার মত, পোশাক, যিক্‌র, মীলাদ, দরূদ, তরীকা ইত্যাদির সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বা সাহাবীগণের পুরো মিল হচ্ছে না, একটু মিলিয়ে নিন। তাঁরা ঠিক এভাবে যিক্‌র করেছেন, এভাবে মীলাদ পড়েছেন, অমুক বিষয়ে ঠিক একথা বলেছেন, কাজেই আপনি ঠিক অবিকল তাঁদের মত চলুন। আপনি দেখবেন যে, সে প্রেমিক আপনার কথা মানছেন না। আপনার কথাগুলো হাদীসে নেই- সেকথা তিনি দাবি করবেন না। আপনার কথাগুলির বিপরীতে তার মতের পক্ষে কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসও তিনি পেশ করতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করবেন না। বিভিন্ন ওযুহাত দেখাবেন। একেবরে অপরাগ হলে বলবেন, এগুলো ওহাবী মত বা বিভ্রান্ত মত! তিনি যে কর্ম বা মতামত পোষণ করছেন সেটিই একমাত্র সঠিক বা সুন্নী মত। কাজেই কোনো দলিল ছাড়াই সকল হাদীস ও সুন্নাত বাতিল হয়ে গেল।

অনেকের কাছেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত এভাবে 'ওহাবী' বলে উড়িয়ে দেওয়া সহজ, তবে ওলীগণের মতামত উড়িয়ে দেওয়া অনেক কঠিন! রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন বা বলেছেন বললে তাঁরা সহজেই একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বা বিনা ব্যাখ্যাতেই তা উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বুজুর্গদের কথা বা কর্ম অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, অবস্থার পরিবর্তন হয় না। উক্ত ওলী-প্রেমিককে বলুন, আপনি যে, কাজটি করছেন তার বিরুদ্ধে বা যাকে আপনি নিন্দা করছেন তার পক্ষে শাইখ আব্দুল কাদির জিলানী, মুঈন উদ্দীন চিশতী, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী (রাহিমাহুমুল্লাহ) বা অন্য অমুক বুজুর্গ অমুক গ্রন্থে লিখেছেন, তখন একই ভাবে তিনি বিভিন্ন অযুহাতে তা মানতে অস্বীকার করবেন। কোনো অবস্থাতেই তিনি তাঁর মত বা কর্ম পরিবর্তন করতে রাযি হবেন না! যে বুজুর্গের নামে তিনি চলছেন স্বয়ং সে বুজুর্গের মতও যদি তার মতের বিরুদ্ধে পেশ করা হয় তবুও তিনি তার একটি ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু নিজের মত বা কর্ম পরিবর্তন করবেন না।

অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ এটি। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে হক্ক এবং বাতিলের একটিই মাপকাঠি রয়েছে, তা হলো তার নিজের পছন্দ। হাদীস-কুরআন বা বুজুর্গদের মতামত তার পছন্দকে প্রমাণ করার জন্য, পছন্দকে উল্টানোর জন্য নয়। যা তার পছন্দ হয় না তা বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেন। আরবীতে এ মাপকাঠিটির নাম (هوى)। বাংলায় প্রবৃত্তি বা 'ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ' বলা হয়। কুরআন-হাদীসে বারবার এ ভয়ঙ্কর রোগ সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এক স্থানে বলা হয়েছে: "আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তাঁর নিজের পছন্দ অপছন্দ বা নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে ? আপনি কি তার উকিল হবেন?"[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে: অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভাললাগা মন্দলাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ মতের প্রতি তৃপ্তি ও আস্থা।"[২]

এ রোগ থেকে মুক্তির একটিই পথ, নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভাললাগা ও মন্দলাগাকে সুন্নাতের অধীন করা। ব্যাখ্যা দিয়ে সুন্নাতকে বাতিল না করে ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের মত বা বুজুর্গদের মতকে বাতিল করে সুন্নাতকে হুবহু গ্রহণ করা। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

শেষ কথা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের খেদমতে এ বইটি আমার অতি নগণ্য একটি প্রচেষ্টা। চেষ্টার মধ্যে যদি কল্যাণকর কিছু থেকে থাকে তা শুধু মহান প্রতিপালক আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর দয়া ও তাওফীক। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল, ভ্রান্তি আছে সবই আমার অযোগ্যতার কারণে এবং শয়তানের কারণে। আমি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তাওবা করছি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহর দরবারে সকাতর প্রার্থনা যে, তিনি দয়া করে এ অযোগ্য প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেবেন। আল্লাহর কত প্রিয় বান্দা কতভাবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য মহান কাজ করে চলেছেন। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। না পারলাম ব্যক্তিগত জীবনে ভাল ইবাদত করতে। না পারলাম উম্মতের কোনো কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে। এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ দয়া করে কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, যাদেরকে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি ও যারা আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসেন তাঁদের সকলের এবং পাঠক-পাঠিকাগণের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেবেন এ দু'আ করেই শেষ করছি। আমিন!

সালাত ও সালাম সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ (ﷺ), তাঁর পরিজন ও সহচরদের জন্য। প্রথমে ও শেষে, সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

গ্রন্থপঞ্জি

এ গ্রন্থ রচনায় মূলত হাদীসগ্রন্থ ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করেছি। এছাড়া মাঝেমধ্যে দু একটি তাফসীর ও ফিকহ বিষয়ক বই থেকে তথ্য গ্রহণ করেছি। যে সকল গ্রন্থ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটি তালিকা এখানে গবেষক পাঠকদের সুবিধার্থে প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো:

১. কুরআন কারীম
২. ইবনুল মুবারাক (১৮১ হি) কিতাবুয যুহদ, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।
৩. মালিক বিন আনাস (১৭৯ হি), আল-মুয়াত্তা (কাইরো, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৫১)
৪. কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম আল-আনসারী, (১৮২ হি), কিতাবুল আসার, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৫ হি.।
৫. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি), কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৬. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, কিতাবুল আসল বা আল-মাবসূত, করাচি, ইদারাতুল কুরআন
৭. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-হুজ্জাত, বৈরুত, আলামুল কুতুব, ১৪০৩, ৩য় প্রকাশ।
৮. মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল দাব্বী (১৯৫ হি), কিতাবুদ দু'আ (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৯, ১মপ্রকাশ)
৯. আব্দুর রাজ্জাক সানআনী (২১১ হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
১০. আল-ফাররা, আবু যাকারিয়া (২১১ হি), মায়ানীল কুরআন, বৈরুত, আলম আল-কুতুব।
১১. ইবনে হিশাম (২১৩ হি), আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র, ১৯৭৮)
১২. সাঈদ ইবনু মানসূর (২২৭ হি), আস-সুনান, রিয়াদ, দারুল উসাইমী, ১৪১৪ হি., ১ম।
১৩. ইবনে সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি), আত-তাবাকাতুল কুবরা, (বৈরুত, দার সাদির)
১৪. ইবনে আবী শাইবা (২৩৫ হি), আল- কিতাবুল মুসান্নাফ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫)
১৫. আহমদ ইবনু হাম্বল (২৪১ হি), মুসনাদে আহমদ (কাইরো, দারুল মাআরিফ, ১৯৫৮)
১৬. দারেমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান (দামেশক, দারুল কলম, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১)
১৭. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (২৫৬ হি), আস সহীহ, ফতহুল বারী সহ, (বৈরুত, দারুল ফিকর)
১৮. ইমাম বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ, বৈরুত, দারুল বাশাইর, ১৯৮৯, ৩য় প্রকাশ।
১৯. ইমাম বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ, রিয়াদ, দারুল মাআরিফ, ১৯৭৮।
২০. ইবনুল জারূদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৩০৭ হি) আল-মুনতাকা, (বৈরুত, সাকাফিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮)
২১. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১ হি), আস-সহীহ, (কাইরো, দারু এহইয়াইল কুতুবুল আরাবিয়্যাহ)
২২. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআস (২৭৫ হি), আস-সুনান (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮)
২৩. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি), আস-সুনান (ইস্তাম্বুল, মাকতাবাহ ইসলামিয়্যাহ)
২৪. তিরমিযী, আবু ইসা মুহাম্মাদ (২৭৯ হি), আস- সুনান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
২৫. আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ ইবনু হাম্বল (২৯০ হি), আস-সুন্নাহ, (দাম্মাদ, দারু ইবনিল কাইয়িম, ১ম, ১৪০৬হি)
২৬. আল-বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি), আল-মুসনাদ (মদীনা মুনাওয়ারাহ, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৯ হি., ১ম প্রকাশ)
২৭. নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শুআইব (৩০৩ হি), আস-সুনান, (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯২)
২৮. নাসঈ, আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯১)
২৯. নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪০৬ হি, ২য় প্রকাশ)
৩০. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী (৩০৭ হি), মুসনাদে আবী ইয়ালা (দেমাশক, দারুস সাকাফাহ আল- আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৩১. তাবারী, ইবনু জারীর (৩১১হি), জামেউল বাইয়ান/তাফসীরে তাবারী, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮৮)
৩২. ইবনু খুযাইমা (৩১১হি), সহীহ ইবনে খুযাইমা (সৌদী আরব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২য় প্রকাশ ১৯৮১)
৩৩. আবু উ'আনাহ, ইয়াকুব ইবনু ইসহাক (৩১৬হি) আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৮, ১ম)
৩৪. আবু জাফর তাহাবী (৩২১হি), শরহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭)
৩৫. আকু জাফর তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আসার, বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৯৪, ১ম প্রকাশ।
৩৬. ইবনে দুরাইদ (৩২১হি) জামহারাতুল লুগাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিল মাআরিফ উসমানিয়্যাহ, ১৩৪৫হি)
৩৭. উকাইলী, মুহাম্মাদ ইবনু উমর (৩২২হি), আদ-দু'আফা আল-কাবীর, বৈরুত, দারুল মাকতাবাতিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪।
৩৮. ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি), সহীহ ইবনে হিব্বান, তারতীব ইবনে বালবান (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৭)
৩৯. তাবারানী, আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি), আল- মু'জাম আল- কাবীর (ইরাক, ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ)
৪০. তাবারানী, আল- মু'জামুল আওসাত (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৪১. তাবারানী, আল-মু'জামুস সাগীর, জর্দান, আম্মান, দারু আম্মার, ১৯৮৫, ১ম প্রকাশ।
৪২. তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়্যীন, বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৮৪, ১ম প্রকাশ।
৪৩. তাবারানী, কিতাবুদ দু'আ, বৈরুত, ইলমিয়্যাহ।
৪৪. আবু বকর জাস্‌সাস (৩৭০হি), আহকামুল কুরআন (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি.)
৪৫. দারাকুতনী, আলী ইবনু উমর (৩৮৫হি) আস-সুনান, বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৬৬।
৪৬. আল:জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩হি), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য় প্রকাশ, ১৯৭৯)
৪৭. ইবনে ফারিস (৩৯৫হি), মু'জাম মাকায়ীসুল লূগাত (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল:ইসলামী, ১৪০৪)
৪৮. হাকিম নাইসাপূরী (৪০৫ হি), আল- মুস্তাদরাক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্র.)
৪৯. আবু নুআইম আল-ইসবাহানী (৪৩০ হি), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৪০৫, ৪র্থ)
৫০. আল-কুদায়ী, মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ (৪৫৪ হি) মুসনাদুশ শিহাব, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৮৬, ২য়)
৫১. বাইহাকী (৪৫৮হি), শুআবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)

৫২. বাইহাকী, আস- সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪)
৫৩. বাইহাকী, হায়াতুল আনবিয়া, রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ।
৫৪. ইবনু আব্দিল বার, ইউসূফ ইবনু আব্দিল্লাহ (৪৬৩ হি), আত-তামহীদ, মরোক্কো, ওয়াকফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৩৮৭ হি.।
৫৫. খাতীব বাগদাদী, আহমদ ইবনু আলী (৪৬৩ হি), তারীখ বাগদাদ, বৈরুত, ইলমিয়্যাহ।
৫৬. আবু বকর সারাখসী (৪৯০ হি), আল:মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯)
৫৭. আবু হামিদ আল:গাজালী (৫০৫ হি), ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৫৮. আলাউদ্দীন সামারকান্দী (৫৩৯ হি), তুহফাতুল ফুকাহা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৫৯. আবু বকর ইবনুল আরাবী (৫৪৩ হি), আহকামুল কুরআন বৈরুত, দারু এহইয়াইত তুরাসিল আরাবী
৬০. আল-কাসানী, আলাউদ্দীন (৫৮৭ হি), বাদাইউস সানায়ে', বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
৬১. ইবনুল আসীর মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬ হি), জামেউল উসূল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭১)
৬২. ইবনুল আসীর, আন- নিহায়াতু ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৬৩. আল-মাকদীসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আহাদীসুল মুখতারাহ, মাক্কা মুকাররামাহ, মাকতাবাতুন নাহদাতিল হাদীসাহ, ১৪১০হি., ১ম প্রকাশ।
৬৪. মুনযিরী, আব্দুল আযীম (৬৫৬ হি), আত- তারগীব ওয়াত তারহীব (কায়রো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪)
৬৫. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১হি), আল-জামিয় লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী), কাইরো, দারুশ শা'ব, ১৩৭২ হি., দ্বিতীয় প্রকাশ।
৬৬. নববী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি), শারহু সহীহ মুসলিম, সহীহ মুসলিম সহ (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১)
৬৭. নাবাবী, আল-আযকার, (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাত)
৬৮. নাবাবী, রিয়াদুস সালেহীন, (বৈরুত, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ)
৬৯. ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম (৭১১ হি), লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৭০. খাতীব তাবরীযী (৭৩০ হি) মেশকাতুল মাসাবীহ, (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য়, ১৯৮৫)
৭১. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৭৪৮ হি), মীযানুল ইতিদাল, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, ১ম)
৭২. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪১৩, ৯ম সংস্করণ)
৭৩. যাহাবী, আল-কাবাইর, (মদীনা মুনাওয়ারা, দারুত তুরাস, ১৯৮৪, দ্বিতীয় প্রকাশ)
৭৪. ইবনুল কাইয়েম (৭৫১ হি), আল- মানারুল মুনীফ (হালাব, মাকতাবুল মাতবুআতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৭০)
৭৫. ইবনুল কাইয়েম, হাশিয়াতু ইবনুল কাইয়েম আলা আবী দাউদ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫, ২য় প্রকাশ)
৭৬. ইবনুল কাইয়েম, জালাউল আউহাম (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৭৭. যাইলায়ী, আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসূফ (৭৬২ হি), মিশর, দারুল হাদীস, ১৩৫৭ হি.।
৭৮. আল-ফাইউমী, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ (৭৭০ হি), আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৭৯. ইবনু কাসীর (৭৭৪ হি), তাফসীরুল কুরআনিল কারীম (কাইরো, দারুল হাদীস, ২য় প্রকাশ ১৯৯০)
৮০. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ ১৯৯৬)
৮১. ইবনু রাজাব (৭৯৫ হি), জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, (মক্কা মুকাররামা, বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৮২. উমর ইবনু আলী ওয়াদীইয়াশী আনদালুসী (৮০৪হি), তুহফাতুল মুহতাজ, (মক্কা মুকাররামা, দারু হেরা, ১৪০৬, ১ম প্রকাশ)
৮৩. নূরুদ্দীন হাইসামী (৮০৭হি), মাওয়ারিদুয যামআন বি যাওয়াইদি ইবনে হিব্বান (বৈরুত, দারুস সাকাফাতিল আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯০)
৮৪. নূরুদ্দীন হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
৮৫. আল-ফাইরোজআবাদী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকূব (৮১৭ হি) আল:কামূসুল মুহীত (বৈরুত, মুআস্সাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ ১৯৮৭)
৮৬. আল বুসীরী, আহমদ ইবনু আবী বকর (৮৪০হি) মুখতাসারু ইতহাফিস সাদাতিল মাহারাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৮৭. আল বূসীরী, যাওয়ায়িদু ইবনি মাজাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
৮৮. আল বূসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ, (বৈরুত, দারুল আরাবিয়্যাহ, ১৪০৩ হি., দ্বিতীয় প্রকাশ)
৮৯. আহমদ ইবনু আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫হি), মুখতাসারু কিতাবিল বিতর, (জর্দান, যারকা, মাকতাবাতুল মানার, ১৪১৩, ১ম)
৯০. ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি), ফাতহুল বারী, (বরুত, দারুল ফিকর, তারীখ বিহীন)
৯১. ইবনে হাজার, আল ইসাবাহ, (বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৯২, ১ম প্রকাশ)
৯২. ইবনু হাজার, বুলুগুল মারাম, (বৈরুত, তারীখ ও তথ্য বিহীন)
৯৩. ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর, (মাদীনা মুনাওয়ারা, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৪)
৯৪. সান'আনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি), সুবুলুস সালাম, (বৈরুত, তুরাস আরাবী, ১৩৭৯, ৪র্থ প্রকাশ)
৯৫. সাখাবী, শামসুদ্দীন (৯০২ হি), আল- মাকাসিদুল হাসানা, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭)
৯৬. সাখাবী, আল-কাওলুল বাদী' (মদীনা মুনাওয়ার, আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৭, ৩য়)
৯৭. সুয়ূতী, জালালুদ্দীন (৯১১ হি), তাদরীবুর রাবী (রিয়াদ, মাকতাবাতুল কাওসার, ৪র্থ প্র, ১৪১৮হি)
৯৮. সুয়ূতী, ফাদ্দুল ওয়া' ফী আহাদীসি রাফইল ইয়াদাইনি ফিদ দু'আ (জর্দান, যারকা, মাকতাবাতুল মানার, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫)
৯৯. সুয়ূতী ও মাহাল্লী, তাফসীরে জালালাইন, (কাইরো, দারুল হাদীস, ১ম প্রকাশ)
১০০. ইবনু ইরাক, আলী ইবনু মুহাম্মাদ (৯৬৩ হি), তানযীহুশ শারীয়াহ, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৯৮১, ২য়)
১০১. ইবনু নুজাইম (৯৭০ হি), আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর, (মক্কা মুকাররামা, মুসতাফা বায, ১৯৯০)
১০২. মুল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল- আসরারুল মারফুয়া, (লেবানন, বৈরুত, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৫ ইং)
১০৩. মুল্লা আলী কারী, আল-মাসনূ'য়, (হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১৯৬৯, ১ম)
১০৪. মুল্লা আলী কারী, মিরকাত, (বৈরুত, মুআস-সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ)
১০৫. মুজাদ্দিদে আলফে সানী (১০৩৪ হি), মাকতুবাত শরীফ (বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী (ঢাকা, আফতাবীয়া খানকাহ শরীফ, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০ হি./১৪০৬ বাং)
১০৬. আল-যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২হি), মুখতাসারুল মাকাসিদিল হাসানা (সিরিয়া, আল মাকতাব আল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৩),

১০৭. যারকানী, শারহুয যারকানী আলাল মুআত্তা, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ১৪১১, ১ম প্রকাশ)
১০৮. সিনদী, নূরুদ্দীন (১১৩৮ হি), হাশিয়াতুস সিনদী আলান নাসাঈ, (হালাব, মাতবূআত ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬, ২য় প্রকাশ)
১০৯. আজলূনী, ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ (১১৬২ হি), কাশফুল খাফা, (বৈরুত, রিসালাহ, ১৪০৫, ৪র্থ)
১১০. মুহাম্মাদ আল- কাত্তানী (১২৪৫ হি), আর- রিসালাতুল মুসতাতরাফা (লেবানন, বৈরুত, দারুল বাশাইর আল ইসলামিয়্যা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৬ ইং)
১১১. শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি) নাইলুল আউতার, বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৭৩।
১১২. শাওকানী, তুহফাতুয যাকিরীন বি উদ্দাতি হিসনিল হাসীন, (বৈরুত, দারু সাদির, তা. বি.)
১১৩. আব্দুর রাউফ মুনাবী, ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল-কুবরা, ১৩৫৬ হি, প্রথম প্রকাশ)
১১৪. মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান মুবারাকপুরী (১৩৫৩ হি), তুহফাতুল আহওয়াযী, (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ)
১১৫. তাহতাবী, হাশিয়াতুত তাহতাবী, (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ)
১১৬. শামসুল হক আযীমআবাদী, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.)
১১৭. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সাহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
১১৮. আলবানী, যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৮)
১১৯. আলবানী, সাহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২০. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ,১৯৯৭)
১২১. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস যাঈফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১২২. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ)
১২৩. আলবানী, সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব (বিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ৩য় প্রকাশ ১৯৮৮)
১২৪. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১ম প্রকাশ)
১২৫. আলবানী, সহীহুল আদাবিল মুফরাদ, (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ)
১২৬. আলবানী, যায়ীফুল আদাবিল মুফরাদ, (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ)
১২৭. ড. সাঈদ কাহতানী, হিসনুল মুসলিম, (রিয়াদ, মুআসসাসাতুল জুরাইসী, ১৭ম প্রকাশ, ১৪১৬হি)
১২৮. মাওলানা মুহাম্মাদ সারফারায খানসাহেব সাফদার, রাহে সুন্নাত: আল-মিনহাজুল ওয়াদিহ (ভারত, দেওবন্দ, মাকতাবাতু দানেশ, তা. বি)
১২৯. যাকারিয়্যা ইবনু গোলাম কাদির, আল-ইখবার ফীমা লা ইয়াসিহহু মিনাল আযকার, (জেদ্দা, দারুল খাররায, ১ম প্রকাশ, ২০০১)
১৩০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, "এহ্ইয়াউস সুনান" সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঢাকা, ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ১ম প্রকাশ, ২০০২)।
১৩১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৬)।